সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ : বাংলাদেশ (১৯৫৬-১৯৮৫)

পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম :

সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ : বাংলাদেশ (১৯৫৬-১৯৮৫)

গবেষকের নাম : মো. রাকিবুল ইসলাম
নিবন্ধন নম্বর : ১১৯/২০১৫-১৬ (পুনঃ)

তত্ত্বাবধায়কের নাম : ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
নভেম্বর ২০১৯

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মো. রাকিবুল ইসলাম রচিত 'সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ : বাংলাদেশ (১৯৫৬-১৯৮৫)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। সন্দর্ভটি গবেষকের একক গবেষণালব্ধ ফল। গবেষক এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশ করেননি।

(ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০
(ডেপুটেশন)

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, 'সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ : বাংলাদেশ (১৯৫৬-১৯৮৫)' আমার একক গবেষণালব্ধ অভিসন্দর্ভ। আমি এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোথাও কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করিনি, বা কোথাও প্রকাশের জন্য জমা দেইনি।

(মো. রাকিবুল ইসলাম)
পিএইচ. ডি. গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নিবন্ধন নম্বর : ১১৯/২০১৫-১৬ (পুনঃ)

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

প্রসঙ্গকথা ৭

অবতরণিকা ৯

প্রথম অধ্যায় : সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ **১১**

দ্বিতীয় অধ্যায় : সাহিত্যনির্ভর বাংলা চলচ্চিত্র **৩০**

তৃতীয় অধ্যায় : সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ : বাংলাদেশ (১৯৫৬-১৯৮৫) **৪০-২১২**

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ ৪১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ গল্প হতে সিনেমা ১২৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ নাটকের চলচ্চিত্ররূপ ১৪৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ চলচ্চিত্রে লোকসাহিত্য ১৭৪
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ কবিতার ছবি ১৯৪

উপসংহার ২১৩

ঈরিশিষ্ট ২১৬

সাহিত্যনির্ভর বাংলা চলচ্চিত্রপঞ্জি ২১৭
গ্রন্থপঞ্জি ২২৩
সাক্ষাৎকারপঞ্জি ২৩৯

প্রসঙ্গকথা

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে গণমাধ্যমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততার কারণে এ বিষয়ে গবেষণার প্রতি আগ্রহবোধ করি। প্রথমে 'বাংলাদেশের টেলিভিশন নাটক' নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলাম। কিন্তু শৈশব থেকে চলচ্চিত্রের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও ভালোলাগার কারণে পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু হিসেবে চলচ্চিত্রকে বেছে নেই। তৎসময়ে বাংলাদেশের কোন পাবলিক-বিশ্ববিদ্যালয়ে চলচ্চিত্র-অধ্যয়ন বিষয়ক বিভাগ না থাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগে যোগাযোগ করি। উক্ত বিভাগের তৎকালীন প্রধান, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. ইস্রাফিল শাহিন আমাকে এ বিষয়ে বাংলা বিভাগে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। সে-অনুযায়ী বাংলা বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক বরেণ্য শিক্ষক ড. আবুল কাসেম ফজলুল হক-এর শরণাপন্ন হই। তিনি অবসরোত্তর ছুটিতে থাকায় আমাকে একই বিভাগের আরেক শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করার সুযোগ করে দেন—আজ সকলের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি।

অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও রূপরেখা-নির্মাণে আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছিলো গবেষণা সমাপ্তির মূলমন্ত্র। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শে 'সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ : বাংলাদেশ (১৯৫৬-১৯৮৫)' শিরোনামে গবেষণায় প্রবৃত্ত হই। তাঁর বাসায় সময়ে-অসময়ে অবাধ যাতায়াতের সুযোগ দিয়ে এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে আমাকে গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করার পথ সুগম করে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিসীম। স্যারের সহধর্মিণী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান শ্রীমতী শিপ্রা সরকার আমার সকল উৎপাত হাসিমুখে প্রশ্রয় দিয়ে, গবেষণাকর্মের খোঁজ-খবর নিয়ে এবং নিয়ত উৎসাহ প্রদান করে বিশেষভাবে ঋণী করেছেন।

গবেষণা-প্রস্তাবনা প্রণয়নকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আনোয়ারুল আজিম ও সহকারী অধ্যাপক (বর্তমান অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) ড. মিল্টন বিশ্বাস তাঁদের সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। চলচ্চিত্র-গবেষক অনুপম হায়াৎ অনেক তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। গবেষক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব মির্জা তারিকুল কাদের উদারভাবে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে যারা প্রয়োজনীয় গ্রন্থসহায়তা, পরামর্শদান এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শ্রদ্ধেয় চলচ্চিত্রকার প্রয়াত চাষী নজরুল ইসলাম, ভারতের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার গৌতম ঘোষ, চলচ্চিত্রকার তানভীর মোকাম্মেল, চলচ্চিত্রকার নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান, প্রয়াত নায়ক বুলবুল আহমেদ, শিশু সাহিত্যিক কাইজার চৌধুরী, নায়ক ফারুক, নায়িকা ববিতা, নায়িকা কবরী, ড. তোবারাক হোসেন ভূঁইয়া, নায়িকা মৌসুমী, নায়ক রিয়াজ, নায়ক ওমর সানী, বরেণ্য অভিনেত্রী আনোয়ারা, ড. হানিফ সিদ্দিকী, আবদুল বারী মোল্লা, সাংবাদিক রাজিব নূর, জার্মান প্রবাসী সাংবাদিক জাহিদ আল-আমিন, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সাংবাদিক মাইনুল শাহিদ, সাংবাদিক নূর মোহাম্মদ, চলচ্চিত্র নির্মাতা পার্থিব রাশেদ প্রমুখ। এঁদের সবার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

গবেষণাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় গণগ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এই দুই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অনুলিপি বিভাগের সংশ্লিষ্টদের, যারা ধৈর্যসহকারে অসংখ্য বইয়ের ফটোকপি করে দিয়ে গবেষণাকর্মকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছেন, তাদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

সর্বদা উৎসাহ-অনুপ্রেরণাদায়ী আমার আব্বু, আশীর্বাদকারী আম্মু ও সংসারের কঠিন দায়িত্ব এবং নিজের পেশাগত কর্তব্য পালন করেও গবেষণা সমাপ্ত করতে নিরন্তর তাগিদ জুগিয়ে যাওয়া আমার সহধর্মিণী সর্বদা সহযোগিতা করেছেন—তাঁদের ঋণ পরিশোধযোগ্য নয়। গবেষণা করতে গিয়ে যাদের সবচেয়ে বঞ্চিত করেছি ; তারা অবারিত আনন্দ ও উদ্যম যুগিয়ে নিরলস কাজ করার প্রেরণাদায়ী আমার পুত্রদ্বয়—অধিনায়ক ও অভিনন্দন।

মো: রাকিবুল ইসলাম

ঢাকা, ৩০ অক্টোবর, ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

চলচ্চিত্র আধুনিক যুগের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। কী শিল্প, কী বিনোদন, কী ব্যবসায় ; কখনওবা ব্যবসায় প্রসারের উপায় কিংবা প্রচারের মাধ্যম—সর্বক্ষেত্রে এর অসীম বিচরণ। সৃষ্টির এতো অল্প সময়ের মধ্যে চলচ্চিত্রের মতো সর্বত্র প্রভাব বিস্তারকারী মাধ্যম আজ-অবধি আবিষ্কৃত হয়নি। অর্থ উপার্জনের উপায় হিসেবে চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু হলেও এর নানাবিধ সংশ্লেষ সমাজ ও ব্যক্তিক জীবনে বর্তমান বৈশ্বিক-বাস্তবতায় অপরিহার্য হয়ে ওঠেছে। চলচ্চিত্র আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নিয়ত প্রভাবিত করে চলেছে। বলা যায়, আমরা এখন চলচ্চিত্র বলয়ের মধ্যে বাস করছি এবং কোন না কোনভাবে এর দ্বারা চালিত হচ্ছি। চলচ্চিত্রকে আমরা যদি শিল্প হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে এটি সকল শিল্পের শিল্প ; এর মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত, রঙ, 'পারফর্মিং আর্ট' প্রভৃতি। ব্যবসায় হিসেবে চলচ্চিত্র স্বয়ং বিলিয়ন-বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা। অপরদিকে অন্য ব্যবসায়ের প্রচার-প্রসারের মাধ্যম—উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন বিশেষ চলচ্চিত্র দেখে বিশেষ কোন পন্য, সেবা কিংবা 'স্টাইল'–এর প্রতি দর্শকদের আগ্রহ তৈরি হতে পারে, ফলে উক্ত পন্য বা সেবার কাটতি বেড়ে গিয়ে ব্যবসায়ের সমৃদ্ধি ঘটাতে পারে। আজকাল অর্থের বিনিময়ে সিনেমায় অতি কৌশলে অভিনেতা-অভিনেত্রীর ব্যবহার্য বিষয় হিসেবে পন্যের উপস্থাপন করা হয়—যা বিপণন বাড়ানোর কৌশল হিসেবে স্বীকৃত। চলচ্চিত্রকে শিক্ষা-সচেতনতা বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অধিকার, পরিবার-পরিকল্পনা, 'স্যানিটেশন' প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করতে সরকারি ও বেসরকারিভাবে চলচ্চিত্রকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। এমনকি বর্তমানে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে প্রচার করতে বা তা কায়েম করতে চলচ্চিত্রের ব্যবহার করে থাকে। চলচ্চিত্রের এই বহুবিধ ব্যবহার অন্য সকল মাধ্যম থেকে যে ফলপ্রসু তা আজ সর্বজন বিদিত। সর্বোপরি বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে একে বিবেচনা করলে দেখা যায়, আমাদের প্রাত্যাহিক জীবন আজ চলচ্চিত্র ছাড়া অসম্পূর্ণ।

চলচ্চিত্রকে যেভাবেই বিবেচনা করা হোক না কেন এর মধ্যে শিল্প-সংস্রব না ঘটলে সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। তাই চলচ্চিত্র সৃষ্টির অব্যবহিত পর থেকেই এর শিল্প-সংযোগ ও শিল্প-অন্বেষণ শুরু হয়েছে। এ কারনে শুরুতেই চলচ্চিত্র দ্বারস্থ হয়েছে সাহিত্যের দরবারে। কেননা সাহিত্যের ভান্ডারে রয়েছে এমন সব শিল্পিত গল্প, এমন সব সিনেমাটিক উপাদান, যা আদর্শ চলচ্চিত্র সৃষ্টির পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। তাই আজ-অবধি চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্যের সংশ্লেষের মতো শিল্পের অন্যান্য শাখার এতো ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়নি। সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের লেনা-দেনা, সম্পর্ক-বিরোধই বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

'সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ : বাংলাদেশ (১৯৫৬-১৯৮৫)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশে নির্মিত তিন দশকের সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র থেকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে বিচার করে সাতটি চলচ্চিত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। যাতে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা ও বিভিন্ন ধরনের গল্প নমুনা হিসেবে ব্যবহার করে সামগ্রিক বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। এই অভিসন্দর্ভে 'উপসংহার' ব্যতীত তিনটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে পর্যালোচনার বিষয়—'সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ'। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগ এবং এই দুই মাধ্যমের মিথস্ক্রিয়ায় উভয়ের লাভ-ক্ষতি ও সম্ভাবনার কারণসমূহ শনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাহিত্যনির্ভর বাংলা চলচ্চিত্র বিষয়ে সারসংক্ষেপ আলোচনা করা হয়েছে। 'সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ : বাংলাদেশ (১৯৫৬-১৯৮৫)' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে পাঁচটি পরিচ্ছেদ—এক. 'উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ', দুই. 'গল্প হতে সিনেমা', তিন. 'নাটকের চলচ্চিত্ররূপ', চার. 'চলচ্চিত্রে লোকসাহিত্য' পাঁচ. 'কবিতার ছবি'।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই অভিসন্দর্ভে উল্লেখিত সময়রেখার মধ্যে নির্মিত সবকটি সাহিত্যনির্ভর সিনেমা নিয়ে পর্যালোচনা করলে গবেষণার কলেবর বৃদ্ধির কারণে অন্বিষ্ট বিষয়ের গভীরে আলোকপাত করা সম্ভব হতো না। ফলে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হতো। তাই আলোচনার মূল বিষয়গুলো নির্বাচন করে এর আলোকে এক বা একাধিক সিনেমা বাছাই করা হয়েছে গবেষণাকর্মকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য। সিনেমা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—সিনেমা কিংবা নির্মাতার গুরুত্বকে নয়। এ কারণে অনেক শিল্পমান-সমৃদ্ধ ভালো সিনেমা বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে পর্যালোচনার বাইরে রয়ে গেছে—যা আলাদাভাবে গবেষণার দাবি রাখে। অপরদিকে কোন্ লেখকের সাহিত্য বাছাই করা হয়েছে তা-ও এখানে প্রাধান্য পায়নি। গবেষণায় উল্লেখিত সময়কালের মধ্যে অনেক ভালো লেখকের সাহিত্য থেকে ভালোমানের সিনেমা নির্মিত হলেও নির্দিষ্ট বিষয়ে নির্বাচিত সিনেমা পর্যালোচনা করার কারণে সাহিত্যনির্ভর অনেক ভালোমানের সিনেমা বাদ দিতে হয়েছে। অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত সকল স্থিরচিত্র ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় যে সকল সাহিত্য ও তা থেকে নির্মিত চলচ্চিত্র নির্বাচন করা হয়েছে—তাদের উভয়ের আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ পর্যালোচনা করতে গিয়ে যেসব উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে, তা পাদটীকা হিসেবে পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়ের শেষে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভে উদ্ধৃত চলচ্চিত্র ও উপন্যাসের নাম, পৃষ্ঠাসংখ্যা বা দৃশ্যনম্বর সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রের নয় নম্বর দৃশ্য বোঝাতে লেখা হয়েছে তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ৯। অনুরূপভাবে উপন্যাসের একত্রিশ পৃষ্ঠা বোঝাতে তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ৩১ লেখা হয়েছে। একইভাবে গল্পের সংক্ষিপ্তরূপ গ. ; নাটকের সংক্ষিপ্তরূপ না. ; কবিতার সংক্ষিপ্তরূপ ক. ; লোকসাহিত্যের সংক্ষিপ্তরূপ লো. লেখা হয়েছে। ইংরেজীতে Page No. বোঝাতে সংক্ষেপে P. ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ

প্রথম অধ্যায়

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ

ভাষা সৃষ্টির ইতিহাস থেকে জানা যায় প্রাচীন সুমেরু সভ্যতায় প্রথম লিখিত ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। আধুনিক ইতিহাসবিদরা মনে করেন খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে সেখানকার অধিবাসীরা সুমেরীয় ভাষায় কথা বলত।[১] এর আগে আকারে-ইঙ্গিতে, মাটিতে দাগ কেটে বা ছবি এঁকে মানুষ মনের কথা প্রকাশ করত। সুমেরীয়রাই প্রথম ব্রোঞ্জ-এর পাত্রে খোদাই করে ভাষার লিখন পদ্ধতির ব্যবহার শুরু করে। ইংরেজিতে এটি 'proto-writing' (খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের শুরুতে এর ব্যবহার শুরু হয়) নামে পরিচিত। ভাষাসৃষ্টির পর থেকে মানুষের গল্প বলার একটি মাধ্যম তৈরি হয়ে যায়। লোকমুখে বিভিন্ন গল্প মানুষের আনন্দ-বিনোদনের অবলম্বন হয়ে ওঠে। এসব গল্প মুখে-মুখে প্রচারিত হয়ে লোকসাহিত্যের জন্ম দেয়। লিখন-পদ্ধতি আবিষ্কারের পর লোকসাহিত্য ধীরে-ধীরে লেখ্যরূপ পায়। এভাবে মানুষের গল্প বলা ও শোনার আদিম ইচ্ছা থেকে কালক্রমে জন্ম হয় আধুনিক সাহিত্যের।

ভাষা ও সাহিত্যের মতো চলচ্চিত্রের ইতিহাস এতো পুরাতন নয়। বলা যায় এটি শিল্পের একটি নবীন শাখা। তবে চিত্রে গতিময়তা আনার প্রচেষ্টা গুহাচিত্রের আমল থেকেই শুরু হয়েছে। পুরাতন প্রস্তরযুগে, প্রায় সাড়ে আঠার হাজার বছর আগে প্রাচীন স্পেনের আলতামিরা গুহাচিত্রে ধাবমান বাইসন্ বোঝাতে এর ছয়টি পা এঁকে ছবিকে গতিময় করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এটিই বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্র সৃষ্টি-প্রয়াসের প্রামাণ্য দলিল। এরও অনেক আগে থেকে মানুষ তার চোখের সামনে প্রত্যহ ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি হুবহু চিত্রে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে আসছে। বহু দিনের বহু লোকের চেষ্টার ফলে স্থিরচিত্রের গতিময় রূপ থেকে চলচ্চিত্রের সার্থক নির্মাণ মাত্র একশ বছরের কিছু অধিককাল আগের ঘটনা। কিন্তু এই অল্প সময়ে মানুষ ও সমাজের ওপর এর প্রভাব ব্যাপকতা লাভ করে। তাই, অল্প সময়েই একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র স্বীকৃতি লাভ করেছে।

চলচ্চিত্র একটি মিশ্রশিল্প। ক্যামেরা এর প্রধান উপায় বা বাহন। কারিগরি দিক ছাড়া কাহিনি বা প্লট এর প্রধান উপাদান। সাহিত্যের মতো চলচ্চিত্রের সাফল্য-ব্যর্থতা শুধুমাত্র কাহিনির ওপর নির্ভর করে না। সামগ্রিক সফলতা নির্ভর করে অভিনয়, পরিচালনা, সম্পাদনা ও অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহারে। সাহিত্যের প্রধান বাহন শব্দ। একের পর এক শব্দ বুনে সাহিত্যিক তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করেন। চলচ্চিত্রের মূল উপাদান হচ্ছে ইমেজ বা ছবি। ছবি সেখানে কথা বলে। ছবির পর ছবি সাজিয়ে চলচ্চিত্রকার একটি ঘটনা বা বিষয়কে চিত্রায়িত করেন। চলচ্চিত্র হচ্ছে সমাজের ঘটনানির্ভর জীবনপ্রণালী ও সংস্কৃতির চিত্রিতরূপ। তেমনি, সাহিত্যও একটি সমাজের ঘটনাবহুল জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির বর্ণিতরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ অর্থে চলচ্চিত্র মানে চলমান চিত্র। অর্থাৎ, স্থিরচিত্রের চলমান রূপ। কিন্তু একটিমাত্র স্থিরচিত্রকে প্রযুক্তির দ্বারা চলমান করলেই তাকে চলচ্চিত্র বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, যে চিত্রসমষ্টি চলে বা গতিশীল তা-ই চলচ্চিত্র। কিন্তু এতেও চলচ্চিত্রের সংজ্ঞার্থ পরিষ্কার হয় না। ধরা যাক, অনেকগুলো বিক্ষিপ্ত স্থিরচিত্রকে গতিশীল করে কয়েক মিনিট কিংবা কয়েক ঘণ্টার একটি ক্লিপ তৈরি করা হলো—তাকে কি চলচ্চিত্র বলা যাবে? এক কথায় উত্তর, যাবে না। কারণ কয়েকটি ধ্বনি মিলে যদি অর্থপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ না করে—তাহলে যেমন তাকে ভাষা বলা যায় না, তেমনি অনেকগুলো স্থিরচিত্র মিলে যদি কোন অর্থপূর্ণ কাহিনি তৈরি করতে না পারে, তাকেও চলচ্চিত্র বলা যায় না। এখন ধরা যাক, কোন ব্যবসায়িক পণ্যের বিজ্ঞাপনে যদি একটি অর্থপূর্ণ কাহিনি বর্ণনা করা হয়—তাহলে সেটা কি চলচ্চিত্র হবে? চলচ্চিত্রের সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী একেবারেই না। কারণ বিজ্ঞাপনে পণ্যের প্রসারের জন্য আপাতদৃষ্টিতে একটি কাহিনি বলা হলেও তা পূর্ণ কাহিনি নয়। কাহিনির খণ্ডাংশ মাত্র।

তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সময়ের পরিধিতে যা-ই হোক না কেন, চলচ্চিত্র হতে গেলে অনেকগুলো স্থিরচিত্র মিলে একটি পূর্ণ কাহিনি বর্ণনা করতে হবে, যা অবশ্যই অর্থপূর্ণ হবে। হোক সেটা পাঁচ মিনিটের শর্টফিল্ম বা ডকুমেন্টরি কিংবা তিন ঘণ্টার পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি। চলচ্চিত্রের পরিচয়জ্ঞাপক অভিধা একাধিক। মুভ করে বলে ইংরেজিতে একে বলা হয় মুভি। সিনেমাটোস্কোপে নির্মিত হতো বলে এর নামকরণ হয়েছে সিনেমা। ফিল্মে ধারণ করা হয় বলে ফিল্ম। ছবির সাহায্যে গল্প বলা হয় বলে একে ছবিও বলা হয়। এমনকি বইয়ের গল্প (সাহিত্য) থেকে চলচ্চিত্র নির্মিত হয় বলে বাংলায় কিছুকাল আগেও সিনেমাকে বই বলে শনাক্ত করা হতো।

সাহিত্যে গল্প বলা যেমন প্রাচীন বিষয়, তার চেয়েও অনেক পুরনো চিত্রের সাহায্যে গল্প বলার রীতি। প্রাচীন মানুষরা লিখতে জানত না। ভাষাও তখন সুগঠিত ছিল না। তখন চিত্রের সাহায্যে তারা মনের ভিতরের ভাব-গল্প প্রকাশ করার চেষ্টা করত। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের প্রাচীন গুহাচিত্রে দেখা যায়, গুহাবাসীরা দেয়ালে পশুর রক্ত, চর্বি, বিভিন্ন রকমের মাটি ও গাছ-গাছড়ার রসমিশ্রিত এক ধরনের রঙ ব্যবহার করে বিভিন্ন জীবজন্তুর ছবি আঁকত। তৎকালে গুহাবাসীদের জীবিকার প্রধান উপায় ছিল পশুশিকার। শিকারে যাওয়ার প্রাক্কালে তাদের চাওয়া থাকত দেবতা যেন একটি শিকার (পশু) তাদের ভাগ্যে লিখে দেন। পাশাপাশি ভয় এবং প্রার্থনাও ছিল—তারা নিজেরাই যেন বন্য হিংস্র পশুদের শিকারে পরিণত না হয়। সঙ্গত কারণে শিকার সম্বন্ধীয় গল্পগুলোই তারা অবসর সময়ে চিত্রে বলার চেষ্টা করত। অন্যদিকে গুহা না থাকায় প্রাচীন মিশরীয়রা ছবি আঁকত প্রার্থনাঘর, মন্দির বা কবরের দেয়ালের গায়ে। আবার, ধারাবাহিক ছবির মাধ্যমে তারা বিভিন্ন গল্প বলার চেষ্টা করত। ভাষার হরফ হিসাবে ব্যবহার করত বিভিন্ন ছবিকে। ইংরেজিতে এই মাধ্যমটিকে বলা হয় 'হাইঅরোগ্লিফিক'। তাদের আঁকা ছবিতে গল্পবলার বিষয়বস্তু ছিল গুহাবাসীদের চেয়ে ভিন্ন। ছবির মাধ্যমে তারা বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ, শিকার, সৈন্য, মৃত রাজা-রানীর গল্প বলত। সাধারণ লোকদের ছবি এরা আঁকত ছোট করে, আর রাজা-রানীর ছবি আঁকত কয়েকগুণ বড় করে। এভাবে এরা বোঝাতে চাইত রাজারা সাধারণের চেয়ে অনেক বড়, ক্ষমতাধর আর পরাক্রমশালী।[২]

চলচ্চিত্র মানুষের অর্থপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশে সক্ষম। সুতরাং এটিও এক ধরনের ভাষা। বলা যায়, এটি পৃথিবীর নবীনতম ভাষা। স্থান-কালের সীমানা ছাড়িয়ে দর্শকগণ চলচ্চিত্রের সাধারণ ভাষা

Dhaka University Institutional Repository

বুঝতে সক্ষম। অপরদিকে, সাহিত্যের ভাষা ঐ নির্দিষ্ট ভাষাজ্ঞান ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে না। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের ভাষা সাহিত্যের ভাষা থেকে অনেক ব্যাপক এবং সুবিধাময়। এই ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ইমেজ বা ছবি। ক্যামেরা এর রচয়িতা। স্যালুলয়েড এর ধারক। যদিও, এই কথার সত্যতা ক্রমশ কমে আসতে শুরু করেছে। স্যালুলয়েডের জায়গা দখল নিতে শুরু করেছে বিজ্ঞানের নব-নব আবিষ্কার। আজকাল ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে সরাসরি হার্ডডিস্ক/হার্ডড্রাইভ/মেমোরিকার্ডে ছবি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যায়। সিনেমার নির্বাক-যুগে চলচ্চিত্র ছিল পুরোপুরি সর্বজনীন ভাষা। পরে শব্দযোজনা করে নির্দিষ্ট ভাষাভাষীর কাছে একে আরো বোধগম্য করে তোলা হয়েছে। তবে এর সর্বজনীনতা এখনো অক্ষুণ্ন আছে। ভাষা জানা না থাকার পরও আফ্রিকান সিনেমা দেখে যেমন জাপানিরা বুঝতে পারে, তেমনি বাংলা সিনেমা দেখেও আমেরিকানরা বুঝতে পারে। দৃশ্যময়তার বাড়তি সুবিধার কারণে, 'শিল্প হিসেবে সাহিত্য যদি বয়সে বা বৈচিত্র্যে জিতে যায়, চলচ্চিত্র অন্যদিক থেকে টেক্কা দেয় প্রভাবে ও বিস্তারে'।[৩]

সাহিত্যের মতো চলচ্চিত্রও মানুষের গল্প-বলার কাজটি করে থাকে। তবে, শব্দের পর শব্দ লিখে নয়, ছবির পর ছবি সাজিয়ে। প্রথমদিকে চলচ্চিত্রে হাতে-আঁকা ছবি ব্যবহার করা হত। পরে এর জায়গা দখল নেয় ক্যামেরায় তোলা স্থিরচিত্র। এই স্থিরচিত্র আবিষ্কারের ইতিহাস বেশ পুরোনো। যেকোন বস্তুর হুবহু ছবি তৈরির প্রচেষ্টা সেই প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে চীনা দার্শনিক মো জি (Mo Di, 470 BC-391 BC)[৪] এবং গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল (৩৮৪ খ্রিষ্টপূর্ব-৩২২ খ্রিষ্টপূর্ব)[৫] পিনহোল ক্যামেরা সম্বন্ধে বর্ণনা করেন, যা পরবর্তী সময়ে স্থিরচিত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হতো। তবে চলচ্চিত্র হচ্ছে অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যোগফল। 'বিজ্ঞানের আধুনিক বিকাশকে একাত্ম করে, চলচ্চিত্র আধুনিকতম শিল্পমাধ্যম হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছে। হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র একটি মাধ্যম, স্বতন্ত্র একটি শিল্প।'[৬]

বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জন চলচ্চিত্র দেখানোর চেষ্টা করলেও এ কাজে প্রথম সফল হন লুমিয়ের ব্রাদার্স। ১৮৯৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর, ফ্রান্সের গ্র্যান্ড ক্যাফে ইন প্যারিস-এ চলচ্চিত্রের দুই আদি পুরুষ অগাস্ত লুমিয়ের (১৮৬২-১৯৫৪) এবং লুই লুমিয়ের (১৮৬৪-১৯৪৮) প্রথম দর্শকদের সামনে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন।[৭] বিশ্বের ইতিহাসে যাত্রা শুরু হয় এক বিস্ময়কর শিল্পের। যদিও চলচ্চিত্র শুরুর প্রথম দিকে এটি ছিল শুধুই বৈজ্ঞানিক চমক। এমনকি লুমিয়ের ভাইদের কাছেও। 'সচেতনভাবে ...তাঁরা সিনেমার জন্মদানে প্রয়াসী ছিলেন না, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিরসনই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবু সিনেমার জন্মের পটভূমি হিসাবে এর মূল্য যেমন অপরিসীম, তেমনি চিত্তাকর্ষক।'[৮] পর্দায় মানুষ, প্রাণী বা কোন বস্তুর গতিময়তা দর্শককে বিমোহিত করত। এই চমকের ঘোর কাটতে তাদের বেশিদিন সময় লাগল না। সংশ্লিষ্টরা জানেন, ভাষাসৃষ্টির ইতিহাস কতো দীর্ঘ ও জটিল। কিন্তু বর্তমানে একটি শিশু যে ভাষাগোষ্ঠীতেই জন্মাক না কেন, সে তার শ্বাসকার্যের মতো স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই ভাষা আয়ত্ত করে নেয়। 'মানুষের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিশুর বিবিধ মানসিক ও সামাজিক ধারণার মতো ভাষাও জন্মাবধি অধিগত হইয়া যায়। যেহেতু শিশুমনের বৃদ্ধি তাহার ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া যায় সেহেতু মাতৃভাষা-লাভে সে কখনই সজ্ঞান চেষ্টা করে না।'[৯] চলচ্চিত্রের আবিষ্কারও তেমনি বহু জটিল পথ পাড়ি দিয়ে লুমিয়েরদের হাতে সফলতা পেলেও কিছুদিনের মধ্যেই তা মানুষের কাছে প্রাত্যহিক ঘটনার মতোই স্বাভাবিক হয়ে যায়। অথচ প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

চলচ্চিত্র প্রদর্শনের দিন দর্শকরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়েছিলেন। সাধারণের কাছে বিস্ময় কেটে গেলে ১৯০০ সাল নাগাদ লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং বিদায় নেন চলচ্চিত্র ব্যবসা থেকে।[১০]

আবিষ্কারের শুরুতে চলচ্চিত্র ছিল পরিচালক বা ব্যবসায়ীদের কাছে শুধুই অর্থ উপার্জনের উপায়, সার্কাস বা ম্যাজিকের মতই বাণিজ্য করার নতুন উপকরণ মাত্র ; অনেকটা বেচাকেনার হাটে রোজগারের পণ্য হিসেবেই এর জন্ম। ফলে, Art অর্থে শিল্প হয়ে ওঠার আগে এটি Industry অর্থে শিল্প হয়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক চমক কেটে গেলে চলচ্চিত্রকাররা দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে বেছে নিলেন পর্দায় ছোট ছোট কাহিনিচিত্র বা তথ্যচিত্র দেখানো। চলচ্চিত্রের শুরুতে 'নির্বাক ছবিতে কিছু-কিছু দৃশ্য কিংবা জীবনের চলমান মুহূর্তের দৃশ্যধারণ করা হতো। তাতে মুভি যে স্থিরচিত্র থেকে আলাদা—তা স্পষ্ট হয়ে গেল। পরবর্তী সময়ে তাকে সংগঠিত করার চেষ্টা করা হলো এইজন্য যে, এই শটগুলোর মাধ্যমে যদি গল্প বলা যায়।'[১১] চলচ্চিত্রের আদিপুরুষ লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ও প্রথমে মনমতো যা পেতেন তা ক্যামেরায় ধারণ করে দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করতেন। যেমন : স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে, বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছে কিংবা নাস্তার টেবিলে শিশুর দৃশ্য। পরবর্তী সময়ে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে দর্শক ধরে রাখতে তারা এক শটের মধ্যেই হাস্যরসাত্মক গল্প বলার চেষ্টা করতেন। অর্থাৎ ক্যামেরা স্থির অবস্থায় চালু করে গল্প অথবা ফিল্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যেতেন, আর একই ফ্রেমে সাজানো গল্পটি তখন অভিনীত হতো। *Watering the Gardener* এর একটি চমৎকার উদাহরণ।

চলচ্চিত্রে গল্প-বলার এই যে প্রয়াস, তা থেকে সাহিত্যের সঙ্গে এর একধরনের বন্ধন তৈরি হয়ে গেল। এই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গল্পচিত্রেও দর্শকদের মন বেশিদিন তৃপ্ত রইল না। পরবর্তীকালে ফরাসি চলচ্চিত্রকার মেলিয়েঁ (Marie-Georges-Jean Méliès, known as Georges Méliès, 1861-1938) এক শটের গল্প বলা থেকে বহু শট বিভাজনে গল্প বলার রীতি তৈরি করেন। কাহিনিচিত্রণে বেছে নেন 'সিন্ড্রেলা'র (Cinderella, 1899, based on the fairy tale by Charles Perrault) মতো বিভিন্ন রূপকথার গল্প। সিন্ড্রেলাকে তিনি তিনটি ভাগে বিশটি শটে বিভক্ত করে চিত্রায়িত করেন। এরপর Jules Verne (1828-1905) –এর ফ্যান্টাসিধর্মী গল্প অবলম্বনে তৈরি করেন 'A Trip to the Moon' (1902)। খণ্ড-খণ্ড দৃশ্য জোড়া দিয়ে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ গল্প বলার রীতি সেই থেকে শুরু হয়ে যায়। কিন্তু দর্শকরা চলচ্চিত্রের কাছে আরও বেশি কিছু প্রত্যাশা করতে থাকল। ঠিক যেমনি সাহিত্যে বলা হয় মানুষের গল্প, মানবিকতার গল্প, জীবনের গল্প—সে রকম। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্রের অধ্যাপক Haig P. Manoogain (1916-1980) তাঁর *The Film Makers Art* (1966, New York : Basic Books) গ্রন্থে বলেন– 'Plot is the working out of the story of a film comprising a casually connected series of motivated incidents, structures refers to the way in which the events of the plot are ordered and intrigated.'[১২] তবে মনে রাখতে হবে, উভয়ের গল্প বলার পদ্ধতি আলাদা।

সাহিত্যের গল্পগুলোকে এক সময় চলচ্চিত্রকাররা পর্দায় জীবন্ত করতে শুরু করলেন। দর্শকরা নতুন করে চলচ্চিত্রে অন্যরকম ভাললাগার সন্ধান পেলেন। আর এই ভাললাগার যোগান দিতে চলচ্চিত্রকাররা নতুন-নতুন কাহিনির খোঁজে বারবার সাহিত্যের কাছে যেতে শুরু করলেন। তখনও

Dhaka University Institutional Repository

চলচ্চিত্র ছিল শুধুই ব্যবসায়িক পণ্য। আস্তে-আস্তে এর সঙ্গে শিল্পচেতনা যোগ হতে লাগল। চলচ্চিত্রকাররাও চেষ্টা শুরু করলেন—কীভাবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একে অধিকতর নান্দনিক করা যায়। কালক্রমে এটি শিল্পরূপ ধারণ করল। কিন্তু চলচ্চিত্র অত্যন্ত ব্যয়বহুল মাধ্যম। ফলে শিল্পগুণ রক্ষার পাশাপাশি এতে বিনিয়োগের টাকা লাভসহ ফেরত আসা অর্থাৎ এর ব্যবসায়িক দিকটিও মাথায় রাখতে হয়েছে। তাই চলচ্চিত্রকাররাও ঐ সময়ে বিনিয়োগের ঝুঁকি এড়াতে পাঠকনন্দিত সাহিত্যকর্মগুলোকে চিত্রায়িত করতে বেশি আগ্রহী হলেন। যার ধারাবাহিকতা এখনো বিদ্যমান। কী নির্বাক, কী সবাক উভয় যুগের শুরু থেকেই 'চলচ্চিত্রকাররা মনে করলেন, যে সাহিত্যগুলো জনপ্রিয় তা থেকে সিনেমা করলে জনপ্রিয়তা আসতে পারে। দ্বিতীয়ত সাহিত্যের মধ্যে এতো ভাল সিনেমাটিক উপাদান আছে, গল্প আছে—সেই গল্পগুলোকে যদি তুলে আনা যায় তাহলে ভাল একটি চিত্রনাট্য তৈরি হতে পারে।'[১৩]

অন্যভাবে বলতে গেলে কোন নতুন শিল্পই শূন্য থেকে তৈরি হয় না। সে-কারণেই চলচ্চিত্র-সৃষ্টির শুরুতে বিভিন্ন শিল্প-মাধ্যমের কাছে একে দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। '...চলচ্চিত্র ...একটি যৌগিক মাধ্যম—অন্যসব মাধ্যম থেকে কিছু-কিছু করে নিয়ে ও কিছু-কিছু বর্জন করে চলচ্চিত্র নিজেকে গড়ে তুলেছে। সংগীতের গতি, চিত্রকলার দৃশ্যতা, আলোকচিত্রের বাস্তবতা, স্থাপত্যের গঠন, উপন্যাসের বর্ণনা, নাটকের অভিনয়, নৃত্যের ছন্দ– সমস্ত নিয়েই চলচ্চিত্র (যেমন গ্রহণ তেমনি বর্জনও, চলচ্চিত্রে নেই সংগীতের বিমূর্ত শিল্পগুণ, উপন্যাসের বিশ্লেষণ-ক্ষমতা, নাটকের ত্রিমাত্রিক রূপারোপ, চিত্রকলার বিমূর্তায়ন, আলোকচিত্রের তাৎক্ষণিকতা, স্থাপত্যের মিথস্ক্রিয়া, নৃত্যের ত্রিমাত্রিকতা)। ন্যারেটিভের দিক থেকে দেখলে, চলচ্চিত্রের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্ভবত সাহিত্য, নাটক ও চিত্রকলার সঙ্গে।'[১৪] তবে সাহিত্যের কাছেই চলচ্চিত্র সবচেয়ে বেশি ঋণী, বিজ্ঞানের উপর প্রায় পুরোটাই নির্ভরশীল—একথা অনস্বীকার্য। 'The most modern of all the arts, cinema is fittingly the most dependent on science and technology.'[১৫]

এখানে একটি কথা আবারও বলা প্রয়োজন, চলচ্চিত্র কিন্তু শুরুতেই শিল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়নি। সে নিজের মতো করে কিছু একটা দেখাতে চেয়েছে বা বলতে চেয়েছে মাত্র। বিষয়ের বৈচিত্র্যে ও দ্রুত প্রভাব বিস্তার ক্ষমতাগুণে চলচ্চিত্র প্রথম থেকেই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। ধীরে ধীরে এর মধ্যে শিল্পচেতনা যোগ হয়েছে। প্রথম দিকে চলচ্চিত্র শিল্পিত উপাদান—সাহিত্য বিশেষ করে নাটক থেকেই বেশি আত্তীকরণ করতে থাকল। এভাবেই, সাহিত্যের ক্লাসিকগুলো চলচ্চিত্রকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে—যা দর্শকের কাছে বিনোদন ও শিল্পমাধ্যম হিসেবে বিশেষ জায়গা দখল করতে সাহায্য করেছে। চলচ্চিত্র সম্পর্কে ভারতীয় লেখক-সমালোচক-তাত্ত্বিক ধীমান দাশগুপ্ত বলেছেন, 'বিবিধ প্রসঙ্গ অনুষঙ্গের সঙ্গে তার নিত্য যোগাযোগ। ইতিহাসচেতনা ও কাব্যময়তা ও গাণিতিকতা, নাটক ও সাহিত্য, নৃতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব সকলের সঙ্গেই অপরিহার্য বিনিময় তার। ...সাহিত্য, নাটক, চিত্রকলা, সংগীত : চারটি মাধ্যমই চিত্রনাট্যকারকে তাঁর চিত্রনাট্যকর্মে সমভাবে সাহায্য করতে পারে।'[১৬]

শত বছরের ব্যবধানে সাহিত্যের কাঠামো থেকে বেরিয়ে চলচ্চিত্র আজ আলাদা শিল্পমাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তারপরও শিল্পের অন্যান্য শাখার চেয়ে সাহিত্যের সঙ্গেই এর ঘনিষ্ঠতা এখনো সবচেয়ে বেশি। এর প্রধান কারণ হচ্ছে—সাহিত্য মন, মানুষ আর সমাজের গল্প বলে। একইভাবে

Dhaka University Institutional Repository

চলচ্চিত্রেও সমাজ এবং মানুষের সুখ, দুঃখ, আবেগ, অনুভূতি প্রতিফলিত হয়। দুই মাধ্যমেরই উদ্দেশ্য এক—গল্প বলা। 'সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের বাহ্যিক অমিল যতখানি, অন্তরের মিল তার চেয়ে বেশি। সাহিত্যে কথার মধ্য দিয়ে রূপের সৃষ্টি হয়, রূপের মধ্য দিয়ে ভাবের, চলচ্চিত্রেরও উদ্দেশ্য রূপের মধ্য দিয়ে ভাবসৃষ্টি।'[১৭] যে রকমভাবে কাঁচামাল, শ্রম আর বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করে রাঁধুনির চেষ্টা আর পরিশ্রম সহযোগে সুস্বাদু খাবার তৈরি করে অতিথির সামনে পরিবেশন করা হয়। খাওয়ার পর অতিথি খাবার তৈরির পিছনের কথা একবারও চিন্তা করে না। শুধু খাদ্যের স্বাদ-বিস্বাদ, গুণাগুণ বিচার করে। চলচ্চিত্রও তেমনি অর্থ, বিজ্ঞান, শিল্প, সময়, মেধা, পরিশ্রমের সমন্বয়ে তৈরি হয়। দর্শক-সমালোচকও চলচ্চিত্র তৈরির পিছনের দিক নিয়ে ভাবেন না। পর্দায় সিনেমা দেখে তাদের ভাললাগা-মন্দলাগা বিচার করেন। এই ভাললাগা-মন্দলাগাও খাবারের স্বাদ-বিস্বাদের মত। দর্শক-সমালোচকের কাছে চলচ্চিত্রের স্বাদ-বিস্বাদ হচ্ছে এর গল্প ও গল্প বলার ধরন। সাহিত্যের বেলায়ও তা-ই। সাহিত্যের গল্পের মধ্যে যেমন সিনেমাটিক উপাদান থাকে, তেমনি স্বাধীন চিত্রনাট্যনির্ভর চলচ্চিত্রেও কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা আঙ্গিক থাকতে পারে, যার মধ্যে সাহিত্যগুণ নিহিত আছে। অন্যভাবে বলা যায়, কোন সাহিত্যকে যখন ক্যামেরায় ধারণ করা হয়, মানের বিচারে ভাল হোক মন্দ হোক তা চলচ্চিত্র। আবার কোন চলচ্চিত্রকে গল্পাকারে লেখা হলে, তাও ভাল-মন্দ সাহিত্য হতে পারে। 'একটি চলচ্চিত্রের মান-নির্ণয় এবং রস আস্বাদনের জন্য চলচ্চিত্রটির বিশ্লেষণাত্মক পাঠ খুব জরুরি। শুধুমাত্র চলচ্চিত্র দেখে এই জরুরি কাজটি করে ওঠা খুব একটা সহজ কাজ নয়। এর জন্য দরকার, চলচ্চিত্র পাঠের পাশাপাশি চলচ্চিত্র সাহিত্যের সাথে পরিচিত হওয়া।'[১৮] সাহিত্য ও চলচ্চিত্র উভয়ই আলাদা-আলাদা শিল্প। উভয়ের মধ্যে কাহিনি আছে। প্রারম্ভ, উৎকর্ষ ও গ্রন্থিমোচন আছে। উভয়-ই মানুষের কথা বলে, জীবনের কথা বলে। 'মাধ্যম হিসেবে দুটি এত বেশি স্বতন্ত্র যে তুলনামূলক আলোচনা প্রায় অবান্তর হয়ে পড়ে; স্বাতন্ত্র্য বিচারে এক একটির কার্যকারিতা ভিন্ন এবং উভয়ের পারস্পরিক বিভেদগুলিও অত্যন্ত স্পষ্ট।'[১৯]

আমেরিকার Westchester Community College-এর English and Film Studies Department-এর অধ্যাপক Dr. William Costanzo চলচ্চিত্র ও সাহিত্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, পৃথিবীর মোট চলচ্চিত্রের এক তৃতীয়াংশ তৈরি হয় উপন্যাস থেকে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা, যেমন : নাটক, ছোটগল্প প্রভৃতি মিলে তৈরি হয় মোট চলচ্চিত্রের পঁয়ষট্টি শতাংশ বা তারও বেশি।[২০] তাহলে সহজে অনুমেয় চলচ্চিত্রে সাহিত্যের উপযোগিতা কত বেশি। বাংলাদেশেও ১৯৫৬ সালে প্রথম চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' নির্মিত হয়েছিল পরিচালক আবদুল জব্বার খানের (১৯১৬-১৯৯৩) স্বরচিত নাটক 'ডাকাত' অবলম্বনে। এই নাটকটি তিনি ১৯৫৩ সালে লিখেছিলেন।[২১] সাহিত্যের যেমন একটি ভাষা আছে, চলচ্চিত্রেরও তেমনি একটি স্বতন্ত্র ভাষা আছে। গল্পের প্রয়োজনে চলচ্চিত্র সাহিত্যের উপর নির্ভর করলেও সবসময় একে অনুসরণ করে না। আর এখানেই চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্যের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন— "আমি আমার ছবির বিষয় হিসেবে বহুপঠিত, বহুচর্চিত কোনও লেখার কাছে সাধারণত যাই না। এমন কি, কমলকুমার মজুমদারের (১৯১৪-১৯৭৯) 'তাহাদের কথা' (১৯৯৩) করার কথা যখন ভেবেছি এবং করার পরও দেখেছি যে, কমলকুমার মজুমদার কোনওদিনই পাঠকের দ্বারা সঙ্গত কোনো গ্রাহ্য লেখক নন, কেননা তাঁর পাঠক সংখ্যা প্রায় হাতে গোনা যায়। ফলে আমার বিশেষ কোনও অসুবিধে হয়নি দর্শক নিয়ে। আমি 'তাহাদের কথা' থেকে মোটের ওপর চার-

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচটা সংলাপ নিয়েছিলাম। বাকি পুরোটাই আমার সাজানো—চরিত্র, সংলাপসহ প্রায় অধিকাংশটাই নিজের মতো করে গড়ে নিয়েছিলাম।"[২২] রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) 'পোস্টমাস্টার', 'মণিহারা' ও 'সমাপ্তি' গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের (১৯২১-১৯৯২) 'তিনকন্যা' (১৯৬১) ছবিতে পরিচালক চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে কোথাও কাহিনিকে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছেন, কোথাও কিছুটা বদলে নিজের মতো করে তৈরি করেছেন। সত্যজিতের 'পোস্টমাস্টার'-এ রবীন্দ্রনাথের কাহিনির মূলভাব অটুট থাকলেও সংলাপ, চিত্র-বিন্যাস ও কাহিনি বর্ণনায় ছিল পরিচালকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। 'মণিহারা' গল্পের গা ছমছম করা ভৌতিক আবহ এর চলচ্চিত্ররূপে নেই। আবার সমাপ্তি গল্পের মৃন্ময়ী আর চলচ্চিত্রের মৃন্ময়ী পাঠক আর দর্শকের কল্পনাকে কখনো-কখনো এক করে দেয়। "...সমন্বয়ের পথে যখন দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে তখন রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের 'রহমত' চরিত্রটি 'কাবুলিওয়ালা' সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্র ছবি বিশ্বাসের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। রহমতের দুঃখে দর্শকের চোখ জলে ভরে যায় অনায়াসে। এখানেই সাহিত্য আর চলচ্চিত্র একাকার হয়ে যায়।"[২৩]

নির্বাকযুগে (১৮৯৫-১৮২৯) অনেক কাহিনিচিত্র বা সিনেমা তৈরি হতো সাহিত্য থেকে। বিশেষ করে নাটকের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠযোগ ছিল। তখন থিয়েটারের নাটক সরাসরি ক্যামেরায় ধারণ করে পর্দায় দেখানো হতো। 'সূচনাপর্বে চলচ্চিত্র মাধ্যমটি মঞ্চনাটক থেকে অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, কাহিনি ও বিষয়বস্তুসহ একাধিক উপাদান আত্মস্থ করে বিনোদন, শিল্প ও গণযোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উন্মুখ হয়ে ওঠে।'[২৪] সবাক যুগের প্রথম ছবি 'জ্যাজ সিঙ্গার' (১৯২৭) থেকে গল্প-উপন্যাসের উপর চলচ্চিত্রের কাহিনির নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে। চলচ্চিত্রে সাহিত্যিক গল্পের উপযোগিতা এতই বেশি যে, কোন কোন গল্প বহুবার চিত্রায়িত হয়েছে। স্কটিশ লেখক স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের (Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, 1859-1930) বিশ্বখ্যাত কাহিনি 'শার্লক হোমস্' (১৮৮৭) নিয়ে দু'শোর চেয়েও বেশি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। ইংরেজ নাট্যকার শেক্সপীয়রের (১৫৬৪-১৬১৬) 'রোমিও এন্ড জুলিয়েট' অবলম্বনে তৈরি হয়েছে প্রায় পঞ্চাশটির মতো চলচ্চিত্র।[২৫] বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় উপন্যাস শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) রচিত 'দেবদাস' (১৯১৭) অবলম্বনেও উপমহাদেশে চৌদ্দবার[২৬] চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। সাহিত্যের সব শাখা এমনকি কবিতা থেকেও চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। কেননা কবিতার মধ্যেও কবির অর্ন্তলোকে ধরা এক একটি কাহিনি আছে। ১৯৫৬ সালে আমেরিকান পরিচালক, প্রযোজক ও সম্পাদক Robert Wise (Robert Earl Wise, 1914-2005) প্রাচীন গ্রীক মহাকাব্য হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' অবলম্বনে আমেরিকা, ইতালি ও ফ্রান্সে নির্মাণ করেন বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র 'হেলেন অফ ট্রয়'।[২৭] বাংলাদেশেও ১৯৮৫ সালে নন্দিত চলচ্চিত্রকার তানভির মোকাম্মেল (১৯৫৫-) নির্মাণ করেছেন নির্মলেন্দু গুণের (১৯৪৫-) কবিতা অবলম্বনে 'হুলিয়া'। ২০১৪ সালে তরুণ চলচ্চিত্রকার মাসুদ পথিক (১৯৭৬-) একই কবির কবিতা অবলম্বনে নির্মাণ করেছেন 'নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ'।

চলচ্চিত্রের ইতিহাসের প্রায় শুরু থেকেই সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শিল্পের অন্য কোন শাখার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে এতো আলোচনা বা প্রশ্ন উত্থিত হয়নি। সঙ্গীত, চিত্রকলা, থিয়েটার বা মঞ্চনাটক এগুলো আলাদা শিল্পমাধ্যম হিসাবে বহু আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা দর্শক বা শ্রোতা আছে। যদিও নাটকের লিখিত রূপ আছে এবং তা সাহিত্যেরই একটি শাখা, তবুও এর একটি আলাদা রূপকল্প (Form) তৈরি হয়ে গেছে এবং

Dhaka University Institutional Repository

দর্শকরাও স্বতন্ত্ররূপে এটিকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু নাটকের মতো চলচ্চিত্র কোন লিখিত শিল্প নয়। এ কারণে চলচ্চিত্র সাহিত্যের শাখা হিসাবে কখনো গণ্য হতে পারে না। চলচ্চিত্রও কখনো সাহিত্যের দাবি নিয়ে হাজির হয়নি। সাহিত্যের কাছে বারবার এসেছে শুধু কাহিনির প্রয়োজনে। চলচ্চিত্রের কোন কোন চিত্রনাট্য নাটকের মতো সাহিত্য হতে পারে কিনা—তা এখনো বিতর্কের বিষয়। '...তবে এটাও ঠিক– চিত্রনাট্যকে এখন অনেকেই সাহিত্য ব'লে গণ্য করতে উৎসুক।'[২৮] এ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র (১৯৬২) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর চিত্রনাট্যের মধ্যে অনেক সাহিত্যগুণ রয়েছে। অনেক সমালোচক এটিকে সাহিত্য হিসাবে বিচার করতে চেয়েছেন। সমসাময়িককালে এই চিত্রনাট্যটি 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[২৯] শিল্পের এক শাখার সঙ্গে আরেক শাখার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া কোন মাধ্যমকেই ছোট করে না। নিজের সমৃদ্ধির খাতিরে এই আদান-প্রদান শিল্পে একটি স্বীকৃত উপায়। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য পূর্ণেন্দু পত্রীর অভিমত:

> সৃষ্টির জগতে পরস্পর-নির্ভরতার জটিল সম্পর্ক বহুকালের পুরনো। কোনো একটা বিশেষ শিল্প-মাধ্যম নিজের উর্বরতার গরজে অন্য মাধ্যম থেকে সংগ্রহ করছে পরোক্ষ উপকরণ অথবা প্রত্যক্ষ প্রেরণা– এমন দৃষ্টান্ত সাহিত্য ও শিল্পকলার ইতিহাসে অজস্র। কীটসের যে কবিতাকে চাইনিজ স্ক্রোল পেনটিং-এর সঙ্গে তুলনা করতে পেরে তৃপ্ত হয়েছিলেন ইয়েটস, সেই 'ওড অন এ গ্রীসিয়ান আর্ন'-এর উৎস ছিল ক্লদ লোরেনের আঁকা একটি পেন্টিং। রোমান্টিক পিরিয়ডে ইতালির ভাস্কর্যের কাছে ইংরেজ কবিদের অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতার কাহিনি এখন ইতিহাস। আবার এর উলটোদিকে দেখতে পাব পৃথিবীর অজস্র স্মরণীয় ছবির উদ্ভব ও বিকাশের পিছনে কবিদের বরাভয় মুদ্রা। দেলাক্রোয়ার বিশ্ববিদিত 'লিবার্টি লিডিং দ্যা পিপল' ছবিটি যেমন আংশিক উদ্বুদ্ধ অগস্ত বারবিয়েরের কবিতায়, তেমনই আরও একাধিক ছবির জননী না হলেও ধাত্রীদেবতার ভূমিকা দান্তের 'ডিভাইন কমেডির'। প্রাচীন টার্নার, সুদারল্যান্ড কিংবা আধুনিক ক্লে, ক্যান্ডিনস্কি, মিরো-রা ছবিকে নিয়ে আসতে চেয়েছেন কবিতার কাছে, যেমন অপোলিনের কিংবা কামিংস কবিতার কাঠামোয় জুড়ে দিতে চেয়েছিলেন ছবির শরীর।[৩০]

সংগীতে স্বরলিপি যে কাজটি করে থাকে, চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্য তা-ই করে। চিত্রনাট্য হচ্ছে নাট্যচিত্রের রূপকল্প। অর্থাৎ চলচ্চিত্রে যে নাটকটি রূপায়িত হবে তার একটি লিখিতরূপ। 'চলচ্চিত্র রচনা বা নির্মাণের আগে বিস্তারিত অনুপুঙ্খ পরিকল্পনের লিখিত রূপকে বলা হয় চিত্রনাট্য।'[৩১] সাহিত্য ছাড়াও চলচ্চিত্র ইতিহাস-নির্ভর হতে পারে, ইতিহাস আশ্রয়ীও হতে পারে, মিথ অবলম্বনেও হতে পারে, আবার সাধারণ কোন একটি ভাবনাও হতে পারে। বিখ্যাত জাপানি পরিচালক-চিত্রনাট্যকার নাগিসা ওশিমা (১৯৩২-২০১৩) একটি ছবির জন্য কোনভাবেই গল্প ঠিক করতে পারছিলেন না। এমনকি ক্লাসিকস থেকে শুরু করে আধুনিক গল্প-উপন্যাস তন্ন-তন্ন করেও। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৬ সালের এক সকালে খবরের কাগজের একটি সাধারণ সংবাদ তাঁর মনে গেঁথে যায়। একেই তিনি পরবর্তী সিনেমার গল্প বা বিষয় হিসেবে নির্বাচন করলেন। সেই সংবাদকে বিষয়বস্তু করে নির্মিত 'বয়' (১৯৬৯) ছবিটি আজও জাপানে সেরা ছবির মর্যাদায় আসীন। অবলম্বন যা-ই হোক না কেন, চিত্রনাট্যকারকে তা থেকে একটি গল্প বের করে আনতে হয়। আর সেই গল্পটিকেই যদি সঠিক ভাষাপ্রয়োগে লেখা হয় তবে তা সাহিত্যের মর্যাদাও পেতে পারে।

সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের আরেকটি সাযুজ্য হচ্ছে—কাহিনির গতি। সাহিত্য গতিশীল তার ঘটনার প্রবাহে—সিনেমাও চলমান ছবির পরম্পরায়। সঙ্গীতের গতি আছে, তবে এটি বিমূর্ত শিল্প।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রকলা গতিহীন। তাই এদের সাথে চলচ্চিত্রের সম্পর্কের আলোচনার বিষয়বস্তু এদিক থেকে অতটা জোরালো নয়। সংলাপ ও কাহিনি বর্ণনার রীতিও সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রে আলাদা। প্রাকৃতিক দৃশ্যকে সিনেমায় চিত্রিত করতে গেলে আলাদা করে কোন সংলাপ বা গল্প বলার প্রয়োজন হয় না। ছবি-ই সেখানে দৃশ্য বর্ণনার কাজটি করে থাকে। চলচ্চিত্রের মতো সাহিত্যের নিজস্ব কোন ভিজ্যুয়াল দিক নেই। সাহিত্য প্রথমে পাঠকের মস্তিষ্কে একটি মননশীল উপলব্ধি তৈরি করে, পরে তা থেকে পাঠকের মনে দৃশ্যজাত উপলব্ধি তৈরি হয়। চলচ্চিত্রের বেলায় হয় তার ঠিক উল্টো। চলচ্চিত্রে আগে দর্শক চোখ দিয়ে ঘটনাগুলো মনে ধারণ করে, পরে প্রত্যেকে নিজের মতো করে মস্তিষ্কে বিশ্লেষণ করে কাহিনিকে ব্যাখ্যা (Interpret) করতে চায়। সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের কোন দ্বন্দ্ব নেই—বৈপরীত্য আছে। একটি পাঠকের মননশীল উপলব্ধি থেকে দৃশ্যজাত উপলব্ধি তৈরি করে, অপরটি দর্শককে দৃশ্যজাত উপলব্ধি থেকে মননশীল উপলব্ধিতে ধাবিত করে। যেমন : কোন সিনেমায় নায়ক-নায়িকার নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট দেখে কিংবা সিনেমার শেষে কোন ট্র্যাজিক পরিণতি দেখে দর্শক অনেক সময় আপ্লুত হয়ে পড়ে। তারা এই করুণ পরিণতি মেনে নিতে না পেরে ঐ দৃশ্যগুলোর জায়গায় নিজের মতো করে এক একজনের কল্পনায় এক এক রকমের কাহিনি সংযোজন করে ছবিটি দেখতে চায়। সাহিত্যের বর্ণনাও পাঠকের কল্পনায় চলচ্ছবি তৈরি করে। একেক জনের কল্পছবি একেক রকম। সাহিত্যে দৃশ্যবর্ণনার কাজটি গল্প দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয়। সিনেমার চিত্ররূপও সাহিত্যিকের দেওয়া দৃশ্যবর্ণনার সঙ্গে পাঠকের কল্পনার জগৎ মিলেমিশে একাকার না-ও হতে পারে। পাঠক এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন। পাঠ করার সময় থেকে চিন্তার সময় পর্যন্ত পাঠক নিজেই তা নির্ধারণ করেন। এক পাঠকের 'পথের পাঁচালী'র কল্পচিত্র ও আরেক পাঠকের কল্পচিত্র এক নয়। প্রত্যেকের কাছে অপু, দুর্গা, নিশ্চিন্দিপুর আলাদা-আলাদা। রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের রতন কি শ্যামলা না ফর্সা ? সে কি ফ্রক পরে না শাড়ি পরে ? লম্বা না বেঁটে ? —এসব প্রশ্নের উত্তর এক এক পাঠকের কাছে এক এক রকম হতে পারে। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের রতনকে কিন্তু কোন দর্শক শাড়ি বৈ ফ্রক পরিহিত দেখেছে এ কথা বলা যায় না।

চলচ্চিত্রের রয়েছে এক সম্মোহনী ক্ষমতা। পরিচালক সম্মোহনকারীর মতো তার কথা, দৃষ্টিভঙ্গি গল্পচ্ছলে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দর্শকদের দেখিয়ে নেন। তাদের পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণের জন্য প্রেক্ষাগৃহকে নিস্তব্ধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। দর্শকের দৃষ্টি এবং চেতনা দুই-ই থাকে পর্দার দিকে, নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার কোন সুযোগ নেই এখানে। মাঝখানের বিরতি বাদ দিলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো সময়টাই দর্শকের পৃথিবী ঐ চলচ্চিত্রকে ঘিরেই সীমাবদ্ধ থাকে। দর্শক এখানে সম্মোহিত হয়ে পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেন। তবে, আজকাল বিভিন্ন যন্ত্রযোগে যে কোন জায়গায়, যে কোন সময় নিজের মতো করে সিনেমা দেখার সুযোগ রয়েছে। সেই কারণে সাহিত্যের পাঠকদের মতো চলচ্চিত্রের দর্শকদেরও সিনেমা দেখা এবং কল্পনা করার স্বাধীনতা বেড়ে গেছে বহুগুণ। সচেতন দর্শক আজ চলচ্চিত্র শুধু দেখতেই চান না—পাঠও করতে চান। পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি মিলিয়ে দেখতে চান। চলচ্চিত্রের জটিল মাধ্যমে পরিচালকও সবসময় শতভাগ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে ছবি নির্মাণ করতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে প্রযোজক, ক্যামেরাম্যান, অভিনেতা-অভিনেত্রী, প্রকৃতি ও প্রকৃত অবস্থা সর্বোপরি সম্পাদকের কাছে তার ইচ্ছাও কখনো কখনো জলাঞ্জলি দিতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের পার্থক্য এখানেই যে, সাহিত্যে এর রচয়িতার বর্ণনার বাইরেও পাঠক তার নিজস্বানুভূতি দিয়ে কল্পনায় ইচ্ছেমত চলচ্ছবি তৈরি করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে পাঠক সম্পূর্ণ স্বাধীন। সাহিত্যিকরা কোন সময়কে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করতে পারেন। 'কেউ কেউ বেশকিছু লাইন লেখেন, আবার কোনও সাহিত্যিক দু'চার কথায় তা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন, যা পাঠকের মনে দাগ কেটে যায়। পাঠক তখন নিজের মনের পর্দায় সেই বিশেষ ক্ষণটি দেখতে পান।'[৩২] অন্যদিকে চলচ্চিত্রকারকে গল্পের বর্ণনা সেলুলয়েডে তাঁর নিজস্ব প্রজ্ঞা দিয়ে এমনভাবে চিত্রিত করতে হয়, যাতে গল্পের বর্ণনার সঙ্গেও এর সাযুজ্য থাকে, আবার অধিকাংশ দর্শকের কল্পনার সঙ্গেও যেন এটি মিলে যায়। এই কঠিন কাজটি যিনি দক্ষতার সঙ্গে করতে পারেন তিনিই সার্থক চলচ্চিত্রকার। দর্শকের কল্পনা এদিক থেকে শৃঙ্খলিত। চলচ্চিত্রকারের দৃষ্টিভঙ্গির উপরেই তাদের নির্ভর করতে হয়। সাহিত্য ও চিত্রনাট্য রচনার মধ্যে পদ্ধতিগত অনেক পার্থক্য আছে। সাহিত্য রচনায় লেখকের সাহিত্যবোধ ও ভাষাজ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু চিত্রনাট্য রচনায় সাহিত্যবোধ ও ভাষাজ্ঞান ছাড়াও চলচ্চিত্রবোধ, চলচ্চিত্র নির্মাণের টেকনিক ও কারিগরি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কেননা সাহিত্য শুধু ঘটনার বর্ণনা করলেও চিত্রনাট্যে কাহিনি বুননের জন্য সংলাপ, ক্যামেরার কোণ প্রয়োগের নির্দেশনা, আলো ব্যবহারের কৌশল, অভিনেতা-অভিনেত্রীর এক্সপ্রেশন, সময়, লোকেশন ইত্যাদি সবিস্তারে চিত্রনাট্যকারকে বর্ণনা করতে হয়। "ঔপন্যাসিক কনরাড ও সিনেমার অন্যতম আদি স্রষ্টা গ্রিফিথ উভয়েই তাঁর শিল্পকর্মের অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'The task I am trying to achieve is to make you see.' চলচ্চিত্র এবং সাহিত্য উভয় মাধ্যমেই প্রাথমিক শর্তে এই দেখার ব্যাপারটা রয়ে গেছে। একটি মনের দেখা, অনেকটা কাল্পনিক; অপরটি চোখের দেখা, একেবারে প্রত্যক্ষভাবে। এই মনোগত রূপকল্প এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্রকল্পের ভিত্তিতেই দুটি মাধ্যমের কাঠামোর ভিন্নতা বিবর্তিত হয়েছে।"[৩৩]

প্রাত্যহিক ঘটনার সবকিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। হলেও মনে রাখি না। যে সব বিষয়ে আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল আছে সেগুলোই আমরা ভালোভাবে চোখে পর্যবেক্ষণ করি, মনে ধারণ করি এবং স্মৃতিতে জমা রাখি। এই স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে সদ্য ও পুরাতন টুকরো-টুকরো স্মৃতি নিয়ে সাহিত্যিক তার সাহিত্যকর্ম রচনা করেন। তাই সাহিত্যের সব গল্পই লেখকের অভিজ্ঞতাজাত—এমনকি কল্পকাহিনি পর্যন্ত। বাস্তববাদী দার্শনিকরা মনে করেন, মানুষ কোনভাবেই তার লব্ধ অভিজ্ঞতা ছাড়া নতুন কিছু ভাবতে বা কল্পনা করতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে যা অদ্ভুত এবং অভূতপূর্ব মনে হয়—ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার সবটাই আমাদের অভিজ্ঞতাজাত। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা আমাদের কল্পনায় জোড়া দিয়ে নতুন কিছু তৈরি করেছি বলে ভ্রমবোধ করি। লেখকের অর্জিত অভিজ্ঞতা পাঠকের কাছে নতুনভাবে সঞ্চারণ ঘটায়। চলচ্চিত্রের মাধ্যমেও দর্শকদের মধ্যে অনুরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হয়। আর সাহিত্য যেহেতু দর্শনজাত মাধ্যম নয়, সেহেতু সাহিত্য দেখে আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের কোন সুযোগ নেই। এটি পাঠ করতে হয় অথবা অন্যের পাঠ শ্রবণ করতে হয়। কিন্তু চলচ্চিত্র দেখেও সম্ভব, এর কাহিনি শুনেও সম্ভব। কারণ এটি দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম। তবে এই অভিজ্ঞতা বাস্তবের মতো নয়। ভালো লাগুক আর না-লাগুক চলচ্চিত্রে আমরা আগে দেখি। সেখান থেকে কিছু জিনিসের প্রতি আমাদের আগ্রহ তৈরি হয়, মনে রাখি—কিছু জিনিস ভুলে যাই। আগ্রহের বিষয়গুলো অনেক সময় অনুকরণ কিংবা করি। কোন জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীর পোশাক, কেশ-বিন্যাস, সাজ-সজ্জা অনেক সময় আমাদের এমনভাবে প্রভাবিত করে যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সমাজে তা ব্যাপকভাবে চর্চিত হয়। সাহিত্যের পাঠক যেহেতু চলচ্চিত্রের দর্শকের

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ে কম, সুতরাং এটি সমাজকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারে না। তবে ভালো সাহিত্য ও ভালো চলচ্চিত্র উভয়ই মানুষের উন্নত রুচিবোধ বা মনন তৈরি করে।

শিল্পে স্বল্পবাদ বলতে একটি বিষয় আছে। অল্প কথায় বা অল্প কাজে অনেককিছু বোঝানোর গুণটি-ই স্বল্পবাদ। এই স্বল্পবাদ সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের মিথস্ক্রিয়ায় কখনো কখনো একে অন্যের বিপরীত। সাহিত্যে যা স্বল্প কথায় বলা সম্ভব সিনেমায় তা না-ও হতে পারে। জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) 'বনলতা সেন' কাব্যের 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'— এই চরণটিকে স্বল্পদৃশ্যে চলচ্চিত্ররূপ দেওয়া প্রায় অসম্ভব। আবার সাহিত্যের হাজার শব্দের বর্ণনা চলচ্চিত্রে মাত্র কয়েকটি ফ্রেমে চিত্রায়িত করা সম্ভব।

নাটকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের একটি মিল আছে। সিনেমার মতো মঞ্চনাটকও দর্শককে সর্বান্তকরণে আকৃষ্ট করে রাখতে চায়। সাহিত্যে লেখকের চিন্তার জগৎকে ছাপিয়ে পাঠক তার নিজস্ব ভুবন তৈরি করে। অপরদিকে চলচ্চিত্রে দর্শকদের চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে চলচ্চিত্রকার তাদের সত্তাকে অধিকার করেন। কিন্তু কোন-কোন চলচ্চিত্রবোদ্ধা ঠিক উল্টোভাবে বিষয়টিকে চিন্তা করে থাকেন— '...সিনেমার যে দৃশ্যমানতার ক্ষমতা আছে উপন্যাস বা গল্পের তা নেই। পরিপার্শ্ব, প্রকৃতি বা চরিত্রের মনের আবেগের শরীরী ভাষা উপন্যাসে বিবরণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সিনেমায় আমরা এগুলি দেখতে পাই। স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি বা সিনেমা আমাদের বুঝিয়ে দেয়। সিনেমার কথকঠাকুর হন পরিচালক, কিন্তু ছবির দৃশ্যায়ন থেকে একজন দর্শক-পরিচালক যা বোঝাতে চেয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি কল্পনার রাজত্বে নিজেকে নিয়ে যেতে পারে। উপন্যাস বা গল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু এটি সম্ভব নয়। পাঠক সম্পূর্ণভাবেই লেখকের হাতে বন্দী, তাঁর ভাষা, তাঁর ভাবনা, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রণে বাঁধা। সিনেমায় দর্শকের যে স্বাধীনতা আছে, পাঠকের সেই স্বাধীনতা কোথায় ?'[৩৪]

সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের লেন-দেনের পথে একটি সমস্যা শুরু থেকেই দেখা দিয়েছিলো। এটি হলো শিল্পের স্বাধীনতার সমস্যা। সাহিত্য স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কোন শিল্পের কাছে সে মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু চলচ্চিত্র নবীন শিল্প। অনেকে আবার এটিকে শিল্প হিসেবেও মানতে নারাজ। 'সংশয়ীদের বক্তব্য : চলচ্চিত্রে চিত্রকলার পরিশুদ্ধতা নেই। তাই মৌলিক আর্ট-ফর্ম হিসেবে চলচ্চিত্র গ্রাহ্য নয়।'[৩৫] ভিন্নমত বাদ দিলে এটি একটি শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম। তাই শুরুতে বিভিন্ন শিল্পের কাছে তাকে হাত পাততে হয়েছে নিজের পরিপুষ্টতার জন্য। অন্যদিকে চলচ্চিত্রকে স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে সাহিত্যকে কতটা অনুসরণ করবে, নাকি একবারে বর্জন করবে—এ নিয়েও বহুমত দেখা দিতে লাগল। একদল ভাষ্যকার সাহিত্যকে অন্ধ অনুসরণের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিল। সত্যজিৎ রায়ের (১৯২১-১৯৯২) চলচ্চিত্রের গল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রতি এরকম দুর্বলতা আমরা দেখতে পাই। সেই সময়ে চলচ্চিত্রের দুরবস্থার বিষয়ে বলতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় বলেছেন— 'আমার মনে হয় চিত্রোপযোগী ভালো গল্প উপন্যাসের অভাব বাংলা ছবির বর্তমান ব্যাপক দৈন্যের একটা বড় কারণ।'[৩৬] অন্যদল সাহিত্যকে একেবারেই বর্জন করে চলচ্চিত্রকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হিসেবে দেখতে চাইল। আরেকদল দু'য়ের মধ্যে সমন্বয় রক্ষায় প্রয়াসী হয়ে উঠল। সাহিত্য, কবিতা, চিত্র, সঙ্গীত—এদের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক কি ? এমন প্রশ্নের উত্তরে মৃণাল সেন বলেছেন– '...আমরা অনেকেই মনে করে থাকি যে এক শিল্প মাধ্যমের সঙ্গে অন্য এক শিল্প মাধ্যমের কোন সম্পর্ক নেই। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অহি-নকুলের সম্পর্ক। ...আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বুঝেছি, তফাৎ নেই, বরং সম্পর্ক গভীর। এবং যতোই দিন যাচ্ছে, যতোই পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাড়ছে, সম্পর্ক ততোই গভীরতর হচ্ছে।'[৩৭]

প্রসঙ্গত বলা যায়, সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ নিয়ে আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী ইংরেজ নাট্যকার বার্নাড শ' (George Bernard Shaw, 1856-1950) প্রথমদিকে বিরূপ ধারণা পোষণ করেছিলেন। তখন চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগ চলছিল। সংগত কারণেই বার্নাড শ' বলেছিলেন, "আমি আবারও বলছি, সংলাপ ছাড়া নাটক মানে নাটকের সর্বনাশ—আমার ক্ষেত্রে এটা আমি কিছুতেই হতে দেব না।" পরে বার্নাড শ' তাঁর অবস্থান থেকে দূরে সরে এসেছিলেন। তিনি তাঁর রচিত নাটককে চলচ্চিত্রায়ণের অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর 'পিগম্যালিওন' (১৯৩৮) সেরা চিত্রনাট্যের জন্য 'একাডেমি অ্যাওয়ার্ড' লাভ করে। বার্নাড শ' নিজেই দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য তাঁর মূল পিগম্যালিওন-এর শেষাংশ পরিবর্তন করেছিলেন। চলচ্চিত্রায়ণে সাহিত্যের এই পরিবর্তন ও পরিমার্জনকে অনেকে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। অনেকে আবার দ্বিমত পোষণ করেছেন। বিখ্যাত হাঙ্গেরীয় তাত্ত্বিক-সমালোচক বেলা বালাজ (Béla Balázs, 1884-1949) মনে করেন, সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের আদান প্রদান দুই মাধ্যমের জন্যই উপকারী। আবার স্পেনিশ লেখক কার্লোস রুইজ সাফন (Carlos Ruiz Zafón, 1964-) তাঁর 'মান বুকার' (২০০৯) পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ 'শ্যাডো অব দ্য উইন্ড'কে (২০০১) চলচ্চিত্রায়ণের অনুমতি দেননি। তিনি মনে করেন, তাঁর এই উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে রূপদান অসম্ভব। তার মতাদর্শী আরেক লেখক পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত তারিক আলীর (১৯৪৩-) মতে, ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত তাঁর 'শ্যাডোজ অব দ্য পোর্মেগ্রেনেট' (১৯৯২) উপন্যাসে বর্ণিত তদানীন্তন স্পেনকে বর্তমান সময়ে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। কিন্তু তাঁর বক্তব্য বর্তমান প্রযুক্তির যুগে গ্রহণযোগ্য নয়। এর বড় প্রমাণ জেমস্ ক্যামেরুনের (১৯৫৪-) 'অ্যাবাটার' (২০০৯)। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে যে কোন দৃশ্যকেই এখন চিত্রায়িত করা সম্ভব।

পর্যবেক্ষণক্রমে দেখা যায়, কোন দুর্বল গল্প বা কাহিনিকে অবলম্বন করে ভালোমানের চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। যেমন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) রচিত 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। গল্পকারের নিজের অভিমত অনুযায়ী 'অরণ্যের দিনরাত্রি' উন্নতমানের ছোটগল্প নয়। অথচ, ঐ গল্প অবলম্বনেই নির্মিত সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' (১৯৭০) অতি উন্নতমানের একটি চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রে রূপান্তরের আগে মূল গল্প বা কাহিনিটি প্রায় অবমূল্যায়িত ছিল। আমেরিকান লেখক জ্যাক শেফারের (Jack Warner Schaefer, 1907-1991) ১৯৪৯ সালে লেখা উপন্যাস *Shane* অবলম্বনে George Stevens (1904-1975) পরিচালিত একই নামে নির্মিত 'শেইন' (Shane, 1953) চলচ্চিত্রটিও এরকম আরেকটি উদাহরণ। অন্যদিকে অনেক ভালোমানের গল্প নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রও অনুরূপ সফলতা পায়নি। মাহবুব-উল আলম (১৮৯৮-১৯৮১) রচিত 'মফিজন'-এর (১৯৪৮) চিত্ররূপ 'হীরামন' এর একটি উদাহরণ। আবার, ভালো কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত ভালো চলচ্চিত্রের সংখ্যা নেহাত কম নয় ; যেমন: বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ১৮৯৯-১৯৭৯) রচিত ও মৃণাল সেন (১৯২৩-) পরিচালিত হিন্দি ছবি 'ভুবন সোম' (১৯৬৯), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) রচিত ও সত্যজিত রায় পরিচালিত 'জলসাঘর' (১৯৫৮), কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯) রচিত ও বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত পরিচালিত 'নিম অন্নপূর্ণা' (১৯৭৯) ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ লেখক তাঁদের রচনার পরিবর্তনের বিরোধী। তাঁরা চান তাদের সাহিত্যকর্মকে হুবহু চলচ্চিত্রায়িত করা হোক। পরিচালক-চিত্রনাট্যকাররা তাদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তারা সাহিত্যকে অতটা প্রধান্য না দিয়ে এর ব্যবচ্ছেদ করে প্রয়োজনে সংযোজন-বিয়োজন ঘটাতে চান। এদের মধ্যে আবার একদল সাহিত্যকে একেবারেই গুরুত্ব দিতে নারাজ। তারা চলচ্চিত্রের গল্প-চিত্রনাট্য নিজের মতো করেই লিখতে চান। ব্রিটিশ পরিচালক Tony Kaye (1952-) একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর স্পষ্ট কথা ব্যক্ত করেছেন— '...it is very difficult to get one's bearings in someone else's story, for the raw materials are chosen with reference to the style of a story that one has clearly in mind. So, in the long run, I find it much simpler to invent the story out of the whole cloth.'[৩৮] ইতালির পরিচালক-চিত্রনাট্যকার আন্তোনিয়নি (Michelangelo Antonioni, 1912-2007), পরিচালক-চিত্রনাট্যকার-প্রযোজক রোসেলিনি (Roberto Gastone Zeffiro Rossellini, 1906-1977), পরিচালক ভিসকন্তি (Luchino Visconti di Modrone, 1906-1976), পরিচালক-চিত্রনাট্যকার বের্তোলুচ্চি (Bernardo Bertolucci, 1940-) ; ফ্রান্সের পরিচালক-চিত্রনাট্যকার গদার (Jean-Luc Godard, 1930-), লেখক-পরিচালক-চিত্রনাট্যকার জঁ কক্‌তো (Jean Maurice Eugène Clément Cocteau, 1889-1963), অভিনেতা-পরিচালক-চিত্রনাট্যকার ত্রূফো (François Roland Truffaut, 1932-1984), পরিচালক-চিত্রনাট্যকার-সম্পাদক রেনে (Alain Resnais, 1922-2014) ; স্পেনের চলচ্চিত্রকার বুনুয়েল (Luis Buñuel Portolés, 1900-1983) ; পোলান্ডের পরিচালক-প্রযোজক-লেখক-অভিনেতা পোলানস্কি (Rajmund Roman Thierry Polański, 1933-) ; আমেরিকান অভিনেতা-পরিচালক-প্রযোজক-লেখক অরসন ওয়েলস (George Orson, 1915-1985) ; ব্রিটেনের পরিচালক-সমালোচক লিন্ডসে অ্যান্ডারসন (Lindsay Gordon Anderson, 1923-1994) —এরা কখনোই চলচ্চিত্রকে সাহিত্যের উপর নির্ভরশীল বলে মেনে নিতে পারেননি। সুইডেনের লেখক-পরিচালক-চিত্রনাট্যকার বার্গম্যান (Ernst Ingmar Bergman, 1918-2007) এ বিষয়ে লিখেছেন— 'Film has nothing to do with Literature ; the two art forms are usually in conflict'।[৩৯] গত শতাব্দীর মাঝামাঝিতে অথরতত্ত্ব ও নিউ ওয়েব বা নুভেল ভাগ বা নবতরঙ্গ নামে চলচ্চিত্রধারার সূচনা হয়েছিল, যার অনুসারীরা নিজেরাই তাদের চলচ্চিত্রের কাহিনি লিখতেন, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করতেন এবং পরিচালনা করতেন। এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন ফ্রান্সের আঁদ্রে বাজাঁ (André Bazin, 1918-1958)।

একথা সত্য যে শুরুতে সাহিত্যের হুবহু দাসত্ব চলচ্চিত্রের নিজের শিল্পস্বাতন্ত্র্য নির্মাণের কাজকে প্রলম্বিত করেছে। জর্জ মেলিয়েঁ এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর হাত ধরেই চলচ্চিত্র নিজেকে স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে গোড়াপত্তন করল। নিজের মতো করে "সাহিত্য নির্ভর ছবি করা যায় তা তিনিই প্রথম দেখান 'এ ট্রিপ টু দি মুন' (১৯০২) করে (মূল কাহিনিকার জুল ভার্ন)।"[৪০] আর আমেরিকার ফিল্ম-অগ্রপথিক এডউইন এস. পোর্টার (Edwin Stanton Porter, 1870-1941) তাঁর *The Life of an American Fireman* চলচ্চিত্রে নিজের মতো করে কাহিনি বিন্যাস করেন। এরপর ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ (David Llewelyn Wark Griffith, 1875-1948) তৈরি করে দিলেন চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা। টমাস ডিকসনের কাহিনি অবলম্বনে তিনি নির্মাণ করেন এক মহাকাব্যোচিত চলচ্চিত্র 'দি বার্থ অব এ নেশন' (১৯১৫)। এরপর সোভিয়েত চলচ্চিত্রকার কুলেশভ (Lev Vladimirovich Kuleshov, 1899-1970), পুদভ্‌কিন (Vsevolod Illarionovich Pudovkin, 1893-1953),

Dhaka University Institutional Repository

আইজেনস্টাইন (Sergei Mikhailovich Eisenstein, 1898-1948) চলচ্চিত্রকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন উচ্চমার্গীয় শিল্পের আসরে, ক্যামেরার বিভিন্ন কোণ ব্যবহার করে কিংবা সম্পাদনার নানা কৌশল জুড়ে দিয়ে। এরা বুঝতে পেরেছিলেন চলচ্চিত্রের রয়েছে এক অসীম সম্ভাবনার দিক—চোখের সামনে ঘটনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা। যা অন্য কোন শিল্পমাধ্যমের নেই ; এমনকি থিয়েটারেরও নেই, সাহিত্যেরও নেই। এক ফোঁটা চোখের জল কিংবা রোমান্টিক দৃশ্যে নায়িকার ঠোঁটের ভীরু-কাঁপুনি চলচ্চিত্রে ক্লোজআপের মাধ্যমে যেভাবে দেখানো সম্ভব, থিয়েটারে সেটা কল্পনাও করা যায় না। সাহিত্যের বর্ণনায় হয়তো খানিকটা চেষ্টা চলে ; কিন্তু লেখকের ভাষাসৃষ্টির দীনতা থাকলে সেটি অংকুরেই বিনষ্ট হয়। আর ভাষাজ্ঞানহীন পাঠকের কাছে তো সাদা কাগজে ছাপা অক্ষর ছাড়া আর কিছুই নয় সেটি।

সাহিত্যের বর্ণনা চলচ্চিত্রে রূপান্তরের কাজটি একেক পরিচালক একেকভাবে করে থাকেন। পারিপার্শ্বিক অন্য কোন ঘটনা কিংবা প্রতীক এমনকি মিথের সাহায্যেও বর্ণনা করে থাকেন। সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালী'তে ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর দৃশ্য বর্ণনায় মিথের সাহায্য নিয়েছিলেন। ছবিতে ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘটি গড়িয়ে পড়ে যায়। এই ঘটি পড়ে গিয়ে ডুবে যাওয়া আর আত্মার দেহত্যাগ করার সাথে প্রতীকী যোগসূত্র আছে। ভারতীয় মিথে প্রচলিত আছে—জীবন একটি ঘটের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। সাহিত্যের বর্ণনা আর চিত্রনাট্য বা সিনেমার বর্ণনা এক নয়। সাহিত্যে শব্দ দিয়ে কোন বিমূর্ত বিষয়কে বর্ণনা করা যায়। কিন্তু ক্যামেরা কোন বিমূর্ত বিষয় ধারণ করতে পারে না। তারপরেও কাহিনির প্রয়োজনে চিত্রনাট্যের সেই বিমূর্ত ভাবটি দর্শকের সামনে মূর্তিমান করে তুলতে হয়। ধরা যাক, কোন এক দুঃসংবাদে কারো মন ভেঙে গেছে বা ভিতরে ভিতরে গুমরে উঠছে। এটা সাহিত্যে বোঝানো যতটা সহজ চলচ্চিত্রে ততটা নয়। চলচ্চিত্রকারকে সেক্ষেত্রে প্রতীক অথবা ডিটেলের আশ্রয় নিতে হয়। যেমন : 'পথের পাঁচালী'তে হরিহর দুর্গার কথা জিজ্ঞেস করতেই সর্বজয়ার মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে সত্যজিৎ রায় তা দেখিয়েছেন ডিটেল ব্যবহারে—উনুনের ওপর হাড়িতে ভাত ফুটে টগবগ টগবগ করছে। এই ভাত ফুটার টগবগ অবস্থাটিই ঐ মুহূর্তে সর্বজয়ার মনের ভিতরের অবস্থাকে দর্শকের কাছে মূর্ত করে তুলেছে।

যারা এখনো মনে করেন সাহিত্যের সাথে চলচ্চিত্রের বাঁধন জনম-জনমের; কখনোই এর ছেদ ঘটবে না—তারা সাহিত্যের সাথে চলচ্চিত্রের আদান-প্রদানের মধ্যে একটি সূত্র মেনে চলতে চান। হয় চলচ্চিত্রটি হবে সাহিত্যের মূলানুগ অথবা সাহিত্যের চেয়েও সুন্দর। চলচ্চিত্রের নামে সাহিত্যে কালিমা লেপনের অধিকার তারা চলচ্চিত্রকারকে দিতে চান না। সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ এক অর্থে সাহিত্যকে চলচ্চিত্রে রূপান্তর করা বোঝায়। ইংরেজিতে এই বিষয়টি 'adaptation' নামেই বহুল পরিচিত। 'সাহিত্যকে চলচ্চিত্রে হুবহু রূপায়ণ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। যারা এই কাজটি করতে চেয়েছেন তারা ভাল চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে পারেননি। তার কারণ এই দু'য়ের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। সাহিত্যের ভাষা থেকে চলচ্চিত্রের ভাষায় রূপান্তরিত করতে হয়।'[৪১] যে কোন কিছুর রূপান্তরই কোন-না-কোন সূত্র মেনে চলে। তবে সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে রূপান্তর—এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদের মতো সহজ ব্যাপার নয় বরং বেশ জটিল এক প্রক্রিয়া। রূপান্তরের সূত্র প্রতিটি পদক্ষেপে বদলে যেতে পারে। সাহিত্য থেকে চিত্রনাট্য লেখার সময় যেমন বদলাতে পারে ; চিত্রনাট্য থেকে চিত্রায়ণের সময়ও বদলাতে পারে। সম্পাদনার টেবিলেও বদলে যেতে পারে—যা আগে থেকে

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারণ করা ছিল। সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে হুবহু রূপান্তর করলে তা না-সাহিত্য, না-চলচ্চিত্র হয়। 'সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরের আগে চিত্রনাট্য লেখার সময় চিত্রনাট্যকারকে কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হয়। মূল গল্পটিকে ভালোভাবে আত্মস্থ করে বইটিকে একেবারে রেখে দিতে হয়। বই দেখে-দেখে চিত্রনাট্য লেখা আর পরীক্ষাকক্ষে বই দেখে-দেখে উত্তরপত্র লেখা একইরকম ব্যাপার। তবে মূল বইয়ের কিছু-কিছু ঘটনা ও সংলাপ হুবহু ব্যবহার করা যেতে পারে, যেগুলোর মধ্যে সিনেমাটিক উপাদান আছে।'[৪২] মূলগল্প হৃদয়ঙ্গম করার পর চিত্রনাট্যকারের মস্তিষ্কে যে চিত্ররূপ তৈরি হয় তা থেকেই সার্থক চলচ্চিত্রের উত্তম চিত্রনাট্য হতে পারে। সাহিত্যিকের নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্রকারের অভিজ্ঞতা মিলেমিশে ভালো চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। সাহিত্যের কোন অংশ চলচ্চিত্রে যাবে কোন অংশ যাবে না, তা নির্ভর করে গল্পের কোন অংশে সিনেমাটিক উপাদান আছে ; কোন অংশটি ন্যারেটিভের সাথে যাবে, কোন অংশটি ন্যারেটিভের সাথে যাবে না। যেমন : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসের শুরুতে বর্ণনা আছে '...নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে নৌকার আলো ওগুলি।'[৪৩] গৌতম ঘোষ (১৯৫০-) 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৯২) সিনেমায় এই অংশটি হুবহু রূপান্তর করার চেষ্টা করেছেন। আবার '...প্রায় অকেজো লাইনের উপর চার-পাঁচটা ওয়াগন দাঁড়াইয়া আছে। মাছের বোঝা লইয়া যথাসময়ে ওয়াগনগুলি কলিকাতায় পৌঁছিবে। সকালে বিকালে বাজারে বাজারে ইলিশ কিনিয়া কলিকাতার মানুষ ফিরিবে বাড়ি। কলিকাতার বাতাসে পাওয়া যাইবে পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ।'[৪৪] উপন্যাসের এই বর্ণনাটুকু চলচ্চিত্রে রূপান্তরের অনুপযোগী বিধায় এটি চিত্রনাট্য বা সিনেমায় স্থান পায়নি। ক'লাইনের এই বর্ণনায় এতো বেশি লোকেশন আর কলেবর রয়েছে যে, এর হুবহু চিত্রায়ণের মহাযজ্ঞ দর্শকদের বিরক্তির কারণ হতে পারে। কারণ, এর মধ্যে কোন সিনেমাটিক উপাদান নেই। জেসমিন ওয়েস্ট মনে করেন, '... a book should simply serve as the idea, the stimulus, the inspiration for the film.' এডওয়ার্ড ফিশার মনে করেন: "যদি কেউ ছবি দেখে মন্তব্য করে, 'যাঃ, এ তো বইটার মতো নয়!' বা 'আরে, মূল নাটকটা তো এ রকম ছিল না!' —তা হলে সেটা চলচ্চিত্রের খুব উচ্চ প্রশংসাই হবে। কারণ তার মূলের মতো হওয়ার কথাই নয়।"[৪৫] মূল গল্পটি বিস্মৃত, অপঠিত বা অজানা থাকলে চলচ্চিত্রে রূপান্তরে এর বড় রকমের পরিবর্তন হলেও আমরা মাথা ঘামাই না। কিন্তু গল্পটি কোন বিখ্যাত লেখকের কিংবা বহুল পঠিত, জনপ্রিয় বা জানা গল্প হলেই আমাদের মনকে প্রশ্ন করে বসি ছবিটি গল্পের সাথে এই জায়গাটায় মিলল না কেন? ; না মিলাতে দৃশ্যটি ভালো লাগেনি অথবা দৃশ্যটির নতুনত্বের কারণে অনেক নান্দনিক হয়েছে। তবে দর্শকদের এসব চিন্তা চলচ্চিত্রকাররা অনেক সময় আমলে নেন না। সত্যজিৎ রায়ের একটি উদ্ধৃতি থেকে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করা যেতে পারে :

> গল্প থেকে চিত্রনাট্য করতে গিয়ে অনেক সময় দেখেছি যে, গল্পের কোনও-কোনও চরিত্র যেন হঠাৎ পালটে যাচ্ছে। চিত্রনাট্যকে সেক্ষেত্রে মূল গল্পের প্রতি বিশ্বস্ত রাখা যায় না। তার কারণ, গল্পটা যেভাবে এগোচ্ছিল, গভীরভাবে সেটা ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে, কিছু-কিছু চরিত্র এমন আচরণ করছে, তাদের আগের কাজকর্মের সঙ্গে তার সংগতি নেই। ফলে সেগুলি শোধরাবার দরকার হয়। ফলে মূল গল্পের যে পরিণতি ছিল, ছবির গল্পের পরিণতি তা থেকে একটু আলাদা হয়ে পড়ে। ...মূল গল্পটা ভুলেও যাই অনেক সময়। মূল থেকে সরে আসছি কি না, তা নিয়ে মাথা ঘামাই না তখন। গল্পটা যদি রবীন্দ্রনাথের কোনও বিখ্যাত রচনা হয়, তবু আর তা নিয়ে মাথা ঘামাই না।[৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

চলচ্চিত্র সমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪০-) তাঁর একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ১৯৮১ সালে তাঁর গৃহীত এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, 'চিত্ররূপায়ণ মূল সাহিত্যের একটি সমালোচনা—এটিই যথার্থ চলচ্চিত্রের লক্ষণ।'[৪৭] এ ছাড়াও সাহিত্য হতে পারে কোন চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুপ্রেরণা। একটি ছোট্ট কবিতার অনুপ্রেরণায় তৈরি হতে পারে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। এমনকি কোন প্রবন্ধ কিংবা গল্পের একটি মাত্র লাইনের বর্ণনা চলচ্চিত্রকারকে অনুপ্রাণিত করতে পারে নতুন কোন চলচ্চিত্র নির্মাণে।

সাহিত্যে শব্দের পরিবর্তনে যেমন বাক্যের অর্থ বদলে যায়, চলচ্চিত্রেও দৃশ্যকোণ পরিবর্তনের ফলে একই ঘটনার বক্তব্য বিভিন্নভাবে বদলে যেতে পারে। এজন্য পরিচালককে ঠিক করতে হয় কোন কোণ থেকে দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দি করবেন। প্রয়োজন বুঝে সঠিক সময়ে সঠিক কোণ থেকে দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দি করতে পারাই সফল পরিচালকের কাজ। ভালো সিনেমাটিক উপাদানসমৃদ্ধ সাহিত্যকে কোন পরিচালক যদি সঠিক কোণে দৃশ্যগুলো ক্যামেরাবন্দি করতে না পারেন তাহলে এটি একটি নিম্নমানের চলচ্চিত্র হতে বাধ্য। এরকম অনেক সিনেমা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের লেন-দেনের পথে নির্মিত হয়েছে। এইসব নিম্নমানের ছবির জন্য এককভাবে স্ব-স্ব নির্মাতারাই দায়ী। কোণ নির্বাচনের মতো লেন্স ব্যবহারেও পরিচালককে সতর্ক থাকতে হয়। বিষয়টা অনেকটা কবিতায় ছন্দ প্রয়োগের মতো। "তখন 'পথের পাঁচালী'র শুটিং হচ্ছে। অনেকেই দেখতে গেছেন। দুর্গার একটা ক্লোজ-আপ দরকার। সত্যজিৎ রায় বা তাঁর ক্যামেরাম্যান সুব্রতবাবু (সুব্রত মিত্র, ১৯৩০-২০০১) কেউই ঠিক করতে পারছেন না ঠিক কী লেন্স ব্যবহার করা যায়। সকলেই ভীষণ ভাবছেন। এমন সময় ওখানে উপস্থিত একজন বললেন যে ৭৫ মি.মি. লেন্স ব্যবহার করলে ভালো হবে। তখন ৭৫ মি.মি. লেন্স ক্যামেরায় লাগানো হল এবং দেখা গেল সত্যিই দুর্গার মুখখানি অসাধারণ লাগছে। ছবি তোলা হল। কিন্তু এডিটিং টেবিলে দেখা গেল ছবিটি একেবারেই আলাদা একটি ইমেজ হয়ে রয়েছে। তার আগের ইমেজ বা পরের ইমেজের মধ্যে একটুও সেতুবন্ধন করছে না। ফলে সত্যজিৎ রায়কে সে ইমেজ সরিয়ে রেখে আবার নতুন করে শুট করতে হল।"[৪৮]

অনেকে মনে করেন, সাহিত্যের সাথে চলচ্চিত্রের আদান-প্রদান বলতে গেলে প্রায় একপাক্ষিক। সাহিত্য শুধু গল্প-সংলাপ দিয়ে যাচ্ছে, চলচ্চিত্র তা গ্রহণ করছে। আবার এ কথাও স্বীকার্য যে, চলচ্চিত্রে সাহিত্যের সফল পরিণতি—অন্তরালে চলচ্চিত্র কিছুটা হলেও সাহিত্যকে প্রভাবিত করছে। 'পঞ্চাশের দশক থেকে সিনেমা শুধুমাত্র সাহিত্যের নকল করে ক্ষান্ত হয়নি—সে সাহিত্য রচয়িতাদের এমন উপন্যাস লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে যা অচিরেই সিনেমার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।'[৪৯] অনেক সাহিত্যিকও তাদের গল্প-উপন্যাসকে চলচ্চিত্রধর্মী করে লিখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। উদাহরণত নীহাররঞ্জন গুপ্তের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তাদের কাছে ফিল্ম-রাইটের মোহ অত্যন্ত লোভনীয়। তারা সাহিত্যে চলচ্চিত্রের ভিজ্যুয়াল দিকটি ফুটিয়ে তুলতে চান বর্ণনার মাধ্যমে। বর্ণনার ধরনও এমন হয় যে, চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য তা এমন সহজপাচ্য যে প্রায় চিত্রনাট্যের শামিল। ফলে চলচ্চিত্রকাররা এমন তৈরি জিনিস পেয়ে লুফে নেন। তারা শুধুমাত্র এটিতে গতি সঞ্চার করে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলেন। এক্ষেত্রে সাহিত্য ভাব ও ভাষাগত ছবি তৈরি করে, চলচ্চিত্র দৃশ্য-শ্রাব্য ইমেজ নির্মাণ করে। সাহিত্যে যা মনোগত—চলচ্চিত্রে তা দৃশ্যগত। ফরাসি চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক, সমালোচক ও নির্মাতা জঁ মিত্রি (১৯০৭-১৯৮৮) দেখিয়েছেন, 'সাহিত্যে ন্যারেটিভ

Dhaka University Institutional Repository

একটা জগতের রূপ পায় আর চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত জগৎ নিজেকে একটা ন্যারেটিভ রূপে গড়ে তোলে।'[৫০] তবে সাহিত্য ন্যারেটিভ থেকে ফিল্ম ন্যারেটিভে রূপান্তরের সময় মনে রাখতে হবে যে— সাহিত্য ও চলচ্চিত্র উভয়ই আলাদা মাধ্যম, একটির সঙ্গে অন্যটির পারস্পরিক আদান প্রদান হতে পারে, হুবহু অনুকরণ নয়। এটাই এই দু'য়ের সম্পর্কের মূল কথা।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. http://en.wikipedia.org/wiki/Sumer
২. অশোক মিত্র, *পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৫, ১৭, ১৯
৩. পবিত্র সরকার, 'সাহিত্য ও চলচ্চিত্র', *বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়*, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি: বাংলা বিভাগ, চন্দননগর কলেজ-জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৭
৪. http://www.history-of-china.com/spring-and-autumn-period/mozi.htm
৫. http://www.obscurajournal.com/history.php
৬. অপরেশ কুমার ব্যানার্জী, ভূমিকা, *চলচ্চিত্র শিক্ষা*, হাসান রাউফুন রচিত, ঢাকা: জ্যোতিপ্রকাশ, পৃ. ৬
৭. David Parkinson, *History of Film*, Italy: Conti Tipocolor, Thames and Hudson, ISBN 0-500-20277-x), P. 16
৮. অমিয় রায় চৌধুরী, *শতবর্ষের সিনেমা ও চার্লি চ্যাপলিন*, কলকাতা: দীপায়ন, প্রথম সংস্করণ- মাঘ ১৪০৪, পৃ. ১
৯. সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, কলিকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স, দ্বাদশ সংস্করণ-১৯৭৫, পৃ. ১
১০. বাদল রহমান, *চলচ্চিত্রের ভাষা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১৮
১১. গৌতম ঘোষের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, কলকাতা: তারিখ- ০৬.০১.২০১৪ (গৌতম ঘোষের নিজ বাসায় এই গবেষক কর্তৃক ভিডিও ক্যামেরায় ধারণকৃত)
১২. Haig P. Manoogain, *The Film Makers Art*, উদ্ধৃত- শ্রীনিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র*, আনন্দধারা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১২ মে ১৯৮৬, পৃ. ১০
১৩. গৌতম ঘোষের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, পূর্বোক্ত।
১৪. ধীমান দাশগুপ্ত, 'সাহিত্যের ভাষা বনাম চলচ্চিত্রের ভাষা : সংঘাত ও সমন্বয়', *বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮
১৫. David Parkinson, *History of Film*, Thames and Hudson, Italy, Reprinted 1997, ISBN 0-500-20277-Xs, P. 07
১৬. ধীমান দাশগুপ্ত, *চিত্রনাট্য রচনা ও চিত্রনাট্য বিশ্লেষণ*, কলকাতা: বাণীশিল্প, চতুর্থ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ-জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১০, ১৮
১৭. *চিত্রনাট্য, চলচ্চিত্রের অভিধান*, ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলকাতা: বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ১৯৮১, পৃ. ১৩০
১৮. মানজারেহাসীন মুরাদ, ভূমিকা, *চলচ্চিত্র শিক্ষা*, হাসান রাউফুন রচিত, ঢাকা: জ্যোতিপ্রকাশ, পৃ. ৪
১৯. দিব্যেন্দু পালিত, 'চলচ্চিত্র কথা', অসীম সোম সম্পাদিত, *রূপরেখা*, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ- জুন ১৯৭৫, পৃ. ১৩২
২০. http://www.pbs.org/wgbh/masterpiece/learningresources/fic_adaptation.html
২১. মির্জা তারেকুল কাদের, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প*, বাংলা একাডেমি: ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৯৩, পৃ. ১০৩
২২. বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, *কীভাবে ছবি করি কীভাবে ছবি হয়*, কলকাতা, পরম্পরা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০১১, পৃ. ৩৩
২৩. মুনমুন হোড় সিন্‌হা, 'যুগ্ম আহ্বায়কের নিবেদন', *বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩
২৪. আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, বাংলা একাডেমি: ঢাকা, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

২৫. http://d2buyft38glmwk.cloudfront.net/media/cms_page_media/11/FITC_Adaptation_1.pdf
২৬. অনুপম হায়াৎ, *চলচ্চিত্রে দেবদাস*, *ভোরের পাতা*, ঈদ সংখ্যা- ২০১৫, ঢাকা
২৭. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_based_on_poems
২৮. সব্যসাচী দেব, সূচক ভাষণ, *বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
২৯. *এক্ষণ*, নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত, কলকাতা: সুবর্ণরেখা, মহাত্মাগান্ধী রোড
৩০. পূর্ণেন্দু পত্রী, *সিনেমা সংক্রান্ত*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় মুদ্রণ- জুলাই ২০০৫, পৃ. ৯
৩১. ঈশ্বর চক্রবর্তী, উদ্ধৃত- অনুপম হায়াৎ, *চলচ্চিত্রবিদ্যা*, চলচ্চিত্র অধ্যয়ন কেন্দ্র: ঢাকা, পৃ. ৫৫
৩২. অসিত সেন, পরিচালকের দায়-দায়িত্ব, *শতবর্ষে চলচ্চিত্র* (১ম খণ্ড), নির্মাল্য আচার্য্য ও দিব্যেন্দু পালিত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ- জনিুয়ারি-২০১১, পৃ. ১৩
৩৩. 'সাহিত্য ও চলচ্চিত্র', *চলচ্চিত্রের অভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০২
৩৪. পার্থ রাহা, 'চলচ্চিত্র ও সাহিত্য', *বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
৩৫. প্রণব কুমার বিশ্বাস, *বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, সমকাল প্রকাশনী, কলকাতা, বাংলা- ১৩৮৪ সাল, পৃ. ১৮
৩৬. বক্তব্য : সত্যজিৎ রায়, উদ্ধৃত– পূর্ণেন্দু পত্রী, *সিনেমা সংক্রান্ত*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় মুদ্রণ- জুলাই ২০০৫, পৃ. ১১
৩৭. মৃণাল সেন, চলচ্চিত্র ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ, গ্রন্থপ্রকাশ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, পৃ. ২৫
৩৮. পিয়ের লেপ্রোহোঁ, *Michelengelo Antonioni*, উদ্ধৃত: পবিত্র সরকার, *সাহিত্য ও চলচ্চিত্র*, পৃ. ৮৮
৩৯. Ernst Ingmar Bergman, *The English Literature Companion*, Google Book, By Julian Wolfreys, P. 237 (https://books.google.com.bd/books?id=N4YdBQAAQBAJ&pg=PA237&dq=Film+has+nothing+to+do+with+Literature&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiYhJCTtoHXAhWJs48KHStsAeYQ6AEIJDAA#v=onepage&q=Film%20has%20nothing%20to%20do%20with%20Literature&f=false)
৪০. হাসান রাউফুন, *চলচ্চিত্র শিক্ষা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০
৪১. গৌতম ঘোষের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, পূর্বোক্ত।
৪২. চাষী নজরুল ইসলামের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, কমলাপুর-ঢাকা, তারিখ- ২১.০৪.২০১১
৪৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *পদ্মানদীর মাঝি*, মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস সম্পাদিত, মল্লিক ব্রাদার্স ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ- জুলাই ২০০৫, পৃ. ৩১
৪৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬
৪৫. মন্তব্য : এডওয়ার্ড ফিশার, উদ্ধৃত– পবিত্র সরকার, 'সাহিত্য ও চলচ্চিত্র', *বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
৪৬. সত্যজিৎ রায়, *দেশ*, ১৭ জুন ১৯৯৫ সংখ্যা, পৃ. ৪৭-৪৮ (উদ্ধৃত– পবিত্র সরকার, 'সাহিত্য ও চলচ্চিত্র', *বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২)
৪৭. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকার (১৯৮১) উদ্ধৃত– 'সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের আন্তঃসম্পর্ক', *বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬
৪৮. বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, *কীভাবে ছবি করি কীভাবে ছবি হয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
৪৯. গাস্তঁ রোবের্জ, সিনেমার কথা, বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ১৬৭
৫০. জঁ মিত্রি, উদ্ধৃত– ধীমান দাশগুপ্ত, 'সাহিত্যের ভাষা বনাম চলচ্চিত্রের ভাষা : সংঘাত ও সমন্বয়', *বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্যনির্ভর বাংলা চলচ্চিত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্যনির্ভর বাংলা চলচ্চিত্র

বাংলা চলচ্চিত্র ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সংজ্ঞার মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বলতে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে নির্মিত চলচ্চিত্রকে বোঝায়। তবে কেউ কেউ অবিভক্ত বাংলা থেকে আরম্ভ করে পূর্ব পাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশে নির্মিত সকল চলচ্চিত্রকে এর অন্তর্ভুক্ত করতে চান। অপরদিকে বাংলা চলচ্চিত্র বলতে পৃথিবীর যেকোন স্থানে বাংলা ভাষায় নির্মিত যাবতীয় চলচ্চিত্রকে বোঝায়। বাংলা ভূখণ্ড, এমনকি সমগ্র উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ হীরালাল সেন। বিশ্ব চলচ্চিত্র-যাত্রার শুরুর দিকে "১৯৯০ সালে তিনি ইংল্যান্ড থেকে ছবি তোলার যন্ত্রপাতি আনেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যোগাযোগ করেন সেকালের সুদক্ষ মঞ্চনট অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে। অমর দত্ত তখন কোলকাতার ক্লাসিক থিয়েটারের মালিক। ওখানে তখন মঞ্চস্থ হচ্ছিল জনপ্রিয় নাটক 'সীতারাম'। হীরালাল সেন ওই নাটকের নির্বাচিত খণ্ডদৃশ্য চলচ্চিত্রায়িত করেন। এরপর অনেক নাট্যদৃশ্য তিনি ক্যামেরায় ধরে রাখেন।"[১] এর তিন দশক পর ১৯৩১ সালে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'দি লাস্ট কিস' মুক্তি পায়। ঢাকার নবাব পরিবারের উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় অম্বুজপ্রসন্ন গুপ্তের পরিচালনায় নির্মিত হয় এ সিনেমাটি। ঢাকার বাইরে পরিবেশনের জন্য ছবিটি আহসান মঞ্জিলের সৈয়দ সাহেব আলম কলকাতার 'অরোর ফিল্ম কোম্পানি'র কাছে নিয়ে যান। সেখানে অরোর ফিল্ম কোম্পানীর লোকেরা সুকৌশলে প্রিন্টটির স্বত্ব কিনে নেয়। ছবিটির দ্বিতীয় কোন প্রিন্ট না থাকায় এবং অরোর ফিল্ম কোম্পানি এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না করায় ঐতিহাসিক এ সিনেমাটির আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি। ফলে ছবিটির গল্প সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু জানা সম্ভব হয়নি। 'দি লাস্ট কিস'–এর আগে অবশ্য ১৯২৭-২৮ সালে ঢাকায় পরীক্ষামূলকভাবে 'সুকুমারী' নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু জনসম্মুখে এটি প্রদর্শিত হয়নি। এর কাহিনি সম্বন্ধেও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।[২]

'দি লাস্ট কিস'–এর ৩৫ বছর পর ১৯৫৬ সালে আবদুল জব্বার খান স্বরচিত নাটক 'ডাকাত' অবলম্বনে 'মুখ ও মুখোশ' নির্মাণ করেন। এটি বাংলাদেশের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত সবাক চলচ্চিত্র। হীরালাল সেন থেকে আব্দুল জব্বার খান পর্যন্ত চলচ্চিত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এদেশ তথা উপমহাদেশে চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল নাটকের মঞ্চরূপকে সরাসরি ফিল্মে ধারণ করার মাধ্যমে। এমনকি উপমহাদেশে সবাক চলচ্চিত্র যুগের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'দেনা পাওনা'ও নির্মিত হয়েছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে। নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত ১৯৩১ সালে সিনেমাটি মুক্তি পায়। অর্থাৎ সাহিত্যকে আশ্রয় করেই উপমহাদেশে চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু ও বিকাশ। বাংলাদেশ ভূখণ্ডের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' থেকে ১৯৮৫ সাল অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ গবেষণার জন্য নির্বাচিত সময়কাল পর্যন্ত ৭৮৯ টি

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা নির্মিত হয়েছে।[৩] এর মধ্যে সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র হচ্ছে প্রায় একশ। এর বাইরে অনেক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন: উপন্যাস, গল্প, নাটক, লোকসাহিত্য এমনকি কবিতা থেকেও সিনেমা নির্মিত হয়েছে।

বর্তমান গবেষণার জন্য নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে নির্মিত সাহিত্যনির্ভর বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ছাড়াও দেশে-বিদেশে এ পর্যন্ত যে কয়টি সাহিত্যনির্ভর উল্লেখযোগ্য বাংলা সিনেমা নির্মিত হয়েছে তার একটি সারসংক্ষেপ আলোচনা প্রাসঙ্গিক। এ প্রসঙ্গে প্রথমে আসে 'পথের পাঁচালী' (১৯৫৫) –এর নাম। জগদ্বিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ-আনুকূল্যে নির্মিত এই সিনেমা বিশ্ব-চলচ্চিত্র দরবারে আজও বাংলা সিনেমার প্রতিনিধিত্ব করে চলছে। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস অবলম্বনে একই নামে নির্মিত এই সিনেমাটি উক্ত সালে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের জন্য ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায় এবং ১৯৫৬ সালে ফ্রান্সের 'কান' চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল পুরস্কারসহ বহু পুরস্কার লাভ করে। একই চলচ্চিত্রকারের সাহিত্যনির্ভর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হচ্ছে— তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়-এর গল্প অবলম্বনে নির্মিত 'জলসাঘর' (১৯৫৮) ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য অবলম্বনে নির্মিত 'তিন কন্যা' (১৯৬১), 'চারুলতা' (১৯৬৪) ও ঘরে বাইরে (১৯৮৪) ; উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী রচিত রূপকথা অবলম্বনে একই নামে নির্মিত 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' (১৯৬৯) ; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়–এর উপন্যাস অবলম্বনে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' (১৯৭০) ; সত্যজিতের নিজের লেখা সাহিত্য 'ফেলুদা সিরিজ' অবলম্বনে নির্মিত 'জয় বাবা ফেলুনাথ' এবং হেনরিক ইবসেন-এর *An Enemy of the People* অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র 'গণশত্রু' (১৯৮৯)।[৪]

বাংলা সিনেমার আরেক কিংবদন্তি ঋত্বিক কুমার ঘটক এর দ্বিতীয় ছবি অযান্ত্রিক (১৯৫৮) সুবোধ ঘোষ রচিত একই নামের ছোটগল্প অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে। এরপর শিবরাম চক্রবর্তীর সর্বাধিক আলোচিত উপন্যাস 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' অবলম্বনে নির্মাণ করেন 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৫৮)। ভারতীয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর বড়গল্প 'চেনামুখ'–এর কাহিনি অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটক তৈরী করেন তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০)। এর আখ্যান ছিল উদ্বাস্তুদের অসহনীয় জীবন সংগ্রাম। 'অথর' ধারার এ নিরীক্ষাধর্মী চলচ্চিত্রটি ঋত্বিকের অন্যসব চলচ্চিত্র থেকে দর্শকদের কাছে বেশি জনপ্রিয়তা পায়। 'সাইট অ্যান্ড সাউন্ড' চলচ্চিত্র বিষয়ক মাসিক সাময়িকীতে সর্বকালের সেরা চলচ্চিত্রের তালিকায় এটি ২৩১ নম্বরে অবস্থান পেয়েছে।[৫] ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচিত বিখ্যাত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটক ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে নির্মাণ করেন 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্র। এটি 'একমাত্র বাংলাদেশি ছবি হিসেবে ওয়ার্ল্ড ক্লাসিক্স-এর শ্রেষ্ঠ চল্লিশ ছবির তালিকায় স্থান পেয়েছে।'[৬]

এদেশে সিনেমা নির্মাণের উন্মেষকালে নাচ-গানসমৃদ্ধ উর্দু সিনেমা বানানোর প্রতি বেশি উৎসাহী হয়ে পড়েন বাংলাদেশি চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা। এ সময় ঢাকায় নির্মিত হয় চান্দা, তালাশ, মালা, সংগম, তানহা, বাহানা ও চকোরী-এর মতো উর্দু সিনেমা। ফলে এর প্রভাবে বাংলা সিনেমার ভবিষ্যৎ সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। 'বাংলা চলচ্চিত্রের এমন দুঃসময়ে পরিচালক ও প্রযোজক হিসেবে এগিয়ে আসেন সালাহউদ্দিন। বাঙালি পরিচালক হিসেবে তিনি নজর দেন শেকড়ের দিকে। তিনি এমন ছবি নির্মাণে আগ্রহী হন যেটি বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে। ফলহেতু ১৯৬৫

সালে তিনি নির্মাণ করেন দেশের প্রথম লোককাহিনি ভিত্তিক চলচ্চিত্র 'রূপবান'। ছবিটির নির্মাতা সালাহউদ্দিন হলেও এর নির্মাণে পর্দার অন্তরালে ভূমিকা রেখেছিলেন সিনেমা সংশ্লিষ্ট দুই ভাই সফদর আলী ভূঁইয়া ও সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া। তাঁদের দীর্ঘদিনের উৎসাহে এ সিনেমা নির্মাণে নেমেছিলেন সালাহউদ্দিন।'[৭] যাত্রাপালার প্রভাবযুক্ত এ ছবিটির ব্যবসায়িক সাফল্যের পর একই বছর একই লোককাহিনি নিয়ে সফদার আলি ভূঁইয়া নির্মাণ করেন 'রহিম বাদশা রূপবান'। ১৯৬৯ সালে সালাউদ্দিন আবারও 'আলোমতি' নামে লোকসাহিত্য নির্ভর সিনেমা নির্মাণ করেন। লোকসাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের আগে তিনি নাটক অবলম্বনে সিনেমা নির্মাণ করেও মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। আমজাদ হোসেনের লেখা নাটক 'ধারাপাত' অবলম্বনে ১৯৬৩ সালে তিনি একই নামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এদেশে লোককাহিনি নির্ভর সিনেমার জনপ্রিয়তা ও আধিপত্য বিরাজ করে আশির দশক পর্যন্ত। এমনকি বাংলাদেশে এ পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যবসাসফল ছবি 'বেদের মেয়ে জোসনা' (১৯৮৯) নির্মিত হয়েছে লোককাহিনি অবলম্বনে। তোজাম্মেল হক বকুল পরিচালিত এ ছবিতে মূল ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অঞ্জু ঘোষ এবং ইলিয়াস কাঞ্চন। ছবির 'বেদের মেয়ে জোসনা আমায় কথা দিয়েছে' গানটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। চলচ্চিত্রটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও পুনঃনির্মিত হয়। এতে মূল ভূমিকায় অভিনয় করেন অঞ্জু ঘোষ ও চিরঞ্জীত। বাংলাদেশে ছবিটি নির্মাণ করতে খরচ হয়েছিল ২০ লক্ষ টাকা। এর বিপরীতে ছবিটি আয় করেছে একশগুণ টাকা। 'ছবিটি মুক্তির দুই বছর পর একটি বিনোদন পত্রিকা জানিয়েছে, এই আয়ের পরিমাণ ২০ কোটি টাকা। যদিও অনেকেই তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই বিভিন্ন পরিমাণ টাকার অঙ্কের কথা বলেন। কেউ কেউ ৪০ কোটি টাকার কথাও বলেন।'[৮]

লোককাহিনি নির্ভর অন্যান্য সিনেমাগুলো হচ্ছে— ইবনে মিজান পরিচালিত 'আবার বনবাসে রূপবান' (১৯৬৬), 'জরিনা সুন্দরী' (১৯৬৬), 'আমির সওদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরী' (১৯৭০) ও 'কমল রানীর দীঘি' (১৯৭২) ; সৈয়দ আউয়াল পরিচালিত 'গুনাই বিবি' (১৯৬৬) ; বজলুর রহমান পরিচালিত 'গুনাই' (১৯৬৬) ; আলি মনসুর পরিচালিত 'মহুয়া' (১৯৬৬) ; জহির রায়হান পরিচালিত 'বেহুলা' (১৯৬৬) ; হাবিব মেহেদী পরিচালিত ময়ূরপঙ্খী (১৯৬৭) ; সফদর আলী ভূঁইয়া পরিচালিত 'কাঞ্চনমালা' (১৯৬৭) ও 'কাজলরেখা' (১৯৭৬) ; আজিজুর রহমান পরিচালিত 'সাইফুল মূল্ক বদিউজ্জামাল' (১৯৬৭) ও 'মধুমালা' (১৯৬৮) ; দিলীপ সোম পরিচালিত 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৬৮) ; খান আতাউর রহমান পরিচালিত 'অরুণ বরুণ কিরণ মালা' (১৯৬৮) ; মহিউদ্দীন পরিচালিত 'গাজী কালু চম্পাবতী' (১৯৬৯) ; ফাল্গুনী গোষ্ঠী পরিচালিত 'মলুয়া' (১৯৬৯) ; ফয়েজ চৌধুরী পরিচালিত 'মালকাবান' (১৯৭৫) ; শেখ নজরুল ইসলাম পরিচালিত 'নদের চাঁদ' (১৯৭৯), এবং চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত 'বেহুলা লক্ষিন্দর' (১৯৮৭)। নিকট অতীতে এ কে সোহেল পরিচালিত লোককাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্র 'খায়রুন সুন্দরী' (২০০৭) ছবিটিও দারুণভাবে ব্যবসা সফল হয়েছে।

ভারতের আরেক বরেণ্য চলচ্চিত্রকার তপন সিংহ উল্লেখযোগ্য কিছু সাহিত্যনির্ভর সিনেমা নির্মাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা' ছোটগল্প অবলম্বলে ১৯৫৬ সালে তিনি নির্মাণ করেন 'কাবুলিওয়ালা'। নায়ক ছবি বিশ্বাসের দুর্দান্ত অভিনয়ে এবং তপন সিংহ-এর দক্ষ পরিচালনায় ছবিটি আজও মানুষের মনে দাগ কাটে। ১৯৬১ সালে একই নামে বিমল রায় ভারতে এবং ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

সালে কাজী হায়াৎ বাংলাদেশে এর পুনঃনির্মাণ করেন। তপন সিংহ-এর সাহিত্যনির্ভর অন্যান্য চলচ্চিত্রগুলো হচ্ছে— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্প অবলম্বনে 'ক্ষুদিত পাষাণ' (১৯৬০) ; তারাশংকর বন্দোপাধ্যয়ের উপন্যাস অবলম্বনে একই নামে নির্মিত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৬২) ; শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঝিন্দের বন্দী' উপন্যাসের কাহিনি নিয়ে একই নামে নির্মিত চলচ্চিত্র 'ঝিন্দের বন্দী' (১৯৬১) ; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এডভেঞ্চার উপন্যাস 'সবুজ দ্বীপের রাজা' অবলম্বনে নির্মিত 'সবুজ দ্বীপের রাজা' (১৯৭৯) এবং সমরেশ বসুর উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত 'নির্জন সৈকতে'(১৯৬৩)।

স্বনামধন্য চলচ্চিত্র পরিচালক চাষী নজরুল ইসলাম সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণে সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন।[৯] প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস 'নিজের সঙ্গে দেখা' অবলম্বনে ১৯৮১ সালে নির্মাণ করেন 'ভালো মানুষ'। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাস' উপন্যাস অবলম্বনে পরের বছর নির্মাণ করেন 'দেবদাস' (১৯৮২)। এটি ছিল বাংলাদেশে দেবদাস উপন্যাসের প্রথম চলচ্চিত্রায়ণ। ছবিটি বাঙালি দর্শক সমাজে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। দেবদাস উপন্যাস নিয়ে উপমহাদেশে সর্বাধিক সংখ্যক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। ২০১৩ সালে চাষী নজরুল ইসলাম এর পুনঃনির্মাণ করেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৮৪ সালে তিনি একই নামে নির্মাণ করেন 'চন্দ্রনাথ'। এতে নাম ভূমিকায় (চন্দ্রনাথ) অভিনয় করেছেন রাজ্জাক এবং সরযূর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দোয়েল। এছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুচন্দা, গোলাম মুস্তাফা, সিরাজুল ইসলাম, সাইফুদ্দিন প্রমুখ। চিত্রনাট্য লিখেছেন কেশব চট্টোপাধ্যায়। চলচ্চিত্রটি ৯ম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ পার্শ্বচরিত্র অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক, শ্রেষ্ঠ গীতিকার ও শ্রেষ্ঠ নারী কণ্ঠশিল্পী বিভাগে পুরস্কার লাভ করে। শরৎ সাহিত্য নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে পরপর সফলতা পেয়ে চাষী নজরুল ইসলাম ১৯৮৬ সালে শরৎচন্দ্র-এর 'শুভদা' উপন্যাস অবলম্বনে নির্মাণ করেন 'শুভদা'। এ ছবিতেও তিনি সফলতা পান। এতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আনোয়ারা ; অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাজ্জাক, বুলবুল আহমেদ, জিনাত প্রমূখ। শরৎ সাহিত্যের বলয় থেকে বেড়িয়ে ১৯৯৭ সালে সেলিনা হোসেন এর উপন্যাস 'হাঙর নদী গ্রেনেড' অবলম্বনে একই নামে নির্মাণ করেন 'হাঙর নদী গ্রেনেড'। এতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুচরিতা, সোহেল রানা, অরুণা বিশ্বাস, অন্তরা, ইমরান, দোদুল, আশিক প্রমুখ। চাষী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্প অবলম্বনে একসময় 'কাঠগড়া' নামের একটি ছবির কাজ শুরু করেছিলেন। নানা জটিলতায় তখন ছবিটির কাজ শেষ করতে পারেননি।[১০] পরে এই গল্প অবলম্বনে ২০০৪ সালে ইমপ্রেস টেলিফিল্মের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি 'শাস্তি' নামেই ছবিটি নির্মাণ করেন। ২০০৬ সালে রবীন্দ্রনাথের আরেক গল্প 'সুভা' অবলম্বনে নির্মাণ করেন 'সুভা' চলচ্চিত্রটি। এছাড়া রাবেয়া খাতুন-এর উপন্যাস অবলম্বনে ২০০৪ সালে নির্মাণ করেন 'মেঘের পরে মেঘ'। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক এই ছবিতে অভিনেতা রিয়াজ দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেন এবং তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন পূর্ণিমা।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার আমজাদ হোসেন তাঁর নিজের লেখা উপন্যাস 'নিরক্ষর স্বর্গে' অবলম্বনে নির্মাণ করেন 'নয়নমনি' (১৯৭৬)। এতে প্রধান প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন ফারুক, ববিতা, এটিএম শামসুজ্জামান, সুলতানা জামান, আনোয়ার হোসেন, আনোয়ারা, রওশন

জামিল, সৈয়দ হাসান ইমাম, ও টেলি সামাদ। এ কে এম জাহাঙ্গীর খান নিবেদিত এই ছবিটি আলমগীর পিকচার্স লি.-এর ব্যানারে নির্মিত হয়। চলচ্চিত্রটি তিনটি বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে। এরপর ১৯৭৮ সালে নিজের লেখা আরেক উপন্যাস 'দ্রৌপদী এখন ট্রেনে' অবলম্বনে নির্মাণ করেন 'গোলাপী এখন ট্রেনে'। এ ছবিটিও শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। তাঁর 'নাগর দোলা' (১৯৭৯) চলচ্চিত্রটিও নাজমুল আলম রচিত 'ফুলমতী' নামক ছোটগল্প অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রকার গৌতম ঘোষও সাহিত্যের নদীতে অবগাহন করেছেন চলচ্চিত্র নির্মাণের রশদের খোঁজে। কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বিখ্যাত উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' অবলম্বনে গৌতম ঘোষ বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথ প্রযোজনায় ১৯৯৩ সালে নির্মাণ করেন 'পদ্মা নদীর মাঝি'। এতে অভিনয় করেন— আসাদ, চম্পা, রূপা ব্যানার্জী, উৎপল দত্ত প্রমূখ। এরপর নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত সমরেশ মজুমদার-এর 'কালবেলা' উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে ২০০৯ সালে নির্মাণ করেন 'কালবেলা'। এতে মূখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, পাওলী দাম, সন্তু মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ২০১০ সালে আবার ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'মনের মানুষ' উপন্যাস অবলম্বনে গৌতম ঘোষ নির্মাণ করেন 'মনের মানুষ'। ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, হাসান ইমাম, রাইসুল ইসলাম আসাদ, চঞ্চল চৌধুরী, শুভ্র কুণ্ডু, পাওলি দাম, প্রিয়াংশু চ্যাটার্জী, তাথৈ, নাউফেল জিসান, চম্পা, শাহেদ আলী প্রমুখ।

চলচ্চিত্র পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ ১৯৯২ সালে নির্মাণ করেন তাঁর প্রথম ছবি 'হীরের আংটি'। এই চলচ্চিত্রটি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় রচিত একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে চিত্রায়িত। এরপর সুচিত্রা ভট্টাচার্য-এর 'দহন' উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৯৭ সালে একই নামে নির্মাণ করেন 'দহন' চলচ্চিত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি' উপন্যাস অবলম্বনে ২০০৩ সালে নির্মাণ করেন 'চোখের বালি'। এতে অভিনয় করেন বলিউডের প্রভাবশালী অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন (বিনোদিনী), রাইমা সেন (আশালতা), প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরেক উপন্যাস 'নৌকাডুবি' অবলম্বনে ২০১১ সালে একই নামে নির্মাণ করেন 'নৌকাডুবি'।

১৯৯২ সালে নন্দিত সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস 'শঙ্খনীল কারাগার' অবলম্বনে মুস্তাফিজুর রহমান নির্মাণ করেন 'শঙ্খনীল কারাগার'। এতে অভিনয় করেছেন ডলি জহুর, আসাদুজ্জামান নূর, সুবর্ণা মুস্তফা, চম্পা প্রমুখ। চলচ্চিত্রটি বিশেষ সুনাম অর্জনের পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রসহ চারটি বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে। এই সাফল্যের পর হুমায়ূন আহমেদ নিজেই চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রয়াসী হন। ১৯৯৪ সালে তাঁর নিজের লেখা উপন্যাস অবলম্বনে 'আগুনের পরশমণি' নির্মাণ করে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের সফল পরিচালক হিসেবে তিনি নাম লেখান। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন আসাদুজ্জামান নূর, বিপাশা হায়াত, আবুল হায়াৎ, ডলি জহুর প্রমুখ। বাংলাদেশ সরকারের অনুদানে নির্মিত 'আগুনের পরশমণি' শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রসহ আটটি বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে। এরপর একে একে তিনি নিজের রচিত সাহিত্য অবলম্বনে নির্মাণ করেন বেশ কয়েকটি নন্দিত সিনেমা। তাঁর 'শ্রাবণ মেঘের দিন' উপন্যাস অবলম্বনে নূহাশ চলচ্চিত্রের ব্যানারে ১৯৯৯ সালে নির্মাণ করেন 'শ্রাবণ মেঘের দিন'। ২০০০ সালে নিজের

Dhaka University Institutional Repository

লেখা উপন্যাস অবলম্বনে নির্মাণ করেন 'দুই দুয়ারী'। ছবির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন জাহিদ হাসান, শাওন, মাহফুজ আহমেদ, আনোয়ারা, মুক্তি, গোলাম মুস্তফা, সালেহ আহমেদ ও ডাক্তার এজাজ। ২০০৩ সালে নিজের লেখা অপর উপন্যাস অবলম্বনে নির্মাণ করেন 'চন্দ্রকথা'। এতে প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেন ফেরদৌস ও মেহের আফরোজ শাওন। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আসাদুজ্জামান নূর, আহমদ রুবেল, চম্পা, এবং স্বাধীন খসরু। ২০০৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'শ্যামল ছায়া' হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র। ছবিটি ২০০৬ সালে 'সেরা বিদেশী ভাষার চলচ্চিত্র' বিভাগে বাংলাদেশ থেকে অস্কারে মনোনীত করা হয়েছিল। ছবিটির বিশেষত্ব হচ্ছে— সরাসরি যুদ্ধের দৃশ্য না দেখিয়েও এতে যুদ্ধের আবহ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এটি তাঁর 'শ্যামল ছায়া' উপন্যাস অবলম্বনে নির্মাণ করা হয়েছে। ২০০৬ সালে নিজের লেখা সাহিত্য অবলম্বনে নির্মাণ করেন 'নয় নম্বর বিপদ সংকেত' ছবিটি প্রযোজনা করে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম। ২০০৮ সালে তাঁর উপন্যাস অবলম্বনে একই নামে নির্মাণ করেন 'আমার আছে জল'। চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন ফেরদৌস, মীম, জাহিদ হাসান, মেহের আফরোজ শাওন, পিযূষ বন্দোপাধ্যায়, মুনমুন আহমেদ, সালেহ আহমেদ, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ও ডাক্তার এজাজ আহমেদ প্রমুখ।

হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্য নিয়ে অন্য পরিচালকদের নির্মিত প্রায় প্রতিটি সিনেমাই সফলতা পেয়েছে। এগুলোর মধ্যে চলচ্চিত্রকার বেলাল আহমেদ ২০০৬ সালে হুমায়ূন আহমেদের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' অবলম্বনে একই নামে নির্মাণ করেন 'নন্দিত নরকে'। এতে অভিনয় করেছেন ফেরদৌস, সুমনা সোমা, মনির খান শিমুল, লিটু আনাম প্রমুখ। একই সালে আবু সাইয়ীদ নির্মাণ করেন হুমায়ূন আহমেদ রচিত 'জনম জনম' উপন্যাস অবলম্বনে 'নিরন্তর'। ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন আবু সাইয়ীদ। এতে অভিনয় করেছেন শাবনূর, ইলিয়াস কাঞ্চন, আমিরুল হক চৌধুরী, ডলি জহুর, লিটু আনাম, শহীদুল আলম সাচ্চু প্রমুখ। ছবিটির জন্য আবু সাইয়ীদ কেরালা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ জুরি পুরস্কার এবং গোয়ায় অনুষ্ঠিত ভারত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ফিপ্রেসি ও গোল্ডেন ক্রো পীজেন্ট পুরস্কার লাভ করেন। ২০০৭ সালে সেরা বিদেশী ভাষার চলচ্চিত্র হিসেবে বাংলাদেশ থেকে এই ছবিটিও অস্কারে পাঠানো হয়েছিল। জনপ্রিয় অভিনেতা ও চলচ্চিত্রকার তৌকির আহমেদ হুমায়ূন আহমেদ-এর 'দারুচিনি দ্বীপ' উপন্যাস অবলম্বনে নির্মাণ করেন 'দারুচিনি দ্বীপ' (২০০৭)। এটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে। এছাড়া সেরা অভিনেতা শাখায় পুরস্কার লাভ করে রিয়াজ এবং অভিনেত্রী শাখায় জাকিয়া বারী মম। একই সালে শাহ আলম কিরণ-এর পরিচালনায় নির্মিত হয় হুমায়ূন আহমেদ রচিত 'সাজঘর' গ্রন্থের কাহিনির উপর ভিক্তি করে 'সাজঘর' সিনেমাটি। এটি তিনটি বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করতে সক্ষম হয়। অধুনা ২০১৮ সালে হুমায়ূন আহমেদের বিখ্যাত 'মিসির আলি' ধারাবাহিক অবলম্বনে সরকারী অনুদানে নির্মিত হয় 'দেবী'। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অনম বিশ্বাস এবং প্রযোজনা করেছেন জয়া আহসান। এতে মিসির আলি চরিত্রে অভিনয় করেছেন চঞ্চল চৌধুরী এবং রানু চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয়া আহসান ; অনান্য গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছেন শবনম ফারিয়া, অনিমেষ আইচ ও ইরেশ যাকের। ছবিটি ব্যাপক ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করে।

প্রখ্যাত বাংলাদেশি চলচ্চিত্রকার মোরশেদুল ইসলাম ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রীয় অনুদানে নির্মাণ করেন 'দীপু নাম্বার টু'। ছবিটির জন্য তিনি একাধিক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছেন। মুহাম্মদ জাফর ইকবালের একই নামে রচিত কিশোর উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছে। চলচ্চিত্রের নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অরুণ ; অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন বুলবুল আহমেদ, ববিতা, আবুল খায়ের, গোলাম মুস্তাফা, শুভাশীষ প্রমুখ। ২০০৪ সালে হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস অবলম্বনে তিনি নির্মাণ করেন আরেকটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র 'দূরত্ব'। ইমপ্রেস টেলিফিল্ম-এর ব্যানারে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি ২০০৪ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। এতে প্রধান প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন হুমায়ুন ফরীদি, সুবর্ণা মুস্তাফা, রাইসুল ইসলাম আসাদ, হাকিম ফেরদৌস, আখতার হোসেন, দেলোয়ার হোসেন, ওয়াহিদা মল্লিক জলি, শহিদুল আলম সাচ্চু ও তানিয়া। এরপর ২০০৬ সালে নির্মাণ করেন 'খেলাঘর'। এটি মাহমুদুল হকের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস 'খেলাঘর' অবলম্বনে নির্মান করা হয়েছে। এতে অভিনয় করেছেন রিয়াজ, সোহানা সাবা, আরমান পারভেজ মুরাদ, গাজী রাকায়েত, আবুল হায়াৎ প্রমুখ। ২০০৯ সালে হুমায়ূন আহমেদ রচিত 'প্রিয়তমেষু' উপন্যাস অবলম্বনে 'প্রিয়তমেষু' নামে একটি ছবি পরিচালনা করেন মোরশেদুল ইসলাম। এতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন আফসানা মিমি ও সোহানা সাবা ; অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন তৌকির আহমেদ, আরমান পারভেজ মুরাদ, গাজী রাকায়েত, হুমায়ুন ফরীদিসহ আরো অনেকে। প্রিয়তমেষু চলচ্চিত্রটি একটি বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে। এছাড়া আরও দেশি-বিদেশি পুরস্কারে ভূষিত হয়। মুহম্মদ জাফর ইকবাল রচিত 'আমার বন্ধু রাশেদ' নামের শিশুতোষ উপন্যাস অবলম্বনে বাংলাদেশ সরকারের অনুদানে মোরশেদুল ইসলাম নির্মাণ করেন একই নামে চলচ্চিত্র 'আমার বন্ধু রাশেদ' (২০১১)। মমন চলচ্চিত্র ও ইমপ্রেস টেলিফিল্ম পরিবেশিত এই চলচ্চিত্রটি প্রযোজনা করেছেন ফরিদুর রেজা সাগর। এতে অভিনয় করেছেন চৌধুরী জাওয়াতা আফনান, রাইসুল ইসলাম আসাদ, পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনামুল হক, হুমায়রা হিমু, ওয়াহিদা মল্লিক জলি, আরমান পারভেজ মুরাদ, এছাড়াও শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয় করেছেন রায়ান ইবতেশাম চৌধুরী, কাজী রায়হান রাব্বি, লিখন রাহি, ফাইয়াজ বিন জিয়া, রাফায়েত জিন্নাত কাওসার আবেদীন। ২০১৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'অনিল বাগচীর একদিন'। হুমায়ূন আহমেদ রচিত একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন মোরশেদুল ইসলাম এবং প্রযোজনা করেছে বেঙ্গল ক্রিয়েশনস। এ ছবিতে অনিল বাগচীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন আরেফ সৈয়দ, অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন গাজী রাকায়েত, তৌফিক ইমন, জ্যোতিকা জ্যোতি, ফারহানা মিঠু এবং মিশা সওদাগর।

সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ধারা 'কবিতা' অবলম্বনে বাংলাদেশে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তানভীর মোকাম্মেল। ১৯৮৫ সালে কবি নির্মলেন্দু গুণ-এর কবিতা 'হুলিয়া' অবলম্বনে একই নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তিনি। তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'লালসালু' (২০০১) চলচ্চিত্রটিও নির্মিত হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-এর বিখ্যাত উপন্যাস 'লালসালু' অবলম্বনে। ছবিটি একাধিক বিভাগে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। এতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাইসুল ইসলাম আসাদ, তৌকির আহমেদ, চাঁদনী, আমিরুল হক চৌধুরী, চিত্রলেখা গুহ, রওশন জামিল, মুনিরা ইউসুফ, আলী জাকের। ২০১৪ সালে মাসুদ পথিক নির্মলেন্দু গুণ-এর কবিতা অবলম্ববনে নির্মাণ করেন পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ'।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোল্লেখিত চলচ্চিত্র ছাড়াও সাহিত্যনির্ভর উল্লেখযোগ্য বাংলা চলচ্চিত্রগুলো হচ্ছে— শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা' অবলম্বনে নির্মিত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী নির্মিত প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'দেনা পাওনা' (১৯৩১) ; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' অবলম্বনে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরিচালনায় নির্মিত 'কপালকুণ্ডলা' (১৯৩৩) ; প্রমথেশ বড়ুয়া নির্মিত শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' উপন্যাস অবলম্বনে 'দেবদাস' (১৯৩৫) এবং 'গৃহদাহ' উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত 'গৃহদাহ' ; হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী' উপন্যাস উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত 'নদী ও নারী' (১৯৬৫) ; খান জয়নুলের নাটক অবলম্বনে বশীর হোসেন-এর '১৩ নং ফেকু উস্তাগার লেন' (১৯৬৬) ; রোমেনা আফাজ-এর উপন্যাস 'কাগজের নৌকা' অবলম্বনে সুভাস দত্ত নির্মিত 'কাগজের নৌকা' (১৯৬৬) ; সচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও সিকান্দার আবু জাফর রচিত নাটক অবলম্বনে নির্মিত সিনেমা 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' (১৯৬৭) ; সৈয়দ শামসুল হকের 'রোকেয়ার মুখ' অবলম্বনে 'আয়না ও অবশিষ্ট' (১৯৬৭) ; মজিবুর রহমান সাহিত্যরত্নের উপন্যাস 'আনোয়ারা' অবলম্বনে জহির রায়হানের 'আনোয়ারা' (১৯৬৭) ; আরব্য উপন্যাস অবলম্বনে নজরুল ইসলামের 'আলীবাবা' (১৯৬৭) ; শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাস অবলম্বনে সুবোধ মিত্রের 'গৃহদাহ' (১৯৬৭) ; আকবর হোসেনের উপন্যাস 'অবাঞ্ছিত' অবলম্বনে কামাল আহমেদের 'অবাঞ্ছিত' (১৯৬৯) ; হাসিবুর রহমানের 'গাঁয়ের বধূ' অবলম্বলে আলি কাওসারের 'গাঁয়ের বধূ' (১৯৭১) ; কাজী নজরুল ইসলামের ছোটগল্প 'পদ্মগোখরো' অবলম্বনে খান আতাউর রহমানের 'সুখ-দুঃখ' (১৯৭১) ; রবীন্দ্রনাথের গল্প 'সম্পত্তি' অবলম্বনে শুভেন্দু রায়ের 'উপহার' (১৯৭১) ; দিলারা হাশেমের উপন্যাস 'ঘর মন জানালা' অবলম্বনে সুভাস দত্তের 'বলাকা মন' (১৯৭৩) ; কাজী আনোয়ার হোসেনের রহস্য উপন্যাস 'মাসুদ রানা' অবলম্বনে মাসুদ পারভেজের 'মাসুদ রানা' (১৯৭৪) ; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী' অবলম্বনে দীপেন গুপ্তের 'দেবী চৌধুরানী' (১৯৭৪) ; নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প অবলম্বনে রাজেন তরফদারের 'পালংক' (১৯৭৬) ; কাজী আনোয়ার হোসেনের রহস্য উপন্যাস 'কুয়াশা' অবলম্বনে আজিজুর রহমানের 'কুয়াশা' (১৯৭৭) ; আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' অবলম্বনে সুভাস দত্তের 'বসুন্ধরা' (১৯৭৭) ; শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাস অবলম্বনে পিয়াস বসুর 'সব্যসাচী' (১৯৭৭) ; শহীদুল্লাহ কায়সারের উপন্যাস 'সারেং বৌ' অবলম্বনে আবদুল্লাহ আল মামুনের 'সারেং বৌ' (১৯৭৮) ; আশরাফ সিদ্দিকীর 'গলির ধারের ছেলেটি' অবলম্বনে সুভাস দত্তের 'ডুমুরের ফুল' (১৯৭৮) ; আবু ইসহাকের উপন্যাস অবলম্বনে মসিউদ্দীন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী নির্মিত 'সূর্যদীঘল বাড়ী' (১৯৭৯) ; আবদুর রাজ্জাক চৌধুরীর উপন্যাস 'কন্যা কুমারী' অবলম্বনে দিলীপ সোমের 'স্মৃতি তুমি বেদনা' (১৯৮০) ; স্বরচিত নাটক 'এখন দুঃসময়' অবলম্বনে আবদুল্লাহ আল মামুনের 'এখনই সময়' (১৯৮০) ; এরিখ কাস্টনারের শিশুতোষ উপন্যাস 'এমিল এন্ড হিজ পার্টি' অবলম্বনে বাদল রহমানের 'এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী' (১৯৮০) ; সাদত হোসেনের গল্প 'লাইসেন্স' অবলম্বনে আজিজুর রহমানের 'মহানগর' (১৯৮১) ; শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 'স্বামী' অবলম্বনে নূর-উল আলম-এর 'স্বামী' (১৯৮১) ; আকবর হোসেনের উপন্যাস 'মেঘ বিজলী বাদল' অবলম্বনে কাজী নূরুল হকের 'মেঘ বিজলী বাদল' (১৯৮৩) ; নীহারঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস 'লালুভুলু' অবলম্বনে কামাল আহমেদের 'লালুভুলু' (১৯৮৩) ; আরব্য উপন্যাস অবলম্বনে ইবনে মিজানের 'লাইলী মজনু' (১৯৮৩) ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'কঙ্কাল' অবলম্বনে কাজী হায়াৎ-এর 'রাজবাড়ী' (১৯৮৪) ; ভারতীয় পুরাণ অবলম্বনে মতিন রহমানের 'রাধাকৃষ্ণ' (১৯৮৫), মুহম্মদ

হান্নানের 'রাইবিনোদিনী' (১৯৮৫) ; শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 'বৈকুণ্ঠের উইল' অবলম্বনে রাজ্জাকের 'সৎ ভাই' (১৯৮৫) এবং শরৎচন্দ্রের গল্প 'রামের সুমতি' অবলম্বনে শহীদুল আমিনের 'রামের সুমতি' (১৯৮৫) ; তারাশঙ্করের উপন্যাস 'চাঁপাডাঙার বউ' অবলম্বনে রাজ্জাকের 'চাঁপা ডাঙ্গার বউ' (১৯৮৬) ; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস অবলম্বনে চিত্রনায়ক বুলবুল আহমেদ নির্মাণ করেন 'রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত' (১৯৮৭), একই কাহিনি নিয়ে একই নামে ১৯৫৮ সালে হরিদাস ভট্টাচার্য ভারতে এর চলচ্চিত্রায়ণ করেন ; জহির রায়হানের উপন্যাস 'হাজার বছর ধরে' অবলম্বনে কোহিনূর আক্তার সূচন্দা নির্মাণ করেন 'হাজার বছর ধরে' (২০০৫) ; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অবলম্বনে রাজা সেনের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (২০০৭) ; রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' অবলম্বনে সুমন মুখোপাধ্যায়ের 'চতুরঙ্গ' ; রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্প অবলম্বনে নারগিস আকতারের 'অবুঝ বউ' (২০১০) ; সৈয়দ শামসুল হকের 'নিষিদ্ধ লোবান' উপন্যাস অবলম্বনে নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু পরিচালিত 'গেরিলা' (২০১১) ; সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'ইচ্ছের গাছ' উপন্যাস অবলম্বনে নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রাসাদ নির্মিত 'ইচ্ছে' (২০১১) ; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে কমলেশ মুখোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' (২০১৩) ; হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস অবলম্বনে মেহের আফরোজ শাওনের 'কৃষ্ণপক্ষ' (২০১৬) ; জাফর ইকবালের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত মোরশেদুল ইসলামের শিশুতোষ চলচ্চিত্র 'আঁখি ও তার বন্ধুরা' (২০১৭) ; হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্প অবলম্বনে আক্রম খানের 'খাঁচা' (২০১৭) উল্লেখযোগ্য।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, তেজগাঁও, ঢাকা, পৃ. ৪

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬-২৮৩

৩. অনুপম হায়াৎ, সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*, ৯ বর্ষ ২৩ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮০, দৈনিক বাংলা ভবন, ১ নং ডি. আই. টি. এভেন্যু ঢাকা, পৃ. ৫৮

৪. https://bn.wikipedia.org/wiki/ সত্যজিৎ_রায়ের_চলচ্চিত্র

৫. http://www.cinemacom.com/2002-sight-sound.html

৬. মনিস রফিক, ঋত্বিক ঘটকের *তিতাস একটি নদীর নাম* চিত্রনাট্যের ভূমিকা অংশ, পার্থিব রাশেদ ও মনিস রফিক সম্পাদিত (২০১৩), রোদেলা প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা) ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ৮

৭. মিছিল খন্দকার, 'বাংলা চলচ্চিত্রের উত্থানপর্বে লোককাহিনি', *দৈনিক সমকাল*, ২৪ নভেম্বর ২০১৭, Link: https://samakal.com/cinematic/article/17111548/বাংলা-চলচ্চিত্রের-উত্থানপর্বে-লোককাহিনি

৮. সিমিত রায় অন্তর, 'সিনেমার আয়-ব্যয় ও ফাঁকা বুলি', *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ৬ আগস্ট ২০১৫, Link: http://www.kalerkantho.com/print-edition/ronger-mela/2015/08/06/252833

৯. চাষী নজরুল ইসলামের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, কমলাপুর-ঢাকা, তারিখ- ২১.০৪.২০১১

১০. পূর্বোক্ত। তারিখ- ২১.০৪.২০১১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ : বাংলাদেশ (১৯৫৬-১৯৮৫)

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ : বাংলাদেশ (১৯৫৬-১৯৮৫)

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ : তিতাস একটি নদীর নাম

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ চলচ্চিত্র পরিচিতি

মূল কাহিনি : অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাস ‘তিতাস একটি নদীর নাম’
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : ঋত্বিক কুমার ঘটক
প্রযোজনা : হাবিবুর রহমান খান
চিত্রগ্রহণ : বেবী ইসলাম
স্থিরচিত্র : সুনীল আমিন
সম্পাদনা : বশীর হোসেন
সঙ্গীত : ওস্তাদ বাহদুর হোসেন খাঁ
রূপসজ্জা : রেবতী দাস
শিল্পনির্দেশনা : মুনশী মহিউদ্দিন
শব্দ গ্রহণ : আমজাদ হুসাইন

অভিনয়ে : ফখরুল হাসান বৈরাগী (নিবারণ), নারায়ণ চক্রবর্তী (মোড়ল), বনানী চৌধুরী (মোড়লের গিন্নী), কবরী চৌধুরী (রাজার ঝি), ঋত্বিক কুমার ঘটক (তিলকচাঁদ), শফিকুল ইসলাম (অনন্ত), সিরাজুল ইসলাম (মাগন সরদার), রওশন জামিল (বাসন্তীর মা), এম এ খায়ের (বাসন্তীর বাবা), প্রবীর মিত্র (কিশোর), গোলাম মুস্তফা (রামপ্রসাদ এবং কাদের মিয়া), সুফিয়া রোস্তম (উদয়তারা), রোজী সামাদ (বাসন্তী), রানী সরকার (মুংলি)।

অন্যান্য ভূমিকায় : নূপুর, শিরিন, চানু ভট্টাচার্য, মালতি দেবী, কে মতিন, শেখ ফজলু, এ মতিন, মেজবাহ আহমদ, অরুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শীলাজ মল্লিক, সুপ্রিয়া গুপ্তা, রহিমা খাতুন, ফরিদ আলি, মহিব্বুর রহমান, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, খলিল খান, ফারুক খান, কালিপদ সেন, সাগরিকা, শামসুল হুদা, শহীদ, অমিতা বসু, চক্কন, তমিজ রিজভী, রবিউল হোসেন, সুনীল আমিন, জয় ইসলাম ও অন্যান্য।

অতিথি শিল্পী : আবুল হায়াত, গোলাম রাব্বানী, দিলীপ চক্রবর্তী, জাহাঙ্গীর চাকলাদার।

মুক্তি : ১৯৭৩।
সময় : ১৫৯ মিনিট (পূর্ণদৈর্ঘ্য)।
ফরম্যাট : ৩৫ মি: মি:।
কালার : সাদাকালো।

Dhaka University Institutional Repository

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাস পরিচিতি

অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) শ্রেষ্ঠ কীর্তি ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। শিল্পমূল্যের বিচারে উপন্যাসটির গ্রহণযোগ্যতা সর্বজন-বিদিত। প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকা একটি ধীবর সম্প্রদায়ের ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাওয়ার কাহিনি নিয়ে এই উপন্যাসের ভিত গড়ে উঠেছে। লেখক নিজে মালো ছিলেন। মালো সম্প্রদায়েই তাঁর আতুর ঘর থেকে বেড়ে ওঠা। অন্য লেখকদের মতো উপর থেকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাঁকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু আহরণ করতে হয়নি। তিতাস পাড়ে আজন্ম বেড়ে উঠতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখা নিজ কৌমের গহীনে বিরাজিত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, কর্ম-সংস্কৃতি থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার নিরিখে তিনি উপন্যাসটি রচনা করেছেন। ফলে উপন্যাসটিতে ওঠে এসেছে প্রান্তজনীন লোকাচার, ধর্মবিশ্বাস, স্বার্থ-সংঘাত ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়। ‘মোহাম্মদী’ পত্রিকায় উপন্যাসটির প্রথম কিছু অংশ প্রকাশিত হয়। এরপর ঘটনাচক্রে বইটির প্রথম পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যায়। পাঠক ও শুভার্থীদের উৎসাহে ভাষাতীত মনোকষ্ট নিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণ পুনরায় লিখতে বসেন তিতাসের কাহিনি। ‘আদি পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়ার কারণে পুনর্লিখিত পাণ্ডুলিপি নতুন মাত্রা পেল, কিংবা আদি লেখনের ছোটগাল্পিক চারিত্র্য পুনর্লিখিত পাণ্ডুলিপিতে পেল ঔপন্যাসিক সত্তা।’[১] ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ শুধু নদী-তীরবর্তী জনজীবনের কাহিনি নয়, প্রসাদগুণে এটি হয়ে উঠেছে ব্রাত্যজনের জীবনঘনিষ্ঠতার সর্বজনীন মহাকাব্য। পুনর্লিখিত পাণ্ডুলিপিটি ১৯৫৬ সালে ‘পুথিঘর’ থেকে বই আকারে প্রকাশিত হয়।

অনুবন্ধ

ঋত্বিক ঘটকের (১৯২৫-১৯৭৬) প্রথম ছবি ‘নাগরিক’ সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, ‘ঋত্বিকবাবুর বইটা সময়মত release হলে তিনিই প্রথম পথিকৃৎ হতেন।’[২] অর্থাৎ ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতো। ‘নাগরিক’-এর পর ঋত্বিক ‘অযান্ত্রিক’, ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’, ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘কোমল গান্ধার’, ‘সুবর্ণরেখা’র মতো নন্দিত সিনেমা নির্মাণ করেছেন। বাণিজ্যিকভাবে এগুলো ব্যবসাসফল না হলেও ঋত্বিক ঘটক তৎকালেই প্রবাদপ্রতিম হয়ে গিয়েছিলেন চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের কাছে। বর্তমানে বিশ্ব-চলচ্চিত্রের আঙ্গিনায় ঋত্বিক ঘটক শুধু একটি নাম নয়, চর্চা ও গবেষণার বিষয়। সঙ্গত কারণেই তাঁর সপ্তম পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ নির্মাণের পারদর্শিতা নিয়ে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর ষষ্ঠ ছবি ‘সুবর্ণরেখা’ থেকে ‘তিতাসের’ দূরত্ব প্রায় এক যুগ। এই সময়ের মধ্যে তিনি আর কোন পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেননি। দীর্ঘ বিরতিতে তিনি তাঁর স্বপ্ন ও চিন্তাকে শাণিত করার অবসর পেয়েছেন। এসময় তাঁর অন্য চলচ্চিত্রগুলোর গণ্ডি থেকে বেড়িয়ে ‘এপিকধর্মী’ কিছু একটা করার তাড়না নিজের মধ্যে প্রোথিত হয়। অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসে তিনি সেই আরাধ্য বিষয়ের খোঁজ পান। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ নির্মাণ প্রসঙ্গে ঋত্বিকের নিজের বক্তব্য থেকেই এ সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়:

> তিতাস পূর্ব বাংলার একটা খণ্ডজীবন, এটি একটি সৎ লেখা। ইদানীং সচরাচর বাংলাদেশে (দুই বাংলাতেই) এ রকম লেখার দেখা পাওয়া যায় না। এর মধ্যে আছে প্রচুর নাটকীয় উপাদান, আছে দর্শনধারী ঘটনাবলী, আছে শ্রোতব্য বহু প্রাচীন সঙ্গীতের টুকরো—সব মিলিয়ে একটা অনাবিল

আনন্দ ও অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করা যায়। ব্যাপারটা ছবিতে ধরা পড়ার জন্য জন্ম থেকেই কাঁদছিল। ...অদ্বৈতবাবু অনেক অতিকথন করেন। কিন্তু লেখাটা একেবারে প্রাণ থেকে, ভেতর থেকে লেখা। আমি নিজেও বাবুর চোখ দিয়ে না দেখে ওইভাবে ভেতর থেকে দেখার চেষ্টা করেছি। অদ্বৈতবাবু যে সময়ে তিতাস নদী দেখেছেন, তখন তিতাস ও তার তীরবর্তী গ্রামীণ সভ্যতা মরতে বসেছে। ...তিনি এর পরের পুনর্জীবনটা দেখতে যাননি। আমি দেখাতে চাই যে, মৃত্যুর পরেও এই পুনর্জীবন হচ্ছে। তিতাস এখন আবার যৌবনবতী। আমার ছবিতে গ্রাম নায়ক, তিতাস নায়িকা।[৩]

তিতাস পাড়ে যাপিত জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাজাত উপলব্ধি দিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণ মালো সমাজের বাস্তব জীবনচিত্র এঁকেছেন 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে। চলচ্চিত্রকারও মালো সমাজের গভীরে অন্তর্দৃষ্টি ফেলে নির্মাণ করেছেন 'তিতাস একটি নদীর নাম' সিনেমাটি। ঋত্বিকের চলচ্চিত্রজ্ঞানের মহাপারদর্শিতায় এটি শুধুমাত্র সিনেমা নয় হয়ে উঠেছে জল-জীবিকার চলমান মহাকাব্য। এপিকধর্মী কিছু করার যে লালিত বাসনা তাঁর মধ্যে দীর্ঘদিন জাগ্রত ছিল 'তিতাস একটি নদীর নামে' তার সর্বস্ব নিংড়ে দিয়েছেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭৩ সালে ছবিটি নির্মিত হয়। একটি সূত্রমতে এটি 'একমাত্র বাংলাদেশি ছবি হিসেবে ওয়ার্ল্ড ক্লাসিক্স-এর শ্রেষ্ঠ চল্লিশ ছবির তালিকায় স্থান পেয়েছে।'[৪] ২০১০ সালে পশ্চিমা সিনেমা বোদ্ধাদের আগ্রহের কারনে এটি 'কান ফিল্ম ফেস্টিভালে' বিশেষ মর্যাদায় প্রদর্শিত হয়।

তিতাস একটি নদীর নাম : চলচ্চিত্র ও উপন্যাসের সংশ্লেষ

'শিল্পের আরেকটা দিক আছে। সৌম্য শান্ত করুণ স্নিগ্ধ প্রসাদগুণের মাধুর্যে রঞ্জিত এ শিল্প। এ শিল্পের শিল্পী মহাকালের তাণ্ডবনৃত্য আঁকিতে পারে না। পিঙ্গল জটার বাঁধন খসিয়া পড়ার প্রচণ্ডতা এ শিল্পীর তুলিকায় ধরা দিবে না। এ শিল্পের শিল্পী মেঘনা, পদ্মা, ধলেশ্বরীর তীর ছাড়িয়া তিতাসের তীরে আঙিনা রচনা করিয়াছে। এ-শিল্পী যে-ছবি আঁকে তা বড় মনোরম।'[৫] ঔপন্যাসিকের এই কথায় লুকিয়ে আছে তিতাসের অনুভূমিক চিত্র। পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরীর মতো প্রমত্তগুণের কৌলীন্য নেই তিতাসের। মালোদের মতো তিতাসও ব্রাত্য নদী। তবে আকারে দরিদ্রতা নেই। 'তিতাস মাঝারি নদী। দুষ্ট পল্লীবালক তাকে সাঁতরাইয়া পার হইতে পারে না। আবার ছোট নৌকায় ছোট বউ নিয়া মাঝি কোনদিন ওপারে যাইতে ভয় পায় না' (তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ২৮)।[৬] শান্ত স্থির এই নদীর কূল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট ছোট পল্লী নিয়ে গড়ে ওঠেছে অন্ত্যজ মালোদের গ্রামগুলো। তাদেরই একটি গোকর্ণ গ্রাম। সেখানে মালোদের বাস। ভদ্র সমাজের চোখে এরা ব্রাত্য। এই অন্ত্যজ কৌমের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের জীবনগাঁথাই 'তিতাস একটি নদীর নাম'। অদ্বৈত মল্লবর্মণ মালো পরিচয়ে গর্ববোধ করতেন। তিনি জেলে সমাজকে দেখেছেন বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে। নিজের রক্ত-মাংস-মননে ধারণ করা মালো সমাজের আচার, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা তাঁর উপন্যাসে সরাসরি উঠে এসেছে। এখানেই 'তিতাস একটি নদীর নাম' এর স্বাতন্ত্র্য। এতে আরোপিত রোমান্টিকতার বালাই নেই। নিরেট বাস্তবতার বিশদ বর্ণনায় উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে মালো সমাজের প্রতিচ্চিত্র। ঋত্বিক ঘটকও সেই ধারাটি বজায় রাখতে চেয়েছেন। চলচ্চিত্র নির্মাণে তিনি তিতাসকে লেখকের চোখে নয়,

Dhaka University Institutional Repository

নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। শুধুমাত্র উপন্যাস থেকে রশদ সংগ্রহ করে 'তিতাস একটি নদীর নাম' নির্মাণের অভিপ্রায় ঋত্বিকের ছিল না। তাই এর নির্মাণে ছিল দীর্ঘ প্রস্তুতি, বৃহৎ কিছু করার অভিপ্রায়। ঋত্বিকের ভাষায়, 'শ্রদ্ধাঞ্জলি গোছের কিছু একটা করার অভিলাষ'। দুই বাংলায় প্রোথিত ঋত্বিকমানস বহুদিন ধরে যে সাংস্কৃতিক ঐক্যের সন্ধান করেছিল, অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসের তিতাস পাড়ে তিনি তা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাইতো ছবি নির্মাণের আগে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বারবার ছুটে এসেছিলেন তিতাসকে স্বচক্ষে দেখে এর কূলবর্তী জনজীবনের বাস্তবতাকে নিজের মধ্যে ধারণ করার জন্য। এ প্রসঙ্গে ঋত্বিক গবেষক বাঁধন সেনগুপ্তের অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

> এই ছবিটা (তিতাস একটি নদীর নাম) করার আইডিয়া তাঁর মাথায় অকস্মাৎ এসেছে বলেও মনে হয় না। আসলে, তাঁর অবচেতন মনে একটা বড়ো গোছের বা বড়ো মাপের ভাবনা নিরন্তর এই সুদীর্ঘ সময় তাঁকে পীড়িত করে এসেছে। অকস্মাৎ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও সংগ্রাম তথা বাংলাদেশের স্মৃতি ও বাংলা ভাষার গৌরব-গাথা সেদিন এই দুই বাংলার গণমানসকে সত্তুরের গোড়ায় দারুণভাবে আন্দোলিত করেছিল। ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর মনোভূমিতে দুই বাংলার মিলন তথা সাংস্কৃতিক ঐক্যের বাঞ্ছিত পটভূমিটি এই ঘটনার মধ্যে সহসা নিজেকে নতুন করে খুঁজে পায়। ফলে যা ছিল এতদিন কল্পনার অথবা মানস প্রতিমার কেন্দ্রবিন্দু, ওই বাংলায় গিয়ে সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হল সেই বাঞ্ছিত পটভূমিটি হয়তো অদ্বৈত মল্লবর্মণের এই উপন্যাসের মধ্যে অনেকখানি ধরা পড়বে। উপরন্তু এই উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে তাঁর প্রার্থিত এপিকধর্মী এক রূপ যা বাঙালি জীবনবোধের প্রবহমান এক অপ্রতিরোধ্য গতিকেই বয়ে নিয়ে চলেছে। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তিপর্বে তাঁকে আমরা দেখেছি বারংবার কুমিল্লায় ছুটে যেতে। ...ছবি করবার চিন্তা থেকেই সেই সময়ে তিনি সংগ্রহ করতেন কুমিল্লার কাছাকাছি অর্থাৎ তিতাস নদীর সন্নিহিত অঞ্চলসমূহের লোক-সঙ্গীত ও বিবিধ ধর্মীয় আচার-আচরণ সম্পৃক্ত মালোদের গান। অর্থাৎ তিতাসকে কেন্দ্র করে এপিকধর্মী কিছু করার ভাবনা পাকাপাকিভাবে তাঁর মাথায় ঢোকে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে এসে। সুতরাং এই ছবি করার পেছনে জাগ্রত বাংলার একটি নবতর পরিপ্রেক্ষিত তাঁকে এই কাজে নিঃসন্দেহে উদ্বুদ্ধ করেছে।[৭]

'তিতাস একটি নদীর নাম'কে ঋত্বিক তিতাসের পাড়েই নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'যখন প্রথম এটা (তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাস) বেরল..., তখন থেকে আমার মাথায় যে এটা আমি ছবি করব। এটা আমার দারুণ ভালো লেগেছিল। কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে যে ওদেশে আমাকে যেতে দেবে না, তখন আয়ুব খাঁর দেশ। আমি কমিউনিস্ট, আমাকে ভিসা দেবে না কিছুতেই। কাজেই আই কুড নট ডু। এবং আমাকে বহুবার বহুলোক বলেছে যে এখানে (ভারতে) করো। আমি বলেছি এখানে হয় না। ঐ নদী, ঐ জমি, ঐ নৌকো, ঐ মুখ এদেশে পাওয়া যাবে না।'[৮] ঋত্বিকের নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রটি তিনি অদ্বৈতের উপন্যাসের সঙ্গে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি মিশিয়ে নির্মাণ করেছেন। সিনেমার শুরুতে নামভূমিকায় নেপথ্য সঙ্গীত হিসেবে ধীরাজউদ্দীন ফকিরের কণ্ঠে লালনের গান ব্যবহার করা হয়েছে। ধীরাজউদ্দীন ফকির পেশাদার শিল্পী ছিলেন না। আবার তিনি কৈবর্ত সমাজেরও কেউ নন।[৯] কিন্তু তাঁর কণ্ঠে নদীর গান—তাতে সারা দুনিয়ার সকল নদীজীবী মানুষের অন্তরের কথাই গীত হয়ে উঠেছে। তিনি যে দরদ দিয়ে গান গেয়েছেন শহুরে শিল্পী দিয়ে গান করালে এইরকম অকৃত্রিম সুর

অন্তর থেকে বেরিয়ে আসত না। এরকম উপলব্ধি থেকে ঋত্বিক সিনেমার শুরু থেকেই বিষয়বস্তুর বিশুদ্ধতা নিয়ে আপোসহীন ছিলেন। তিতাস পাড়ের জনজীবনের মাঝে আবদ্ধ রেখেই ঋত্বিক সিনেমার কাহিনিকে বিশ্বজনীন রূপ দিতে চেয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'আমি চাইছিলাম যে এমন এক শিল্পরীতি আমার করায়ত্ত হোক, যা যথাসম্ভব জাতীয় হয়েও আন্তর্জাতিক সার্বভৌমত্বে উজ্জ্বল।'[১০] তিতাস পাড়ের মালো সমাজের যেই অবস্থা, পদ্মাপাড়ের ধীবর সমাজ কিংবা Mexican চলচ্চিত্র Redes[১১]-এর জেলেদেরও সেই একইরূপ দেখতে পাওয়া যায়। এদের ঘরে দিনের আলো বেড়ার ফাঁক গলে ভিতরে প্রবেশ করে, রাতের আলো একইভাবে বাইরে বেরিয়ে যায়। ঝড়-বৃষ্টি-দুর্যোগ কোন কিছুতেই তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। না প্রকৃতির ওপর, না সমাজ-সংসারের, না শাসন-শোষণের। এদের কোন সামাজিক গুরুত্ব নেই। আছে শুধু বিশ্বজনীন এক পরিচয়—এরা খেটে খাওয়া মানুষ। 'এই শ্বাশত বাংলার আবহমান সূত্রের ধারক, বাংলার খেটে খাওয়া অখ্যাত জনের উদ্দেশ্যে' (তি. এ. ন. না. চ./ টাইটেল দৃশ্যের মুখবন্ধ)[১২] ছবিটি উৎসর্গ করে ঋত্বিক তাঁর স্বপ্নের দায় থেকে মুক্ত হয়েছেন। কারণ তাঁর তিতাসপূর্ব সকল ছবিতেই কোন না কোনভাবে নাগরিক জীবনের সংগ্রাম, যন্ত্রণা ও হতাশা এসেছে। এই বৃত্তের বাইরে এসে ব্রাত্যজনের কৌম-সংস্কৃতি, টিকে থাকার লড়াই, নদী, প্রকৃতি ও সহজ-সরল জীবনের ছবি এঁকেছেন। তিতাস শুধু একটি সিনেমা নয়, আবহমান বাংলা ও প্রাকৃতজনের চিত্রকাব্য। সঞ্জিত রায় চৌধুরী লিখেছেন, "খাঁটি বাংলা ছবি কী করে তৈরি করতে হয়—কোনদিন এমন প্রশ্ন উঠলে তার জবাব দেবে 'তিতাস একটি নদীর নাম'।"[১৩] নাগরিক যন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত হতাশার গ্লানি নিম্নবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজকে নিত্য কুঁড়ে কুঁড়ে খেলেও গ্রামীণ প্রাকৃত সমাজে দুঃখ কষ্টে চির অভ্যস্ত অসহায় মানুষগুলোর মাঝে উৎসব নব প্রাণ-সঞ্চার করে। উপন্যাসের বর্ণনায়, 'মাঘ মাসের শেষ তারিখে সেই মালোপাড়াতে একটা উৎসবের ধুম পড়িল। এটা কেবল কুমারীদের উৎসব। নাম মাঘমণ্ডলের ব্রত। এ-পাড়ার কুমারীরা কোনোকালে, অরক্ষণীয়া হয় না। তাদের বুকের উপর ঢেউ জাগিবার আগে, মন যখন থাকে খেলার খেয়ালে রঙিন, তখনই একদিন ঢোল সানাই বাজাইয়া তাদের বিবাহ হইয়া যায়। তবু বিবাহের জন্যে তারা দলে-দলে মাঘমণ্ডলের পূজা করে।'[১৪]

উৎসবমুখর আবহে গ্রাম্য অবুঝ বালিকা বাসন্তী মঙ্গলময় যুগলজীবন কামনায় বাঁশের ছত্রের ঘূর্ণনে খই-নাড়ু ছিটিয়ে মাঘমণ্ডলের ব্রত পালন করে। এই ছত্রের ঘূর্ণাবর্তের মতো তার নিয়তি যে একদিন বাঁধা পড়ে যাবে তারই ইঙ্গিত দিয়ে ঋত্বিক চলচ্চিত্রের সূচনা করেন। নিয়তির দুর্বিপাকে ঘুরপাক খেতে খেতে বিপর্যস্ত বাসন্তীর মনে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো আশা জাগ্রত হয়ে আবার মুহূর্তেই তা তলিয়ে গিয়ে জীবনাবসানের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে। ঋত্বিক উপন্যাসের নদী ও তার কূলবর্তী গাঁয়ের বর্ণনা বাদ দিয়ে সিনেমার শুরুতেই একেবারে মালোপাড়ার অন্দরে ঢুকে গেছেন। এমনকি যে ধীবর সমাজ নিয়ে তাঁর চলচ্চিত্রযাত্রা, তাদের জীবিকার প্রধান উপায় মাছ ধরার অনুষঙ্গও ছবিতে সেভাবে ওঠে আসেনি। এস্থলে জীবিকার অপ্রধান উৎস ধীবর নারীদের সুতা কাটার বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চলচ্চিত্রকার মালোদের কৌম-জীবনের গহীনে গিয়ে নারী-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণপূর্বক তাদের নিয়ত সংগ্রাম, আশা, বেদনার বিষয়গুলো তুলে ধরার মাধ্যমে গ্রাম-বাংলাকে উপস্থাপন করতে উৎসাহী ছিলেন। তিতাস নির্মাণের প্রায় চল্লিশ বছর আগে বাংলাদেশে থাকাকালীন তিনি এদেশকে যেভাবে দেখেছিলেন সিনেমাকেও সেভাবেই নির্মাণ করতে চেয়েছেন। সেই প্রতীতি যে তিনি ধারণ করতেন তা তাঁর উক্তিতেই বোঝা যায়—'ছবি করতে-করতে বুঝলাম সেই অতীতের

Dhaka University Institutional Repository

ছিটেফোঁটা আজ আর নেই।'[১৫] 'মানুষের চিন্তাধারা পাল্টে গেছে, মানুষের মন গেছে পাল্টে, মানুষের আত্মা গেছে পাল্টে।'[১৬] দেশভাগের পর জীবনব্যাপী ঋত্বিকের মনে যে অতীতচারিতা ছিল তিতাস নিয়ে সিনেমা করতে গিয়ে সেই ধারার প্রভাব থাকবে স্বাভাবিকভাবেই তা ধরে নেয়া যায়। নিজের দেখা বাংলার সেই বোধ থেকে তিনি তিতাসকে নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন। সেই সহজ সরল জীবন, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান মিশ্রিত বাঙালি জীবনধারায় ঋত্বিকের সমৃদ্ধ মন কখনও এর থেকে বিচ্যুত হয়নি। অন্ত্যজ ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর নারী, তার সংগ্রাম, আবেগ, প্রেম, ভালবাসা এসব ঋত্বিক-ভাবনায় একটা বড় স্থান জুড়ে সতত অবস্থান করেছে। সেই জাগ্রত বোধ থেকে তাঁর অন্যান্য সিনেমার মতো তিতাসেও নারী পেয়েছে বিশেষ মর্যাদা। তাই কিশোরের প্রতি বাসন্তীর অনুরাগ, দূরে থাকার বিরহ প্রথমেই ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো সিনেমা জুড়ে নারীর প্রাধান্য লক্ষণীয়। অদ্বৈত মল্লবর্মণের মালো পাড়ায় কুমারীদের খেলার খেয়ালে রঙিন থাকা অবস্থায় বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ে সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা বা উচ্ছ্বাস থাকে না। শুধুমাত্র সামাজিক আচারের অংশ হিসাবে তারা মাঘমণ্ডলের পূজা করে। কিন্তু ঋত্বিক বাস্তব সমাজের গভীরে প্রবেশ করেছেন। সেখানে এই অবুঝ বালিকারা বিয়ের পরিণতি সম্বন্ধে না জানলেও যুগ যুগ ধরে দেখে আসা রীতি তাদের শিশুমনের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে মানসিক পরিপক্বতা লাভ করে। নদীর ধারে বাসন্তীর বিরহ প্রহর গোনা, কিশোর আর সুবলকে নিয়ে মুংলির ঠাট্টা করা, রামপ্রসাদের কাছে বাসন্তীর বিয়ে নিয়ে মুংলির কথা বলা তা-ই প্রমাণ করে। লেখক যেখানে ঔপন্যাসিক বর্ণনায় সূক্ষ্ম এই দিকটিকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন বা এড়িয়ে গেছেন চলচ্চিত্রকার সেখানে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণপূর্বক সেটি চরিত্রে বিধৃত করেছেন।

অদ্বৈতের তিতাসের চেয়ে ঋত্বিকের তিতাস আরও শান্ত কিন্তু কোথাও বিশাল আকৃতির, আবার কোথাও উপন্যাসে বর্ণনার চেয়ে অনেক সংকীর্ণ। অদ্বৈতের তিতাসের 'কুলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস'। 'তিতাসের কত জল! কত স্রোত! কত নৌকা! সবদিক দিয়াই সে অকৃপণ।'[১৭] এই বৈসাদৃশ্যের কারণ, উপন্যাস লেখার বহু বছর পরে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। ততোদিনে তিতাস অনেকটা সংকুচিত হয়ে গেছে। অন্যদিকে তিতাস নদী ছাড়াও পদ্মার বিভিন্ন অংশে ছবিটির শ্যুটিং হয়েছে। ফলে সিনেমায় নদীকে কখনো পদ্মার মতো বিশাল আবার কখনো মূল তিতাসের মতো অবরুদ্ধ দেখা গেছে।[১৮] অদ্বৈত উপন্যাস রচনায় পেয়েছেন বর্ণনার স্বাধীনতা। ঋত্বিকের ছিল চলচ্চিত্র নির্মাণে দৃশ্য প্রকাশের সময়জনিত সীমাবদ্ধতা। অদ্বৈত যে বর্ণনা করেছেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে, ঋত্বিককে তা তুলে ধরতে হয়েছে মাত্র একটি দৃশ্য বা সংলাপের মাধ্যমে। দুজনের বর্ণনাপদ্ধতিও আলাদা, প্রকাশভঙ্গিও আলাদা। অদ্বৈত উদার তার বর্ণনায়, ঋত্বিক বখিল তার ফ্রেমিংয়ে। তবে, প্রয়োজনে ঘটনা, চরিত্র কিংবা সংলাপ সৃষ্টিতে কোন প্রকার কৃপণতাও করেননি ঋত্বিক। সব কিছুরই একেবারে মাপামাপা ঠিকঠাক ব্যবহার করতে চেয়েছেন চলচ্চিত্রে। সীমার মাঝে অসীমকে ধরতে চেয়েছেন তিনি। একারণে তাঁর সিনেমাও পেয়েছে এক অনন্য মাত্রা। সিনেমায় রামপ্রসাদের কণ্ঠে শোনা যায়– '...এই সব আছে এই নাই, এই বাত্তি জ্বইলা ওঠে এই নিব্বা যায়, হদিস মিলে না, এই কাইল তুই ছোড আছিলি, আইজ বড়ো হইছস। এই তিতাস জলে—কাইল হয়ত দেখমু শুকনা খটখইট্যা, ড্যাঙ্গা। মরণকালে যে জল মুখে না দিলে পরাণটা তক বাইর হয় না, একদিন হয়ত দেখুম তিতাসে সেই জলটুকুও নাই। এই যে পালের দল বহর সাজাইয়া চলে, খালি চলে, খালি চলে, খালি চলে।'[১৯] রামপ্রসাদের দার্শনিক বয়ানের দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে তিতাসের

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য চিত্র তুলে ধরেছেন চলচ্চিত্রকার। নদীর ধারে বাসন্তীর সঙ্গে রামপ্রসাদের কথোপকথনের সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে বিস্তীর্ণ তিতাসের বিশদ বর্ণনাও একই সঙ্গে দর্শকের সামনে চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠে। অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর উপন্যাসে প্রথম খণ্ডের প্রথম পর্বের প্রায় পুরোটা জুরে যে বর্ণনা দিয়েছেন চলচ্চিত্রকার তা এই দৃশ্যের দ্বারা যথাযথ নৈপুণ্যে বিধৃত করার চেষ্টা করেছেন। ঋত্বিক বিশ্বাস করতেন 'ছবিতে গল্পের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন এসেছে বক্তব্যের যুগ। শুধু ছবির কথা কেন ...সব শিল্পেই এই বিবর্তন ঘটেছে।'[২০] উপন্যাস বহির্ভূত এই দৃশ্যে রামপ্রসাদের মেয়ে দুর্গার প্রসঙ্গ টেনে এনে সন্তানের জন্য বাবার মনের গহীনে চিরন্তন হাহাকার উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন চলচ্চিত্রকার।

মালোদের অফুরন্ত চাহিদা মিটাতে গিয়ে তিতাস যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তিতাস ছেড়ে জেলেদের নৌকা তখন প্রবাসে বের হয়। কিশোর আর সুবলও এই পথ অনুসরণ করে। তাদের সঙ্গী হয় প্রবীণ মালো তিলকচাঁদ। গন্তব্য শুকদেবপুরের উজানিনগর খলা। উপন্যাসের বিস্তর বর্ণনা বাদ দিয়ে চলচ্চিত্রকার শুধুমাত্র মালো সমাজকে প্রাধান্য দিয়ে, তাকে আশ্লিষ্ট করে যে আখ্যানটুকু অপরিহার্য মনে হয়েছে ততটুকুই সিনেমায় স্থান দিয়েছেন। "তিতাসের মহরত অনুষ্ঠানে ঋত্বিক বলেছিলেন, 'মনে হয় মল্লবর্মণের মূল বক্তব্য আমি বুঝতে পেরেছি, আমি তারই ছবি তুলব। সে বিশ্বাস আমার আছে।'"[২১] সেই মূল বক্তব্য প্রকাশের অনিবার্য অংশ হিসেবে মাছ ধরা শেষে কিশোরদের নৌকা ভিড়ে উজানীনগরের ঘাটে। মোড়ল স্বয়ং আসে মাছ দেখতে। উপন্যাসের ধারাবাহিক বর্ণনা ঋত্বিক কৌশলে চিত্রিত করেছেন সিনেমায়। উপন্যাসে লেখক ঘটনা বর্ণনায় ভাষ্যকার হিসেবে ভূমিকা নিয়েছেন। এস্থলে চলচ্চিত্রকার ঘটনা বর্ণনায় চরিত্রের মুখে সংলাপ বসিয়ে কাহিনির বিস্তার ঘটিয়েছেন। উপন্যাসে উল্লেখিত বাসুদেবপুরের পরিবর্তে চলচ্চিত্রে কালীপুরের লোকজন কর্তৃক কাইজ্যার সূত্র ধরে শুকদেবপুরে হামলা হয়। এ ঘটনাটি উপন্যাসের বর্ণনায়— 'মোড়ল গিয়াছে একটা শুকনা বিল লইয়া বাসুদেবপুরের লোকদের পুরানো একটা বিবাদ মিটাইতে। ...ঝগড়াটা ছিল অনেক দিন আগের। বিনা রক্তপাতে মীমাংসা হয় তারই চেষ্টা করিতে মোড়ল তাহাদের গ্রামে গিয়াছিল। আর ফিরিয়া আসে নাই।'[২২] উপন্যাসে মোড়লকে আটকে রেখে অকস্মাৎ দোল উৎসবে বাসুদেবপুরবাসী হামলা করেছে। এর পরিবর্তে চলচ্চিত্রে মোড়লের বয়ানে কালীপুরবাসী কর্তৃক হামলার পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। উভয় জায়গাতেই মূল অনুষঙ্গটি হচ্ছে নিম্নবর্গীয় দুটি সমাজের অস্তিত্বের লড়াই। এ লড়াই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নয়, কেবলমাত্র টিকে থাকার লক্ষ্যে স্বগোত্রীয়দের মধ্যে দখলদারিত্বের লড়াই। শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টির বহু আগে থেকেই এই লড়াই চলে এসেছে। 'মানব সমাজের সামাজিক জীবনের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপিত হয় যুদ্ধ-বিগ্রহকে অবলম্বন করে। সে যুদ্ধ ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে এবং পরবর্তীতে গোষ্ঠী বা সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রেও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়টি, কেননা খাদ্য ও আবাসস্থল আয়ত্তকরণের প্রয়োজনীয়তা, যা এক অর্থে অর্থনৈতিক সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন, —তা স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম তথা যুদ্ধ বিগ্রহে।'[২৩] মানুষের জীবন প্রধানত অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। জীবিকার একটি উপায় যখন রুদ্ধ হয়ে যেতে থাকে, বেঁচে থাকার তাগিদে সচেতন-অসচেতন সকল মানুষই এর বিকল্প উদ্ঘাটন করে ক্রমান্বয়ে জীবিকার অন্য উপায়কে আত্তীকরণ করতে থাকে। গোকর্ণঘাটের বর্তমান মালোসমাজের উপর আলোকপাত করলে দেখা যায়, নদীতে মাছের অপ্রতুলতার কারণে অধিকাংশই তাদের পেশা বদলে কেউ নাপিত,

Dhaka University Institutional Repository

কেউ সূতার, কেউ ধোপা, কেউ শ্রমিক, আবার কেউ ব্যবসায়ী বনে গেছে। তেমনি অদ্বৈতের উপন্যাসেও দেখা যায় তিতাসে মাছের ঘাটতি দেখা দিলে মালোরা অন্য নদীতে চলে যায় মাছ আহরণে। তিতাসে মাছের অপ্রতুলতা ও নদী শুকিয়ে জীবিকার বর্তমান পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা থেকে মরা বিল নিয়ে তাদের সঙ্গে বাসুদেবপুরের লোকজনের দ্বন্দের সূত্রপাত হয়। কারণ মালোদের ভবিষ্যতের সম্ভাব্য জীবিকা হিসেবে কৃষিকাজের মতো স্থায়ী কিছু তাদের চিন্তায় প্রাধান্য পায়। এর প্রমাণ উপন্যাসে পাওয়া যায় অন্য গ্রামের বর্ণনা থেকে—'এখানে ঘরে ঘরে জাল যেমন আছে তেমনি হালও আছে। ...কোনদিন কোন অদৃশ্য শয়তান যদি ইহাদের জালের গিঁটগুলি খুলিয়া দেয়, নৌকার লোহার বাঁধগুলি আলগা করিয়া ফেলে, আর নদীর জল চুমুক দিয়া শুষিয়া নেয়, ইহারা মরিবে না। ক্ষেতে শস্য ফলাইবে' (তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ২৮)। সিনেমায় ঋত্বিক গোকর্ণঘাটের মালোদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানে মনোযোগী না হয়ে নিজ কৌমের আদি পেশার প্রতি আনুগত্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন।

যুদ্ধ বিগ্রহের মাঝেও মানব মনের শাশ্বত প্রেম বাঁধা পড়ে থাকে না। যৌবনের সাগ্রহে কিশোররা সমূহ লড়াইয়ের আভাস পেয়েও দোল উৎসবে যোগ দেয় নারী নৃত্যের বাঁকে মনের নৌকা নোঙ্গর করার প্রয়াসে। নৃত্যদলের মাঝে হঠাৎ চোখ পড়ে এক কুমারীর ওপর। তার সলজ্জ হাসিতে কিশোরের মনে অজানা শিহরণ দোলা দেয়। এমন সময় আচমকা আক্রমণ করে বসে কালীপুরের লোকজন। সমূহ বিপদের কবল থেকে মেয়েটিকে রক্ষা করতে লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিশোর। পরক্ষণেই দেখতে পায় তার পিছনে মেয়েটি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। কিশোর হিতাহিত না ভেবে মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে তুলে চতুর্দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, 'জল আনো, জল আনো। তোমরার মাইয়া মূর্ছা গেছে। গামছা আনো।'[২৪] পূর্ব থেকে সংজ্ঞায়িত কোন বিষয়কে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে গেলে অনেকসময় এর ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ, প্রকরণ যেমন বদলে যায় উপকরণও তেমনি বদলে যেতে পারে। উপন্যাসে এই সংলাপটি এই রকম—'এর মা কই, এর মা কই! ডরে অজ্ঞান হইয়া গেছে! জল আন, পাংখা আন' (তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ৩৮)। এখানে সংলাপে যেমন পরিবর্তন এসেছে, উপকরণেও পাংখার পরিবর্তে গামছা এসেছে। এক্ষেত্রে লেখক এবং চলচ্চিত্রকারের স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি, ঘটনার সময় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাব ফেলে থাকতে পারে। লেখক যদি তীব্র গরমের সময় এই অংশটি লিখে থাকেন স্বভাবতই তাঁর মনে একটি মানুষ অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঘটনায় পাখার বিষয়টি প্রথমে চলে আসবে। তেমনি সিনেমা নির্মাণের সময়ও একই রকম প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। 'ঋত্বিক ঘটক তেমন কোন প্রথাগত চিত্রনাট্য করেননি। তাঁর একটা আউটলাইন ছিল; কিন্তু সেটা ছিল সম্পূর্ণ তাঁর মাথায়। আর উনি অনেক সময় শ্যুটিং লোকেশনে গিয়ে সেই দিনের শ্যুটিং এর চিত্রনাট্য লিখতেন।'[২৫] যেহেতু পূর্ব থেকে চিত্রনাট্য নির্দিষ্ট থাকত না এবং নদীর পাড়ে এই দৃশ্যটির শ্যুটিং হয়েছে, নদীর স্নিগ্ধ হাওয়া এখানে সংলাপ নির্ধারণে প্রপঞ্চ হিসেবে কাজ করে থাকতে পারে। একারণে অজ্ঞান মেয়েটির চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে দেওয়া হোক আর মাথায় পানি ঢালাই হোক তা মোছার জন্য তাঁর চিন্তায় তাৎক্ষণিক ভাবে গামছা আবশ্যক মনে হয়েছে। ঐ সময় বাতাসের উপস্থিতিও এই দৃশ্যে বটবৃক্ষের পত্রসঞ্চালনে নিশ্চিত হওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসে কিশোরকে যেভাবে প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দেখা যায়, রাজার ঝি'র জন্য তার মনে যে অস্থিরতা—চলচ্চিত্রে তেমনটি দেখা যায় না। উপন্যাসের বর্ণনায়—'কিশোরের মনে একটা অস্বাভাবিক আশা জাগিয়াছে। সেই মেয়েটির সঙ্গে তার বিবাহ হইবে। আশাটা আরও অস্বাভাবিক এইজন্য : সে নিজে কাউকে কিছু বলিতে পারিবে না, তাকেই বরং কেউ আসিয়া বলুক। মনে মনে সে রঙ ফলায় : আচ্ছা এমন হয় না, মেয়েপক্ষ কেউ আসিয়া তাকে বলে, 'অ কিশোর, এই কন্যা তোমারে দিলাম, লইয়া গিয়া বিয়া কর' (তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ৩৯)। নদীর ধারে সমবয়সী একটি তরুণ তাকে লক্ষ্য করে আসার সময় তার মনে যে নিঃসন্দিগ্ধ আশার প্রদীপ জ্বলে ওঠে তার বর্ণনাও একই পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়—'কিশোর ভাবিয়া রোমাঞ্চিত হইল : এ বোধ হয় তারই (রাজার ঝি) কোন ভাই হইবে। আসিতেছে সম্বন্ধের কথা চালাইতে। এ না হইয়া যায় না।' চলচ্চিত্রে রাজার ঝি'র জন্য এমন আকুলতা তার অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পায় না। এখানে কিশোর মূলত লাজুক, গম্ভীর। প্রেমের উদ্বেলতা যেমন তার মনকে ছাপিয়ে যায় না, তেমনি মনোভাবের আতিশয্যেও তা ধরা পড়ে না। সে নিঃস্পৃহ। সিনেমার ছয় নম্বর দৃশ্যে দেখা যায়, কিশোর নৌকার গলুইয়ের উপর নিবিষ্ট মনে জাল ঠিক করছে। সমবয়সী একটি লোক পেছন দিক থেকে হেঁটে তার কাছে আসছে। কিশোরের সে দিকে কোন নজর নেই। ঋত্বিক বলেছিলেন, 'অদ্বৈতবাবু অনেক অতিকথন করেন'। 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ ...blah-blah করে গেছে। মানে গুচ্ছের অকারণ কথা আছে।'[২৬] সিনেমায় এই অতিকথনে সংযমতা আনতে চলচ্চিত্রকার ঠাকুর ঝি'র প্রতি কিশোরের অনুরাগের বিষয়টি বাইরে প্রকাশ করতে দেননি। বরঞ্চ জাল বোনার সময় কিশোরের হাস্যোজ্জ্বল অভিব্যক্তির মাধ্যমে তার মনে সুপ্ত সূক্ষ বাসনাটি প্রকাশ করেছেন। চলচ্চিত্রে এ জাল বোনা কেবল মাছের জাল বোনা নয়, ঠাকুর ঝি'কে নিয়ে তার মনের ভিতরে ভবিষ্যৎ স্বপ্নের জাল বোনা। কিন্তু সমবয়সী লোকটির কুটুম্বিতা করার প্রস্তাবেও তার মধ্যে কোন ভাবাবেগ নেই। একইভাবে নিবিষ্টমনে জাল সেলাই করে করতে দেখা যায় তাকে। এই প্রস্তাবে উপন্যাসের 'কিশোরের সকল শিরা-উপশিরা একযোগে স্পন্দিত হইতে লাগিল' (তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ৪০)। আবার সিনেমায় যখন বাদ্য-বাজনা বাজাইয়া কাপর-গামছা বদল কইরা বন্ধুস্থি করার ইঙ্গিতপূর্ণ প্রস্তাব পায় তখনও কিশোরের মনের আনন্দ বাইরে থেকে ধরা দেয় না। এর পরিবর্তে তাকে গভীর ভাবনায় আচ্ছন্ন হতে দেখা যায়।

মোড়ল চরিত্রটিও এখানে সাদাসিধা। উপন্যাসের মোড়লকে যেরকম ব্যস্ত ও কঠিন মনে হয়েছে চলচ্চিত্রের মোড়ল সে-রকম নয়। বরং আট দশজনের মতোই সে সরল, কোনরূপ মোড়লীপনা তার মাঝে নেই। ঋত্বিক-মানসে যে মার্কস, লেনিন বাস করতেন প্রচ্ছন্নভাবে তারই প্রভাব পড়েছে সিনেমায়। মোড়লের ডাক পেয়ে কিশোর বাড়িতে গেলে মোড়ল গিন্নি তাকে নিয়ে সোজা ঘরের ভিতর প্রবেশ করে রাজার ঝি'র সঙ্গে মালা বদল করিয়ে দেয়। এমন ঘটনায়ও কিশোরকে নিঃস্পৃহ থাকতে দেখা যায়। কোন আপত্তি নেই আবার আগ্রহের প্রাবল্যও নেই। দুজনকে একই ঘরে রেখে বাইরে থেকে শেকলবন্দি করে মোড়ল গিন্নি চলে গেলে ভয়ে রাজার ঝি'র বুক ধরফর করে, নিঃশ্বাসের দ্রুততায় ঠোট শুকিয়ে আসে। অন্যদিকে কিশোরের মুখে সুষুপ্ত হাসির আভাস, চোখে কামনার স্পৃহা ফুটে ওঠে। দৃশ্যটিতে 'ক্লোজ আপ' এবং 'মিডশটে' মধুর মিলনের পূর্ব মুহূর্তে দুটি অচেনা নর-নারীর মনের ভিতরের অবস্থা কোনরূপ সংলাপ ছাড়া শুধুমাত্র অভিব্যক্তির মাধ্যমে সুনিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কামনার বহ্নিশিখায় উদ্দীপ্ত হয়ে কিশোর রাজার ঝিকে আচমকা টানে যখন বিছানায় নিয়ে যায়, বাইরে কতগুলো মেয়ে তখন উঠোনে বসে পড়ে—যারা

এতক্ষণ ধরে আড়ালে থেকে ঘরের ভিতরে লক্ষ রাখছিল। এই বসে যাওয়ার শট কিংবা ঘর থেকে চলে যাওয়ার আগে কিশোরকে উদ্দেশ্য করে মোড়ল গিন্নির বলা—'দেখ জাইল্যা উতালা হইয়া পাখির মতো পাখ বাড়াইয়ো না, রইয়া-সইয়া আগমন কইরো' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ৭)। এগুলো দ্বারা এখানে সিনেমার ভাষা সৃষ্টি করা হয়েছে। মূল ঘটনাকে কেন্দ্রীভূত করতে এরকম ছোট ছোট শট কিংবা সংলাপ অনুঘটক হিসেবে কাজ করে থাকে। মূল কাহিনি বহির্ভূত দৃশ্য সৃষ্টি কিংবা সংলাপ সংযোজনে ঋত্বিক ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সিনেমা করার আগে তিনি মূল গল্পটিকে ভাঙতেন, তারপর নিজের মতো করে গড়তেন। উপন্যাসে বর্ণনা ছিল—'মালাবদল হইয়া গেলে, মোড়ল-গিন্নি হঠাৎ ঘরের বাহির হইয়া শিকল তুলিয়া দিল। মেয়েটি ভয় পাইয়াছিল। দরজা বন্ধ, অন্ধকার ঘর! কারো মুখ কেউ দেখিতে পায় না। অবশেষে কিশোর তাহার ভয় দূর করিল' (তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ৪১)। ভয় পাওয়ার দৃশ্যটিকে যে গভীরভাবে সিনেমায় দেখানো হয়েছে এবং ভয় ভাঙার দৃশ্যবর্ণনায় যে অনুষঙ্গগুলো যোগ করা হয়েছে তা-ই ভাঙা-গড়ার খেলা। উপন্যাসের হালকা বর্ণনাকে ভেঙে চলচ্চিত্রে দৃঢ়ভাবে নির্মাণ করেছেন ঋত্বিক। তিনি নিজেই বলেছেন, 'Film is not made, film is built. আমি চিত্রপরিচালক নই, আমি চিত্রস্রষ্টা।'[২৭] "বদ্ধ ঘরে কিশোর এবং রাজার ঝি'র অন্তরঙ্গ মুহূর্তে এক অদ্ভুত শব্দকে সমালোচক কামারের হাপর টানার শব্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, 'বুঝাই যাচ্ছে এ হচ্ছে নবদম্পতির সঙ্গমরত সময়ের ইঙ্গিত, তাদের প্রথম মিলনের হৃদয়াবেগজনিত শব্দ।' হঠাৎ কিশোর ...রাজার ঝি'কে জাপটে ধরে বিছানায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্যামেরা দ্রুত দিক পরিবর্তন করে এবং কামারের সেই হাপর টানার শব্দ আরও উচ্চকিত হয়। ...দৃশ্যটি আইজেনস্টাইনের *The General Line* (১৯২৯) ছবিটির একটি দৃশ্যের সাথে সাজুয্যপূর্ণ, যেখানে একটি ষাঁড় লাফিয়ে উঠে একটি গাভীর উপর উপগত হয়। আইজেনস্টাইন দ্রুততার সাথে সেখানে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জনের দৃশ্য সংযোজন করেন।"[২৮]

খলাভাঙা দলের সঙ্গে কিশোরকে ফিরে যেতে হবে। মোড়ল সেভাবেই ব্যবস্থা করে রেখেছে। যাওয়ার আগে কিশোরের শ্বশুর খাতায় নাম ঠিকানা লিখে রাখে। অজানা অচেনা লোকের কাছে মেয়েকে নির্দ্বিধায় সমর্পণ করার যে সরল বিশ্বাস তৎকালে ছিল তা এই ঠিকানা লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এতোদিনের ঘর ছেড়ে মেয়ে ঐ নির্দিষ্ট ঠিকানায় থাকবে, এমন সংশয়হীন সান্ত্বনা বাবাকে আশ্বস্ত করে। সম্মিলিত উলুধ্বনিতে রাজার ঝি চিরদিনের জন্য শ্বশুর বাড়ির পথে পা ফেলে। যাত্রাপথে তুলসী তলায় গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাস্তুশাস্ত্র ও সনাতন ধর্ম মতে তুলসী গাছ শুভকাজ, সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির উৎস। তাই স্বামীর ঘরে যাওয়ার আগে তুলসী তলায় গিয়ে দেবীর আশীর্বাদ নেওয়া গ্রাম-বাংলার সনাতন সমাজে অবশ্য পালনীয় রীতি হিসেবে দেখা যায়। ঋত্বিক বলেছেন, 'আমাদের দেশে যে store house আছে, যে-ভাণ্ডার আছে, myth, পুরাণ ইত্যাদি—তার মধ্যে যে wisdom আছে, যে-জ্ঞান আছে, সেগুলো আজকালকার আমরা প্রায় ভুলে যাচ্ছি। আমরা সেগুলোকে আর পাত্তা দেই না, অথচ তার মধ্যে প্রচুর সত্য আছে।'[২৯] সেই প্রাকৃতিক সত্যকে তিনি নব উচ্চারণে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে ছেয়েছেন। ঋত্বিক এখানে ধর্মীয় মিথের সঙ্গে সামাজিক রীতির ঐক্য গড়ে তুলতে চেয়েছেন। নিজে তিনি ভগবানে বিশ্বাসী না হলেও যুগ যুগ ধরে আচারিত অন্যের ধর্মবিশ্বাসকে মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করেননি। তিনি মনে করতেন ধর্মকে ব্যবহার করা হয় লোকঠকানো ও জোচ্চুরি করার হাতিয়ার হিসেবে। এ প্রসঙ্গে তাঁর সাহসী ভাষণ—'ঈশ্বরে আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। শুধু তাই নয়, এ নামটাকেই আমি ঘৃণা করি। এই সব গল্প দিয়ে আর কতদিন

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ-সংসার চালাতে হবে, সেটা আমাকে বুঝতে হবে। এসব বানানো গপ্পো সম্পূর্ণ জোচ্চুরি। আর, বেবাক জোচ্চুরি দিয়ে খুব বেশিদিন ঠকানো বা ঠেকিয়ে রাখা যায় না।'[৩০] ধর্মের পক্ষে সাফাই নয়—শান্তির স্বপক্ষে, মঙ্গলের স্বপক্ষে ঐক্য গড়ে তোলাই ছিল ঋত্বিক-মানসের অন্যতম প্রতীতি। তাঁর প্রায় সকল সিনেমাতেই ঐক্যের উদাত্ত আহ্বান দেখা গেছে। তিনি যেমন চেয়েছিলেন মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক ঐক্য, তেমনি চেয়েছেন দুই বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্য। এক বাংলায় তাঁর জন্মের শিকড় আরেক বাংলায় বিচরণ। দুটোই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তবে পূর্ববাংলার বিরহ তাঁকে সবসময় তাড়া করে ফিরেছে। তাইতো 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পোতে' (১৯৭৭) তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আশ্রয়ের সন্ধানে আরেকটি নীড়হারা পাখি, যে পাখির নাম—বাংলাদেশ।' কিংবা 'ওরে আমার ভালবাসার ধন তোরাই বাংলাদেশের একটা অংশ, নবীন বাংলাদেশের—যে বাংলাদেশ আজো জন্মায়নি।'

সুবলের মনে বাসন্তীকে পাওয়ার সুপ্ত বাসনা সম্ভাবনার দ্বার খুলে আশার প্রদীপ হয়ে জ্বলে ওঠে। যদিও বাসন্তী এখনও কিশোরের পথপানে চেয়ে বসে আছে। কিন্তু মালো সমাজে নারীর মতামত মূল্যহীন। পুরুষের মর্জির ওপরই তাকে চলতে হয়। সিনেমায় সুবল কিশোরকে জিজ্ঞেস করতে দেখা যায়—'দাদা, তাইলে বাসন্তীরে তুমি এখানেই পাইয়া গেলা, অহন দেশের বাসন্তীরে তুমি কারে দিবা কও?' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ৯)। নারী যে বস্তুরূপ আদান প্রদানের বিষয় হিসেবে তৎসমাজে বিবেচিত হতো—অদ্বৈতের মতো ঋত্বিকও তা দেখাতে ভুল করেননি। কিশোরের প্রতি বাসন্তীর অনুরাগ থাকলেও কিশোরের এরকম কোন বাসনা ছিল না। উপন্যাসে কিশোরের কথায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়—'নারে সুবলা, না, ঠিসারার কথা না। বাসন্তীরে আমার, তোর লগেই সাতপাক ঘুরাইয়া দেমু।' ...যারে লেংটা থাইক্যা দেখতাছি– ছোটকালে যারে কোলে পিঠে লইছি– হাসাইছি, কাঁদাইছি, ডর দেখাইছি, ভেউরা বানাইয়া দিছি– তারে কি বিয়া করন যায়! বিয়া করন যায় তারে, যার লগে কোনোকালে দেখাসাক্ষাৎ নাই। দেখাসাক্ষাৎ খালি মুখাচণ্ডীর সময়– গীত জোকারের লগে পিঁড়ির উপর শাড়ীর ঘোমটা তুইল্যা যখন চোখ মেইল্যা চায়– সে হয় সত্যের স্ত্রী। আর সগল তো ভইন' (তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ৩১,৩২)। সিনেমায় কিশোর তাই বাসন্তী প্রসঙ্গে সুবলকে বলে, 'তরেই দিয়া দিলাম, যা' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃশ্য ৯)।

ডাকাতের মুল্লুক দিয়ে নাও চালাতে হবে তাই নববধূকে পাটাতনের নিচে শুইয়ে রেখে নৌকা চালায় তারা। অন্য নৌকা থেকে ধীরাজউদ্দীন ফকিরের কণ্ঠে গান ভেসে আসে, 'কোরানেতে তার প্রমাণ / লা শরীক কালাম / ...আল্লাজি হুকুম করলো / পাঠাইয়া দিল তখন মদিনার শহরে।' এই গানের মাধ্যমেও ঋত্বিক ঐক্য গড়ে তুলতে চেয়েছেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। উপন্যাসেও এর সন্ধান পাওয়া যায়। ঐক্যের জন্য প্রয়োজনে ঋত্বিক মূল কাহিনি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। নিজের ভাবাদর্শ প্রয়োগ করতে গিয়ে কোন রকমের আপোস করেননি। কখনো খ্যাতি অর্জনের জন্য রয়ে সয়ে কাজ করেননি, সত্যভাষণে কোনপ্রকার পিছপা হননি। 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'র নীলকণ্ঠ বাগচীর বয়ানে তিনি নিজের সম্বন্ধে এ সত্য প্রকাশ করে গেছেন—'মাল (মদ) খাবার পয়সা জোটানোর জন্যে মিথ্যে কথা বলে যাব, চুরিও করব, কিন্তু নাম যশ মানুষ খুন করে পয়সা জোটানোর জন্যে বা পদ মর্যাদার জন্যে একটি মিথ্যেও আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না।'[৩১]

ঋত্বিককে নিয়ে বিরুদ্ধচারীদের বড় অভিযোগ তিনি খুব অস্থির, বিক্ষিপ্ত, কাহিনির ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন না। 'তিতাস একটি নদীর নাম' নিয়েও সেইসময় আলোচনার ঝড়

উঠেছিল—তিনি অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসের বারোটা বাজিয়েছেন। ঋত্বিকের অভিমত অনুযায়ী তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন না, নির্মাণ করেন। এই নির্মাণ কাঠামো দৃঢ় করতে গিয়ে প্রয়োজন হলে বাড়তি রসদ যোগ করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'সাহিত্য একটা art আর ফিল্ম আর-একটা শিল্প। কাজেই সাহিত্যকে ফিল্মে রূপায়ণ করতে গেলে তখন ঐ সাহিত্যকে একেবারে বোবার মতো... যা এরা করে, মানে লোকজন করে... এটা ঠিক না। সাহিত্য হচ্ছে পড়ার। ...কিন্তু film is a performing art. এখানে চোখে দেখার একটা ব্যাপার আছে, কানে শোনার ব্যাপার আছে। এই দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ আছে। কাজেই করতে গেলে (সাহিত্য থেকে সিনেমা) বদল করতেই হয়। তাতে যদি সাহিত্যিকেরা চটে যান— তাতে আমার কিছু বলার নেই। ...তাঁরা নিশ্চই বোঝবার চেষ্টা করবেন যে, একটা medium থেকে আর-একটা medium-এ translate করতে গেলে খানিকটা ঘটনা ঘটাতেই হয়।'[৩২] এই ঘটনা ঘটার ব্যাপারটা আমরা 'তিতাস একটি নদীর নাম' সিনেমার নানা জায়গায় দেখতে পাই। বউকে নিয়ে কিশোর মালো-পাড়ায় ফেরার পথে সবার অলক্ষ্যে ডাকাতরা রাজার ঝিকে নিয়ে যায়। ধস্তাধস্তি করে রাজার ঝি ডাকাতদের নৌকা থেকে নদীতে ঝাঁপ দেয়। ঘুম থেকে ওঠে কিশোর বউকে খুঁজে না পেয়ে শোকে পাগল হয়ে যায়। এরপর রাজার ঝি'র পরিণতি কিশোরের মনের অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য চলচ্চিত্রকার একটি বাড়তি দৃশ্যের অবতারণা করেন। রাজার ঝিকে সকালবেলা নদীর পাড়ে বেহুঁশ অবস্থায় দেখতে পেয়ে অন্য জেলেরা উদ্ধার করে। এসময় নদীতে বয়ে চলে ছিন্নপাল তোলা বড় বড় নৌকা। এই দৃশ্যদ্বারা বোঝানো হয়েছে—ছিন্ন পালের মতো কিশোরের হৃদয়টা বিদীর্ণ হয়ে গেছে। ছেঁড়া পাল নিয়েই বিশাল নৌকাগুলো যেমন দুস্তর নদী পার হবে নিরবধি। রাজার ঝি'কেও ছিন্ন হৃদয় নিয়ে জীবনের অথৈ নদী পাড়ি দিতে হবে। ছেঁড়া পালের নৌকাকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করে ঋত্বিক তাদের মনের বর্তমান অবস্থা ও অনাগত ভবিষ্যৎকে উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন।

সিনেমার পরের দৃশ্যটিও বাড়তি। ঋত্বিক এখানে বাসন্তীর মায়ের মুখে সংলাপের মাধ্যমে সুবলের পরিণতি, বাসন্তী ও কিশোরের বর্তমান বাস্তবতা তুলে ধরেছেন—'আরে ও অলুক্ষণা মাইয়া, আরে ও অপয়া মাইয়া, আরে ও বাসন্তী, তুই আমারে জ্বালাইয়া খাইলি, এই আনমনে বনবাদারে ঘুরস ক্যা? ...একটার লগে বিয়া আছিল ঠিকঠাক ছোডকালে, হেইডা থাইকক্যাও নাই, দিলাম বিয়া সুবলার লগে, হেইডা মরল বউভাতের পরের দিন, আর তুই ছেমড়ি তার নামের জয়ঢাক অইয়া রইলি' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ১৩)। এই দৃশ্যের আরেক সংলাপে ফুটে উঠেছে মালোদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক দৈন্যের চিত্র—'যত অভাব এই গোকইন্যা ঘাটে, এই কয়টা বছরে কি অভাবটা নাইম্যা আইলরে'। ঋত্বিকের আরাধ্য বিষয় ছিল জীবনের অমোঘ পরিহাস বরণ করা খেটে খাওয়া মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জয়গান। সেই ব্রত পালন হেতু ঘটনার ফাঁকে সুচতুর কৌশলে তিনি এ বিষয়গুলোকে নিয়ে আসেন সিনেমার অনিবার্য উপাদান হিসাবে। কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই সিনেমার জাম্পকাটের মতো ঔপন্যাসিক 'প্রবাস খণ্ড' থেকে একলাফে 'নয়া বসতে' চলে গেছেন চার বছরের ঘটনা ডিঙিয়ে। চলচ্চিত্রকারও তাঁর চেয়ে বড় সময় অতিক্রম করেছেন সিনেমায়। উপন্যাসে সময় অতিক্রম করলে বারবার চরিত্রের বয়স ফুটিয়ে তোলা লেখকের বর্ণনায় মাধ্যমে যতটা সহজ, চলচ্চিত্রে সেটা ততো সহজ ব্যাপার নয়। কারণ সিনেমা দৃশ্যমান। তাই ঋত্বিককে চার বছরের বেড়াজাল ছিঁড়ে এমন একটা সময়ে পৌঁছুতে হয়েছে যেখানে ছোট বাসন্তী, মুংলি বয়সে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া উপন্যাসের সঙ্গে সময়ের মিল রেখে ছবি করলে চার বছরের ফাঁকে অনন্তের বয়স

Dhaka University Institutional Repository

হতো তিন বছরের কিছু অধিককাল। এই সময় ধরে কাহিনি শুরু করলে ঘটনার প্রবাহমানতার সঙ্গে সময়ের সঙ্গতি বজায় রেখে অনন্ত চরিত্রটিকে পর্দায় একাধিকবার পাল্টাতে হতো। কিন্তু সিনেমায় এটি ব্যয়বহুল ব্যাপার। তাই ছবি নির্মাণে এসব ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকাররা কৌশলী ভূমিকা নিয়ে থাকেন। রাজার ঝিকে নিয়ে নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ মালো পাড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে নৌকার মধ্যে নিত্যানন্দ বলে– 'আইচ্ছা মা, দুইডা কথা কইবা, নয়-দশটা বছর অইয়া গেলো গা, তোমারে ডাকাতের চর থন তুইলা আনলাম, একবারও তো বাপের বাড়িত যাওনের কথা কও নাই' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ১৪)। এই সংলাপে চলচ্চিত্রকারের অভিসন্ধি সাধারণ দর্শকদের কাছে ধরা না পরলেও সচেতন মাত্রই তা বুঝতে সক্ষম যে অনন্তকে এমন একটি গ্রহণযোগ্য বয়সে উপস্থাপন তাঁর অভিপ্রায় ছিল যাতে চরিত্র বদল না করে কাহিনি চালিয়ে নেয়া যায়।

স্বামীর সন্ধানে এসে রাজার ঝি অনন্তকে নিয়ে নৌকা থেকে নেমেই দেখতে পায় এক পাগলকে জোর করে তিতাসের জলে গোসল করাতে নিয়ে আসা হয়েছে। তার দিকে কারও ভ্রুক্ষেপ নেই, শুধু বাসন্তীর মুখে এক অব্যক্ত বেদনার ছায়া ক্ষণিকের জন্য ধরা দেয়। পরক্ষণেই ঘাটে অচেনা আগন্তুকদের দেখতে পেয়ে বাসন্তী জিজ্ঞেস করে— 'নতুন আইছো নি? কোন ভিটাত বাড়ি?' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ১৫)। রাজার ঝি'র কাছে এর কোন উত্তর নেই। বিশ্বব্যাপী পিতা-মাতা-স্বামী-সংসার হারা এক অসহায় উদ্বাস্তু নারীর প্রতিনিধি সে, নির্দিষ্ট কোন ভিটা নেই তার। এই উদ্বাস্তুতার বিষয়টি ঋত্বিকের প্রতিটি সিনেমাতেই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ উপাদান। কেউ দেশ ছেড়ে দেশান্তরে, কেউ গ্রাম ছেড়ে শহরান্তরে আর রাজার ঝি এসেছে গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে। এরা সকলেই এক সূত্রে গাঁথা। সবারই বাস্তু-অন্নের সমস্যা। পুঁজিবাদের ক্রীড়নকে পরিণত হওয়ার সমস্যা। সিনেমায় সেই শ্রেণিশোষণকে ঋত্বিক তুলে ধরেছেন কালুর মা চরিত্রের মাধ্যমে। উপন্যাসে কালোবরন চরিত্রটি গোকর্ণঘাটের মালোদের কাছে সামন্তপ্রভু হিসেবে চিত্রিত। সেখানে তাকে বাইরের মহাজনদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজে মালো থেকে ব্যাপারীতে উন্নীত হতে দেখা গেছে। তার ভিতর প্রভুত্ববাদী কূটচাল ও জিঘাংসা ছিল। বাসন্তীকে না পেয়ে সুবলকে সে কৌশলে হত্যা করছে—এমন ইঙ্গিত উপন্যাসে রয়েছে। স্বামীকে হারানোর অন্তরজ্বালাই পরবর্তীকালে বাসন্তীকে বিদ্রোহী করে তুলে। ঋত্বিক কালোবরন চরিত্রটিকে ছবি থেকে একেবারে বাদ দিয়েছেন। পরিবর্তে মালো সমাজের ভিতরের সামন্ত প্রভু হিসেবে কালুর মাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এখানেও ঋত্বিকের নারীবাদী মনোভাবের প্রভাব দেখা যায়। সিনেমায় রাজার ঝি'র সঙ্গে নদীর ঘাটে কালুর মা'র দেখা হলে সাগ্রহে তার সঙ্গে নিতে চায়। বাসন্তীর সংলাপে কালুর মার সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়—ফাও কাজ করিয়ে নেওয়ার অভিসন্ধি থেকে কালুর মা রাজার ঝি'কে জায়গা দিতে চায়। কালুর মাকে উপন্যাসের চেয়ে সিনেমায় বেশি প্রভাবশালী হিসেবে দেখানো হয়েছে। অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে সমাজের যে শ্রেণিটা—কি প্রভাব বিস্তারে, কি অর্থনৈতিক শোষণে নিজেদের প্রভুত্ব ফলাতে চায়, কালুর মাকে তাদেরই প্রতিভূ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। যেমনটা পদ্মা নদীর মাঝিতে হোসেন মিয়া তার প্রভাব বিস্তারের নিয়ামক হিসেবে কপর্দকহীন ধীবর সমাজকে ব্যবহার করেছে। কিংবা *Redes* সিনেমার Don Anselmo-এর মতো জেলেসমাজের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে কালুর মা এখানে গোটা মালো সমাজের সামন্ত প্রভু হিসেবে চিহ্নিত না হয়ে মালো নারীদের প্রভু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

পরের দৃশ্যে দেখা যায় কালুর মার উঠানে বসে মহিলারা গল্প করছে। গল্প ঠিক নয়, কালুর মা বলছে বাকীরা শুনছে। মালো সমাজে কালুর মার আধিপত্য বোঝাতে চলচ্চিত্রকার তার বাড়ির উঠোনে সবার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। উপন্যাসের বর্ণনায়, 'কালোর মারও কৌতূহল হয়। সকালে একবার দেখিয়া গিয়াছে। বিকালেও একবার দেখিতে আসিল। ...বাকি দিন কিভাবে কাটিবে, কালোর মা চলিয়া গেলে সে তাই ভাবিতে বসে। কিন্তু লোকে তাকে ভাবিবার অবকাশ দেয় না। একটু পরেই একদল বর্ষীয়সী নারী আসিল। কালোবরণের বাড়িকে বড়বাড়ি বলে। তার বাড়ি আর এ-বাড়ির মাঝখানে একটি বাঁশের বেড়া। সেই বেড়াতে কাপড় শুকাইতে দিয়াছিল। সেখানা আনিয়া বিছাইয়া দিবে কিনা ভাবিতেছে। তারা ভাবিবার অবসর না দিয়া মাটিতেই বসিয়া পড়িল' (তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ৫৬)। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় অনন্তের মার বাড়িতেই সব মহিলার জটলা বসেছিল। নিজের বক্তব্য তুলে ধরার মানসে চলচ্চিত্রকার উপন্যাসের বিশাল পরিধি থেকে সিনেমায় রূপান্তরের সময় ঘটনাগুলোকে যথাসম্ভব সংকুচিত করতে গিয়ে এর স্থান, সময় ও চরিত্রের সংলাপগুলো বদলে দিয়েছেন। কোথাও কোথাও ঘটনাগুলোকে কাঠামোবদ্ধ করেছেন, কোথাও আবার মূল কাঠামো ভেঙে ফেলেছেন। এই ভাঙা গড়ার মাঝে সিনেমার সংলাপে কিছু গড়মিল লক্ষ্য করা যায়। অনন্তের মাকে সুতা তৈরির ব্যাপারে বলতে গিয়ে বাসন্তী বলে– 'মোডাডা এক 'ট্যাহা' আর চিকনডা দুই 'ট্যাকা' সের দরে কৈবর্ত্য পাড়ার লোকেরা পরম আনন্দে কিইন্যা লইবো' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ১৮)। একই সংলাপে একবার ট্যাহা আরেকবার ট্যাকা বলা হয়েছে। সিনেমায় একাধিক দৃশ্যে সংলাপে এরকম অসঙ্গতি দেখা যায়।

মালো সমাজে রামপ্রসাদের মতো সজ্জন যেমন ছিল তেমনি নিতাইকিশোরের মতো ঘুষখোর, কৃষ্ণচন্দ্রের মতো ধড়িবাজও ছিল। উপন্যাসে বাসন্তী বৈঠকে উপস্থিত লোকদের সম্বন্ধে ধারণা দিতে গিয়ে রাজার ঝি'কে বলে, "এই জনের নাম নিতাইকিশোর। ঘুষ খাইয়া পেট মোটা করিয়াছে, কিন্তু চালে এক মুঠা ছন নাই। আর এই যে কানা মানুষ, তিনি লোকের বিচার করিতে গিয়া 'শ্বশুরের বিছানায় বউ শোয়ায়, জামাইর বিছানায় শাশুড়ি শোয়ায়', তার নাম কৃষ্ণচন্দ্র। এই 'দেড় নিয়তির' জন্য চক্ষুধন খাইয়াছে" (তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ৬২)। কিন্তু উপন্যাসে বর্ণিত এই সংলাপটি সিনেমায় ১৯ নম্বর দৃশ্যে মুংলীর বলিষ্ঠ কণ্ঠে শোভা পেয়েছে। সিনেমার বিভিন্ন অংশে সংলাপের এরকম রদবদল উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য দৃশ্যে এই সংলাপের মাধ্যমে মুংলীকে প্রতিবাদী নারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ভরা মজলিসে মুংলীর এই সাহসী উচ্চারণ দ্বারা সিনেমার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের একটা বার্তা দেওয়া হয়েছে। পুরো সিনেমাতেই এর একটা প্রচ্ছন্ন প্রভাব লক্ষ করা যায়। সিনেমায় কালোর মা, মুংলী, বাসন্তী, লবচন্দ্রের বউ প্রত্যেকেই স্ব স্ব মহিমায় উদ্ভাসিত। দশজনের বিচারে মুংলীর সমাজে সুবলার শ্বশুর ও কিশোরের বাপের সঙ্গে অনন্তের মাকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে উক্ত সমাজে নারীর প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ঋত্বিক স্বীকার করেছেন, 'নারীরা আমার মতে সমাজের এবং সংসারের আদ্যাশক্তি। সেজন্য আমার ছবিতে সর্বদাই নারীর প্রতি মমতা, স্নেহ এবং শ্রদ্ধার প্রকাশ রাখার চেষ্টা করেছি।[৩৩] এই দৃশ্যে মালো সমাজের ঐক্য এবং সমাজের মুরুব্বিদের কথার প্রতি অন্যদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের বিষয়টিও উঠে এসেছে। ঋত্বিক একদিকে যেমন নিপীড়িত মানুষের চিত্র একেছেন তাঁর সিনেমায়, অন্যদিকে সাম্য প্রতিষ্ঠার জয়গানও গেয়েছেন। এই সাম্য ধনী-গরিবের, নারী-পুরুষের, হিন্দু-মুসলমানের। 'নাগরিক'-এ রামু যখন কোনভাবেই একটা চাকরি জোগাড় করতে পারছে না, উমা তখন সেলাইয়ের কাজ করে সংসারের ভার বহন করেছে। 'যুক্তি

Dhaka University Institutional Repository

তক্কো আর গপ্পো'তে নীলকণ্ঠ বাগচীর উদাসীনতায় সংসার যখন ভাসছিল; ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দুর্গাকে তখন মফস্বলের স্কুলে শিক্ষকতা করতে দেখা যায়। 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতাকেও আমরা একই রূপে দেখতে পাই। বাংলাদেশি নারীদের প্রতি ঋত্বিকের সুউচ্চ ধারণা ছিল। 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'তে শাঁওলি মিত্র অভিনীত বঙ্গবালা চরিত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমাদের দেশের (ভারতের) বাঙালি মেয়েদের সব সময়েই দেখা যায় ন্যাকা-ন্যাকা, আহ্লাদে-আহ্লাদে, পুতু-পুতু, কিন্তু বাঙালি মেয়ে তা নয়। আমি তাই এনেছি এক তেজোদৃপ্ত মেয়ে—আর তার মধ্য দিয়ে সমস্ত বাংলাদেশের আত্মাটাকে ধরার চেষ্টা করেছি'[৩৪] যেহেতু 'তিতাস একটি নদীর নাম' সমসাময়িক কালে নির্মিত সেহেতু উভয় চলচ্চিত্রে ঋত্বিকের একই মানসাকাঙ্ক্ষা কাজ করেছে বলে মনে হয়।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ তিতাস নিয়ে একটি নির্দিষ্ট সমাজের নির্দিষ্ট কালের চিত্র আঁকতে চেয়েছেন। ঋত্বিক তিতাসকে বাংলার প্রতিমূর্তি হিসেবে কল্পনা করে এর সর্বজনীন রূপ দিয়েছেন। এই বাংলা মা ভগবতীর স্বরূপ। এই বাংলা সকলের। সিনেমায় অনন্তের উদ্দেশ্যে রাজার ঝিকে বলতে শোনা যায়, 'ভগবতী মানে মা, তরও মা আমারও' (চ./ দৃ. ১৪)। বংশ পরম্পরায় তিতাস যেমন কূলবর্তী সবাইকে মাতৃস্নেহ দিয়ে আসছে। তেমনি বাংলার সব নদীই ঋত্বিকের কাছে মাতৃসম, দেবীরূপ। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, ব্রহ্মপুত্র, কুশিয়ারা, তিস্তা, সুরমা ও তিতাস সব নদীর স্বরূপ তাঁর কাছে এক। তিতাসকে দেবী কল্পনায় তিনি যে ছবি তৈরি করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই ছবিতে রাজার ঝি চরিত্রে অভিনয়কারী কবরীর কথায়—'উনি আসলেন বাংলাদেশে। আসার পর স্টুডিওতে হইচই পড়ে গেল। তখন ঋত্বিক দা বললেন আমি তোমার স্ক্রিনটেস্ট নিব। ...উনি আমাকে মেকআপ দিলেন দুর্গা মায়ের মেকআপ। এবং সত্যি সত্যি আমাকে একেবারেই দুর্গা মায়ের মতো করেই ছবি নিলেন।[৩৫] তিতাসকে দেবীজ্ঞান করে ছবি করা যে ঋত্বিক মানসে ছিল তাঁর প্রমাণ নিজের স্বীকারোক্তিতেও পাওয়া যায়, 'তিতাস আমার একটা study আর আমার একটা worship'[৩৬]। তিতাসের সঙ্গে আরকেটাইপ ভাবনার মিশেল ঘটিয়েছেন রাজার ঝি চরিত্রে। ২১ নম্বর দৃশ্যে রাজার ঝি কর্তৃক মা ভগবতীর পূজা, ৪৪ নম্বর দৃশ্যে অনন্তের চোখে এবং ৪৬ নম্বর দৃশ্যে বাসন্তীর চোখে ভগবতীর রূপে রাজার ঝি'র দর্শনদান সে সাক্ষ্য বহন করে। রাজার ঝি চরিত্রটিকে ঋত্বিক জগৎমাতার প্রতিমূর্তি হিসেবে নির্মাণ করেছেন। সমালোচক গৌতম ভদ্র তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম : মালোর চোখে– তিতাস একটি নদীর নাম : মধ্যবিত্তের চোখে' প্রবন্ধে বলেছেন, মালোরা বৈষ্ণব এবং তিতাসের বর্ণনায় তারা যে আরকেটাইপ ব্যবহার করে তা হল মোহিনী রাধার। ...এখানে মালোদের মনে এবং সংস্কৃতিতে জগদ্ধাত্রীর ব্যবহার তাদের জীবনের রূপায়ণ নয়, ঋত্বিকের নিজের আঁকড়ে ধরে থাকা প্রতিমূর্তির ব্যবহার। এটা মধ্যবিত্তের মননে আরোপিত মালো সংস্কৃতির অবাস্তব রূপ।' অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ঋত্বিক তাঁর মধ্যবিত্তীয় চোখ দিয়ে তিতাসকে নিরূপণ করেছেন। 'Genre'-এর বিচারে 'তিতাস একটি নদীর নাম' আঞ্চলিক উপন্যাস। তবুও এটি আঞ্চলিকতার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বিশ্বজনীন আবেদন সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। ঋত্বিকও তাঁর নির্মাণে তিতাসকে কেবল গোকর্ণঘাটে আটকে রাখতে চাননি—এক সর্বজনীন আবহ সৃষ্টিতে প্রয়াসী ছিলেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে জগদ্ধাত্রীর প্রতিমূর্তি হিসেবে মোহিনী রাধার মূর্তিই হোক আর কল্যাণময়ী দুর্গারই হোক—একে সিনেমায় কোন গোষ্ঠীর ডিটেল হিসেবে ভাবার অবকাশ থাকে না। কারণ চলচ্চিত্রকারকে কোন না কোন মূর্তিতে একটি বিষয়কে প্রকাশ করতে হয়। সমালোচক কোন দৃষ্টিতে এর বিচার করবেন তা-ই বিচার্য বিষয়।

ঋত্বিক ঘটকের প্রায় সব ছবিতে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে এবং ব্যক্তিগত জীবনেও যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে তা হল উদ্বাস্তু সমস্যা। দেশ বিভাজনের ফলে পূর্ববাংলা ছেড়ে অনেক শরণার্থীর সঙ্গে তাঁকেও দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। নতুন জায়গায় নতুন করে শিকড় গাড়তে গিয়ে প্রতিকূল প্রতিবেশের সঙ্গে তার যে পরিচয় ঘটেছে, সারা জীবন ধরে তাঁকে তা তাড়া করে ফিরেছে। তাই তাঁর ছবিগুলোতে দেখা যায় অসহায় উদ্বাস্তুদের রক্ষায় কেউ না কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। উদ্বাস্তুদের প্রধান সমস্যাটি সব জায়গায়ই এক। আর তা হল আশ্রয়। নতুন আগুন্তুকদের পুরাতনরা স্থান দিতে চায় না। বিশ্বজনীন এই সমস্যাটি ঋত্বিক বহু বছর আগে যেভাবে অনুধাবন করেছিলেন বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতেও তা সমভাবে লক্ষণীয়। তাই তাঁর ছবির এই বিষয়বস্তু তৎকালীন হয়েও সমকালীন। 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'তে কাজের খোঁজে গ্রাম থেকে কলকাতায় আসা বুড়ো পণ্ডিত জগাইকে যেমন নীলকণ্ঠ বাগচী নিজের ঠাঁইহীন অবস্থায়ও আশ্রয় দিয়েছে, নচিকেতাকেও তেমনি আশ্রয় দিয়েছে, আবার বাংলাদেশের শরণার্থী বঙ্গবালাকেও ফেলে দিতে পারেনি। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে মানস ঋত্বিক জীবনভর লালন করেছিলেন তা অদ্বৈতের উপন্যাসের রামপ্রসাদ ও কাদের মিয়া চরিত্রের সঙ্গে চলচ্চিত্রের রামপ্রসাদ ও কাদের মিয়া চরিত্রে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। একারণেই হয়তো রামপ্রসাদ এবং কাদের মিয়া চরিত্রদুটিকে চলচ্চিত্রে একই ব্যক্তি (গোলাম মুস্তফা) দিয়ে অভিনয় করিয়েছেন ঋত্বিক। রামপ্রসাদকে উপন্যাসে ও সিনেমায় উভয়খানেই অনন্তের মায়ের উদ্দেশ্যে প্রায় অভিন্নভাবে বলতে শোনা যায়, 'মা যদি এই গ্রামে না উইঠা আমার গ্রামে উঠতো, এক ঘর আছিলাম দুই ঘর অইতাম' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ২০)।

শত দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনার মাঝেও ব্রাত্য সমাজে উৎসব অধিবাসীদের মধ্যে নবপ্রাণ সঞ্চার করে। দলবেধে চাঁদা উঠিয়ে তারা পূজা পার্বণ উদ্‌যাপন করে। ধনী গরিব সবাই এর ভাগীদার হয়। কিন্তু কেউ নিতান্তই অপারগ হলে তার চাঁদার টাকা ছাড়াও পূজা হয়। অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসে সবাই মিলেমিশে উৎসব আনন্দে মেতে ওঠার এরকম চিত্র আমরা দেখতে পাই। একদিকে সমতা অন্যদিকে মানবতা উভয় বিষয়ে ঋত্বিক সারাজীবন ধরে শিল্পীর দায় থেকে অবদান রাখার চেষ্টা করে গেছেন। তাই উপন্যাসের এই অংশটুকু ঋত্বিক সততার সঙ্গেই তাঁর সিনেমায় তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে রামকেশব সকলের সঙ্গে অংশগ্রহণের জন্য জাল বিক্রি করে পূজার চাঁদা দিতে গেলে মুংলী যখন বলে—'জালডা অহন বেইচো না রামকেশব কাহা, তোমার চান্দা ছাড়াও পূজা অইবো। কিন্তু জালডা বেচলে আবার জাল বানাইতে দেরি লাগবো। আমি মাতব্বররে বুঝায়া কমু (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ২২)।' তখন এই পতিত সমাজে একতা আর মানবতা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আর এটাই মালোদের শক্তি।

পৌষ সংক্রান্তির পরবে রামকেশবের বাড়িতে পিঠা বানানোর আয়োজন চলে। বাসন্তী আর তার মা মিলে চালের গুড়ি কুটে। অনন্তের মাকেও জোর করে নিয়ে যায় পিঠা বানানোর জন্য। সাধ্যাতীত চেষ্টায় পিঠা খাওয়ানোর ক্ষুদ্র আয়োজনে তিতাস পাড়ের মালোদের মনে অপরিসীম আনন্দ সঞ্চার করে। পিঠা বানাতে গিয়ে নারী মনের গহীনে লুকানো গূঢ় বেদনাগুলো গল্পছলে বলার মাঝে নিজেদের কষ্ট লাঘবের যে বিষয় জড়িয়ে আছে তা ঋত্বিকের কিছু হলেও জানা আছে। কারণ ঋত্বিক আশৈশব বড় হয়েছেন এদেশে। এদেশের গ্রামীণ সমাজ তার হৃদয়ের পটভূমিতে সর্বদা জাগ্রত ছিল। দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেও আমৃত্যু ভুলতে পারেননি এদেশের মাটি ও মানুষকে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ বরাবরই তাকে টানত। নাড়ীর টানে তিনি একাধিকবার বাংলাদেশে এসেছেন এদেশের গ্রামকে যাপন করতে। কুমিল্লায় বোনের বাড়িতে থেকে সংগ্রহ করেছেন তিতাস উপকূলীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর লোকগান, আত্মস্থ করেছেন জনজীবন। উপন্যাসের বিশাল কলেবর থেকে সেই নির্মল আনন্দটুকু ছেঁকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশে থাকাকালীন যে হাসি-খুশিভরা সমৃদ্ধ জীবন তিনি এখানে দেখেছেন, দীর্ঘদিন আগে দেশত্যাগ করলেও তা ম্লান হয়নি। সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চাত উপলব্ধি ঔপন্যাসিকের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে চলচ্চিত্রে এর নান্দনিক উপস্থাপন করেছেন। তিনি নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আমার কৈশোর এবং প্রথম যৌবন পূর্ব বাংলায় কেটেছে। সেই জীবন, সেই স্মৃতি, সেই nostalgia আমাকে উন্মাদের মতো টেনে নিয়ে যায় তিতাসে, তিতাস নিয়ে ছবি করতে। 'তিতাস' উপন্যাসের সেই period-টা হচ্ছে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার, যা আমার চেনা, ভীষণ ভাবে চেনা। ...সে বাংলাদেশ আপনারা দেখেননি, সেই প্রাচুর্যময় জীবন, সেই সুন্দর জীবন... আমি যেন সেই জীবনের পথে চলে গেছি, সেই জীবনের মাঝখানে... এখনও যেন সব সে রকম আছে, ঘড়ির কাঁটা যেন এর মাঝে আর চলেনি। এই বোকামি নিয়ে, এই শিশুসুলভ মন নিয়ে 'তিতাস' আরম্ভ।"[৩৭]

তিতাসে নারীর বেদনাকে চলচ্চিত্রকার দেখিয়েছেন একেবারে ভিতর থেকে। অদ্বৈতের তিতাসে অনন্তর মা যখন 'পরস্তাব' বলে তখন মনের লীন বেদনাটুকু পাঠকের কাছে ধরা পড়ে না। কিন্তু ঋত্বিক এই বেদনার স্বরূপ উন্মোচন করতে চেয়েছেন দর্শকদের সামনে। 'পরস্তাব' বলার সময় অনন্তের মায়ের অভিব্যক্তি, বিশেষ করে বাসন্তীর চোখের সামনে ধোঁয়া নির্গত হওয়ার দৃশ্য—নারী মনের অব্যক্ত কথা দর্শকদের চোখে ধরিয়ে দেয়। এ যেন বিরহের আগুনে পোড়ে অঙ্গার হওয়া বাসন্তীর হৃদয় থেকে নির্গত ধোঁয়া। উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ পাগলের মনস্তত্ত্বের যে চিত্র এঁকেছেন, ঋত্বিক তা এড়িয়ে যেতে পারেননি। 'একটা পড়ার পুঁথির মত পাগলের মনের উপর দিয়া তার পাগলামির ইতিহাসখানা পাতার পর পাতা উল্টাইয়া গেল। পূর্বস্মৃতি হয়ত তাকে খানিকক্ষণের জন্য আত্মস্থ করিয়া দিল, সে নিজের দিকে, জগতের দিকে তাকাইবার সহজাত ক্ষমতা ফিরিয়া পাইল। না, হয়ত পাইল না। দুইটি নারী তার রান্নাঘরে পিঠা বানাইতেছে। দুইটির সহিতই তার জীবনের সম্পর্ক সুগভীর। ইহাদিগকে কাছে পাইয়া হয়ত ক্ষণকালের জন্য তার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে। হয়ত ভরিয়া উঠে নাই। পাগলের মনের হদিস পাওয়া স্বাভাবিক মানুষের কাজ নয়। তবু মনে হয়, দুটি নারীর এতখানি কাছে অবস্থান তার মনে আলোড়ন জাগাইয়া থাকিবে, তাহা না হইলে, হাঁড়িখুড়ি না ভাঙ্গিয়া, জাল দড়ি না ছিঁড়িয়া ভাল মানুষের মত সে স্থির হইয়া বসিয়া কাঁদিবে কেন?' (তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ৯২)। এই অংশটি নিয়ে নির্মিত সিনেমার দৃশ্যে পাগলের শান্ত-স্থির ভাবভঙ্গি, রাজার ঝি ও বাসন্তীর কথোপকথন শুনে লুকিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাদের দেখতে যাওয়া, পাগল মনে অতীতস্মৃতি উদয় হওয়ার আভাস দেয়। রাজার ঝি পিঠা নিয়ে পাগলের কাছে এলে পাগল প্রথমে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই রাজার ঝি'র মুখপানে তাকিয়ে শান্ত হয়ে যায়। এ সময় ক্লোজআপে রাজার ঝি'র মুখের অভিব্যক্তি এবং 'লীলা বালি লীলা বালি' গানটি ক্রমান্বয়ে নিম্নগ্রাম থেকে উচ্চগ্রামে ওঠা—প্রিয়জনকে হঠাৎ দেখার যে ক্রমোন্নত উচ্ছ্বাস তা ধরা পড়ে। আবার ক্যামেরার ফ্রেমে পাগলের মুখাভিব্যক্তি ধরার সময় একই গানের অসংহত প্রয়োগ, পাগল মনে স্মৃতির বিক্ষিপ্ত আগমন—যা আপন মনে অনুস্মরণ হয়েও হয় না বলে প্রতিভাত হয়। এমন করে শব্দের খেলায় ঋত্বিকের যে মুন্সিয়না তা তাঁর অন্য ছবিগুলোতেও লক্ষণীয়। 'অযান্ত্রিকে' বিনোদের গাড়িতে জল ঢালার সময় ইঞ্জিনের ঢক ঢক করে

পানি খাওয়ার শব্দের মাধ্যমে যন্ত্রের মধ্যে মানবিক অভিব্যক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। আলোচ্য সিনেমায়ও মালা বদলের পর আবদ্ধ ঘরে রাজার ঝি ও কিশোরের দৃষ্টি বিনিময়কালে বিক্ষিপ্ত ও দ্রুতলয়ে 'লীলা বালি' গানের ব্যবহারের মাধ্যমে দুজনের মনে ভয় মিশ্রিত মিলনের অধীর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। আবার সাগর কূলে উন্মত্ত স্রোত বিলীন হয়ে যাওয়ার শব্দের মতো রাজার ঝি'র নিঃশ্বাসের শব্দও প্রেমের উচ্ছ্বাসে কিশোরের হৃদয়কূল ছাপিয়ে অচেনা দুটি শরীরে বিলীন হয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। সত্যজিৎ রায় বলেছেন, 'প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যবস্তু, কথা ও ধ্বনির সাহায্যে ছবিতে যা বলা হল, তার উপরে সংগীতের প্রলেপ দিয়ে বক্তব্যকে আরো পরিস্ফুট বা আরো আবেগময় করার প্রয়োজন যদি পরিচালক বোধ করেন, তবেই তিনি আবহ সঙ্গীতের আশ্রয় নেন। অযথা আবহসঙ্গীতের ব্যবহার ছবির ক্ষতি বৈ উপকার করতে পারে না।'[৩৮] সত্যজিতের কথাকে যথার্থ মেনে নিয়ে বলা যায়, ঋত্বিক আবহসঙ্গীত ও শব্দযোগে এই সিনেমায় ডিটেল ব্যবহারের মুন্সিয়ানা দেখিয়ে অর্থপূর্ণ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত ছাড়া পাগল কিশোর রাজার ঝিকে চিনতে না পারলেও রাজার ঝি যে কিশোরকে চিনতে পেরেছে তার ইঙ্গিত চলচ্চিত্রে দেখতে পাওয়া যায়। উপন্যাসে রাজার ঝি'র সংলাপ ছিল– 'তবে চেষ্টা কইরা দেখতে পারি, আমি নিজে তার মনের মানুষ হইতে পারি কিনা।' —এতে বাসন্তীর সঙ্গে সে মশকরা করেছে বলে মনে হলেও চলচ্চিত্রে রাজার ঝি'র মনের গহীন হতে একরাশ বেদনা চোখের পানি হয়ে বেরিয়ে পড়ে। এতে পাগলের প্রতি তার যে অনুরাগ সিনেমায় দেখা যায়—স্বামী ছাড়া অন্য কারো প্রতি তা গড়ে ওঠার মানসিকতা থাকলে আট বছর ধরে একা একা কাটিয়ে দিয়ে, স্বামীর খোঁজে এতদূর আসত না। চলচ্চিত্রকার যাকে দেবীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন তাঁর এমন কলঙ্কিত রূপও দর্শকদের কাছে কাম্য হতে পারে না। তাছাড়া স্বামীর খোঁজে গোকর্ণঘাটে এলেও তাকে কখনো স্বামীর খোঁজ করার দৃশ্য সিনেমায় দেখা যায় না। এ থেকেও ধরে নেওয়া যায় রাজার ঝি ঠিকই স্বামীকে চিনতে পেরেছিল। এখানে চিনতে পেরেও সে কেন বিষয়টি কারো কাছে প্রকাশ করেনি এমন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এর জবাবে এমনটি ভাবা যায়, যদি পাগলকে সে তার হারিয়ে যাওয়া স্বামী বলে দাবি করত তাহলে মানুষ ভাবত আশ্রয়ের স্বার্থে সে এমনটি করছে। রাজার ঝির সামনেও সত্য প্রমাণের কোন পথ খোলা ছিল না। কেননা পাগল তাকে চিনতে পারেনি। তাছাড়া বিয়ের পর তাকে অন্য যে দুজন দেখেছিল সেই সুবল ও তিলকচাঁদ আট বছরের ব্যবধানে মারা গেছে। সিনেমায় এর প্রমাণ মেলে। উপন্যাসেও এরকম উল্লেখ আছে, 'এক সময়ে তিনজনে মিলিয়া প্রবাসে গিয়াছিল। সেখান থেকে আরেকজনকে লইয়া তারা ফিরিয়া আসিতেছিল। এই চারিজন এইভাবে আগে পিছে মরিয়া গেল' (তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ১০৪)। সুতরাং তার কথার সত্যতা যাচাইয়ের মতো কেউ ছিল না। আরও একটি ভয় ছিল পরিচয় জেনে গেলে ডাকাতে নষ্ট মেয়ে মনে করে সবাই যদি তাকে তাড়িয়ে দেয়। তখন অনন্তকে নিয়ে কোথায় আশ্রয় নিবে। তাই দূর থেকে ভালোবাসা ছাড়া তার সামনে আর কোন উপায় ছিল না।

বুড়ো বাবার অভাবের সংসার থেকে লুকিয়ে চাল, পেঁয়াজ, সব্জি নিয়ে অনাহারী অনন্তের খাবারের সংস্থানের উদ্যোগ ও মা কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বিদ্রোহীরূপ ধারণের মধ্যে যে উৎকণ্ঠা—তাতে বাসন্তীর মাতৃত্বের স্বরূপ ধরা পড়ে। তার এই জেদী মনোভাবের পিছনে মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও দীর্ঘদিন যাবৎ নিজের মধ্যে অবদমিত লিবিডোর তাড়না আক্রান্ত করেছে। তাই নিসংকোচে

বাবা মায়ের উদ্দেশ্যে তাকে বলতে শোনা যায়, 'একলা গতর আমার লুটাইয়া দিমু, বিলাইয়া দিমু, নষ্ট কইরা দিমু, যা মনে লয় তাই করুম। মনে কইরা দেহ কোনকালে বিয়া দিছিলা। মইরা গেছে, জানলাম না কিছু, বুঝলাম না কিছু। হেই অবুঝকালে ধম্মের কাঁচারাঁড়ি বানাইয়া থুইছে। পোড়া কপাল লইয়া বনেবনে কাইন্দা ফিরি, তোমরা কি বুঝবা আমার দুঃখের গাঙ কত গহীন। আমার বুঝি সাধ আহ্লাদ নাই' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ২৭)। কামনাকে অবদমন করতে অনন্তের মাঝে মাতৃত্বের স্বাদ নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা বাধাগ্রস্ত হওয়ার ফলে বাসন্তী নিজেকে সংবরণ করতে পারেনি। তাই জীবনকে উপভোগ করতে না পাড়ার খেদ বিস্ফারিত হয়ে পড়ে। এই লিবিডো তাড়িত করে রাজার ঝিকেও। তাকেও বলতে শোনা যায়, 'তুমি না কইছিলা বইন আমার একজন পুরুষ চাই। হ, চাই-ইত। পুরুষ ছাড়া নারীর জীবনের কানাকড়িও দাম নাই' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ২৯)। তবে রাজার ঝি'র মনে লিবিডোর বাইরেও পুরুষ কামনার অন্য কারণ ছিল নিরাপত্তা। সে নিরাপত্তা আর্থিক, সে নিরাপত্তা সামাজিক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ ছাড়া নারীর সে নিরাপত্তা নেই। সিনেমার একই দৃশ্যে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে—'পুরুষ কি বইন খালি এর-ই লাইগা? পরের ঘরে চাইয়া দেখ, সংসার চালায় পুরুষে। নারী হয় তার সঙ্গের সাথী। ...পাগলে কই কারে হারাইছে, তা আমি কি জানি। আমি কেবল জানি, একলা জীবন চলে না। পাগলেরে পাইলে তারে লগ কইরা জীবন কাটাই।' আরেক দৃশ্যে বাসন্তীর মা যখন লবচন্দ্রের বউকে বলে 'অইডা সোয়ামী না-ভেড়া'। প্রতিউত্তরে তাকে বলতে শোনা যায়, 'ভেড়া হোক পুতু হোক, অইডা আমার' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ৪৯)। তবে বাসন্তীর মাঝে নির্ভরতার কিংবা নিরাপত্তার ভয় নেই। তার মনে আছে দৃঢ়তা, একা একা লড়াই করার প্রত্যয়। পুরুষের প্রতি উচ্চকণ্ঠে সে বলতে পারে, 'এইডা আমার বাপের দ্যাশ, ভাইয়ের দ্যাশ, এইহানে আমি কোন বেডারে ডরাইয়া কথা কই না' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ৭১)। ঋত্বিক এই জায়গায় অদ্বৈতের সঙ্গে পুরোপুরি একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।

দোলের দিন রাজার ঝি কিশোরকে নিয়ে যায় তিতাসে স্নান করাতে। হঠাৎ পাগলের মনে ভাবাবেগ তৈরি হয়। সে তিতাসের পাড়ে দাঁড়ানো অনন্তের হাত থেকে আবির নিয়ে রাজার ঝি'র মুখে মেখে দেয়। এতে রাজার ঝি'র প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় পেয়ে তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে পাগল দৌড়াতে থাকে। ঘটনার আকস্মিকতায় রাজার ঝি অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পাগল তাকে নিয়ে দৌড়ে কিছুদূর যাওয়ার পর তার মুখের দিকে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কী ভেবে মাটিতে শুইয়ে পিছিয়ে আসতে থাকে। এমন সময় হোলি উৎসবে যোগ দেওয়া লোকজন পাগলকে বেদম মারতে থাকে। একসময় মরে গেছে ভেবে সবাই পালিয়ে যায়। পাগল পানি পানি বলে বিড়বিড় করতে থাকলে অদূরে পড়ে থাকা রাজার ঝি'র সংজ্ঞা ফিরে আসে। সে গড়িয়ে গড়িয়ে তিতাস পাড়ে গিয়ে আঁচল ভিজিয়ে জল এনে মুখে দেয়। এতে মুহূর্তের জন্য পাগল সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রাজার ঝিকে চিনতে পেরে বউ বলে সম্বোধন করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এতোদিনের তৃষিত হৃদয়ে ক্ষণিকের জন্য রাজার ঝি'র মনের অলিন্দে যে জোয়ার বয়ে গিয়েছিল মুহূর্তেই বেদনার নীল ছায়ায় তা ঢাকা পড়ে যায়। পুনর্বার কাছে পেয়ে হারানোর শোক সইতে না পেরে রাজার ঝি তিতাসের জলে দেহত্যাগ করে। ঋত্বিক এখানে তিতাস পারে দুজনের মৃত্যুকে টোটেম হিসেবে দেখিয়েছেন। যে তিতাস প্রজন্মের পর প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই তিতাস পারে রাজার ঝি'র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রকার মূলত তিতাসের মৃত্যুর ইঙ্গিত করছেন। এই মৃত্যুর মধ্য থেকে জন্ম নিবে আরেক সভ্যতা। মালোদের কাছে তিতাস মাতৃস্বরূপ। 'মাতৃপ্রতিমার অভিসন্দর্ভই যে ঋত্বিক-চলচ্চিত্রের

Dhaka University Institutional Repository

একটি মূল কথা তা চলচ্চিত্রমোদীদের অজানা নয়। নারী আদ্যাশক্তি-প্রজনন প্রতীক—এ ভাবনা যে প্রতিমা, ভাস্কর্য ও চিত্রে লক্ষ শিল্পী কোটিবার গড়েছে। হাতে টেপা পুতুল, মৃৎভাস্কর্য থেকে শুরু করে শাস্ত্রীয় ও লোকজ নিয়মের মাতৃকা ও নারী মূর্তিতে বাংলার পুরাতাত্ত্বিক ভাণ্ডার বিশাল। এ নারীর মৃত্যু হলে পৃথিবীর সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হবে—এই আদিভাবনা ঘিরে যে প্রত্নপ্রতিমা নির্মিত হয়েছে তারই পুনর্বয়ান কবুল করেছেন ঋত্বিক ঘটক।'[৩৯] তাই ঋত্বিক রাজার ঝিকে ভগবতী রূপে কল্পনা করেছেন। তিতাস জলের সংস্পর্শে তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নদী ও নারীর মাতৃরূপকে একই সুত্রে বিলীন করা হয়েছে। সমালোচকদের একদল এই দৃশ্যটিকে সমকালে অতিনাটকীয় অভিধায় আখ্যা দিয়ে প্রশ্ন রেখেছিলেন ঋত্বিক কেন অদ্বৈতের সঙ্গে দ্বিমত করে বাড়ি থেকে বের করে তিতাস পারে এনে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছেন। এতে অদ্বৈত এবং তাঁর তিতাসের অমর্যাদা হয়েছে। অন্যদল মনে করেন তাঁরা আসলে ঋত্বিকের মূল সুরটি ধরতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে ঋত্বিকের নিজের একটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে—'আমি প্রতি মুহূর্তে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বোঝাব it is not an imaginary story, বা আমি আপনাকে সস্তা আনন্দ দিতে আসিনি। প্রতি মুহূর্তে আপনাকে hammer করে বোঝাব যে যা দেখছেন তা একটি কল্পিত ঘটনা, কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে যেটা বোঝাতে চাইছি আমার সেই thesis-টা বুঝুন।'[৪০] ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাস থেকে সিনেমা করতে গিয়ে পুদভকিনকেও বিভিন্ন জায়গায় পরিবর্তন আনতে হয়েছিল। উপন্যাসে পাভেল জেল থেকে বের হয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে যায়। সেখানে তাকে দেখে মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে, 'এসেছিস...বাড়ি এসেছিস!'[৪১] গোর্কির পাভেল সামান্য চরিত্র নয়, সাড়া বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কথা বলা বিপ্লবীদের প্রতিনিধি। পুদভকিন সেই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পেড়েছেন। তাই তাঁর সিনেমায় মায়ের সাথে পাভেলের মিলনকে চার দেয়ালে বন্দি না রেখে উন্মুক্ত ময়দানে খোলা আকাশের বিশালতায় নিয়ে গেছেন।[৪২] ঋত্বিকের মাটি ও নদীকে মাতৃজ্ঞান করা এবং তাঁর মানসে পূর্ব থেকেই বিরাজিত 'আরকেটাইপ' ধারণা—এই ত্রয়ীর সম্মিলন ঘটিয়েছেন এখানে। রাজার ঝি, মাটি আর তিতাস নদীকে অভিন্ন সত্তা হিসেবে দেখানো হয়েছে সিনেমায়। ঋত্বিক বোঝাতে চেয়েছেন, অনন্তের কাছে তার মা যেমন, মালোদের কাছে তিতাস তেমন, কৃষক কাদের মিয়ার কাছে ফসলী জমিও একই রকম।

কখনও কখনও উপন্যাসের কাহিনি থেকে বের হয়ে এসে চলচ্চিত্রে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করার সাহস দেখিয়েছেন ঋত্বিক। এ বিষয়ে সমালোচকদের কটুকথাকে একেবারেই পাত্তা দিতেন না। ড. গুরুদাস ভট্টাচার্য সাহিত্য-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে চলচ্চিত্র-ব্যক্তিত্বের তুলনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের এবং নজরুলের সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের তুলনা করেছিলেন।[৪৩] বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের পথিকৃৎ মুহম্মদ খসরুর মতে এ তুলনা (নজরুলের সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের) যথার্থ নয়। 'বরঞ্চ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের সৃজনশীলতা এবং জীবনযুদ্ধের বহুবিধ কর্মকাণ্ডের যথেষ্ট সাযুজ্য পাওয়া যায়। দু'জনেই শিল্প সৃষ্টিতে কমিটেড। দু'জনই এলকোহলিক হয়ে পড়েন এবং পরবর্তী জীবনে মানসিক রোগ যন্ত্রণায় আক্রান্ত হন।'[৪৪] ঋত্বিকের ব্যক্তিগত জীবন আলেখ্যের দিক থেকে খসরুর মতামতটি গ্রহণযোগ্য। তবে গুরুদাস ভট্টাচার্য নজরুল-মানসের সঙ্গে ঋত্বিক-মানসের বিদ্রোহী সত্তার বিষয়টিতে আলোকপাত করেছেন বলে প্রতিভাত হয়। শিল্প সৃষ্টিতে তিনি কোন নির্দিষ্ট 'ধারা' বা 'বাদ' মানতেন না। নিজের মতো করেই চিন্তা করতেন, ভাঙতেন, গড়তেন। তাঁর নিজস্ব দর্শনই তাঁকে অন্যদের চেয়ে অনন্য করেছে।

মালো কৌমের বাস্তবতা ছাপিয়ে উপন্যাসের রামধনু খণ্ডে বিরামপুরের কৃষক সমাজের যে চিত্র উঠে এসেছে তা ঋত্বিকও সিনেমার স্বল্প পরিসরে বিধৃত করার চেষ্টা করেছেন। বুর্জোয়া সমাজের ফড়ে, ব্যাপারীরা বিরামপুরের কৃষক কাদের মিয়ার জন্য যেরকম শঙ্কার কারণ, মালোদের কাছেও একই রকম, আবার ম্যাক্সিকান সিনেমা *Redes*-এর জেলেদের কাছেও অনুরূপ। সবখানেই ব্যাপারীরা শুধু ঠকাতে চায়। তবে অদ্বৈতের তিতাসে বুর্জোয়াবাদ কিংবা পারলৌকিক ধর্ম নির্বিশেষে মানব সম্মিলনের উদাত্ত আহ্বান—মানবতাবাদ বিরাজ করে। উপন্যাসের বর্ণনায়:

> ফিরিবার সময় তাদেরই গাঁয়ের একজন মুসলমানের সঙ্গে পথে তার দেখা হয়। তারই মুখে কারবালার মর্মবিদারক কাহিনি শুনিতে শুনিতে বনমালী প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিয়াছিল। এর সঙ্গে আরও শুনিল তাদের প্রিয় পয়গম্বরের কাহিনি। সেজন বীরত্বে ছিল বিশাল, কিন্তু তবু তার আপন জনকে বড় ভালবাসিত। কাদির যেন সেই বিরাটেরই একটুখানি আলোর রেখা লইয়া বনমালীর কাঁধে দাড়ি ঠেকাইয়া চুপচাপ বসিয়া আছে। বনমালীর বড় ভালো লাগিতেছে। বাস্তবিক, যাত্রাবাড়ির রামপ্রসাদ, বিরামপুর গাঁয়ের এই কাদির মিয়া—এরা এমনি মানুষ, যার সামনে হোঁচট খাইলে হাত ধরিয়া তুলিয়া অনেক কাঁটাঘেরা পথ পার করাইয়া দিবে। আবার দাড়ির নিচে প্রশান্ত বুকটায় মুখ গুঁজিয়া, দুই হাতে কোমার জড়াইয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিলেও ধমক দিবে না, কেবল অসহায়ের মত পিঠে হাত বুলাইবে' (তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ১০৭)।

ঋত্বিকের চলচ্চিত্রেও উপন্যাসের এই বর্ণনার সারকথা তুলে ধরা হয়েছে। কাদির মিয়ার বিপদে বনমালীর ছুটে যাওয়া, গোকর্ণঘাটের বাজারে মহরমের লাঠি খেলা দেখে ফেরার সময় কাদির মিয়া বনমালীকে কারবালার বৃত্তান্ত শোনানোর কথা সিনেমায় উল্লেখ আছে।

অনন্তের কল্পনায় মা তার সামনে কাক হয়ে আসে, কখনো ভগবতী রূপে ধরা দেয়। বাসন্তী তাকে মাতৃস্নেহে লালন করলেও মায়ের অভাববোধ সে ভুলতে পারে না। ঘর ছেড়ে বিবাগি হয়ে হাটে গিয়ে আলু কুড়ায়। বনমালির মুখে স্নেহমাখা কথা শুনে তার সঙ্গে নায়ে করে চলে যেতে চায়। মা ছাড়া এই অবুঝ বালকের নিকট সকলের স্নেহই সমগুরুত্বপূর্ণ। তাই জনম জ্যাঠা (উপন্যাসে ধনঞ্জয়) নৌকায় উঠতে বাধা দিলেও অনন্ত জোর করে নৌকা আঁকড়ে থাকতে চায়। শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে না পেরে পানিতে পড়ে যায়। এসময় একগুচ্ছ কচুরিপানা তার পাশ দিয়ে ভাসতে ভাসতে 'ফ্রেম আউট' হয়ে যায়। মাকে হারিয়ে অনন্ত অনেকটা পানিতে পড়ে যাওয়ার মতোই এবং তার পরবর্তী জীবন যে এই কচুরিপানার মতোই ভাসতে থাকবে চলচ্চিত্রকার এই দৃশ্যে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। উপন্যাসেও তার অন্ধকার ভবিষ্যতের একটা ইঙ্গিত আছে, 'বুকভরা একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া অনন্ত ডাঙ্গায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চারিদিক অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না' (তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ১১৬)। উপন্যাসের বর্ণনায় রাত থাকলেও যে বিশেষ ইঙ্গিতের জন্য রাতের কথা বলা হয়েছে চলচ্চিত্রকার তা দিনের আলোয় কচুরিপানার রূপকে বর্ণনা করতে সমর্থ হয়েছেন।

বুড়ো বাপের রোজগারের উপর মা-মরা উটকো ছেলের আশ্রয়কে বাসন্তী মাতৃসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলেও তার মা কিছুতেই মেনে নেয় না। সে অনন্তের মৃত্যু কামনা করে, অভিশাপ দেয়। এতে বাসন্তী ক্ষিপ্ত হয়ে বলে— 'এইডা মরব কোন দুঃখে হুনি? এইডা মরব কোন দুঃখে? আগে আমি মরি। আমি ঘরের বাইর অই' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ৪২)। শ্রাদ্ধশান্তির রাতে অনন্ত বাসন্তীর সাথে ঘুমাতে গেলে পরম মমতা দিয়ে সে অনন্তকে মায়ের সম্বন্ধে বলে, 'মা মরলে সেই মা

Dhaka University Institutional Repository

আর মা থাহে না, শত্তুর হইয়া যায়। মইরা যেইহানে যায় পোলাডারে সেইহানে লওনের চেষ্টা করে। তার আত্মাডা চারপাশে ঘুইরা বেড়ায়। একা পাইলে, কিংবা আন্ধারে, নইলে বট বা হিজল গাছের তলায় পাইলে, নাইলে ঘাটে পাইলে, কাছে কেউ না থাকলে লইয়া যায়। লইয়া মাইরা ফালায়' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ৪৬)। কিন্তু অনন্ত বিশ্বাস করে তার মা এমন নয়। মা তাকে মেরে ফেলতে পারে না। অনন্তের কাছে সে আসে ভগবতী রূপে। অনন্তের মন থেকে সঞ্চারিত হয়ে বাসন্তীর কল্পনায়ও রাজার ঝি ভগবতী রূপে ধরা দেয়। সিনেমায় বারবার আর্কেটাইপের সঞ্চরণ প্রসঙ্গে সমালোচক মনে করেন—'ঋত্বিকের ছবি একটানা দেখতে দেখতে ক্লান্তিকর মনে হতে পারে দর্শকের, ...একই থিমের বারবার ফিরে আসার যে কী অর্থ তা আপাতত তাঁর কাছে স্পষ্ট নাও হতে পারে। ...এখানে ঋত্বিক মিথ এবং আর্কেটাইপ মিলিয়ে দিয়েছেন, পুরাণ হয়ে উঠেছে সামষ্টিক স্বপ্ন, কৌম অবচেতন থেকে ওঠে এসেছে বলেই তা ভাষ্যের মুখাপেক্ষী।'[৪৫]

বাইরে ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়। এই ঝড় যে অনন্তের জীবনের উপর দিয়ে আরেকবার বয়ে যাবে তা বোঝা যায় পরবর্তী দৃশ্যে কাকের উড়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। মিথ অনুসারে কাক অশুভের প্রতীক। উপন্যাসে বর্ণনা না থাকলেও ঋত্বিক বিভিন্ন রূপক এবং প্রতীকের ব্যবহারে ঘটনার আভাস দিয়েছেন। এরপর লংশটে তিনটি মটকি দেখা যায়, দূরে একজন লোক বৃষ্টিতে ভিজে হেটে যাচ্ছে; পরের শটে তিনটি হাঁস বৃষ্টির মধ্যে নদীতে সাঁতার কাটছে—এগুলো দেখে মনে হতে পারে অনর্থক সময় ক্ষেপণ। মনে হতে পারে মূল ঘটনা কোথাও আটকে গেছে। ঋত্বিক বলেছেন, "ফিল্মকে 'চলচ্চিত্র' বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। চলচ্চিত্রকে রেখাঙ্কিত করার জন্য গতিহীন বিষয়ের প্রতিও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কোথাও ক্ষণিক বিরাম, কোথাও নিশ্চলতা সিনেমায় প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি করে। কখনও-কখনও সম্পূর্ণ অনাটকীয়তা পরবর্তী নাটকীয় মুহূর্তের দ্যোতনা এনে দেয়।"[৪৬] এগুলো সাহিত্যের বিরামচিহ্নের মতোই কাজ করে। এর পরের দৃশ্যেই দেখা যায়, বাসন্তীদের বাড়িতে অনন্ত যে ঘরে থাকত ঝড়ে সেটি পড়ে গেছে। এই ঘর পড়ার মধ্য দিয়েই অনন্তের নীড় হারানোর অধ্যায় শুরু হয়। সেদিন বাড়ি ফিরলে মাসি সস্নেহে অনন্তকে খেতে দেয়, তা দেখে বাসন্তীর মা চুলা থেকে মুঠভর্তি জ্বলন্ত আগুনের পাটকাঠি নিয়ে অনন্তের উপর হামলে পড়ে। বাসন্তী বাধা দিলে দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বাসন্তী মায়ের গলা টিপে ধরে মাটিতে ফেলে দিয়ে বুকের উপর বসে আক্রোশ মিটাতে থাকে। উঠোন ভর্তি মানুষ এই এই দৃশ্য উপভোগ করলেও কেউ থামাতে আসে না। কারণ এটি মালো পাড়ায় নৈমিত্তিক ঘটনা। মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়ার স্বচ্ছ বর্ণনা উপন্যাসে না থাকলেও ব্রাত্য কৌমের এই নিত্য অনুষঙ্গটি চলচ্চিত্রকার তুলে ধরেছেন। চলচ্চিত্রে এই ধরনের নাটকীয়তা প্রয়োগে ঋত্বিক ছিলেন সিদ্ধহস্ত। 'নাট্যকথা'র বিশেষ সংখ্যায় 'ঋত্বিকের চলচ্চিত্রে নাট্যভাবনা' প্রবন্ধে শংকর কুণ্ডু যথার্থই বলেছেন, 'নাটক, নাটকীয়তা, নাট্যকল্প দৃশ্যাবলী তাঁর ছবিতে বার বার এসেছে আচম্বিতে নয়– ইচ্ছাকৃতভাবে ও সচেতনভাবেই তিনি এনেছেন– চলচ্চিত্রকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্যে, বিষয়ের অর্থব্যঞ্জনা বৃদ্ধির কারণে।'[৪৭]

মারামারি থেমে গেলে অনন্ত বাড়িতে ফিরে দেখে সব কিছু আর আগের মতো নেই। এই দৃশ্যেও অশুভের প্রতীক কাকের ব্যবহার করা হয়েছে। মাসি রুদ্রমূর্তি ধারণ করে অনন্তকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে। মাসির এই আচরণে সে হতবিহ্বল হয়ে ছুটে যায় তিতাসের পাড়ে। বাসন্তীও পিছু পিছু তিতাসের পাড়ে ছুটে আসে। চলচ্চিত্রকারের দৃষ্টিতে তিতাস সবকিছুতেই অনিবার্য অনুষঙ্গ। তাই

কিশোর ও রাজার ঝি'র মৃত্যুর জন্য যেমন তিতাস পাড়কে বেছে নেয়া হয়েছে, তেমনি অনন্তের টানে বাসন্তীকেও তিতাসের জলে নামিয়েছে। উপন্যাসে কিশোর ও ঠাকুর ঝি যেমন বাড়িতে মারা গিয়েছিল তেমনি অনন্ত বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার সময় বাসন্তী বাড়িতেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল—'সুবলার বউ আর স্থির থাকিতে পারিল না। উঠিয়া হাত বাড়াইয়া স্খলিত কণ্ঠে ডাকিল, অনন্ত! অনন্ত ফিরিল না। সুবলার বউ পড়িয়া যাইতেছিল। তার মা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ধরিল। মার বৃদ্ধ বুকে মাথা রাখিয়া সুবলার বউ এলাইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুইটিও বুজিয়া আসিল' (তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ১২৪)। মালোদের সুখ দুঃখ যে তিতাসের সাথে মিলে মিশে একাকার তা-ই চলচ্চিত্রকার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। তিতাসই তাদের আশ্রয়। তাই বাড়ি থেকে বের হয়ে অনন্ত তিতাসেই ছুটে এসেছে আশ্রয়ের খোঁজে।

বাসন্তীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ক্ষুধা পেলে ঠিকই অনন্ত ছুটে আসবে বাড়িতে। কিন্তু চারদিনেও তার দেখা মিলল না। লবচন্দ্রের বউয়ের কাছে যখন শুনতে পায় রাতে তার বাড়িতে এসে অনন্ত খেয়ে গেছে তখন বাসন্তীর মনে নিদারুণ কষ্ট জেগে ওঠে। রাতে মুংলি এসে বাসন্তীকে ডেকে নিয়ে যায় অনন্তকে দেখানোর জন্য। সেখানে গিয়ে দেখে অনন্ত লবচন্দ্রের বউ উদয়তারার ঘরের বারান্দায় বসে নিবিষ্টমনে খাচ্ছে। তাদের দেখেও অনন্তের কোন ভাবান্তর হলো না। এতে বাসন্তীর হৃদয়ে সরোদের ঘায়ের মতো আঘাত হানে। সঙ্গীতের অভিঘাতে মানব মনের স্বরূপ উন্মোচন করার মতো শৈল্পিক সত্তা চলচ্চিত্রকার দেখিয়েছেন এই দৃশ্যে যন্ত্রসঙ্গীত ব্যবহারের মাধ্যমে। 'সিনেমায় কখনও অভিনয় গুরুত্ব পায়, কখনও দৃশ্যকল্প, কখনও নাটকীয় উপাদান, আবার কখনও সংগীত বিশেষ মূল্য পায়। সঙ্গীতের মাহাত্ম্য অধিকাংশ দর্শকই বোঝেন না।'[৪৮] ঋত্বিক সঙ্গীতকে সিনেমাভাষার এক অপরিহার্য উপাদান মনে করতেন। জীবনভর তিনি শিল্প অন্বেষণ করে গেছেন। অনন্তকে এই অবস্থায় দেখে বাসন্তীর মনের কষ্ট শৈল্পিকভাবে প্রকাশ করেছেন নিদারুণ আবহ সঙ্গীতের মূর্ছনায়। অনন্ত খাওয়া শেষ করে কোন কথা না বলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বাসন্তীর সামনে দিয়ে স্বার্থপরের মতো চলে যায়। স্বার্থের সংঘাত শিশুমনেও কি বিরাট প্রভাব ফেলে অনন্তের মাঝে তা মূর্ত করেছেন ঋত্বিক।

উদয়তারা অনন্তকে নিয়ে বনমালীর সঙ্গে বাপের বাড়ি যাবে বলে নৌকায় ওঠে। বনমালীকে দেখে অনন্তও খুশিমনে তার সঙ্গে যেতে রাজি হয়। মাত্র কদিনের খাবার দেয়ার বদৌলতে অনন্তের কাছে উদয়তারাও আপন বনে গেছে। অনন্তকে নিয়ে উদয়তারা নৌকায় বসে ছড়া কাটছে এমন সময় বাসন্তী সামনে এসে হাজির। পাশে একজন কাপড় কাঁচছিল। অনন্তকে উদয়তারার সঙ্গে চলে যেতে দেখে কাঠের পাটাতনে কাপড় কাঁচার শব্দের মতো বাসন্তীর বুকের ভিতরও হাতুড়িপেটা করে। বাসন্তীর হয়ত ক্ষীণ আশা ছিল, তাকে দেখে অনন্ত মাসী বলে আবেগে চিৎকার করে উঠবে, নয়তো নীরবে পাশে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু তাকে দেখে অনন্ত উল্টো নৌকার ছইয়ের ভিতর চলে যায়। বাসন্তীর বুকের কষ্ট এবার ক্রোধের আগুন হয়ে চোখে ফুটে ওঠে। মুখ দিয়ে শুধু বেড়িয়ে আসে—'কুত্তা'। অনন্তকে পেয়ে বাসন্তীর মনে যে মাতৃত্ব জেগে উঠেছিল, অতীত ভুলে নতুন করে বাঁচার যে স্বপ্ন দেখেছিল তা এই তিতাসের পাড়েই শেষ হয়ে গেল। বুকের ভিতরে জমাট কান্না কষ্টের তীব্রতায় চোখের জলে গড়িয়ে না পরলেও আকাশ ভেঙে অঝোর ধারায় বৃষ্টির দ্যোতনাকে চলচ্চিত্রকার এখানে ডিটেল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বাসন্তীর মন যে একটা জায়গায় স্থির হয়েছিল অনন্তকে হারিয়ে তা

আবার অনাবিষ্ট হয়ে পড়ে। ঘাটে বাধা একটা নৌকা হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে নদীতে ভেসে চলে যাওয়ার দৃশ্যবর্ণনার রূপকে ঋত্বিক এই বিষয়টিকে সিনেমায় বোঝাতে চেয়েছেন। অনন্তের সঙ্গে বাসন্তীর বিরহ-বিদায়ক্ষণ, তার মনের ভিতরকার সুতীব্র বেদনা দর্শকদের সামনে ঋত্বিক যেভাবে চাক্ষুষ করেছেন—উপন্যাসের বর্ণনায় সেরকম দেখা যায় না। অদ্বৈতের উপন্যাসে এর হালকা বর্ণনা পাওয়া যায়, 'নারীদের দলে গিয়া সুবলার বউও দাঁড়াইল। দেখিল দুইজনেই মহা খুশি। উদয়তারা মাঝে মাঝে ছড়া কাটিয়া রঙ্গ করিতেছে আর অকৃতজ্ঞ কুকুরটা (অনন্ত) খুশি মনে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছে' (তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ১২৭)।

মালো পাড়ার মেয়েরা উরুর সাথে টেকো ঘুরিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে সুতা পাকায়। তা দেখার জন্য তেলিপাড়ার এক লোক মালোপাড়ায় ঘুরঘুর করে। বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলে। তা বুঝতে পেরে মালোরা তাকে মেরে নৌকায় তুলে বার-গাঙ্গে ভাসিয়ে দেয়। উপন্যাসের বর্ণনায়, 'লোকটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করিতে শুরু করিল, তখন মেয়েদের কান খাড়া হইল। সুবলার বউ দলের পাণ্ডা হইয়া একদিন রাত্রে তাকে ডাকিয়া ঘরে নিল, আর বাছা বাছা জোয়ান মালোর ছেলেরা তাকে গলা টিপিয়া মারিয়া, নৌকায় তুলিয়া বার-গাঙ্গে নিয়া ছাড়িয়া দিল। স্রোতের টানে সে কোথায় চলিয়া গেল, কেউ জানিল না' (তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ১৩০)। এই খবর মালোপাড়ার বাইরে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু মালোপাড়ার তামসীর বাপের মারফতে তেলিরা জেনে গেল। এর বদলা নিতে বামুন, সাহা, তেলি, নাপিত, নব জাত মিলে গোপন বৈঠক করল। এতে রজনী পালের প্রস্তাব ছিল, তার মামা সমবায় ঋণদান সমিতির ফিসারী শাখার ম্যানেজার বিধুভূষণ পালকে দিয়ে শিক্ষা দিবে। কারণ মালোরা ইতোমধ্যে সমিতি থেকে ঋণ করে খেয়ে ফেলেছে—যা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে আসলে ফুঁলে ফেপে উঠেছে। কিন্তু ঋত্বিক চরিত্র সংকোচনের জন্য এখানে তেলিপাড়ার ঐ যুবকের পরিবর্তে ঋণদান সমিতির ফিসারী শাখার ম্যানেজার হিসেবে মানিক কুণ্ডু নামে একজনকে মালোপাড়ায় ঘুরঘুর করতে দেখিয়েছেন। যাকে বাসন্তী ঘরে ডেকে নিয়ে মুংলি ও কালুর মার সহায়তায় উত্তম-মধ্যম দিয়ে চ্যাংদোলা করে তিতাসে নিক্ষেপ করে। আর বিধু নামে সিনেমায় এক মাতব্বরের চরিত্র দেখা যায়। তবে এখানে কালুর মার মতো প্রভাবশালী মহিলাকে হঠাৎ করে এ কাজে অন্তর্ভুক্ত করায় দর্শকের মনে খটকা জাগতে পারে। সিনেমায় কৌমের ভিতর বাইরে যত প্রতিবাদ হয়েছে তার সবই নারীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। তাই বহিঃশত্রুর মোকাবেলায় কৌমের নারী প্রধান হিসেবে কালুর মার উপস্থিতি চলচ্চিত্রকারের কাছে আবশ্যিক মনে হয়েছে। ঋত্বিক বলেছেন, 'কোনো সাহিত্যকর্মের ভেতরে সম্পূর্ণ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়ে তাকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ধ্যান করে আমার মনের মধ্যে যে আবেগ এবং যে প্রকাশবাঞ্ছা সতত সঞ্চরমাণ হতে থাকত তাকে আমার চিত্রকর্মে প্রকাশ দিতে গিয়ে সেটা আমার নিজস্ব শিল্পকর্ম হয়ে উঠত।'[৪৯] তাই ঋত্বিক তার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র মালোদের দিয়ে কোনপ্রকার হত্যাকাণ্ড ঘটাতে চাননি। সিনেমায় মালো পুরুষদের মধ্যে তমসীর বাপকে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল দেখা গেছে। মালোসমাজের বিরুদ্ধে যখন অন্যরা উঠে পড়ে লাগে তখন তমসীর বাপ তাদের দোসর হয়ে কাজ করে। মালোদের ধ্বংসের নেপথ্যে সবচেয়ে বেশি যে অনুষঙ্গটি কাজ করেছিল, সেই মালো সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করার পরামর্শ তামসীর বাপই অন্য সমাজের লোকদের দিয়েছিল। তার কথা অন্যদের মনে ধরে। মালো পাড়ায় যাত্রার পাঠ বসিয়ে, তবলা হারমেনিয়াম বাজিয়ে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে হত্যার চক্রান্তে বিধু মাতব্বর খুশি হয়ে বলে, 'যাত্রা দিয়া অন্তরে মারো' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ৫৯)। তবে সিনেমায় বিধু মাতব্বর মালোদের শুধু অন্তরে

মারার সিদ্ধান্তেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, মাগন সর্দারকে আদালতে গিয়ে হাত করতেও দেখা যায় মামলা করার জন্য।

তিতাস শুধু মালো পাড়ার সুখ দুঃখের কথাই বলে না। এর অববাহিকায় প্রতিটি পাড়া-গাঁয়ের সুখ দুঃখের গাথা এই তিতাস। তাই উপন্যাসেও যেমন মালোপাড়া ছাড়িয়ে তিতাস পাড়ের অন্য গাঁয়ের সাতকাহন বর্ণিত হয়েছে, চলচ্চিত্রেও তা চিত্রিত হয়েছে। বিরামপুরের কাদের মিয়া, উজানচরের মাগন সর্দার অধ্যায়টি চলচ্চিত্রকে মালোসমাজের একেবারে বাইরে নিয়ে গেছে। ঋত্বিক বলেছেন, 'সব শিল্পই দু'রকম ভাবে করা যায়। একটা হচ্ছে খবরের কাগুজে শিল্প। সেটা করতে পারতাম। আরেকটা হচ্ছে উপন্যাস—যেটা Lasting Value। সেটার জন্য থিতোতে দিতে হয়। নিজের মাথার মধ্যে অভিজ্ঞতা খরচা করতে হয়। Time দিতে হয়—ভাবতে হয়। It take two-three years, four years and then only you can make such a film, otherwise you cannot be honest. তুমি খবরের কাগুজেপনা করতে চাও করতে পারো। আমি খবরের কাগুজে নই। আমি অনেক গভীরে ঢোকার চেষ্টা করি।'[৫০] ঋত্বিক তিতাস অববাহিকার জীবনযাত্রা বুঝতে দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুতি নিয়েছেন। চষে বেড়িয়েছেন অন্ত্যজ জীবনের মূল আস্বাদনের জন্য। তাই ধীবর সমাজের বাইরে সহজ সরল জীবনেও সততা, বিশ্বাস, আশা, ভালোবাসা, স্বার্থ সংঘাতের বিষয়গুলো শিল্প ও মানবতায় সংবেদনশীল ঋত্বিক গভীর থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'মানুষকে ভালবাসি আমি পাগলের মতো। মানুষের জন্যই সবকিছু। মানুষই শেষ কথা। সব শিল্পেরই শেষ পর্যায়ে মানুষে পৌঁছতে হয়।'[৫১] উজানচরের মাগন সর্দার মিথ্যা মামলা দিয়েছে বিরামপুরের কাদের মিয়ার বিরুদ্ধে। এই খবর ঘরের দাওয়ায় বসে ছেলে ছাদির মিয়ার কাছে বলার সময় ঘরের ভিতর থেকে কাদের মিয়ার বিয়াই নিজামুদ্দি মুহুরি বের হয়ে আসে। মেয়েকে নাইয়র নিতে এসেছিল সে। কাদির মিয়ার শব্দ পেয়ে ঘরে গিয়ে লুকিয়ে পরেছিল। কারণ সে কাদিরকে ভয় করে। কাদিরও তাকে পছন্দ করে না। কিন্তু বিয়াইর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা হয়েছে শুনে সে আর লুকিয়ে থাকতে পারেনি। সে কাদেরকে অভয় দিয়ে সাহায্য করতে চায়। কিন্তু কাদের আদালতে না গিয়ে মাগন সর্দারের বিবেকের কাছে নালিশ করে। সে বিবেকের রায়ে নারিকেল গাছ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করে। উপন্যাসের বর্ণনায় জানা যায়, মাগনের সাথে একই পথের পথিক দোলগোবিন্দ সাহা ইহজগতে নাই শুনে তার মধ্যে এক ধরনের অনুশোচনা কাজ করেছিল। কারণ, দোলগোবিন্দও তার মতো ঘুষ খেয়ে, লোক ঠকিয়ে পয়সা কামিয়েছে। সে মরে গেছে জেনে মাগনের মনের ভিতরও মৃত্যুচিন্তা কাজ করেছে। কিন্তু সিনেমায় এইরকম কোন ইঙ্গিত না দিয়ে মাগন সর্দারের আকস্মিক মৃত্যুতে অনেকে এর কঠোর সমালোচনা করেছেন। সিনেমায় কাদির মিয়া যখন মাগনের উপর আক্রমণ না করে ভাল হয়ে যাবে এমন শর্তে নিজের সকল ক্ষতি মেনে নিয়ে মাগনকে নিজের ক্ষতি করার সুযোগ দিয়ে বলে– 'তাই অউক মাগন সর্দার। আমি সইয্য কইরাই যামু, তোমার কোন ভয় নাই, তুমি নির্ভয়ে মামলা কইরা যাও, কোন সাক্ষীসাবুদ খাড়া করুম না, সব মাইনা লমু, ডিক্রির পর নগদ না থাকে জমিন বেইচ্যা দেনা শোধ করুম। তবুও তুমি ভাল হও' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ৬৩)। মাগনকে ভাল হওয়ার সুযোগ দিতে গিয়ে কাদের মিয়া তার সকল ক্ষতি সহ্য করার সরল ওয়াদা এতটাই মাগনের মনস্তত্ত্বের ওপর অভিঘাত এনেছিল যে তা সে নিজেই সহ্য করতে পারেনি। সিনেমায় মাগনের চোখে-মুখে যে অনুশোচনা ফুটে উঠেছে তাতে ভিতর থেকে মাগনের নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অভিব্যক্তিটি ধরা

পড়েছে। তাছাড়া নারিকেল গাছের ভগ্ন মাথার দিকে ক্যামেরা 'টিল্ট আপ' করে স্থির হয়ে যাওয়া শটের মাধ্যমে চলচ্চিত্রকার তার ভগ্ন হৃদয়ের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

দীর্ঘদিন ধরে ছাদির মিয়ার দৌড়ের নৌকা বানানোর প্রস্তাবে কাদির মিয়া রাজি হয়ে টাকা দেয়। বাবার খোশ মেজাজ দেখে ছেলে রমুকে মক্তবে পাঠানোর ইচ্ছাও পোষণ করে। এতে কাদের মিয়া বলে, 'ইস্কুলে পাঠাইলে তোমার হউরের মতো মুহুরী অইবো, মানুষ অইবো না' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ৬৫)। কাদির মিয়া মুহুরীকে শুধু ঘুষ খাওয়া আর মানুষের সাথে ছলনা করা ছাড়াও দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য ঘৃণা করে। কারণ সে নিজে সন্তানদের দিকে তাকিয়ে পুনর্বিবাহ করেনি। উপন্যাসে কাদিরের মনে উপলব্ধি হয় যে, বাপের অপকর্মের দায়ে মেয়েকে শাস্তি দেয়া উচিত নয়। নিজের মেয়ে জমিলার কথাও মনে পড়ে কাদিরের। তাই সে ভাবতে থাকে তার মেয়েকেও যদি এভাবে শ্বশুর বাড়িতে দোষী করা হয়। সিনেমায় কাদিরের এই ভাবনাকে খুশির সংলাপে প্রকাশ করা হয়েছে। মুহুরীর কাছে খুশি যেমন, কাদিরের কাছে জমিলাও তেমন। কারণ দুজনেই পিতা। শেষে রমুকে মক্তবে দিতে রাজি হয়। কিন্তু শর্ত দেয় মিথ্যা কথা বলা, চুরি শিখা কিংবা পরকে ঠকানো শিখলে এর দায় ছাদিরকে নিতে হবে। কাদির মিয়া এখানে সততার প্রতীক। ঋত্বিক কোন প্রথা বা 'ইজম' মানতেন না। 'ফর্ম'-এও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি তিনটি বিষয়কে আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা করতেন 'সত্যম-শিবম-সুন্দরম'। 'সত্যম' হচ্ছে শিল্পের প্রতি সৎ থাকা; যা তিনি কখনোই আপোস করেননি। 'শিবম' হচ্ছে যা কিছু শাশ্বত তাকে ধারণ করা; তাঁর সব ছবিতেই এই শাশ্বত জীবনের শেকড়ের কথা আছে। আর 'সুন্দরম' হচ্ছে সেই সৌন্দর্য যা স্থান-কাল ভেদে পরিবর্তনশীল এবং গ্রহণযোগ্য; তাই তিনি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে কখনো ডিঙ্গিয়ে যেতে চাননি।

নদী তীরবর্তী মানুষদের সবচেয়ে বড় উৎসব নৌকাবাইচ শুরু হয় তিতাসের বুকে। সিনেমায় একে যেন জলচিত্র হিসেবে এঁকেছেন ঋত্বিক—অদ্বৈত যেমন ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার চোখ দিয়ে তিতাসকে দেখেছেন। ঋত্বিক তেমনি তিতাসপাড়ের জনজীবনের সঙ্গে মিশে গিয়ে ছবি তৈরি করেছেন। জীবনের সঙ্গে তিনি যেমন আপোস করেননি, শিল্প-সৃষ্টিতেও তাঁকে আপোসকামী হতে দেখা যায়নি। মন-প্রাণ উজাড় করে দিয়েছেন শিল্প-সৃষ্টিতে। এমনকি আলোচ্য সিনেমায় অসুস্থতা নিয়েও কাজ চালিয়ে গেছেন নিরলসভাবে। শিল্প-সৃষ্টিতে তাঁর মাঝে ছিল শুধু শ্রমসাধনা। ঋত্বিকের সঙ্গে মুহম্মদ খসরুর প্রথম সাক্ষাতে খসরুকে উদ্দেশ্য করে বলা একটি উক্তিতে তাঁর এই রূপটি ধরা পরে—'কিরে হারামজাদা তোর পকেটে তিনটে কলম কেন। আঁতেলীপনা, যাও কবিতা লেখ গিয়ে, ফিল্ম করতে এসো না। ফিল্ম করতে এসে ওসব আঁতেলীপনা চলে না, শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়। বুক-জলে দাঁড়িয়ে শুটিং করতে হয়, বুঝলে?'[৫২] নৌকাবাইচের সময় অনন্তের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় বাসন্তীর। দীর্ঘদিন পর অনন্তকে পেয়ে বাসন্তী আপ্লুত হয়ে পড়ে। অনন্তও মাসীর স্নেহ পেয়ে কাতর হয়ে যায়। উদয়তারার কাছে তা ভাল লাগেনি, তার কথায় অনন্তের অতীত মনে পড়ে যায়। সে চলে যেতে চাইলে বাসন্তী বলে 'তুইও পর হইয়া গেলি অনন্ত?' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ৬৬)। একথায় অনন্ত বাসন্তীকে আঘাত করে বলে– 'আপন তোমার কোনো কালেই আছিলাম না। মা যদ্দিন আছিল, আদরও আছিল, মা মইরা গেল, তোমার আদরও ভাইগ্যা গেল' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ৬৬)। এতে বাসন্তী আর নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে অনন্তের চুলের মুঠি টেনে ধরে মারতে থাকে। তা

দেখে উদয়তারা ও বনমালী এসে বাসন্তীকেও বেদম মারে। মার খেয়ে বাসন্তী বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বাসন্তীর একটাই উপলব্ধি হয়, এই সংসারে মা-ই সত্য, আর কিছু নাই।

বাসন্তীর মার খাওয়ার খবর অন্য পাড়ার লোকেরাও জেনে যায়। লজ্জায় বাসন্তীও ঘরের বাহির হয় না। যুবকরা তার ঘরে উঁকি দেয়। তামসীর বাপের বাড়িতে যে বামন, কায়েত, শিক্ষিত লোকেরা তবলা বাজাতে আসে—যাদের কথা মালোদের কাছে ব্রহ্মার লেখন, তারা বাসন্তীর নামে বাজে কথা বলে বেড়ায়। কিন্তু বাসন্তী এসব কথায় দমে যায়নি। তাই দৃপ্ত কণ্ঠে মুংলিকে উদ্দেশ্য করে তাকে বলতে শোনা যায়, 'এই গেরামের মাইয়া আমি। বিয়া অইছে এই গেরামে। আমি নি ডরাই এই বাজাইরা লোকগো।...আমি হগ্গোল পারি, আর কিছু না পারি, আগুন লাগাইয়া গাও জ্বালাইয়া দিবার পারি' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ৬৮)। বাসন্তী বিদ্রোহী নারী। মালো সমাজে যারা আগে উচিত কথা বলত তারাও বহিঃসংস্কৃতির প্রভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। যারা মালোসংস্কৃতি ধরে রেখে প্রতিবাদ করতে চেয়েছে তাদেরকে বিভিন্ন উপায়ে অবদমন করে রাখা হয়েছে। কিন্তু বাসন্তী সবার সামনে উচ্চকণ্ঠে বলতে পারে, 'দশজনের কাছে জিগাই এর কি কোন বিহিত নাই? গাঁয়ের মধ্যে মা-বোনের কাপড় ধইরা টান দিব, মালু সমাজের গায়ের রক্ত কি তিতাসের জল অইয়া গেছে?' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ৬৯)। রামকেশবের মতো লোকও নিরুপায় হয়ে পড়েছে। তাই সে মালোদের ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করতে পেরে বলে– 'মালোগ একতা গেছে, ভিতর থেইক্যা সব পইচ্যা গেছে, ইহাগর নিস্তার নাই' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ৬৯)। উপন্যাসের রামপ্রসাদ মালোদের যূথবদ্ধ একতার সময় সাহসী কণ্ঠে জমিদারদের বলতে শোনা গিয়েছিল, 'শুন ব্যাপারি, বাবুকে সাপ কইয়া দিও, মালোরা মাছ বেচতে কোন মাশুল দেয় না, দিবেও না। জায়গা দেউক আর না দেউক। মালোরা বাজার জমাইতে যেমুন জানে, ভাঙতেও জানে।' সিনেমায় রামপ্রসাদকে কখনওই প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি। শুধুমাত্র অনন্তের মায়ের থাকার মত গুরুত্বহীন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দশজনের বৈঠকে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। সিনেমার শেষে মোহনকে সঙ্গে নিয়ে জমি দখলের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময়ও তার মধ্যে কোন প্রতিবাদী মনোভাব দেখা যায় না। বরং অন্যরা যখন জমি দখলে ব্যস্ত তখন যতটুকু সম্ভব নিতে পাড়ার মতো দখল করতে গিয়ে অন্যদের হাতে মার খেয়েছে। তা-ও মালো গোষ্ঠী পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর। পুরুষের নিঃস্পৃহতায় নারীকে সিনেমায় চালিকা শক্তি হিসেবে দেখা যায়। অথবা পুরুষকে নিঃস্পৃহ করে নারীকে চালিকা শক্তিরূপে দেখানো হয়েছে। এ কারণে বাসন্তী হয়ে ওঠে নারী-অধিকার আদায়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কখনো সে নারীবাদকেও ছাপিয়ে গিয়ে হয়ে ওঠে ব্রাত্য কৌমের স্বার্থ রক্ষায় বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। এখানে রাজার ঝি চরিত্রের সঙ্গে বাসন্তীর বৈপরীত্য লক্ষণীয়। একজন অন্তর্মুখী শান্ত-ধীর, আরেকজন প্রতিবাদী রুদ্র-কঠিন। তবে দুজনেরই আছে না-পাওয়ার বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার অপ্রাপ্তি। ঋত্বিক অদ্বৈতের মতোই এই দুই নারীকে দুটি ভিন্ন ধারার নদীর মতো এক মোহনায় এনে মিলিয়েছেন। বাসন্তীর পিছু পিছু পাটনীপাড়ার অশ্বিনী বাড়ি পর্যন্ত এলে ব্যঘ্রকণ্ঠে সে যেমন বলতে পারে, 'এইডা আমার বাপের দেশ, ভাইয়ের দেশ, এইহানে আমি কোন বেডারে ডরাইয়া কথা কই না' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ৭১)। আবার পরক্ষণেই নিজের চিন্তা বাদ দিয়ে শরীরের তেজ নামিয়ে মালোদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদাস হয়ে বলতে পারে—'আমার কথা ছাড়ান দেও, আমি কই এই মালু পাড়ার কতা, দিনে দিনে কি অইল কও দেহি।' তিতাসের এই অবস্থার মূলে রয়েছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে ফাটল। উপন্যাসের বর্ণনায়:

মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমসলায় সে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। পূজায় পার্বণে, হাসি ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মালো ভিন্ন অপর কারে পক্ষে সে সংস্কৃতির ভিতরে প্রবেশ করার বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। কারণ মালোদের সাহিত্য উপভোগ আর সকলের চাইতে স্বতন্ত্র। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত তাদের গানগুলি ভাবে যেমন মধুর, সুরেও তেমনি অন্তরস্পর্শী। সে ভাবের, সে সুরের মর্ম গ্রহণ অপরের পক্ষে সুসাধ্য নয়। ইহাকে মালোরা প্রাণের সঙ্গে মিশাইয়া নিয়াছিল, কিন্তু অপরে দেখিত ইহাকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে। আজ কোথায় যেন তাদের সে সংস্কৃতিতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। সেই গানে সেই সুরে প্রাণ ভরিয়া তান ধরিলে চিত্তের নিভৃতিতে ভাব যেন আর আগের মত দানা বাঁধিতে চায় না, কোথায় যেন কিসের একটা বজ্রদৃঢ় বন্ধন শ্লথ হইয়া খুলিয়া খুলিয়া যায়। যাত্রার দল যেন কঠোর কুঠারাঘাতে তার মূলটুকু কাটিয়া দিয়াছে। (তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ১৮৫)

মালোদের একতাহীনতার সুযোগে অন্যপাড়ার লোকেরা পাইক পেয়াদাসহ লোন কোম্পানীর লোকদের নিয়ে মালোপাড়ায় হামলা চালায়। ঋণের টাকার পরিবর্তে সর্বস্ব নিয়ে যায়। আগুন দিয়ে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। বাসন্তী এর প্রতিবাদ করতে পারে না। নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার কথা উপন্যাসে নেই। সেখানে 'পালেরা বাজারের দোকানি। মালোদের অনেক জিনিসপত্র বাকি দিয়া রাখিয়াছে। তাদেরও আদায় হওয়া দরকার। তাই রোরুদ্যমান মালোদের প্রবোধ দিতে আসিয়া তারা বলিল, বিধু পাল কড়া মেজাজের লোক। কিন্তু লোক ভাল। সব নিয়াছে, কিন্তু তোমাদের নৌকাগুলিতে হাত দেয় নাই' (তি. এ. ন. না. উ./ পৃ. ১৯৩)। চরিত্রের মুখে সংলাপের রদবদল ছাড়া প্রায় পুরো সিনেমা জুড়েই উপন্যাসের সঙ্গে কাহিনির মোটামোটি সঙ্গতি রক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু শেষদিকে এসে এর ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি। ঋত্বিকের অসুস্থ হয়ে পড়া এর একটি কারণ হতে পারে। বস্তুত তিতাস কোন একক কাহিনি নির্ভর উপন্যাস নয়; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু ঘটনার সংশ্লেষে যে মহাকাব্যিক আখ্যান তৈরি হয়েছে, সিনেমার দৈর্ঘের সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে তার সবগুলো সুবিন্যস্তভাবে ধারণ করা কঠিন কাজ। তিতাস ছাড়াও ঋত্বিকের পূর্বাপর সব সিনেমায় নারী চরিত্রগুলো যেমন স্বাধীন, সাবলীল—তেমনি প্রতিবাদী বাসন্তী চরিত্রটি শুরু থেকে একই রকমভাবে নির্মিত হয়েছে। কিন্তু সিনেমার শেষদিকে এসে তাকে নির্লিপ্ত দেখা গেছে। তাছাড়া যে সাংস্কৃতিক ঐক্য রক্ষার জয়গান তার সিনেমায় ব্রত হিসেবে দেখা গেছে—অদ্বৈতের তিতাসে বর্ণিত মালোদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বাসন্তী ও মোহনের সেই প্রচেষ্টাকে কোনভাবেই অংকিত করা হয়নি। বাংলা দু'ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে সংস্কৃতিতে ফাটল, পরিণামে আত্মিক বন্ধনের মৃত্যু হয়েছে বলে ঋত্বিক বিশ্বাস করতেন। উপন্যাসেও মালোদের সংস্কৃতি দু'ভাগ হওয়ার ফলে তাদের ঐক্যে ফাটল ধরে। ফলে একটি কৌমের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পরে। এ অবস্থা থেকে রক্ষা করতে মোহনকে সঙ্গে নিয়ে বাসন্তী মালো সংস্কৃতির ধারক হরিবংশ, ভাটিয়ালি প্রভৃতি গানের আহ্বানে যাত্রাগানে মত্ত অন্য মালোদের নিজ সংস্কৃতিতে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। এই বিষয়টিকে চলচ্চিত্রকার স্বজ্ঞানে বাদ দিয়েছেন না শেষ দিকে অসুস্থতা জনিত প্রমাদে বাদ পড়ে গেছে তার মীমাংসা করা যায় না। তবে বাদ পরার বিষয়ে ঋত্বিক নিজেই সংশয়াপন্ন ছিলেন—'আমার মতে বইটা সবচেয়ে সততার সাথে লেখা রচনার মধ্যে অন্যতম ...আমি অনুভবের দ্বারা স্বচ্ছ রূপে আকৃষ্ট হয়েছি। নিছক ব্যক্তিগত নিবিড় অনুভূতিকে তীব্রভাবে গল্পে ব্যক্ত করা হয়েছে। ...ছবির মত দেশের সৌন্দর্যও

আমাকে খুবই আকৃষ্ট করেছে। ...বইটা চিত্রে রূপায়িত করার এত গুণ বর্ণনা করা যায় যে ছবি করার অন্যান্য বিষয়গুলো শেষ পর্যন্ত অবহেলিত থেকে যেতে পারে।'[৫৩]

মালোদের দৈন্যদশার জন্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে চিহ্নিত করতে চলচ্চিত্রকার ব্যর্থ। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে মালোদের মনে বিলাসিতা বেড়ে যায়। আপদকালীন সময়ের জন্য টাকা জমিয়ে রাখার মনোভাব লোপ পেতে থাকে। উল্টো 'লোন কোম্পানি'র সুদের টাকায় তারা সে চাহিদা পূরণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে ঋণ পরিশোরের সক্ষমতা হারায়। এই বিষয়টি চলচ্চিত্রে আসেনি। অন্যদিকে সদা পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক প্রভাবও সিনেমায় তেমনভাবে চিত্রিত হয়নি। বাসন্তীর বাবা ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছে তিতাস শুকিয়ে গেছে। মোহন জাল ফেলে বাস্তবে সে সত্যতার প্রমাণ পেয়েছে। মালোরা সবাই যাত্রা আর অপসংস্কৃতি নিয়ে ব্যস্ত। তিতাস শুকিয়ে যে বেঁচে থাকার পথ বন্ধ হয়ে আসছে সে দিকে কারো খেয়াল নেই। তাই মোহনকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়—'মালু গোষ্ঠী জাত ত্যাগ করুক। কবি করুক। নাচুক। মারামারি কামড়াকামড়ি যা মন চায় করুক। আর ভাবনা নাই গাঙ হুকাইতাছে' (তি. এ. ন. না. চ./ দৃ. ৭৩)। এখানে সব সব দোষ যেন ঐ অপসংস্কৃতির ঘাড়ে পড়ে। প্রকৃতিও যে এখানে বড় সত্য তা সিনেমায় ওভাবে আসেনি। অর্থনৈতিক সংঘাতের দিকটি সিনেমার প্রথমার্ধে প্রায় অনুপস্থিত। লেখক সমালোচক গৌতম ভদ্র বলেন, 'ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারা জানি যে বাস্তবে অর্থনৈতিক জীবনের বেশী ঘাত-সংঘাতের মুহূর্তেই এই জাতীয় আদিম সমাজের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও প্রতিরোধ সবচেয়ে বেশী দানা বাঁধে।'[৫৪] সিনেমায় এরকম কোন ইঙ্গিত নেই। তিনি মনে করেন, 'Marginal গোষ্ঠী কোন মতেই ধনতান্ত্রিক সমাজে পুরানোভাবে টিকে থাকতে পারে না—এরকম একটি সার্বজনীন সত্যের দিকে ইঙ্গিত করতেন সক্ষম হন'[৫৫] অদ্বৈত মল্লবর্মণ। কিন্তু সিনেমায় শুধু ঋণের টাকা আদায়ের কঠোর চিত্রটি এসেছে, কিন্তু ঋণের জালে জড়িয়ে যাওয়ার নেপথ্যের বিষয়টি আসেনি। গৌতম ভদ্র তাই ঋত্বিকের কঠোর সমালোচলনা করে বলেন, 'একটা গোষ্ঠীবদ্ধ গোটা সমাজকে নিয়ে ছবি করার সময় বোধহয় নৈর্ব্যক্তিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন থাকার দরকার হয়, শুধুমাত্র আবেগ থাকলেই হয় না বিশ্লেষণ থাকাও দরকার।'[৫৬] ঋত্বিক বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা ঘোরার কারণে তার মনের মধ্যে একটি ভাষাজট তৈরি হয়ে থাকতে পারে। তাই তিতাস পাড়ের ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতি তার সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়নি। অথবা এই বিষয়টিতে তিনি একেবারাই মনোযোগ দিতে পারেননি।

তিতাস শুকিয়ে গিয়ে মাছশূন্য হয়ে যাওয়ার প্রভাব শুধু গোকর্ণঘাটের মালোদের উপরই পড়েনি, এর অববাহিকার সব মালোপাড়ায়ই পড়েছে। রাধানগর, কিষ্টনগর, মনতলা, গোঁসাইপুর সবখানে একই অবস্থা। বিরামপুরের বনমালীদেরও একই অবস্থা। তাই ছটফটে উদয়তারার মনেও বিষণ্নতার ছায়া। অনেক বদলে গেছে সে। ভাইয়ের দুর্দিন দেখে দীর্ঘদিন পর সে স্বামীর বাড়িতে ফিরে আসে। অনন্তের জন্য যে বাসন্তীকে বিষম মেরেছিল আজ তার কাছেই দুঃখের কথা বলতে এসেছে। যে অনন্তকে বাসন্তীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল উদয়তারা, সে অনন্ত তাকেও ছেড়ে চলে গেছে। সে এখন শহুরে ভদ্রলোকদের সাথে চলে। কিন্তু বাসন্তীর কাছে অনন্ত এখন শুধুমাত্র একটা নাম। যেমন তাদের তিতাস, যার নামটাই শুধু আছে নদীটা মরে গেছে। ব্যক্তিগত সাধ-আহ্লাদ, সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে ওঠে তিতাসই এখন তার ভাবনার মূল বিষয়। এই নদীই তো তাদের মা। মা মরা অনন্তের যেরূপ অবস্থা, তিতাস ছাড়া তাদেরও সেরূপ ছন্নছাড়া অবস্থা। কালুর মা-ও

এখন সর্বস্বান্ত, মুংলি দূরগাঁয়ে ভিক্ষা করে। বাসন্তীর মা-ও তার সঙ্গে যেতে চায়। উদয়তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে আসামের চা বাগানে চলে যেতে চায় শরীরের অবশিষ্ট যৌবনটুকু পুঁজি করে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায়। এই দৃশ্যটি সংবেদনশীল মানুষের মনে ব্যাপক নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে। ঋত্বিক তিতাসের পুনঃসম্পাদনার কাজে যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন 'হোটেল গ্রীন'-এ এক আড্ডায় কলকাতায় তিতাসের বিশেষ প্রদর্শনকালীন একটি ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এ প্রসঙ্গে বলেছেন— 'হল ভরা মানুষ তিতাস দেখছেন, ছবির প্রায় অন্তিম দৃশ্য। যে সিকোয়েন্সে তিতাসের শুকনো পারে উদয়তারা যেমন করে হোক বাঁচবার জন্য শহরে যাবার কথা ভাবছে, এবং উন্মাদপ্রায় বাসন্তীর মাকে বলেছে, "হোঁচট খামুনা, দেহে যৌবন আছে, তরতরাইয়া পিছলাইয়া যামু"—ঠিক সে মুহূর্তে কে যেন সম্মুখের সিট থেকে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। ...প্রজেকশন থেমে গেল। আলো জ্বলে উঠলো। ...যেয়ে দেখি বিষ্ণু বাবু[৫৭] চেয়ার ছেড়ে নীচে বসে পড়েছেন এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন তখনও। ...দৃশ্যটার সঙ্গে এমন গভীরভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন যে নিজের ভাবাবেগকে আর চেপে রাখতে পারেননি।'[৫৮] নদী পাড়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষয়িষ্ণু জীবন প্রণালীর এরূপ বিচিত্র রূপ বাংলাদেশের আর কোন সিনেমায় আজঅবধি চিত্রিত হয়নি।

সিনেমার শেষের দৃশ্যদুটি ঋত্বিক একটু টেনে নিয়ে গেছেন। তিতাসের জল শুকাতে শুকাতে খাবার পানিটুকুও অবশিষ্ট নেই। খালি কলস, লোটা উপুর হয়ে আছে, অসুস্থ বাসন্তীর মনে রামকেশবের কথাগুলো উদিত হয়—'এই তিতাস জলে– কাইল হয়ত দেখমু শুকনা খটখইট্যা, ড্যাঙ্গা। মরণকালে যে জল মুখে না দিলে পরাণটা তক বাইর হয় না, একদিন হয়ত দেখুম তিতাসে সেই জলটুকুও নাই।' না খেতে পেয়ে ক্লিষ্ট বাসন্তী সামান্য পানির জন্য কোনরকমে উঠে পা টেনে টেনে তিতাসের দিকে যায়। চারিদিকে ধু ধু বালি আর বালি। পানির লেশমাত্র নেই। উপায়ান্তর না দেখে হাত দিয়ে বালি খুঁড়তে থাকে। শরীর কুলিয়ে ওঠে না। মরণপণ খুঁড়তে খুঁড়তে যে সামান্য পানির দেখা মিলে তা খাওয়ার শেষ শক্তিটুকুও আর থাকে না। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। হঠাৎ দূর থেকে ভেঁপুর শব্দ আসে। বাসন্তী মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে একটি শিশু ধান খেতের ভিতর দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে তার দিকে আসছে। বাসন্তীর মুখে হাসি ফুটে, নবজীবনের আনন্দে ক্ষণিকের জন্য উদ্বেলিত হয়। কিন্তু হঠাৎ শিশুটি উল্টোদিকে বাঁক নিয়ে চলে যায়। মুহূর্তেই বাসন্তীর ঘোর কেটে যায়। তিতাসের চরেই তার অবধারিত পরিণতি ঘটে। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত সে তিতাসের চরে বালি খুঁড়ে পানির সন্ধান করেছে। তিতাসের বুক খুঁড়ে নদীর পুনরুন্মেষ ঘটানোর প্রণান্ত চেষ্টা করেছে। সবুজ ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে হাস্যোজ্জ্বল শিশুর বাঁশি বাজিয়ে দৌড়ে যাওয়ার মাঝে আশান্বিত বাসন্তীর চোখে একটি সুখী সমৃদ্ধ আগামী প্রজন্মকে দেখাতে চেয়েছেন ঋত্বিক। প্রকৃতি ও মানুষের দ্বান্দ্বিকতার দর্শন; কখনো উভয়ের সহাবস্থান, আবার কখনো মানবসৃষ্ট ক্ষতির প্রতিশোধ নিতে গিয়ে প্রকৃতির রুদ্র আচরণ, ফলে রুষ্ট প্রকৃতির কাছে মানুষের অসহায়ত্বের সঙ্ঘাত ঋত্বিক তুলে ধরতে চেয়েছেন। একইসাথে *Optimism*-এর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে জীবনযুদ্ধে অবিচল বাসন্তীর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সবুজের সমারোহে অবুজ শিশুর সমৃদ্ধ জীবন কল্পনায়, তার চোখে মুখের অভিব্যাক্তিতে। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন একটি সভ্যতার ধ্বংস্তূপের উপর গড়ে ওঠে আরেকটি সভ্যতা। সভ্যতা মরে না, এটি প্রবহমান। ঋত্বিক নিজেই বলেছেন, 'সভ্যতার মৃত্যু নেই, সভ্যতা পরিবর্তিত হয়, কিন্তু সভ্যতা চিরদিনের। সেখানে তিতাসে ধানের ক্ষেত জন্মেছে, সেখানে আর-একটা সভ্যতার আরম্ভ। ...individual মানুষ মরণশীল, কিন্তু মানুষ অমর। সে একটা ধাপ থেকে আর-

একটা ধাপে গিয়ে পৌঁছায়, সে কাথাটাই...বলার চেষ্টা করেছি।'[৫৯] তবে এই দর্শনটি তিতাসে প্রয়োগের পরিকল্পনা প্রথম থেকেই তাঁর মাথায় ছিল কি না তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ ঋত্বিক কোন সুনির্দিষ্ট চিত্রনাট্য তৈরি করেননি। ঘটনার তাৎক্ষণিকতার কারণেও দৃশ্যটি বর্ধিত হয়ে থাকতে পারে। ঋত্বিক-পত্নী সুরমা ঘটকের বয়ানে জানা যায়, তিতাসের চিত্রগ্রাহক বেবী ইসলামের বাসায় ঋত্বিক কিছুদিন ছিলেন। বেবী ইসলামের স্ত্রী তন্দ্রা তাঁকে খুব যত্ন করতেন। তন্দ্রা ইসলামের ছোট ছেলে জয়ের সাথে ঋত্বিকের খুব ভাব জমে ওঠে। তিনি বলতেন 'তোকে আমি কি দেবো?'[৬০] এই জয়ই তিতাস ছবিটির শেষে ধানের ক্ষেতে বাঁশি বাজিয়েছিল। এই তথ্যের উপর ধারণা করা যেতে পারে তন্দ্রা ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশত জয়কে কিছু একটা দেয়ার মানসে 'Optimism' দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটিয়ে কাহিনিকে বড় করেছেন। ঋত্বিকের মতো ইন্টেলেকচ্যুয়াল তাৎক্ষণিক কাহিনির পরিবর্তন বা সংযোজন করার ক্ষমতা রাখেন। তবে এ প্রসঙ্গে তিতাসের প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান বলেছেন, 'সিনেমার আউটলাইনে দৃশ্যটি পূর্ব থেকেই ছিল। শেষ দৃশ্যের জন্য একটি শিশু চরিত্রের প্রয়োজন ছিল। জয়ের বয়স ও চেহারার সঙ্গে ঐ চরিত্রের মিল পাওয়ায় জয়কে চলচ্চিত্রে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।'[৬১] উদ্দেশ্য যা-ই হোক বর্ধিত অংশটি সিনেমায় একটি অনন্য মাত্রা সংযোজন করেছে। কোন প্রকার চিত্রনাট্য ছাড়া Thomas Frederick Dixon-এর *The Clansman* উপন্যাস অবলম্বনে তাৎক্ষনিক বক্তব্য প্রকাশের তাগিদ থেকে D. W. Griffith-Gi *The Birth of a Nation* (১৯১৫) সিনেমটি নির্মিত হয়েছিল,[৬২] যা সর্বকালের সেরা ছবিগুলোর তালিকায় অন্যতম। সিনেমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাসন্তী চরিত্রটির সর্বাপেক্ষা উপস্থিতি থাকলেও এবং তাকে আবর্ত করে সমগ্র সিনেমাটি বিস্তার লাভ করলেও কেন্দ্রীয় চরিত্রের আসনে তাকে বসানো যায় না। সে আসন একেবারেই তিতাসের। বাসন্তী সিনেমার মেরুদণ্ড হলে তিতাস তার হৃৎপিণ্ড, গ্রাম তার পরিকাঠামো। 'অযান্ত্রিকে' যেমন একটি গাড়ি হয়ে ওঠেছে কেন্দ্রীয় চরিত্র বা মূল নায়িকা; 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এও নদী কেন্দ্রীয় চরিত্র, সিনেমার নায়িকা।

পরিশেষ

'মালোদের জীবনযাত্রা, তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক দিকের নানান বিষয়, তাদের লৌকিক উৎসব, জন্ম-কৈশোর-পেশা-বিবাহ-সন্তান উৎপাদন-মৃত্যু এবং একই সমান্তরালে তিতাস নদীর বাঁচা-মরা —সবকিছুর ঐকত্রিক রূপ এই চলচিত্র।'[৬৩] 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রটি বহুবিধ অর্থজ্ঞাপক বিশাল পরিসরে নির্মিত। অদ্বৈতের উপন্যাসের ব্যাপকতা পুরোটা এক সিনেমায় ধারণ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। একারণে চলচ্চিত্রকারকে অনেক কিছু এড়িয়ে যেতে হয়েছে। অনন্তবালা চরিত্রটি উপন্যাসে যেভাবে এসেছে তাতে সিনেমায় এই চরিত্রটি স্থান পাওয়ার দাবি রাখে। অনন্তের প্রণয়-প্রত্যাশী অনন্তবালার হৃদয়ের ক্ষরণ দেখানোর চেয়ে তিতাস-আশ্রিত কৌমের ক্ষয়ে যাওয়ার প্রতিই ঋত্বিকের আগ্রহবোধ ছিল বেশি। তাঁর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সিনেমায় গ্রাম হচ্ছে নায়ক, নায়িকা 'তিতাস'। তাছাড়া মালোদের কৌম সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মাঝে বিশ্বসভ্যতার রূপান্তরের বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটেছে এই সিনেমায়। অদ্বৈতের 'তিতাস একটি নদীর

নাম' যেমন আরভিং স্টোনের 'লাস্ট ফর লাইফের' সাথে একই সূত্রে বাঁধা পড়েছে, তেমনি ঋত্বিকের তিতাসও ম্যাক্সিকান সিনেমা *Redes*-এর জেলে কৌমের বাস্তবতা ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন আবেদন তৈরি করেছে, যা বিশ্বের সকল ব্রাত্যজনের টিকে থাকার লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি। 'ঋত্বিক নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব সভ্যতার বিবর্তনের সমাজপাঠ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এ চলচ্চিত্রকে।'[৬৪] তাছাড়া একটি সমাজকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক আগ্রাসন চালিয়ে সাম্রাজ্যবাদ কায়েমের যে বিশ্বজনীন অশুভ তৎপরতা তা একটি ছোট্ট কৌমের ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক ও চলচ্চিত্রকার যুগপৎ তুলে ধরেছেন। একই বাক্যে একাধিক আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার কিংবা একই বাক্যে একই শব্দের উচ্চারণের দ্বান্দ্বিকতা পরিলক্ষিত হয়েছে সিনেমায়। সর্বোপরি বহুদিন ধরে লালিত তাঁর স্বপ্নের তিতাসকে চূড়ান্ত অনুরাগে তুলে ধরতে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। ফলে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বুনিয়াদী বাস্তবতার "সব বৃত্তি, বিন্যাসকেও ছাপিয়ে উঠেছে নির্ভেজাল একটা 'নস্টাালজিয়া'।"[৬৫]

সিনেমার গানগুলোতে আরোপিত বাদ্যযন্ত্রের আদিখ্যেতা নেই। একেবারে অন্ত্যজ সমাজ, মাটি ও মানুষের জীবনে গানের অপরিহার্য অংশের অবিকৃত উপস্থাপন করা হয়েছে। শটের বিভিন্ন কৌণিক দূরত্ব যথাযথভাবে বজায় রেখে ঘটনা ও চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে। আলোর ব্যবহারেও বৈপরীত্য লক্ষণীয়; কখনো তীব্র আলো ফেলে ঘটনাকে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, কখনো মৃদু আলোতে চরিত্রের অভিব্যক্তি তুলে ধরা হয়েছে। লেন্সের ব্যবহারে তিনি 'ওয়াইড লেন্স' ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। লং শটগুলোতে একই ফ্রেমে চারপাশের সর্বোচ্চটা তুলে আনতে চেষ্টা করেছেন। শব্দ, আবহ সংগীত, রূপক, প্রতীক ও ডিটেলের ব্যবহারে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে দৃশ্যে বহুমাত্রিকতা তৈরি করা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, ভূমিকা- *তিতাস একটি নদীর নাম*, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, আজকাল প্রকাশনী (পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১১), ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. আট

২. সত্যজিৎ রায়, উদ্ধৃত : সুরমা ঘটক, *সিনেমা সংক্রান্ত* : পূর্ণেন্দু পত্রী রচিত, দে'জ পাবলিশিং (দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৫), ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ৫৩

৩. ঋত্বিক ঘটক, চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরও কিছু, উদ্ধৃত : *ছুটির দিনে*, দৈনিক প্রথম আলো, তিতাস একটি নদীর নাম, ইকবাল হোসাইন চৌধুরী, মুদ্রিত সংস্করণ, ৭ জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৬

৪. মনিস রফিক, ঋত্বিক ঘটকের *তিতাস একটি নদীর নাম চিত্রনাট্য*'র ভূমিকা অংশ (যেহেতু ঋত্বিক ঘটক কোন প্রথাগত চিত্রনাট্য করেননি। তাই চিত্রনাট্যটি ছবি দেখে শট টু শট এবং ফ্রেম টু ফ্রেম লেখা হয়েছে), পার্থিব রাশেদ ও মনিস রফিক সম্পাদিত (২০১৩), রোদেলা প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা) ১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা, পৃ. ৮

৫. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, *তিতাস একটি নদীর নাম*, প্রকাশক : নির্মলেন্দু পাল, আজকাল প্রকাশনী (পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১১), ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ৫

৬. 'তি. এ. ন. না. উ.' দ্বারা *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাস বুঝানো হয়েছে।

৭. বাঁধন সেনগুপ্ত, *ঋত্বিক চলচ্চিত্র কথা* (প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ, ২০০৩), পুনশ্চ, ৯এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা, পৃ. ৬৫, ৬৬

৮. ঋত্বিক ঘটক, সাক্ষাৎকার : প্রবীর সেন, *সুবর্ণরেখা- প্রসঙ্গ ঋত্বিক* (২০১১), মনিস রফিক সম্পাদিত, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ। পৃ. ২০৩

৯. তিতাস একটি নদীর নাম চলচ্চিত্রে বাসন্তীর বাবার ভূমিকায় অভিনয় করেন আবুল খায়ের (১৯২৯-২০০১)। তিনি বলেছেন, 'আরিচাঘাটে একদিন রাত্রে হঠাৎ কানে আসে একটি দোতরার সুর ও গান। ঋত্বিকদা বলেন, লোকটিকে নিয়ে আসতে। দোতরা বাদকের নাম ধীরাজউদ্দীন ফকীর। এই ধীরাজউদ্দীন ফকিরই পরে ছবিটির আরম্ভে লালন ফকিরের গান করেন'। উদ্ধৃত : সুরমা ঘটক, *ঋত্বিক– পদ্মা থেকে তিতাস* (২য় মুদ্রণ, ১৯৯৯), অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা, পৃ. ৪৪

১০. ঋত্বিক ঘটক, স্বাক্ষাৎকার : এফ. সা. বিজয় সোনি ও নেত্র সিং রাওয়াত, মার্চ ১৯৮৬, *সুবর্ণরেখা– প্রসঙ্গ ঋত্বিক* (২০১১), মনিস রফিক সম্পাদিত, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ, পৃ. ১৭৯

১১. *Redes* (চলচ্চিত্র), পরিচালনা- Fred Zinnemann and Emilio Gómez Muriel, প্রযোজনা- Carlos Chávez, ম্যাক্সিকো, মুক্তি- ১৯৩৬

১২. 'তি. এ. ন. না. চ.' দ্বারা *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্র নির্দেশ করা হয়েছে।

১৩. সঞ্জিৎ রায় চৌধুরী, উদ্ধৃত : *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ* (২০১৩), মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, রোদেলা প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ৩৩৫

১৪. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, *তিতাস একটি নদীর নাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

১৫. ঋত্বিক ঘটক, উদ্ধৃত : *ঋত্বিককুমার ঘটক– নিজের পায়ে নিজের পথে* (নতুন মুদ্রণ, ২০১৬), মনফকিরা, ২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১, নবোদিত, মুকুন্দপুর, কলকাতা, পৃ. ৫৩

১৬. ঋত্বিক ঘটক, উদ্ধৃত : *প্রসঙ্গ ঋত্বিককুমার ঘটক : চলচ্চিত্র সমালোচনা* (২০১৮), 'তিতাস একটি নদীর নাম : মালোর চোখে– তিতাস একটি নদীর নাম : মধ্যবিত্তের চোখে' গৌতম ভদ্র, চলচ্চিত্র চর্চা, বিভাস মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ব্রহ্মপুর, কলকাতা, পৃ. ৯৬

১৭. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, *তিতাস একটি নদীর নাম*, পূর্বোক্ত, পৃ.

১৮. হাবিবুর রহমান খান, প্রযোজক- *তিতাস একটি নদীর নাম* (চলচ্চিত্র, ১৯৭৩), গবেষকের সঙ্গে হাবিবুর রহমান খানের নিজ বাসায় (গুলশান, ঢাকা) ভিডিও ক্যামেরায় ধারণকৃত সাক্ষাৎকার, ২৭ মে ২০১৮

১৯. সংলাপ : রামপ্রসাদ, *তিতাস একটি নদীর নাম* (চলচ্চিত্র), পরিচালক- ঋত্বিক কুমার ঘটক, প্রযোজনা- পূর্বপ্রাণ কথাচিত্র, বাংলাদেশ, মুক্তি- ১৯৭৩, দৃশ্য- ৩

২০. ঋত্বিক ঘটক, উদ্ধৃত : ঋত্বিক ঘটক– চিন্তা ও সৃষ্টি, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, *শতবর্ষে চলচ্চিত্র* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-চতুর্থ মুদ্রণ নভেম্বর ২০১১, নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, পৃ. ৪৫৩

২১. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ* (২০১৩), রোদেলা প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ৩২০

২২. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, *তিতাস একটি নদীর নাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬, ৩৯

২৩. হারবার্ট স্পেনসার (ইংরেজ দার্শনিক, ১৮২০-১৯০৩), *আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের চিন্তা ও তত্ত্ব* (তৃতীয় প্রকাশ, জুন ১৯৯৬), কাজী তোবারক হোসেন ও মুহাম্মদ হাসান ইমাম সম্পাদিত, সামাজিক বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র, দারুল আমান ৬৮ পুরানা পল্টন লাইন (শান্তিনগর), ঢাকা, পৃ. ৪০

২৪. সংলাপ : কিশোর, *তিতাস একটি নদীর নাম* (চলচ্চিত্র), পরিচালক- ঋত্বিক কুমার ঘটক, প্রযোজনা- পূর্বপ্রাণ কথাচিত্র, বাংলাদেশ, মুক্তি- ১৯৭৩, দৃশ্য- ৫

২৫. ফকরুল হাসান বৈরাগী, উদ্ধৃত : *তিতাস একটি নদীর নাম চিত্রনাট্য*'র ভূমিকা অংশ, পার্থিব রাশেদ ও মনিস রফিক সম্পাদিত, রোদেলা প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা) ১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা, পৃ. ৮

২৬. ঋত্বিক ঘটক, উদ্ধৃত : *ঋত্বিককুমার ঘটক– নিজের পায়ে নিজের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

২৭. ঋত্বিক ঘটক, উদ্ধৃত : *ঋত্বিককুমার ঘটক– নিজের পায়ে নিজের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

২৮. উদ্ধৃত : *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ*, ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৯

২৯. ঋত্বিক ঘটক, উদ্ধৃত : ঋত্বিককুমার ঘটক- *নিজের পায়ে নিজের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

৩০. ঋত্বিক ঘটক, সাক্ষাৎকার : জগৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, (প্রথম প্রকাশ : ধ্বনি ৩ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯) উদ্ধৃত : *সুবর্ণরেখা– প্রসঙ্গ ঋত্বিক*, মনিস রফিক সম্পাদিত, মুহম্মদ খসরু, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ, পৃ. ২১৭

৩১. সংলাপ : নীলকণ্ঠ বাগচী, *যুক্তি তক্কো আর গপ্পো*, পরিচালনা- ঋত্বিক ঘটক, প্রযোজনা- রিতা প্রোডাকসন্স, ভারত, মুক্তি- ১৯৭৭

৩২. প্রবীর সেন, 'ঋত্বিক কুমার ঘটকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার', *ঋত্বিক ঘটক*, অতনু পাল সম্পাদিত, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৬

৩৩. ঋত্বিক ঘটক, শিবাদিত্য দাশগুপ্ত ও সন্দীপন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *সাক্ষাৎ ঋত্বিক*- জানুয়ারি ২০০০, উদ্ধৃত : *সুবর্ণরেখা– প্রসঙ্গ ঋত্বিক*, মনিস রফিক সম্পাদিত, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ, পৃ. ২২২

৩৪. ঋত্বিক ঘটক, উদ্ধৃত : *ঋত্বিককুমার ঘটক– নিজের পায়ে নিজের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

৩৫. কবরী (রাজার ঝি চরিত্রে অভিনয়কারী), সাক্ষাৎকার : Cinemascope, *Ritwik Ghatak Retrospective* (Documentry), চিত্রনাট্য ও পরিচালনা- মুকুট ভট্টাচার্য ও সৌরজিৎ রায়, সম্পাদনা- ইন্দ্রজিৎ শীল, ভারত, Link: https://www.youtube.com/watch?v=wAIUccGSuz8

৩৬. ঋত্বিক ঘটক, *সুবর্ণরেখা– প্রসঙ্গ ঋত্বিক*, 'শেষ সাক্ষাৎকার প্রথম নমস্কারের আগে', মুহম্মদ খসরু, মনিস রফিক সম্পাদিত, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ, পৃ. ১৭১

৩৭. ঋত্বিক ঘটক, উদ্ধৃত : *ঋত্বিককুমার ঘটক– নিজের পায়ে নিজের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

৩৮. সত্যজিৎ রায়, বিষয় চলচ্চিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, পৃ. ৬৪

৩৯. মইনুদ্দীন খালেদ, *সুবর্ণরেখা– প্রসঙ্গ ঋত্বিক*, 'ঋত্বিক ঘটকের তিতাস একটি নদীর নাম', মনিস রফিক সম্পাদিত, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ, পৃ. ৮৬

৪০. ঋত্বিক ঘটক, উদ্ধৃত : *ঋত্বিককুমার ঘটক– নিজের পায়ে নিজের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৪১. ম্যাক্সিম গোর্কি, *মা*, অনুবাদ : পুষ্পময়ী বসু (প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ- ১৯৯৬), সম্পাদনা ও ভূমিকা : ড. সফিকুন্নবী সামাদী, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৬৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা, পৃ. ৮১

৪২. *মা* (*Mother*, সিনেমা), পরিচালনা : Vsevolod Pudovkin, নির্মাণ: Mezhrabpomfilm, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মুক্তি- ১৯২৬

৪৩. গুরুদাস ভট্টাচার্য, *প্রসঙ্গ ঋত্বিককুমার ঘটক : সামগ্রিক মূল্যায়ন*, 'ঋত্বিক ঘটক গঙ্গা থেকে সুবর্ণরেখা থেকে তিতাস', চলচ্চিত্র চর্চা, বিভাস মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ব্রহ্মপুর, কলকাতা, পৃ. ১৪২

৪৪. মুহম্মদ খসরু, *সুবর্ণরেখা– প্রসঙ্গ ঋত্বিক*, 'শেষ সাক্ষাৎকার প্রথম নমস্কারের আগে', মনিস রফিক সম্পাদিত, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ, পৃ. ১৬০

৪৫. বীতশোক ভট্টাচার্য, *প্রসঙ্গ ঋত্বিককুমার ঘটক : সামগ্রিক মূল্যায়ন*, 'যন্ত্র, জন্তু, মানুষ এবং ঋত্বিক', চলচ্চিত্র চর্চা, বিভাস মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ব্রহ্মপুর, কলকাতা, পৃ. ১৩৯

৪৬. ঋত্বিক ঘটক, উদ্ধৃত : *ঋত্বিককুমার ঘটক– নিজের পায়ে নিজের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

৪৭. উদ্ধৃত : *ঋত্বিক কুমার ঘটক– এক বিরলপ্রজ প্রতিভার নাম*, ফজলুল হক রচিত, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ, পৃ. ৬৮

৪৮. ঋত্বিক ঘটক, স্বাক্ষাৎকার : এফ. সা. বিজয় সোনি ও নেত্র সিং রাওয়াত, মার্চ ১৯৮৬, উদ্ধৃত: *সুবর্ণরেখা– প্রসঙ্গ ঋত্বিক*, মনিস রফিক সম্পাদিত, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ, পৃ. ১৭৭

৪৯. ঋত্বিক ঘটক, *সুবর্ণরেখা– প্রসঙ্গ ঋত্বিক*, 'ছবির মাপকাঠি', মনিস রফিক সম্পাদিত, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ, পৃ. ১৭১

৫০. ঋত্বিক ঘটক, *সুবর্ণরেখা– প্রসঙ্গ ঋত্বিক*, 'শেষ সাক্ষাৎকার প্রথম নমস্কারের আগে', মুহম্মদ খসরু, মনিস রফিক সম্পাদিত, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ, পৃ. ১৭১

৫১. ঋত্বিক ঘটক, সাক্ষাৎকার: জগৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্বনি, ৩ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯। উদ্ধৃত: *সুবর্ণরেখা– প্রসঙ্গ ঋত্বিক*, মনিস রফিক সম্পাদিত, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ, পৃ. ১৭১

৫২. মুহম্মদ খসরু, *সুবর্ণরেখা– প্রসঙ্গ ঋত্বিক*, 'শেষ সাক্ষাৎকার প্রথম নমস্কারের আগে', মনিস রফিক সম্পাদিত, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ, পৃ. ১৫৮

৫৩. ঋত্বিক ঘটক, উদ্ধৃত : *প্রসঙ্গ ঋত্বিককুমার ঘটক– চলচ্চিত্র সমালোচনা*, গৌতম ভদ্র, চলচ্চিত্র চর্চা, বিভাস মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ব্রহ্মপুর, কলকাতা, পৃ. ৯৬

৫৪. গৌতম ভদ্র, *প্রসঙ্গ ঋত্বিককুমার ঘটক– চলচ্চিত্র সমালোচনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬।

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।

৫৭. বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) প্রখ্যাত বাঙালি কবি, ঋত্বিক ঘটক তাঁর অশেষ স্নেহভাজন ও গুণমুগ্ধ ছিলেন।

৫৮. ঋত্বিক ঘটক, *সুবর্ণরেখা– প্রসঙ্গ ঋত্বিক*, 'শেষ সাক্ষাৎকার প্রথম নমস্কারের আগে', মুহম্মদ খসরু, মনিস রফিক সম্পাদিত, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ, পৃ. ১৬১

৫৯. ঋত্বিক ঘটক, উদ্ধৃত : *ঋত্বিককুমার ঘটক– নিজের পায়ে নিজের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

৬০. উদ্ধৃত : সুরমা ঘটক, *ঋত্বিক– পদ্মা থেকে তিতাস*, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা, পৃ. ৪৪

৬১. হাবিবুর রহমান খান, প্রযোজক- *তিতাস একটি নদীর নাম* (চলচ্চিত্র, ১৯৭৩), গবেষকের সঙ্গে হাবিবুর রহমান খানের নিজ বাসায় (গুলশান, ঢাকা) ভিডিও ক্যামেরায় ধারণকৃত সাক্ষাৎকার, ২৭ মে ২০১৮

৬২. সোমেশ্বর ভৌমিক, *সিনেমা এবং কয়েকজন*, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৪। মুদ্রক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা, পৃ. ২৬

৬৩. সাজেদুল আউয়াল, *ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র : সমাজবাস্তবতা ও নির্মাণভাবনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০১২, পৃ. ৯৯

৬৪. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ*, রোদেলা প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ৩২৩

৬৫. শতদ্রু চাকী, *প্রসঙ্গ ঋত্বিককুমার ঘটক : চলচ্চিত্র সমালোচনা*, চলচ্চিত্র চর্চা, বিভাস মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ব্রহ্মপুর, কলকাতা, পৃ. ৬৯

উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ : সূর্য দীঘল বাড়ী

‘সূর্য দীঘল বাড়ী’ চলচ্চিত্র পরিচিতি

মূল কাহিনি : আবু ইসহাক-এর উপন্যাস ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : মসিহউদ্দীন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী
সঙ্গীত পরিচালনা : আলাউদ্দিন আলী
সংলাপ : মসিহউদ্দীন শাকের
শিল্প নির্দেশনা : মহিউদ্দিন ফারুক
রূপসজ্জা : মোয়াজ্জেম
চিত্রগ্রহণ : আনোয়ার হোসেন
শব্দগ্রহণ : আবদুল বাসেত
সম্পাদনা : সাইদুল আনাম টুটুল
প্রযোজনা : জনচিত্রায়ণ
পরিবেশনা : শাওন সাগর লিমিটেড

অভিনেতা/অভিনেত্রী

জয়গুন : ডলি আনোয়ার, শফির মা : রওশন জামিল, লালুর মা : সিতারা বেগম, সুফিয়া : আঞ্জুমন, জোবেদ ফকির : এ. টি. এম. শামসুজ্জামান, করিম বক্স : কেরামত মাওলা, গদু প্রধান : জহিরুল হক, খলিল : আরিফুল হক, মসজিদের ইমাম : হাসান ইমাম, লেদু : ফখরুল হাসান বৈরাগী, ডা: রমেশ : নাজমুল হুদা বাচ্চু, সাদেক : নরেশ ভূঁইয়া, হাসু : লেনিন, মায়মুন : ইলোরা গহর, শফী : রবীন, কাসু : সজীব প্রমূখ।

মুক্তি : ১৯৭৯।
দৈর্ঘ্য : ১২৮১৮ ফুট ।
সময় : ১৩২ মিনিট।
ফরম্যাট : ৩৫ মি: মি:।
কালার : সাদাকালো।

‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’ উপন্যাস পরিচিতি

বরেণ্য কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) এর বিখ্যাত উপন্যাস ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’। মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি উপন্যাসটি রচনা করেন। এটি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় কবি গোলাম মোস্তফা সম্পাদিত ‘নও বাহার’ পত্রিকায়। বই আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে— মনোজ বসুর কলকাতাস্থ বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও সংকট ; এর প্রভাবে আমাদের জনপদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, গরীব অসহায় মানুষদের দু’মুঠো ভাতের লড়াই, বেঁচে থাকার জন্য নিয়ত সংগ্রাম, দুর্ভিক্ষ, অসহায় ও অবস্থাসম্পন্নদের স্বার্থ-সংঘাত, নিয়তি ও কুসংস্কার এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

ভূমিকা

দেশে-দেশে চলচ্চিত্র অঙ্গনে বাণিজ্যিক সিনেমার বাইরে চলচ্চিত্রের যে নব-নব ধারা তৈরি হয়েছে যুগে-যুগে তাতে তরুণরাই নেতৃত্ব দিয়েছেন। যেমন: ইতালির নিউরিয়েলিজম বা নয়াবাস্তববাদ, আমেরিকার আন্ডার গ্রাউন্ড সিনেমা, বৃটেনের ফ্রি-সিনেমা মুভমেন্ট, ফ্রান্সের ন্যুভেলভাগ বা নবতরঙ্গ ও নেচারালিজম, ব্রাজিলের 'সিনেমা লোভে' এবং ভারতের প্যারারাল সিনেমা মুভমেন্ট ইত্যাদি। আমাদের চলচ্চিত্রে এ ধরনের কোন ধারা প্রতিষ্ঠিত না হলেও বিকল্পধারার চলচ্চিত্রের কথা আমাদের অজানা নয়। আর এর মূলেও রয়েছেন তরুণ চলচ্চিত্রকাররা। বিশ্বের এইসব নবধারার চলচ্চিত্রকাররা সিনেমাকে শুধুমাত্র বাণিজ্য কিংবা বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে দেখতে চাননি। এরমধ্যে তাঁরা খুঁজে ফিরেছেন এক নতুন ভাষা, নতুন শিল্প। মানব মনের নিগুঢ় রহস্য উন্মোচন, জটিল মনস্তত্ব বিশ্লেষণ, সাংসারিক টানাপোড়েন সর্বোপরি সমাজ-বাস্তবতার চিত্র নির্মাণ কিংবা পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে তাঁরা একে ব্যবহার করেছেন। নতুন করে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি ও সমাজ নির্মাণের ব্রত হিসেবে তাঁরা চলচ্চিত্রকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। 'চলচ্চিত্র এদের কাছে নিছক বিনোদনের মাধ্যম নয়। বরং জীবন ও সমাজকে রূপায়নের একটি অন্যতম হাতিয়ারও। বিষয়বস্তুর বৈচিত্রে, উপস্থাপনার অভিনবত্বে, নির্মাণ কুশলতায় এদের ছবি প্রথাগত ঐতিহ্যের বাইরে।'[১] বিকল্পধারার চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে যে-কয়টি সিনেমা আমাদের চলচ্চিত্রের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে তার মধ্যে সর্বাগ্রে আসে 'সূর্য দীঘল বাড়ী'র নাম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব ও পঞ্চাশের মন্বতর নামক দুর্ভিক্ষে বাংলায় লাখ-লাখ মানুষের মৃত্যু, অনাহারে অর্ধাহারে পড়ে থাকা কঙ্কালসার মানুষের হাহাকার, মৃতদেহ নিয়ে কাক আর কুকুরের কামড়া-কামড়ি সমকালীন বিবেকবান মানুষের মনকে ব্যাপকভাবে নাড়া দিয়েছিল। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন যেমন চিত্রকর্মে তাঁর বেদনা ফুটিয়ে তুলেছেন। কথাশিল্পী আবু ইসহাক তেমনি তাঁর উপন্যাস 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'-তে চিত্রিত করেছেন তৎকালীন সমাজের করুণ-বাস্তব রূপটি। পাঠকনন্দিত এ উপন্যাসটি দেশে-বিদেশে পাঠক-বোদ্ধা মহলে সমাদৃত—এর বিষয় নির্বাচন, সহজ প্রকাশভঙ্গি, আঞ্চলিক ভাষার পরিমিত ব্যবহার, সর্বোপরি গল্পের নির্মাণশৈলির কারণে। এই ধরনের উপন্যাস চলচ্চিত্রকারদের কাছে সিনেমার গল্প হিসাবে আদরণীয় বস্তু। কেননা এ ধরনের সাহিত্য থেকে চিত্রনাট্য করতে গেলে চিত্রনাট্যকারকে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। চিত্রনাট্যও উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাণের ভিত হিসেবে কাজ করে। লেখকই এ ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র নির্মাণে নকশাকার হিসেবে ভূমিকা রাখেন। "একটি রাজপ্রাসাদ কিম্বা মন্দির নির্মাণ করতে হলে যেমন কোনও অভিজ্ঞ স্থাপত্য শিল্পীর পরিকল্পনার সাহায্য নিয়ে সর্ব্বাগ্রে তার একখানি নক্সা এঁকে ফেলা দরকার, তেমনি ভাল একখানি চলচ্চিত্র তুলতে হলে সর্ব্বাগ্রে একখানি 'চিত্রনাট্য' প্রস্তুত করে নেওয়া দরকার। 'চিত্রনাট্য' এক কথায় ছবির নক্সা।"[২]

চলচ্চিত্র-সংসদকর্মী দুই তরুণ চলচ্চিত্রকার মসিহউদ্দীন শাকের এবং শেখ নিয়ামত আলী তাঁদের জীবনের প্রথম ছবি নির্মাণের জন্য নির্দ্বিধায় বেছে নিয়েছেন 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসটিকে। তারপর চিত্রনাট্যের ছাঁচে ফেলে, ক্যামেরার বিভিন্ন কোণ ব্যবহার করে সেলুলয়েডের ফিতায় নির্মাণ করেছেন একটি ভার্চুয়াল সমাজ—যা দেশ-কালের উর্ধ্বে সকল অসহায় নির্যাতিত মানুষের সাধারণ চিত্র, নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদের ভাষা, নারী-মুক্তির আন্দোলন, তৎকালীন সমাজচিত্রের প্রমাণ্য দলিল। সেইসঙ্গে লোকায়ত গ্রাম বাংলার সহজ বিন্যাস—ধানের ক্ষেত, সবুজ মাঠ, পানাপুকুর, হুকোর গুরগুর শব্দ, হিজল-তমালের সাড়ি, বাতাসে কলাপাতার উদ্যাম নৃত্য, তালপাতায় বোনা বাবুইয়ের বাসায় পাখিদের উড়াউড়ি–কিরিমিচির শব্দ, ঘুঘু আর কোকিরের ডাকাডাকি। পাশাপাশি

বাস করা সবলের নিপীড়নে দূর্বলের উষ্ঠাগত প্রাণ হতে ক্ষীণ প্রতিবাদ ; 'গায়ের শক্তিমান ও শক্তিহীন মানুষ! অত্যাচার ও অত্যাচারিত মানুষের হাহাকার! শতাব্দী লাঞ্ছিত ইতিহাস, বাংলার গ্রামের ইতিকথা নকশী কাঁথার মতোই সূর্য-দীঘল বাড়ির সর্বাঙ্গে জড়ানো।'[৩]

সূর্য-দীঘল বাড়ী : উপন্যাস ও সিনেমার শিল্পরূপ

'আবার তারা গ্রামে ফিরে আসে। পেছনে রেখে আসে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মা-বাপ, ভাই-বোন। ভাতের লড়াইয়ে তারা হেরে গেল।'[৪] কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাকের 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের শুরু এমনই আকস্মিকতা দিয়ে। পরের বাক্যেই—'অনেক আশা, অনেক ভরসা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে তারা শহরের বুকে পা বাড়িয়েছিল'।[৫] এই কয়েকটি লাইন পড়েই পাঠকরা তাদের মনে চিত্রকল্প রচনা শুরু করতে থাকেন বিভিন্নভাবে। তবে সাধারণ্যে পাঠকচিত্তে যে চিত্রকল্পটি ফুটে ওঠে তা হল—একদল ভাগ্যান্বেষী লোক দু'মুঠো ভাতের সন্ধানে অনেক আশা নিয়ে শহরে গিয়েছিল। ভাগ্যদেবী তাদের সহায় হয়নি। আবার তাদের গ্রামে ফিরতে হয়েছে। একের পর এক লাইনের মধ্য দিয়ে পাঠক গল্পভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। ভাতের সংগ্রামে পর্যুদস্ত কঙ্কালসার মানুষের বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টা ও পঞ্চাশের মন্বন্তর নামক দুর্ভিক্ষের এক করুণচিত্র তাদের মানস্পটে ভেসে ওঠে। 'সূর্য দীঘল বাড়ী' সিনেমায় নাম ভূমিকার পরেই কলো ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর ভেসে উঠে সাদা হরফে লেখা 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ'। মূল সিনেমা শুরুর আগে পরিচালকদ্বয় কিছু সংগৃহীত দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। প্রথম শটেই দেখা যায় মাটিতে যুদ্ধট্যাংক আর আকাশে উড্ডয়ণমান কিছু যুদ্ধবিমান ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে যাচ্ছে। পরের শটে বোমা বিস্ফোরিত হচ্ছে। শটের ক্রমান্বয়ে দেখা যায়—ট্যাংক ছুটে যাচ্ছে, আকাশ থেকে বিমানগুলো উপর্যপুরি বোমা নিক্ষেপ করছে, ট্যাংকের গোলা একটি বিমানকে ভূপাতিত করছে।[৬] এই শটগুলো দিয়ে যে কোন দর্শকই অনায়াসে বুঝে নিতে পারেন—এটি যুদ্ধকালীন কোন সময়কে নির্দেশ করছে। তবে 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ' কথাটি শুরুতেই বলে না দিলে যেসব দর্শক উপন্যাসটি পড়েননি তারা দোলাচলে পরে যেতেন—এটি কোন যুদ্ধ? সিনেমার চিত্রনাট্য এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে চিত্রনাট্যকারদের প্রাজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনের সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। যদিও এটি তাঁদের প্রথম চিত্রনাট্য রচনা। মূলত চলচ্চিত্র-সংসদকর্মী হিসেবে এ বিষয়ে তাঁদের ছিল অগাধ পড়াশোনা ও দীর্ঘ প্রস্তুতি। তাঁরা জানতেন—'একটি সুলিখিত চিত্রনাট্যই একটি সুনির্মিত ছবির প্রধান অবলম্বন। আমাদের দেশের সাধারণ চলচ্চিত্র নির্মাতারা চিত্রনাট্য বিষয়টিকে স্বচ্ছভাবে উপলব্ধি করতে পারেন না। চিত্রনাট্য রচনার জন্যে শৈল্পিক ব্যাপ্তি ও মানসিক পরিপক্বতা অপরিহার্য।'[৭]

উপন্যাসের শুরুতে পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোন কথাই লেখা নেই। এই মন্বন্তরের কারণ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্ব রাজনীতি-অর্থনীতির উত্থান-পতন, অবিভক্ত বাংলার অতিমুনাফালোভী মজুতদার ও ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত লোভ-লালসা। ফলশ্রুতিতে খাদ্যের অভাবে কয়েক লক্ষ গরিব অসহায় মানুষের না খেয়ে ধুঁকেধুঁকে মৃত্যুবরণ। আধমরা হাড্ডিসার মানুষগুলোর বেঁচে থাকার আশায় পানাপদ্মের মতো এদিক-সেদিক ছুটেচলা। কখনো তারা গ্রাম থেকে শহরে ছুটে গিয়েছে দু'মুঠো ভাতের আশায়। না পেয়ে আশাহত বদনে আবার তাদের ফিরে আসতে হয়েছে গ্রামে। "বাংলা ১৩৫০ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে অবিভক্ত ভারতের বাংলায় ব্যবসাসীদের কারসাজিতে 'পঞ্চাশের আকাল' নামে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তাতে বহু লক্ষ দরিদ্র মানুষ প্রাণ হারায়"[৮]—ইতিহাস থেকে একথা প্রায় সকলেরই জানা। যেহেতু চলচ্চিত্রে দর্শকের কল্পনার

কোনপ্রকার অবকাশ বা স্বাধীনতা থাকে না এবং চলচ্চিত্রকারকেই ঘটনা বর্ণনার দ্বায়ভার নিতে হয়। ফলে মসিহউদ্দীন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' এই শব্দদুটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফিরে গেছেন ঘটনার নেপথ্যে। সিনেমার শুরুতেই দেখিয়েছেন যুদ্ধ, সুযোগ সন্ধানী মজুতদারদের গুদামে খাদ্যের পাহাড়। অপরদিকে খাদ্যের অভাবে মরে পড়ে থাকা আবাল-বৃদ্ধের লাশ, মড়কের প্রতীক শকুনের উড়াউড়ি, বুভুক্ষু মানুষের কান্না যা দর্শকচিত্তকে বেদনাপ্লোত করে। সেইসঙ্গে দেখিয়েছেন অসহায় দৃষ্টিতে খাদ্যের জন্য দুইহাত তুলে উপরের দিকে তাকিয়ে থাকা শিশুর দৃশ্য—যা দেখে দর্শকমনে প্রশ্ন জাগে ক্ষুধা-কাতর হাড্ডিসার মানুষগুলোর খাদ্যের জন্য ফরিয়াদ সমাজের উঁচুস্তরের মানুষের প্রতি, নাকি সৃষ্টিকর্তার নিকট? চলচ্চিত্রকারদ্বয় দ্বান্দ্বিকতাপূর্ণ এই শৈল্পিক দৃশ্যের অবতারণা করেছেন প্রতীক ও ডিটেলের সুনিপূন ব্যবহারে। এমনই এক মন্বন্তরের ছবি সিনেমায় ধারণ করার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মৃণাল সেন বলেছেন—"'বাইশে শ্রাবণ' (১৯৬০)-এর যে দৃশ্য আমরা তুললাম তা হোলো তেতাল্লিশের মন্বন্তরের এক ভয়াবহ ছবি। কেমন করে মানুষেরই তৈরি মহামন্বন্তরে পিঁপড়ের মতো দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবীর চোখের সামনে তিল তিল করে মরে গেল সেই কথাই সেদিন আমরা বললাম আমাদের ছবিতে। সেই নারকীয় মারণ যজ্ঞের ভয়ঙ্কর চাপে ব্যক্তি-মানুষ কেমন করে তার শেষ মানবিক অনুভূতিটুকুও হারিয়ে ফেলেছিল তাই আমরা আমাদের বুকের সমস্ত উত্তাপ আর ঘৃণা দিয়ে ছবিতে হাজির করলাম।"[৯] মসিহউদ্দীন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী মৃণাল সেনের সেই অনুভূতিটুকুই যেন পুনরায় লেপে দিয়েছেন তাঁদের সিনেমার গায়ে।

চলচ্চিত্রকারকে যেমন একটি শব্দ বা একটি ঘটনা বর্ণনা করতে বেশকয়েকটি দৃশ্যের অবতারণা করতে হয়, তেমনি লেখককেও একটি ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেকগুলো শব্দ ; কখনো কখনো অনেকগুলো লাইনের আশ্রয় নিতে হয়। চলচ্চিত্রের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষা কখনোই একরকম নয়। চলচ্চিত্রকারের ভাষা সৃষ্টির মাধ্যম ছবি। ছবির পর ছবি সাজিয়ে তিনি দৃশ্য সৃষ্টি করেন। সাহিত্যিকের ভাষা সৃষ্টির মাধ্যম শব্দ। শব্দের পর শব্দ লিখে তাঁকে ঘটনা বর্ণনা করতে হয়। গল্পকারের এখানে স্পেসের সীমাবদ্ধতা নেই। কিন্তু চলচ্চিত্রকারের সময় সীমিত। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁর কাহিনি শেষ করতে হয়। সাহিত্যিক কোন ঘটনাকে বর্ণনা করতে গিয়ে দশ লাইন বেশি লিখলেও সমস্যা হয় না। চলচ্চিত্রকারকে সময় সীমাবদ্ধতার কারনে অনেক সময় মূল ঘটনাকে কেটেছেটে সংক্ষেপ করতে হয়। তাঁর কাছে ছবির প্রতিটি ফ্রেম অনেক মূল্যবান। তাই কম ফ্রেম ব্যবহার করে তাঁকে বেশি ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে হয়। 'সূর্য দীঘল বাড়ী' সিনেমায় চলচ্চিত্রকারদ্বয় কয়েকটি দৃশ্যের মাধ্যমে পুরো মন্বন্তরের ঘটনাকে দর্শকদের সামনে চাক্ষুষ করতে সমর্থ হলেও আবু ইসহাক 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিবরণ যেভাবে দিয়েছেন তাতে পাঠকের কল্পনায় আরো অনেক দৃশ্য ফুটে ওঠার অবকাশ থেকে যায়:

> অনেক আশা, অনেক ভরসা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে তারা শহরের বুকে পা বাড়িয়েছিল। সেখানে মজুতদারের গুদামে চালের প্রাচুর্য, হোটেলে খাবারের সমারোহ দেখে তাদের জিভ শুকিয়ে যায়। ভিরমি খেয়ে গড়াগড়ি যায় নর্দমায়। এক মুঠো ভাতের জন্যে বড়লোকের বন্ধ দরজার ওপর মাথা ঠুকে ঠুকে পড়ে নেতিয়ে। রাস্তার কুকুরের সাথে খাবার কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়। দৌলতদারের দৌলতখানার জাঁকজমক, সৌখিন পথচারীর পোশাকের চমক ও তার চলার ঠমক দেখতে দেখতে কেউ চোখ বোজে। ঐশ্বর্যারোহীর গাড়ীর চাকায় নিপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারায় কেউ বা। যারা ফিরে আসে তারা বুকভরা আশা নিয়ে আসে আসে বাঁচবার। অতীতের কান্না চেপে, চোখের জল মুছে তারা আসে, কিন্তু মানুষের চেহারা নিয়ে নয়। তাদের শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। পেট গিয়ে মিশেছে পিঠের সাথে। ধনুকের মত বাঁকা দেহ— শুষ্ক ও বিবর্ণ। তবুও তারা ভাঙা মেরুদণ্ড দিয়ে সমাজ ও সভ্যতার মেরুদণ্ড সোজা করে ধরবার চেষ্টা করে। ধুক্‌ধুকে প্রাণ নিয়ে দেশের মাটিতে

প্রাণ সঞ্চার করে, শূন্য উদরে কাজ করে সকলের উদরের অন্ন যোগায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরে হুঁচোট খাওয়া দেশ আবার টলতে টলতে দাঁড়ায় লাঠি ভর দিয়ে।[১০]

প্রথম দৃশ্যের ৭ নম্বর শটে দেখা যায়—শহুরে বস্তি, ঝুপরি ঘরের সামনে এক বৃদ্ধ গালে হাত দিয়ে বসে আছে। বাঁদিকে ক্যামেরা প্যান করে এগুচ্ছে। একটি ঘরের বেড়ায় ঝুলছে জ্যোতিষির সাইনবোর্ড। ভাগ্যাহত অসহায় মানুষগুলো নিজেদের ভাগ্যের ভবিষ্যৎ জানতে নির্ভর করে এসব জ্যোতিষালয়ের। যদিও কখনোই তাদের ভাগ্য ফেরে না। তবুও ভাগ্যের সন্ধানে কোলের শিশুকে নিয়ে অসহায় মায়ের নিরন্তর পথচলা। জয়গুনের কাছে এসে ক্যামেরা স্থির হয়। গরুর গোবর দিয়ে রান্নার জ্বালানি তৈরি করতে ব্যস্ত জয়গুন। যদিও রান্নার জন্য ঘরে একমুঠো চাল অবশিষ্ট আছে কিনা সন্দেহ। তারপরও এসব ভুখা মানুষেরা সবসময় আশায় বুক বাঁধে। আশাই তাদের বাঁচিয়ে রাখে। তাই চাল জোগারের নিকট সম্ভাবনা না থাকলেও জ্বালানির জোগার তাদের করে রাখতে হয়। পরের ক্লোজশটে তার চোখ-মুখে দেখা যায় স্বপ্নের ঝিলিক, নেপথ্যে ঢেকিতে ধান ভানার শব্দ। ভাতের চালের যোগার নেই— জ্বালানিও এখানে সহজলভ্য নয়। যে স্বপ্ন নিয়ে তারা একদিন শহরে এসেছিল, সেই একমুঠো ভাত এখানে অনেক চড়া মূল্যের। জয়গুনকে আবার হাতছানি দেয় গ্রাম। তাই আবার 'দুটি ছেলে-মেয়ের হাত ধরে জয়গুন গ্রামে ফিরে আসে। বাইরের ছন্নছাড়া জীবন এতদিন অসহ্য ঠেকেছে তার কাছে। কতদিন সে নিজের গ্রামে ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করেছে, স্বপ্ন দেখেছে।'[১১] পরিচালকদ্বয়ের কর্ম-চাতুর্যে এই দৃশ্য দ্বারা দর্শক বুঝতে সক্ষম হয়—এই স্বপ্ন পরের বাড়িতে সারাদিন ঢেকিতে ধান ভেনে সন্ধ্যায় ছেঁড়া শাড়ির আঁচলে বেঁধে এক/দেড় সের চাল নিয়ে চঞ্চল পায়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলা ; সারাদিন ক্ষুধার্ত পাখির ছানার মতো ছটফট করা ছেলেপুলেদের নিয়ে রাতে মাটির হাড়িতে রাঁধা ফেন-ভাত তৃপ্তিসহকারে খাওয়া। যার ইঙ্গিত পরিচালকদ্বয় দিয়েছেন ঢেকিতে ধান ভানার শব্দ-যোজনায়। উপন্যাসের শুরুতেই জয়গুনদের গ্রামে ফিরে আসার বর্ণনা থাকলেও সিনেমায় শহুরে জীবন থেকে গ্রামে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। আর শহর থেকে গ্রামে ফিরে যাওয়ার মাঝে সংযোগ স্থাপন করেছে ঢেকিতে ধান ভানার নেপথ্য শব্দ। ফলে সিনেমার নান্দনিকতা ও শিল্পসার্থকতা এই দৃশ্যে এসে ধরা দিয়েছে। তবে কোন কোন দর্শকের কল্পনায় এই স্বপ্ন হয়ত অন্যভাবে ধরা দিতে পারে। যেমন: পোস্টমাস্টার গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের সম্ভাবনা দেখা যায় না।'[১২] এই লাইন তিনটি দিয়ে পাঠকের কল্পনায় রতন মূর্ত হয়ে উঠে বিভিন্নভাবে। কেউ হয়ত ভাবতে পারেন রতন কুচকুচে কালো, কেউ কেউ ভাবতে পারেন শ্যামলা বা ফর্সা, ছিপছিপে বা মোটাসোটা, লম্বা বা বেটে চঞ্চল কিংবা শান্ত। কেউ তার পরনে কল্পনা করতে পারেন ছেড়া ফ্রক ও হাফপ্যান্ট আবার কেউ পাটের মোটা শাড়ি। পাঠকের কল্পনা এখানে বহুমুখী। কিন্তু চলচ্চিত্রকারের হাতে এতো সুযোগ নেই। তাকে ঘটনাটি এমনভাবে দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করতে হয় যাতে অধিকাংশের কল্পনার সঙ্গে মিলে যায়। অথবা সিনেমা দেখার পর বহুমতধারী পাঠকগণের মনে উপলব্ধি হয়—গল্পটি পড়ার সময় তারা-ই হয়ত ভুলভাবে কল্পনা করেছে। এখানেই সার্থক চলচ্চিত্রকারের মুন্সিয়ানা। সত্যজিৎ রায় তাঁর 'তিন কন্যা' ছবিতে রতনকে দেখিয়েছেন ছোটখাট চেহারার শাড়ি পড়িহিত এক চঞ্চল বালিকা হিসেবে।[১৩] রতনের এই মূর্তিটি রবীন্দ্রনাথ এভাবে ভেবেছিলেন কিনা জানা না গেলেও তৎকালীন সমাজ বাস্তবতায় বারো-তেরো বছরের একটি অনাথ গ্রাম্য মেয়ের বেশভুষা এমনটি হতে পারে—এটি সহজে অনুমেয়।

চারদিকে বিরাণ ফসলের মাঠ। তার আল ধরে জয়গুন গ্রামে ফিরে আসে। সঙ্গে আসে ছেলে হাসু, মেয়ে মায়মুন, ভাই-পো শফি ও শফির মা। গ্রামে তাদের বসত ভিটে নেই। আকালের সময় ক্ষুধার জ্বালা মিটাতে সব বেঁচতে হয়েছিল। একমাত্র ভরসা একটা ছাড়া-ভিটে। কিন্তু এই বাড়ির অতীত ভয়ংকর। গ্রামবাসীরা ভয়ে কেউ দিনের বেলায়ও এদিকের ছায়া মাড়ায় না। সবার মনে

বদ্ধমূল ধারণা এই বাড়িতে যারা বসবাস করে তারা নির্বংশ হয়ে যায়। এ নিয়ে গ্রামে অনেক গল্প ছড়িয়ে আছে। গল্পের যে নামকরণ, তা এই বাড়িটিকে ঘিরেই। সূর্যের উদয়াস্তের দিকে অর্থাৎ পূর্ব পশ্চিমে লম্বা ভিটেকে 'সূর্য দীঘল বাড়ি' বলা হয়। গ্রামের লোকেরা এই বাড়িতে উঠার জন্য জয়গুনকে নিষেধ করে। কিন্তু কেউ অন্যত্র থাকার জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে এগিয়ে আসে না। ফলে গ্রামের লোকদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা রেখে জয়গুন সূর্য দীঘল বাড়িতে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। এটি শুধুমাত্র দারিদ্রের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম নয়, প্রথাগত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অবস্থান নয়—পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রামী নারীর নীরব প্রতিবাদও। জয়গুন বাংলাদেশের অসহায় নারীদের বিমূর্ত অবস্থার মূর্ত প্রতীক।[১৪] মসিউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী চলচ্চিত্রে জয়গুনকে এভাবেই চিত্রিত করেছেন। ছবিতে গ্রামের ভিতরে জয়গুনের দাদা সম্পর্কীয় এক বয়স্কের সঙ্গে কথোপকথন লক্ষ করলে দেখা যায়:

> দাদা: ...তরা থাকবি কোনহানে?
> জয়গুন: আমাগ তালগাইছা বিডাত্ গর তুলুম
> দাদা: তালগাইছা বিডাত্ গর তুলবি? পোলাপাইন লইয়া থাকবি, জায়গাডাত বালনা
> জয়গুন: আমাগো আল্লাই দেকব দাদা... [১৫]

শেষ ডায়ালগটিতে জয়গুনের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছে আবু ইসহাকের জয়গুনের মধ্যে উপন্যাসের শুরুতে এমনটি দেখা যায় না। বরং তখনও সে গ্রামের অন্যদের মত ভীতু ও কুসংস্কারাচ্ছন্নই ছিল। 'জয়গুন ও শফির মা সাত-পাঁচ ভেবে এ বাড়িতে বাস করার আশা ছেড়েই দিয়েছিল। ছেলেমেয়ের মঙ্গল আশঙ্কা করেই নিরস্ত হয়েছিল বিশেষ করে। কিন্তু একদিন এক নামকরা ফকির-জোবেদ আলী এ সঙ্কট থেকে তাদের উদ্ধার করে। সূর্য দীঘল বাড়ীর চারকোনে চারটা তাবিজ পুঁতে এসে সে জানিয়ে দেয়—এই বার চউখ বুইজ্যা গিয়া ওড বাড়ীতে। আর কোন ডর নাই।'[১৬] উপন্যাসে ফকির অভয় দেয় জয়গুনকে। সিনেমায় দেখা যায় সাহসী জয়গুন লোকের দেখানো ভয় অগ্রাহ্য করে সোজা সূর্য-দীঘল বাড়িতে গিয়ে ওঠে। কয়েকদিন খোলা আকাশের নিচে গাছতলায় নির্ভয় রাতযাপন করে। তারপর লেদুর সাহায্য নিয়ে বাঁশ-খড়-পাটখড়ি দিয়ে মাথা গুঁজার মত দু'ভিটেয় দুটো ঘর তৈরি করে। এর মধ্যে একদিন এ পথে যাওয়ার সময় জোবেদ আলী দেখে সূর্যদীঘল বাড়িতে নতুন ঘর তৈরি হচ্ছে। লেদুকে দেখে বাড়িতে না ঢুকে ঐদিন অন্যদিকে চলে যায়। পরে সুযোগ বুঝে অন্য একদিন এসে ভয় দেখায়:

> জোবেদ ফকির : গর ওডাইলানি?
> শফির মা : হ, খারান, একটা পিরি..
> জোবেদ ফকির : থাইক্ থাইক্, পিরি লাগবনা, এই বিডায় তোমগো গর তুলতে কেডায় কইছিল।
> শফির মা : এইডাত আমাগ বিডাই।
> জোবেদ ফকির: হুম, বিডাত তোমগই, কিন্তু জ্বিনেত আছর কইরালাইছে, এই গাছগুলাইত বেবাক জ্বিনের বাসা।[১৭]

ফকির জোবেদ আলীর কথায় ভয় পেয়ে শফির মা অনুনয় করে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে। ফকিরও ত্রাতার ভূমিকা নিয়ে বাড়ির চারকোনায় চারটা তাবিজ পুঁতে আসে (ফকিরের ভাষায় জ্বিন তাড়ানোর পাহাড়া), ধুলাপড়া দিয়ে জ্বিনদের আড্ডা ভেঙে দেয়। এক বছরের জন্য নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়। শফির মা আর জয়গুন খুশি হয়। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দুজনেই ফকিরকে চাল দেয়। এখানে আবহমান গ্রাম বাংলার সহায়-সম্বলহীন মানুষদের বিপদের সুযোগ নিয়ে ভন্ড ফকিরদের লোক ঠকানোর চিরায়ত রূপটি ওঠে এসেছে। চলচ্চিত্রকারদ্বয় নিঃসন্দেহে ঘটনা চিত্রণে অনেক সাবধানী ছিলেন। আর অতি সাবধানতাও মাঝে মাঝে অসাবধানী ভুলের কারণ হয়ে দাড়ায়—যা আপাত

দৃষ্টিতে সূক্ষ হলেও ঘটনা বিশ্লেষণে এর ব্যাপকতা ধরা পরে। উপন্যাসে শফির মা তার ভিক্ষার ঝুলি খালি করে ফকিরকে দেয় সোয়া সের চাল আর জয়গুন দেয় সোয়া পাঁচ আনা পয়সা (সূ. দী. বা. উ./ পৃ. ১১)। কিন্তু ছবিতে দেখা যায় শফির মা একটি মাটির পাত্রে চাল নিয়ে বসে কুলা দিয়ে কুড়া ঝাড়ছে। সেখান থেকে দু'হাত ভরে ফকিরকে যে পরিমান চাল দিয়েছে তা কোনভাবেই এক পোয়ার বেশি নয়। আর জয়গুন পাঁচআনার পরিবর্তে দিয়েছে যৎসামান্য চাল। এই দৃশ্যটিতে চলচ্চিত্রকারদের সজাগ দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়নি। কেননা শফির মা ভিক্ষা করে বলে তার কাছে চাল সহজলভ্য, কিন্তু জয়গুনকে চাল কিনে খেতে হয়। অপরদিকে শফি স্টেশনে মোট বহন করে নগদ টাকা আয় করে ; সে হিসেবে জয়গুনের কাছে পয়সা থাকাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া সিনেমায় তখনও জয়গুনকে নিজে আয় করতে দেখা যায়নি।

জয়গুন এই গ্রামের মেয়ে। এই ভিটাও তার বাবার কেনা। এখানকার সবাই তার চেনা-জানা। জয়গুন শহর থেকে গ্রামে ফেরত আসার পথে তার এক দাদার সঙ্গে কথোপকথনেও তাকে এই গ্রামের মেয়ের মতোই স্বাভাবিক আচরণ করতে দেখা যায় চলচ্চিত্রে। শফির মা এই গ্রামের বউ। তাই তাকে বউয়ের মতোই ঐ সময় চুপচাপ দেখা গেছে। কিন্তু ফকিরের সামনে শফির মা ছিল উচ্চকণ্ঠ। জয়গুন সেখানে সলজ্জ। ঘোমটা দেওয়া গায়ের বধুর মতো। যেটা দর্শকমনে দ্বন্দের সৃষ্টি করতে পারে। বিষয়টি পুরো ছবিতে দেখানো জয়গুনের সংগ্রামী চরিত্রের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। চলচ্চিত্রকার মসিউদ্দিন শাকেরের নিজের অভিমত অনুযায়ী 'জোবেদ ফকির কোন গাঁয়ের লোক তা উপন্যাসে পরিষ্কার নয়, তাকে ভিনগাঁয়ের লোক হিসেবে ধরেই সিনেমায় জয়গুনকে ফকিরের সামনে স্বলজ্জ ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।'[১৮]

সিনেমায় জয়গুন প্রথম থেকেই জোবেদ ফকিরকে সন্দেহ করত। কখনো কখনো ফকিরের প্রতি বিরক্ত হতো। অযথা কথার উত্তর দিত না। মাঝে মাঝে পিছ-দুয়ার দিয়ে সরে পড়ত। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে তার ঘরে ঢোকে ফকির যখন জয়গুনকে কুপ্রস্তাবের ইঙ্গিত দেয় তখন সে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। অসহায়ত্ব বরণ করে নিজেকে ফকিরের হাতে সঁপে না দিয়ে চুনের ঘাট্টা মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে উপন্যাসের জয়গুনের মতো প্রতিবাদী কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে—'কুত্তার পয়দা! বাইর অ, বাইর অ ঘরতন।'[১৯] চলচ্চিত্রকারকে সবসময় লেখকের দেখনো পথে হাটতে হবে এমন নয়। চলচ্চিত্রকারের স্বাধীনতা আছে কাহিনিকে ভাঙবার, ভেঙে গড়বার। কেটে বাদ দেওয়ার আবার নতুন কিছু সংযোজন করার। কিন্তু এই ভাঙা-গড়া, কাটা-সংযোজনের মধ্য দিয়ে মূল কাহিনির সর্বনাশ ঘটানো কারো কাম্য নয়। ভাঙা-গড়ার এই খেলায় উত্তীর্ণ সফল চলচ্চিত্র যেমন একদিকে সাহিত্যকে উচ্চমার্গে নিয়ে যেতে পারে, অন্যদিকে এর সর্বনাশ সাহিত্যকে কালিমালিপ্ত করতে পারে। 'পরিচালকের সৃষ্টিশীল মন ও মনন যেকোন বিষয় নিয়েই যেমন অসামান্য সিনেমার জন্ম দিতে পারে, আবার উল্টোটাও হতে পারে। অর্থাৎ বুদ্ধিহীন সিনেমা-পরিচালক অসামান্য বিষয় পেয়েও শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর তৈরি করে বাঁদরকেই শিব ভাবতে শুরু করেন।'[২০] চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে চলচ্চিত্রকারদ্বয় মূল কাহিনির সঙ্গে সিনেমার ঘটনার আগ-পিছু করেছেন। উপন্যাসে প্রথম অধ্যায়ে আবু ইসহাক মুখে চুনের ঘটি নিক্ষেপের মাধ্যমে জোবেদ আলী ফকিরের অধ্যায়টি আপাত সমাপ্ত করেছেন। 'এ ব্যাপারের পর জোবেদ আলী ফকির আর তার চুন-কালির মুখ সূর্য-দীঘল বাড়ীতে দেখায়নি (সূ. দী. বা. উ./ পৃ. ১৩)।' উপন্যাসের শেষপ্রান্তে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য তার উপস্থিতি পুনরায় দেখা যায়। কিন্তু সিনেমায় পরিচালকদ্বয় কাহিনিকে নাটকীয় করার জন্য প্রথমদিকে চরিত্রটিকে কিছুদূর পর্যন্ত সামনে টেনে নিয়ে গেছেন।

উপন্যাসের দুই নম্বর পরিচ্ছেদ শুরু হয় হাসু ও মায়মুনের ভাত খাওয়ার ঘটনা থেকে। কিন্তু সিনেমায় দেখা যায়, জোবেদ ফকিরের জ্বিন তাড়ানো অধ্যায় শেষ হওয়ার পর হাসুর সংগ্রামী জীবন ;

একটি মোটের আশায় চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্লাটফর্ম ধরে ছুটে চলা। এই ছুটে চলা শুধু হাসুর একার নয়, সবাই ছুটছে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। সবার উদ্দেশ্য এক, দু'মুঠো খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকা। এই ছুটে চলতে গিয়ে হাসুদের নিয়ত হোঁচট খেতে হয়। দৌড়ে ট্রেনে উঠে কোনরকমে একটি মোট সংগ্রহ করতে পারলেও স্টেশনের নম্বরধারী কুলিরা গাট্টা মেরে তা ছিনিয়ে নেয়। আবার তাঁদের চোখ ফাঁকি দিয়ে দু-একটি মোট বহন করতে পারলেও লোকেরা নম্বরী কুলি নয় বলে পয়সা কম দেয় (সূ. দী. বা. চ./ দৃ. ৪০)। তবুও হাসুদের থেমে থাকলে চলে না—টিকে থাকার অন্য উপায় খুঁজে নিতে হয়। ইট ভেঙে, ইট টেনে, কখনো নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। সেখানেও মহাজনরা তাদের ঠকায়, তারপরও কোন উপায় থাকে না। "Every film is part of the economic system it is also a part of the ideological system, for 'cinema' and 'art' are branches of ideology." [২১] –এ কথার সত্যতার মতোই চলচ্চিত্রকারদ্বয় ও ঔপন্যাসিক যুগপৎ তাঁদের সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতিফলন স্বরূপ শ্রেণী-বৈষম্যের চিত্র প্রকাশের পাশাপাশি বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সমগোত্রীয়দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সবল কর্তৃক দুর্বলের উপর অর্থনৈতিক শোষণের বাস্তব রূপটি দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন তাঁদের স্ব স্ব শিল্পমাধ্যমে।

হাসুর একার রোজগারে সংসার চলে না। তাই জয়গুনকেও লালুর মার সঙ্গে অন্যের বাড়িতে ধান ভানার কাজ করতে হয়। অন্যের বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে গৃহকর্ত্রীর মুখ ঝামটা জয়গুনের ভালো লাগেনা। তাই যখন জানতে পারে লালুর মা ময়মনসিংহ থেকে চাল কিনে এনে নারায়ণগঞ্জ শহরে বিক্রি করে। জয়গুন তাতে উৎসাহী হয়ে উঠে। অন্যের কাজ ছেড়ে স্বাধীনভাবে চালের ব্যবসা শুরু করে। এতে দু'বেলা ভাতের সংস্থানের যোগান হয়। কিন্তু জয়গুনের মতো স্বাধীনচেতা নারীকে ঐ সময়ের প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ সমাজে হয় পতিত, না হয় ধর্ম-অমান্যকারী হিসেবে চিহ্নিত হতে হয়। তাই মায়মুনের পালিত হাঁসের প্রথম ডিম মসজিদে দান করতে গেলে ইমাম সাহেব যখন জানতে পারে জব্বর মুন্সির স্ত্রী জয়গুন ট্রেনে করে চাল এনে ব্যবসা করে, তখন সে বেপর্দা নারীর দান হারাম মনে করে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বলে—'আল্লাহ তার বান্দারে... হারাম থন হেফাজত করে (সূ. দী. বা. চ./ দৃ. ২৮)।' ছবিতে দেখা যায় জয়গুনদের মতো অসহায়রা নিজে অভুক্ত থেকে হাঁসের পাড়া প্রথম ডিম ধর্মজ্ঞান করে মঙ্গলের আশায় মসজিদে দান করে। আর মসজিদের ইমামগণ এইসবের দাতারা নিজেরা ঠিকমতো খেতে পায় কিনা সে খবর না রেখে নিজে খাওয়ার জন্য অবলীলায় তা গ্রহণ করে। আবার কেউ যদি কোন বিষয়ে আপত্তি তোলে তবে এসব দানকে হারাম আখ্যা দিতেও তাঁদের কুণ্ঠাবোধ হয় না। হাসু যখন মসজিদের ইমামের কাছে ডিম নিয়ে যায় ইমাম প্রথমে খুশিমনে তা গ্রহণ করতে যায়, কিন্তু যখনই পাশে থাকা মুসল্লি জয়গুনের পর্দা না করা নিয়ে আপত্তি জানায় তখনই সে হালাল খাবারকে হারাম বানিয়ে দেয়। কিন্তু ইসলামে হালাল খাবারকে হারাম মনে করাই একটি হারাম কাজ। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে—'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তারা তাকে হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীনকে তাদের দীন হিসাবে গ্রহণ করে না।'[২২] এসব লোকদেখানো ধর্মের সামাজিক সুবিধাভোগীরা চিরকালই দুর্বলের উপর শোষণ ও শাসনের হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করে এসেছে। ঔপন্যাসিকের মতো চলচ্চিত্রকারদ্বয়ও এ বিষয়টিকে শিল্পিতভাবে সিনেমায় চিত্রায়ণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ধর্মজীবীরা কখনো কখনো স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে, আবার কখনো সমাজপতিদের চাপে পরে ধর্মের অপব্যবহার করে। আলোচ্য সিনেমায় দেখা যায়, একদিকে ইমাম সাহেব জয়গুনের দেওয়া দান ফিরিয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে সমাজপতিতের সঙ্গে বেপর্দা নারী আখ্যা দেওয়া জয়গুনের মেয়ে মায়মুনের বিয়ে পড়ানোর জন্য তাদের বাড়িতে গেছে। আবার গদু প্রধানের ইচ্ছায় জয়গুনকে তওবা পড়িয়ে সামাজিক চাপে রাখার ব্যবস্থা করেছে।[২৩] মার্কস বলেছেন ধর্ম হচ্ছে 'শোষিতের দীর্ঘনিঃশ্বাস'। উপন্যাসে মৌলবী সাহেবকে (যাকে সিনেমায় ইমাম সাহেব হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে) অনেক সক্রিয় মনে হয়েছে। মায়মুনের বিয়ের দিন জয়গুনকে তওবা পড়ানোর প্রসঙ্গ উঠলে সে পর্দা করার সপক্ষে নিজ থেকে গল্প

শুরু করেন—'ঐ লোকটা তার বেপর্দা স্ত্রীকে কিছুতেই তালাক দিল না। তখন একজনের ওপর হুকুম অইল—ওরে কতল কর। লোকটাকে কাইট্টা ফেলা অইল। আর তার লহু থেইকা পয়দা অইল কি? না, একটা হারাম জানোয়ার—খিঞ্জির—শুয়োর। এইবার আপনারা দ্যাখেন, পর্দা কি চীজ। পর্দা না মানলে চল্লিশ বছরের এবাদতও কবুল হয় না খোদার দরগায়। সব বরবাদ অইয়া যায়। বেপর্দা স্ত্রীলোক আর রাস্তার কুত্তী সমান (সূ. দী. বা. উ./ পৃ. ৬৮)।' কিন্তু সিনেমায় ইমাম সাহেবকে প্রভাবশালীদের দ্বারা প্রভাবিত এবং কিছু ক্ষেত্রে অসহায় মনে হয়েছে। সিনেমার ৫৭ নম্বর দৃশ্যের ৯ নম্বর শটে গদু প্রধান কর্তৃক জয়গুনের তওবা পড়ানোর প্রস্তাবে ইমাম সাহেবকে নীরব সম্মতি প্রদান করতে দেখা যায়। আবার অসহায় জয়গুন পেটের দায়ে তওবা ভেঙে কাজের জন্য যখন পুনরায় গ্রামের বাইরে বের হয় তখনও গদু প্রধান জয়গুনকে সামাজিক শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে কথা বলতে গেলে ইমাম সাহেবকে তাদের সঙ্গে তাল না মিলিয়ে বলতে শোনা যায়—'শাস্তি আমাগো দিতে অইবো না মিয়া। আল্লাপাক নিজে কইছে যে আমি বেপর্দা আওরতের গোর আজাব মাপ করুম না। এর চাইয়া বড় শাস্তি আর কী অইতে পারে? (সূ. দী. বা. চ./ দৃ. ৭৭, শট ২)।' ইমাম সাহেবের এই দ্বান্দ্বিকতা সিনেমায় পরিলক্ষিত হলেও উপন্যাসে মৌলবী সাহেবের ভূমিকা পরিষ্কার, সে গদু প্রধানের সহযোগী—'জয়গুন তওবা করায় আজ মৌলবী সাহেবেরও খেতে আপত্তি নেই। একদিন তিনি জয়গুনের দেয়া হাঁসের ডিম ফেরত দিয়েছিলেন। কিন্তু সেইদিনের সেই জয়গুন আর এখনকার জয়গুনে তফাত অনেক। একটু আগেও সে মৌলবী সাহেবের কাছে ছিল রাস্তার কুকুর সামিল (সূ. দী. বা. উ./ পৃ. ৬৯)।' এখানে প্রশ্ন জাগে রাস্তার কুকুরের সামিল বেপর্দা নারী জয়গুনের বাড়িতে বিয়ে পড়ানোর জন্য জেনেশুনে কেন তিনি এসেছিলেন? নিশ্চয়ই আগে থেকে পরিকল্পনা করেই এখানে এসেছিলেন। এর ইঙ্গিতও উপন্যাসে পাওয়া যায়, কারণ বিয়ের আসরে গদু প্রধান কর্তৃক তওবা পড়ানোর প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্বে ইমাম সাহেব কানে কানে গদু প্রধানের সঙ্গে আলাপ করেছিল এবং এর পরপরই গদু প্রধান সোলেমান খাঁর সঙ্গে আলাপ করে এই প্রস্তাব উত্থাপন করে।

সমাজের খারাপ মানুষদের ভিড়ে জয়গুনদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কিছু ভাল মানুষও থাকে—তাদেরই একজন লেদু। জয়গুনরা গ্রামে আসার পর তাদের ছাড়া ভিটায় ঘর উঠানো থেকে শুরু করে সার্বক্ষণিক খোজ-খবর নেওয়া, নিজের বাড়ি থেকে মায়মুনের জন্য হাঁস দিয়ে যাওয়া, মায়মুনের বিয়েতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাহায্য করতে দেখা যায় তাকে। বাংলার প্রতিটি গ্রামেই এরকম নিঃস্বার্থ-নিবেদিতপ্রাণ মানুষের সংখ্যা প্রতুল। মূলত গ্রামের অন্দরে অন্তঃদৃষ্টি ফেলে চলচিত্রকারদ্বয় সিনেমা নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন। 'যেখানে গ্রাম আছে কিন্তু গ্রাম্যতা নেই, মফস্বল আছে কিন্তু উপস্থাপনায় মফস্বলীয়তা নেই। ...আবু ইসহাক তাঁর অনবদ্য উপন্যাসে যে গ্রাম এঁকেছেন এবং শাকের-নিয়ামত সেলুলয়েডে যে গ্রাম মূর্ত করতে চেয়েছেন, তার একটা ভৌগোলিক বিবরণ থাকলেও, এ গ্রাম পূর্ব-বঙ্গের যে কোনো গ্রাম, একটা আর্কিটাইপ।'[২৪] উপন্যাসে লেদু চরিত্রটি খুব বেশি সক্রিয় না হলেও সিনেমায় চরিত্রটিকে জয়গুনদের সার্বক্ষণিক হিতাকাঙ্খী রূপে দেখা যায়। লেদু চরিত্রটি এখানে হিতকারীদের আর্কিটাইপ।

উপন্যাসে বর্ষার যে বর্ণনা পাওয়া যায় ছবিতেও তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে অসাবধানতা বশত সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে যখন বর্ষার থৈ থৈ পানি দেখাতে গিয়ে একই দৃশ্যে একই স্থানে পায়ের গোড়ালিসম পানি ক্যামেরার ধরা পরে। সিনেমায় দেখা যায় হাসু যখন বাড়ির পিছনের ঘাটে বাঁধা ডিঙ্গির পানি সেচতেছিল তখন অনতিদূর সামনে দিয়ে মাল বোঝাই একটি নৌকা ভেসে যাচ্ছে। এতে বর্ষাকালের একটা চমৎকার দৃশ্য ফুটে উঠার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু মাঝখান দিয়ে গোড়ালি জল মাড়িয়ে জোবেদ ফকিরের হেটে আসা এবং যতই সে কূলবর্তী হতে থাকে পানির গভীরতা ততই বাড়তে থাকা দেখে দর্শকদের মনে প্রশ্নের উদ্রেগ হয়। এটি যে অসাবধানী ভুল নয় বরং অর্থ-ঘাটতি জনিত অসহায়তা এবং নির্মাণ জনিত জটিলতা তার প্রমান মেলে—'অর্থনৈতিক

ব্যাপারটিই অবশ্য চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে বারবার। নির্মাণ কাজ থেমে থেকেছে, মাঝে-মাঝে চলেছে, ...বর্ষার জল স'রে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে চিত্রায়ণ, নইলে দেরি করতে হবে আরো একটি বছর। কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ সারার উপায় কি? নায়িকা বদলের সমস্যা দেখা দিয়েছে, নতুন নায়িকা পেতে-পেতে বর্ষার জল কি থাকবে?[২৫] জয়গুন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রথমে শর্মিলী আহমেদকে নির্বাচন করা হয়েছিল কিন্তু তিনি ব্লাউজ ছাড়া শুধু শাড়ি পড়ে অভিনয় করতে রাজি না হলে তাঁকে নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। পরে ফেরদৌসি মজুমদারকে অভিনয়ের প্রস্তাব করা হয়। ফেরদৌসি মজুমদার ব্যস্ত থাকায় তারই পরামর্শে ডলি আনোয়ারকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।[২৬] এই তথ্য থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায়, বর্ষার শুরুতেই শুটিং শুরু হয়েছিল। অর্থ জোগাড় ও নায়িকা নির্বাচন করতে দেরি হওয়ায় বর্ষার শেষ দিকে গিয়ে শুটিং শেষ করতে হয়েছিল। যে কারণে বাড়ির পাশে ঘাট তৈরি করার জন্য মাটি খনন করে নাব্যতা সৃষ্টি করা হয়েছে। অপরদিকে মাঠের পানি অপরিবর্তিত থেকে গেছে। এই দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যাওয়ার উপায় ছিল সচেতনভাবে জোবেদ ফকিরকে দৃশ্য থেকে বাদ দেওয়া, নতুবা অন্য পথে তার আগমন ঘটানো।

উপন্যাসে চরিত্রের পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে বিস্তারিত উল্লেখ না থাকলেও চলচ্চিত্রকারদ্বয় তৎকালীন সময় ও সমাজ বাস্তবতা অনুধাবন করে যথাযথ বসনে আচ্ছাদিত করতে সক্ষম হয়েছেন। সিনামায় নারী চরিত্রগুলো ব্লাউজ ছাড়া অবস্থায় অভিনয় করলেও অশ্লীলতার ছিটেফোঁটাও পরিলক্ষিত হয়নি। বরং শৈল্পিকতার ছোঁয়ায় গ্রাম্য নারীদের জীবন-যাত্রাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে চলচ্চিত্রকারের উপলব্দি—'দুনিয়ার সর্বত্র হাঁ-করা বোয়ালেরা টোপের ভেতর শ্রেণী নিপীড়নের কাল বড়শীটাকে দেখতে পায় না। ফলে নায়িকার কদলীবৃক্ষের ন্যায় উরুসম্বলিত অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যমালা যে-দর্শক রুদ্ধশ্বাসে উপভোগ করে, সে টেরও পায় না যে পকেট খালি করে দিয়ে তার হাতে অপসংস্কৃতির নিষ্ফল একটি কলাগাছ প্রকারান্তরে ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে।'[২৭]

'সূর্য দীঘল বাড়ী' উপন্যাস ও সিনেমায় উভয়েই প্রধান অনুষঙ্গ ট্রেন এবং স্টেশন। এর উপরেই জয়গুনদের জীবিকা নির্ভর করে। এখানেই প্রতিদিন হাসুকে ছুটে আসতে হয় মোটের আশায়। চালের ব্যবসা করার জন্য জয়গুনকেও নির্ভর করতে হয় এই ট্রেনের উপর। সিনেমায় দেখা যায় হাসু এবং জয়গুন প্রতিদিন বাড়ির ঘাট থেকে কোষা নৌকা দিয়ে রেল লাইনের পাশে আসে। উপন্যাসে বর্ণিত আছে, 'ট্রেনের হুইসেল বাজে। ফতুল্লা স্টেশন এসে যাবে এক্ষুণি। তারা ঝোলি হাতে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ায়! হাসু কোষাটা পানি থেকে তুলে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। ...ফতুল্লা স্টেশনে নেমে তারা কুলগাছতলায় আসে।'[২৮] এ থেকে বোঝা যায় হাসুদের বাড়ি ফতুল্লা স্টেশনের কাছাকাছি কোন স্থানে। সিনেমায়ও লালুর মায়ের মুখে শোনা যায় ময়মনসিংহ থেকে চাল কিনে এনে নারায়ণগঞ্জ শহরে বিক্রি করার কথা।[২৯] ফলে চলচ্চিত্রকারদের স্বজ্ঞান চিন্তা ছিল ফতুল্লা স্টেশনকে সিনেমায় উপস্থাপন করার। কিন্তু সিনেমায় চিত্রায়িত স্টেশনের সঙ্গে ফতুল্লা স্টেশনের বাস্তবিক কোন মিল পাওয়া যায় না। কেননা ফতুল্লা একটি ছোট স্টেশন। অপরদিকে সিনেমায় প্রদর্শিত স্টেশনের বিশাল প্ল্যাটফর্ম ও রেললাইনের সংখ্যা দেখে বোঝা যায় এটি অন্য কোন স্টেশনের চিত্রায়ণ। একটি নিবন্ধ থেকে জানা যায়, ছবিটির কিছু অংশের শুটিং হয়েছিল নরসিংদীর ঘোড়াশাল এলাকায়।[৩০] এ থেকে ধরে নেওয়া যায় রেল স্টেশনের চিত্র ধারণ করা হয়েছে ঘোড়াশাল থেকে। আরেকটি অসঙ্গতি হচ্ছে, দেশভাগের আগের সময়কার প্রেক্ষাপটে নির্মিত সিনামায় পুরাতন ইঞ্জিন ও কামরা ব্যবহার করা হলেও ইঙ্গিনের সামনে পাকিস্তানের তারকা চিহ্ন দেখা যায়।[৩১] কিন্তু সিনেমায় ১৭ নম্বর দৃশ্যের ৯ ও ১০ নম্বর শটে 'ইংরেজ ভারত ছাড়'—এসব দেয়াল লিখন দেখতে পাওয়া যায়। আবার ২১ নম্বর দৃশ্যের ১৫ নম্বর শটে ট্রেনের কামরায় এক যাত্রী আরেক যাত্রীকে জিজ্ঞেস করতে শোনা যায়, 'পাকিস্তান হলেই কি সমস্যা চুকে যাবে?' এছাড়াও সিনেমার বিভিন্ন দৃশ্যে ব্রিটিশ আমলের প্রেক্ষাপটের প্রমান মিলে। এমনকি সিনেমায় পাকিস্তান হওয়ার পর তা উদ্‌যাপনের দৃশ্যও চোখে

পড়ে। অন্যদিকে ৯ নম্বর দৃশ্যের ১ নম্বর শটে ট্রেনের বগিতে 'বাংলাদেশ' লেখা দর্শকদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। '১৯৪৭-এর দেশবিভাগের পর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় কিন্তু যে-পরিবারের তথা যে জনগোষ্ঠীর কাহিনি উপন্যাসে বর্ণিত তারা সমাজরাষ্ট্র রাজনীতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সীমানায় প্রবেশাধিকার-বঞ্চিত। অথচ এরাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জন। আবু ইসহাক তাদের কথা বলতে গিয়ে সমাজসত্যের রূপ উদ্‌ঘাটন করেন নিরাভরণ দৃষ্টিতে।'[৩২] সিনেমায় ট্রেন আসা এবং যাওয়ার সময় চাকার উপর ক্লোজ আপ শট ব্যবহার করা হয়েছে বারবার—এতে খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের চাকা কখনো ট্রেনের মতো থমকে যাওয়া, আবার জীবিকা অন্বেষণে ছুটে চলার দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে।

হাড়ভাঙা খাটুনির পর হাসুদের পেটে সামান্য খাবার জুটে। হাঁড়িভর্তি পানিতে সামান্য কয়টা ভাত—তা থেকে সানকি ভর্তি করে পানি ও কয়েকটা ভাত খেয়ে যখন হাসুর পেট ভরে না তখন মায়ের কাছে আর কয়েকটা ভাতের আবদার করে। নিরুপার জয়গুন হাঁড়ির নিচে জমা কয়টা ভাত আঙুলের ডগায় করে হাসুর পাতে দিয়ে এবং সেই সঙ্গে ভাতের পানি ঢেলে দিয়ে বলে 'বিসমিল্লাহ্ কইয়া খা। এই দুগ্গায়ই দেহিস বরকত দিবো (সূ. দী. বা. চ./ দৃ. ১৯, শট ২)।' এমতাবস্থায় না খেতে পেয়ে তাদের শারীরিক অবস্থাও ভালো থাকার কথা নয়। উপন্যাসেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়, 'দশ বছরের মেয়ে মায়মুন। কিন্তু সাত বছরের বেশী বলে মনে হয় না। হাঁটতে গেলে পাক খেয়ে পড়ে যাবে মনে হয়' (সূ. দী. বা. উ./ পৃ. ১৪)। অপরদিকে চলচ্চিত্রে হাসু ও জয়গুনকে খেটে খাওয়া মানুষ মনে হলেও মায়মুনকে অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের সন্তানের মতো নাদুস-নুদুস মনে হয়েছে। দশ বছরের মায়মুনকে এখানে সাত বছরের পরিবর্তে বারো-তেরো বছরের মতো দেখা যায়।

নিষ্পেষিত মানুষরা রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি বোঝে না। একটু ভাল থাকার আশায় তারা সবসময় উন্মুখ হয়ে থাকে। তাই ট্রেনের কামড়ায় যখন যাত্রীরা পাকিস্তান হওয়ার পক্ষে-বিপক্ষে মতামত দেয়, 'জয়গুন মন দিয়ে শোনে সব কথা। একটি কথাই তার ভালো লাগে, আশা জাগে মনে—চাল সস্তা হবে, কারো কোন কষ্ট থাকবে না।'[৩৩] উপন্যাসে পাকিস্তান হলে জনগণের লাভ-ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করা হলেও চলচ্চিত্রকার ঘটনার গভীরে গিয়ে নেপথ্য কারণটি ব্যাখা করতে চেয়েছেন সংলাপের মাধ্যমে—'পাকিস্তান যখন হচ্ছেই তখন জিনিষপত্রের হিন্দুয়ানী নামও বদলানো দরকার (সূ. দী. বা. চ./ দৃ. ২১, শট ১৩)।' এর জবাবে অপর যাত্রী বলে— 'দেখুন, মুসলমানরা যখন বাদশা ছিল তখনও হিন্দুয়ানী-মুসলমানী নিয়ে এত কথা উঠতো না। এখন কেন উঠে? এটা ইংরেজের চালাকী (সূ. দী. বা. চ./ দৃ. ২১, শট ১৪)।' আবার দেশভাগের হুজুগে কিছু সুযোগ সন্ধানী মানুষকে তাঁদের আয়ের পথ হিসেবে এই ইস্যুটিকে কাজে লাগাতেও দেখা যায় একই দৃশ্যের ৫ ও ১০ নম্বর শটে—এক হকার ট্রেনে কৃমির বড়ি বিক্রি করে, যার নাম 'পাকিস্তান বড়ি'। চলচ্চিত্রকারদ্বয় মূল উপন্যাসের বাইরে গিয়ে দেখাতে চেয়েছেন দেশভাগপূর্ব পরিস্থিতিতে এই জনপদের রাজনীতি-সমাজনীতি ও অর্থনীতির খণ্ডচিত্র। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যখন পুরো উপমহাদেশ উত্তপ্ত এবং ব্রিটিশরা যখন এ সত্য উপলব্দি করতে পেরেছে যে তাদেরকে ভারতবর্ষ ছাড়কেই হবে তখন তারা এ উপমহাদেশে ধর্মকে ব্যবহার করে অপরাজনীতির বীজ বপন করতে থাকে। আর এটাকে পুঁজি করে তৎকালীন বাংলায় এক শ্রেণির রাজনীতিকরা 'ইসলামোম্যানিয়া' সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। শুধু তাই নয় তারা হিন্দু বিদ্বেষ সৃষ্টি করে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রেরও জন্ম দিয়েছিল। এই 'ইসলামোম্যানিয়া'-কে কাজে লাগিয়ে ফায়দাবাজরা তাঁদের স্বার্থ কিভাবে হাসিল করেছিল তা কৃমির বড়ির নাম 'পাকিস্তান বড়ি'র নামকরণের মাধ্যমে চলচ্চিত্রকারদ্বয় বোঝাতে চেয়েছেন। অন্যদিকে সাধারণ জনগণ এসব না বুঝে ভালোভাবে খেয়ে-পড়ে থাকার আশায় এসবের সমর্থন জুগিয়েছে। এর উদাহরণ খুঁজে পাই আমরা সিনেমার ৪৪ নম্বর দৃশ্যে, যেখানে হাসুকে মায়ের পুরনো শাড়ি কেটে পাকিস্তানের পতাকা বানিয়ে গাছের মগডালে উড়াতে দেখা যায়।

বাড়ির পাশে কাপড় ধোয়ার পর জয়গুন হাত-মুখ ধুতে গিয়ে হঠাৎ বিষণ্নমনে দূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে সবুজ বাঁশঝাড়ের ফাঁকে একটি বাড়ি দেখা যায়। জয়গুনের বুকের ভিতর ধক্ করে ওঠে। এইরকম একটি বাড়িতে একদিন ছোট্ট ছেলে কাশুকে নিয়ে সবুজ প্রাণবন্ত একটি সোনার সংসার ছিল তার। আকালের কালোমেঘের মতো অন্ধকার এসে তার জীবনকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। সেই মেঘ তার জীবন থেকে এখনো কাটেনি। এই দৃশ্যটিতে আকাশে কালো মেঘের প্রতীক[৩৪] ব্যবহার করে পরিচালকদ্বয় জয়গুনের মনের ভীতরের কষ্টকর অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনকে মূর্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

কুসংস্কার এই উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু। তাই উপন্যাসের নামকরণও করা হয়েছে কুসংস্কারকে আশ্রয় করে। 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' কুসংস্কার অনুযায়ী অপয়া। আলোচ্য উপন্যাসে জয়গুনদের এই সূর্য-দীঘল বাড়ির পূর্বপুরুষরাও বিভিন্নভাবে মারা গেছে। এই ভীতি থেকে পারতপক্ষে কেউ এই বাড়ির পাশ দিয়ে দিনের বেলায়ও হেঁটে যায় না। উপন্যাসের বর্ণনায়, 'পূর্ব ও পশ্চিম–সূর্যের উদয়াস্তের দিকে। পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী বাড়ির নাম তাই সূর্য-দীঘল বাড়ী। সূর্য-দীঘল বাড়ী গ্রামে ক্বচিৎ দু'একটা দেখা যায়। কিন্তু তাতে কেউ বসবাস করে না। কারণ, গায়ের লোকের বিশ্বাস— সূর্য-দীঘল বাড়ীতে মানুষ টিকতে পারে না। যে বাস করে তার বংশ ধ্বংস হয়। বংশে বাতি দেয়ার লোক থাকে না। ...সূর্য-দীঘল বাড়ির ইতিহাস ভীতিজনক।'[৩৫] প্রত্যেকটি কুসংস্কারের আড়ালে রয়েছে আসল ঘটনা, ঔপন্যাসিক এবং চলচ্চিত্রকারদ্বয় যুগপৎ এই সত্যকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। তুলে ধরেছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রভাবকেও। তাই উপন্যাসের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের জয়গুনরাও বিশ্বাস করতে শিখে হাসের পাড়া প্রথম ডিম মসজিদে দিতে হয়। জুম্মা নামাজের শেষে জনগণ ছুটে আসে মঙ্গল কামনায় কিংবা রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের আশায় ইমাম সাহেবের পড়া পানির জন্য (সূ. দী. বা. চ./ দৃ. ১৯, শট ২)। সামাজিক কুসংস্কারের পাশাপাশি ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজালে আচ্ছন্ন 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের সমাজ। "তবে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি'-র চরিত্রদের যে ধর্ম তা সম্পূর্ণ অর্থে হয়ত ইসলাম নয়, বরং পূর্ব-বাংলার জলকাদায় সম্পৃক্ত কৃষিভিত্তিক এক জনগোষ্ঠির ...লোকজ ধর্ম যেখানে ইসলাম ও প্রকৃতি ধর্ম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কলেমা-শরীয়ত-হাদীসের সাথে একই গুরুত্ব নিয়ে মন্ত্রপড়া, বানমারা, বশীকরণ, ঝাড়ফুঁকের ...জগাখিচুড়ি।"[৩৬]

ইমাম সাহেবের ফিরিয়ে দেওয়া ডিম বিক্রি করে হাসু মায়মুনের জন্য চুড়ি, কাসুর জন্য খেলনা চরকী ও খাবার জন্য কদমা কিনে। বাড়িতে যাওয়ার পথে নৌকা ভিড়িয়ে কাসুকে কদমা ও চরকী দিয়ে যায়। কাসু এতে অনেক আনন্দিত হলেও খুশি হতে পারেনি তার বাবা করিম বক্শ। কারণ তার মনে সর্বদা ভয়—কাসুকে হয়ত ফুসলিয়ে জয়গুনের কাছে নিয়ে যেতে পারে। কেননা জয়গুনকে তালাক দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার সময় মায়মুনকে মায়ের সঙ্গে দিয়ে দিলেও কাসুকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে—এই আশায় যে ছেলে বড় হয়ে তাকে রোজগার করে খাওয়াবে। তার মনে এই দুরভিসন্ধি থাকলেও হাসু কখনো মায়মুন ও হাসুকে সৎ ভাই-বোন হিসেবে দেখেনি। তাই গোপনে কাসুকে চরকী দিয়ে, কদমা খাইয়ে সে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। বাড়ির ভিতর থেকে করিম বক্শ যখন বুঝতে পেরে চেঁচিয়ে বলে—কেডারে? তখন দুজনের মনের আচমকা ভয় মূর্তমান হয়ে ওঠে চরকীর দ্রুত ঘূর্ণন ও বাদ্যযন্ত্রের আবহ সঙ্গীতে। তারপর করিম বক্শ-এর হাত থেকে দ্রুত পালিয়ে বাঁচতে পারলেও হাসু ধরা পরে যায় মায়ের হাতে। কারণ অযথা পয়সা খরচ করে চুড়ি কেনার মতো বিলাসিতা জয়গুনদের মানায় না। জয়গুন জিজ্ঞেস করতেই হাসু অকপটে স্বীকার করে যে সে ডিম বিক্রি করে এগুলো কিনে এনেছে। কিন্তু তাতেও জয়গুনের রাগ কমেনি, বাকি টাকা দিয়ে কি করেছে জিজ্ঞেস করলে কাসুর জন্য কদম আর চরকী কেনার কথা বলা মাত্রই জয়গুন শিথিল

হয়ে পড়ে। এই একটি যায়গাতেই তার অসম্ভব দুর্বলতা। কোলের শিশুকে ছাড়া থাকার যে কি যন্ত্রনা তা মুখের অভিব্যাক্তিতে ধরতে পেরেছেন চলচ্চিত্রকারদ্বয়। চরম ক্ষুধা-দারিদ্রও যে স্নেহ ভালবাসায় ঘাটতি তৈরি করতে পারেনা তা শৈল্পিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা। বিশেষত ইমাম সাহেব ডিম ফিরিয়ে দেয়ার পর পূর্ব ইচ্ছা অনুযায়ী হাসু ডিমগুলো বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে ভাঁজি করে ভাত দিয়ে খেতে পারত। কিন্তু হাসুর মনে ভাতৃত্যের যে স্নেহ-আকাঙ্খা, তার কাছে নিজের ইচ্ছা-বিলাস বিসর্জিত হয়েছে। হাসুর কাছ থেকে কাসুর খবর পেয়ে জয়গুনের মনে যে প্রশান্তির আভা ফুটে উঠেছে তা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে সিনেমায় (সূ. দী. বা. চ./ দৃ. ৩২)।

কাসু যখন তার সৎ মায়ের কাছে জানতে পারে তার মা আছে, সে পালিয়ে মায়ের কাছে চলে যেতে চায়। কিন্তু করিম বক্শ তাকে কড়া পাহারায় রাখে। হঠাৎ একদিন কাসু অসুখে পড়ে। কবিরাজ দেখিয়েও কোন লাভ হয় না। ঝাড়ফোক, রশি পড়া দেওয়ার পরও আশঙ্কাজনকভাবে অসুখের প্রকোপ বাড়তে থাকায় জয়গুনকে খবর দেওয়া হয়। উত্তর পাড়ার সাদেক খবর নিয়ে এলে শফিকে নিয়ে কাসুকে দেখতে যায় জয়গুন। অচেতন কাসুকে দেখে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। পরক্ষণেই ডাক্তার আনার কথা বলে সাদেকের সঙ্গে শফিকে ডাক্তার বাড়ি পাঠায়। রমেশ ডাক্তার এসে কাসুর নিউমোনিয়া হয়েছে বলে জানায়। জয়গুন তার হাঁস বিক্রি করে ঔষধ আনায়, নিজে সেবা করে। এতে আস্তে আস্তে কাসু সুস্থ হয়ে ওঠে। পরিচালকদ্বয় ছবির মাধ্যমে এখানে একটি মেসেজ দিতে চেয়েছেন—অসুখ হলে কবিরাজ নয়, ডাক্তার ডাকতে হয় ; সঙ্গে নিবির সেবা-শুশ্রুষা করতে হয়। অন্যথা বড় ধরনের অঘটন ঘটে যেতে পারে। এটাই শিল্পের দায়। শিল্পের মাধ্যমে মানুষের কল্যান করা। আর শিল্পীর দায় হচ্ছে শিল্পে তা প্রয়োগ করা বা ফুটিয়ে তোলা। তবে উপন্যাসে কলেরা-বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ও পরিনতি, ফলশ্রুতিতে লোকসমাজে বিদ্যমান ভয় ও ভ্রান্ত ধারণার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সিনেমায় তা একেবারেই ওঠে আসে নি। জয়গুনকে করিম বক্শ আবার ফিরে আসার প্রস্তাব দেয়, প্রয়োজনে ছোট বউকে তালাক দিতে চায়। কিন্তু জয়গুন রাজি হয় না। তার চোখে ভেসে ওঠে আকালের সময় কিভাবে কোলের শিশু কাসুকে রেখে হাসু ও মায়মুনসহ তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। করিম বক্শ জয়গুনকে পাওয়ার জন্য জোবেদ ফকিরের শরণাপন্ন হয়। পীরের মাঝারে শিন্নি খাওয়ানোর জন্য পাঁচসিকা দিয়ে ফকিরের কাছ থেকে কয়েকটি গজাল নেয়। ফকির নিশি রাতে ঘরের বাইরের কোনায় এগুলো পুঁতে দিয়ে আসতে বলে। এখানেও সাধারণের মধ্যে পীর-ফকিরের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

লালুর মা ও জয়গুনরা ময়মনসিংহ থেকে চাল কিনে এনে নারায়নগঞ্জে বিক্রি করে। কিন্তু পুলিশের জ্বালায় ঠিকমতো তাও করতে পারে না। মাঝে মধ্যেই তাদেরকে পুলিশ আটকে রাখে, খারাপ ব্যবহার করে। এরকম দৃশ্য আমরা 'গোলাপী এখন ট্রেনে'[৩৭] সিনেমায়ও দেখতে পাই। একই ছবির আরও একটি দৃশ্যের সঙ্গে 'সূর্য দীঘল বাড়ী' চলচ্চিত্রের সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। 'গোলাপী এখন ট্রেনে'-তে পেটের দায়ে ময়নাকে যখন কাজের সন্ধানে গ্রামের বাইরে যেতে হয় তখন তাকেও গ্রাম্য মাতব্বরদের সালিসের মুখোমুখি হতে হয়। 'সূর্য দীঘল বাড়ী' সিনেমায়ও দেখা যায় জয়গুনকে গ্রামের বাইরে গিয়ে চাল বিক্রির অপরাধে তওবা করতে হয়েছে। সমাজের এসব অসহায় মানুষদের দোষগুলোই শুধু সমাজপতিদের চোখে পরে। তাদের বেঁচে থাকার কোন উপায় করতে কেউ এগিয়ে আসে না। তারা একবারও ভেবে দেখে না তাদের এই রুটি-রুজির সামান্য পথ রুদ্ধ করে দিলে কিভাবে তারা বেঁচে থাকবে। সমাজপতিরা এসব অসহায় নারীদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে লালশার শিকার বানাতে চায়। জয়গুন তার সাহস ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে সন্তানদের খাইয়ে-পড়িয়ে বাঁচানোর জন্য নিজে কাজ করে যায়। 'বাঘিনীর যেমন বঙ্গরমণীরও তেমনি। নিজেকে বাঁচাতে হয়, সন্তানকে বাঁচাতে হয়।'[৩৮]

পুরো সিনেমা জুড়েই রয়েছে মর্মস্পর্শী অনেক দৃশ্য। এর মধ্যে দর্শকদের সবচেয়ে আপ্লুত করে ঈদকে কেন্দ্র করে নির্মিত দৃশ্যগুলো। ঈদের আগে হাসু শিন্নী খাওয়ার জন্য বাজার থেকে নারিকেল কিনে আনে। তা দেখে মায়মুন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু দুই আনা দিয়ে নারিকেল কিনে এনেছে জানতে পেরে জয়গুন যখন হাসুকে উদ্দেশ্য করে বলে—'নাইরকল ছাড়া শিন্নী খাওন যায় না। নোয়াবের পুত নোয়াব? (সূ. দী. বা. চ./ দৃ. ৪৯, শট ৪)' তখন সব আনন্দ ফিকে হয়ে যায়। পৃথিবীর সব মা-ই চায় উৎসব উপলক্ষে তাদের সন্তানরা ভালো-মন্দ খেতে পাক। কিন্তু জয়গুন নিরুপায়। তার কাছে একবেলা ভাল খাবারের চেয়ে তিনবেলা কোনরকমে খেতে পারাই কাম্য। তবুও কাসুকে সে একটি টুপি কিনে দিতে চায়। কারণ কাসু তার কাছে থাকে না। এই অভাববোধকে লাঘব করার জন্য সীমিত সাধ্য দিয়ে টুপি কিনে দেওয়ার বাসনা তার মনে জেগে ওঠে। হাসুকে টুপির দাম জিজ্ঞেস করতেই মায়মুন তার ছেঁড়া কাপড় দেখিয়ে নতুন কাপড় আব্দার করে। একথা শুনে জয়গুন খেঁকিয়ে ওঠে বলে—'কাপড় দিয়া তরে করর দিমু (সূ. দী. বা. চ./ দৃ. ৪৯, শট ৬)'। মায়ের মুখ দিয়ে একথা বের হলেও তার মনেই যে কষ্টের কবর বয়ে বেড়াচ্ছে তা দর্শকমাত্রই বুঝতে পারে। ঈদের দিনও হাসুর বিরাম নেই। মনমরা হয়ে সে স্টেশনে হাটতে থাকে। মনে মনে তার জীবনের চরম সত্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করে—'ঈদের দিন বলে খুশির দিন, আমি কিনু খুশী-মুশী বুঝিনা। এই শহরঅ কত মানুষ। ব্যাবাকতেই তামান বছর কষ্ট-মষ্ট কইরা একদিন একটু ফুর্তি করবার চায়। একদিন ফুর্তি কইরা কি লাভ? কাম কাজ থাকলে ত হগল দিনই ঈদের দিন (সূ. দী. বা. চ./ দৃ. ৫১, শট ২-৭)'। হাসুর এই অন্তর্কথন দর্শকদের মনকে এমনভাবে আন্দোলিত করে যেন মনে হয় এটি শুধু সিনেমা নয় 'মানবতার দলিল'। মানুষের অন্তর ও সমাজকে ভিতর থেকে পাঠ করার যে যোগ্যতা সৃষ্টির অল্প সময়ের মধ্যে চলচ্চিত্র আয়ত্ব করে ফেলেছে, তা শিল্প বিচারে অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের চেয়ে অনেক উন্নতমানের বলেই ধরে নেওয়া যায়। 'আমাদের প্রাচীন শিল্পগুলির কালক্রমে একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, আর তা থেকে তৈরী হয়েছে এগুলির সৌন্দর্যতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্ব—তাদের গুণাগুণ বিচারের মাপকাঠি। প্রত্যেক শিল্পেরই নিজস্ব একটা স্টাইল বা রীতি আছে। স্টাইলাইজেশনের বৈশিষ্ট্য ছাড়া কোনো শিল্পের স্বীয়তা কিংবা স্টাইল গড়ে উঠতে পারে না। আবার ফর্মের দিক থেকে প্রত্যেক শিল্পেরই একটা অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা আছে। চিত্রকরকে ত্রি-স্তর বস্তু-জগতের রূপ প্রকাশ করতে হয় সমতল ক্যানভাস-এর ওপর। কবিকে শব্দ-ছন্দ-অলঙ্কার রীতি-নীতিগুলিকে মেনেই এগোতে হয় কল্পলোকে, আহরণ করতে হয় উপাদানকে। অভিনয়কাল ও মঞ্চসজ্জার ওপর নজর রেখেই নাট্যকারকে নাটক সাজাতে হয়।'[৩৯] চলচ্চিত্রকারকেও অর্থ, সময়, নির্মাণের উপাদান এসবের উপর নির্ভর করে তাঁর কাহিনিকে সাজাতে হয় ; সীমিত সুযোগের মধ্যে অসীম সম্ভাবনাকে ধারণ করতে হয়। মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী এসকল সীমাবদ্ধতাকে জয় করে সমাজের বাস্তবরূপকে এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যা চিত্ররূপ হলেও বাস্তব হয়ে উঠেছে দর্শকের মনে।

মায়মুনের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসে সোলেমান খাঁ-এর ছেলে ওসমানের সঙ্গে। প্রথমে জয়গুন রাজী না হলেও শফির মার পীড়াপীড়িতে রাজি হয়। বিয়ের দিন সাত-আটজন মানুষ আসার কথা মায়মুনের বিয়েতে। কিন্তু সোলেমান খাঁ জুম্মার নামাজ শেষে সকল মুসল্লি নিয়ে বড়যাত্রী হয়ে আসে। এ দেখে সবাই চিন্তায় পড়ে যায়। এতো মানুষের খাবার জোগাড় করা জয়গুনের দুঃসাধ্য। এসময় এগিয়ে আসে লেদু, তরকারিতে পানি মিশিয়ে পরিমাণ বৃদ্ধি করে চিন্তামুক্ত করে। উপন্যাসে বরযাত্রী আসে সন্ধ্যার পরে, আর লেদুর ভূমিকা পালন করে শফির মা (পৃ. ৬৬-৬৭)। বিয়েকে সামনে রেখে জয়গুনকে চাপে ফেলে তার কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ার বদলা নিতে চায় গদু প্রধান। বিয়ের মজলিশে জয়গুনকে গ্রামের বাইরে যাওয়ার জন্য তওবা পড়তে বাধ্য করে। এতকিছুর পরও মায়মুনের সংসার টিকে না। কাসুর অসুখ নিয়ে জয়গুন যখন পেরেশান তখন শফি এসে খবর দেয় মায়মুনকে শ্বশুর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।[৪০] কিন্তু উপন্যাসে মায়মুনকে স্বামীর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার কারণে বাড়িতে ফেরত চলে এলে জয়গুন যখন বিচলিত তখন সাদেক মিয়া এসে

খবর দেয়—কাসুর অসুখ।[৪১] উভয় ঘটনায়ই জয়গুনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। সিনেমায় জয়গুন বাড়িতে এসে জানতে পারে শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাকে দিয়ে ইচ্ছেমতো কাজ করাতো, বিনিময়ে নাম মাত্র খাবার দিতো। কাজ অনুপাতে খাবার না পেয়ে মায়মুন শরীরে জোর পেতো না ফলে ঠিকমতো কাজও করতে পারতো না। তাই বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। তৎকালীন সমাজবাস্তবতায় গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন মানুষরা বাড়ির বউদের পর্যন্ত কাজ করার মেশিন মনে করত, ঠিকমতো কাজ আদায় না করতে পারলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে কার্পণ্যবোধ করত না—ঔপন্যাসিকের মতো চলচ্চিত্রকারদ্বয় যুগপৎ এই দিকটি তুলে ধরেছেন।

অভাবের তাড়নায় জয়গুনকে বাড়ির ফলবতী আমগাছটি পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হয়। হাসুসহ অন্য কুলিরা কাজ না পেয়ে কারখানা থেকে কারখানায় ধর্না দেয় কাজের জন্য। কিন্তু কাজ মেলে না। পাকিস্তান হওয়ার পর আর অভাব থাকবেনা বলে যে স্বপ্ন দেখেছিল অচিরেই তা ভেঙে যায়। এর মধ্যে কাসুর বাপ কাসুকে নিয়ে আসে তার মায়ের কাছে রেখে যাওয়ার জন্য। অসুখের পর থেকে শুধু মায়ের জন্য কান্নাকাটি করে। উপায়ান্ত না দেখে করিম বক্শ নিজেই তাকে মায়ের কাছে নিয়ে আসে। অসুখে পড়ার পর থেকে তার মনটাও কেমন জানি নরম হয়ে গেছে, জয়গুনের জন্যও তার টান অনুভব হচ্ছে। হয়ত জয়গুনের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাসুকে এ বাড়িতে রেখে গেছে। কিন্তু জয়গুনের ভাবনা শেষ হয় না। তওবা করার কারণে রোজগারে যেতে পারে না সে। খাওয়ার লোক কমবে বলে কম বয়সে মায়মুনকে বিয়ে দিয়েছিল। কিছুদিন যেতে না যেতেই উল্টো আবার নিজের কাছে ফেরত এসেছে। লালুর মায়ের কথায় আবার সে চালের কলে কাজ করতে যায়। যে কারণে তাকে তওবা পড়তে হয়েছিল, সে মাইমুনই ফেরত এসেছে। তাই ঘরে বসে না থেকে কাজে যাওয়াই তার জন্য শ্রেয়। তাছাড়া ছোট্ট কাসুর ক্ষুধা সে কোনভাবেই সহ্য করতে পারে না। এখানে একটা বিষয় খটকা লাগে, হাসুসহ অনেকে যেখানে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাজ জোগার করতে ব্যর্থ হচ্ছে, সেখানে ধরে নেওয়া যায় কাজের আকাল যাচ্ছে। কিন্তু লালুর মার প্রস্তাবে জয়গুন যখন জিজ্ঞেস করে, 'কী কাম? ...পয়সা কিমুন দেয়?' এবং উত্তরে লালুর মা যখন বলে 'ধান হুগানির কাম, চাউল ঝারনের কাম। য্যাডাই তুই করবার চাস। ...এক ট্যাকা, আডারো আনা, পাঁচশিকা। নতুন গেলে এক ট্যাকা রোজ। যাবি?'[৪২] তখন বোঝা যায় কাজের কোন অভাব নেই, এমনকি কাজ বাছাই করার সুযোগও রয়েছে। পারিশ্রমিকও ভাল। হাসু যখন নারায়ণগঞ্জ থেকে কাজ শেষ করে ট্রেন মিস করে রেললাইন ধরে হাটতে থাকে তখন অপরিচিত এক লোকের সঙ্গে কথোপকথনে ঐ সময়ে কাজের পারিশ্রমিকের ধারণা মিলে—'দালানের কাম কইরা কত পাস?/ কিনুদিন দশ আনা দেয়, কিনুদিন বার আনা দেয়। ঠিক নাই।[৪৩] নির্মাণ কাজের মতো একটি পরিশ্রমের কাজ করে যদি হাসু দিনে দশ থেকে বার আনা পায়। সেখানে ধানের কলে অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমের কাজে একজন নারীর পারিশ্রমিক এক টাকা থেকে এক টাকা চার আনা নিঃসন্দেহে ভালো পারিশ্রমিক। তাই বলা যায় উক্ত দৃশ্যে লালুর মা যাচিত হয়ে কাজের প্রস্তাব না দিয়ে বরং নিরুপায় জয়গুন কাজের জন্য লালুর মায়ের কাছে অনুনয়-বিনুনয় করলে এবং কাজ প্রাপ্তির সহজলভ্যতা না থাকায় অনেক কষ্টে কাজ জোগার করতে হলে কাহিনির সামঞ্জস্যতা বজায় থাকত। তারপরও জয়গুন চরিত্রের সংগ্রামী জীবন চিত্রন চলচ্চিত্রটিকে মহিমান্বিত করেছে। "'সূর্য দীঘল বাড়ী' চলচ্চিত্রটি মূলতঃ এবং প্রধানতঃ জয়গুনেরই জয়গান বটে—এবং এতে এই শিল্পকর্মের কোন প্রকার হানি না হয়ে গৌরবই বৃদ্ধি পেয়েছে।"[৪৪]

চিত্রনাট্য অনুযায়ী খুরশীদ মোল্লার রেশনের দোকানে শ'খানেক লোক লাইন দিয়েছে।[৪৫] চলচ্চিত্রে খুরশিদ মোল্লার কথায়ও সেরকম বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে—'গরমেন এই তারিকে যে চাউল পাডাইছে আপনেগ ব্যাবাকতেরে তা দ্যাঅন যাইবো না। ব্যাবাকতেরে দিলে মাথা পিছে এক

পোয়া কইরাও পরবো না। আমি উপরে অনেক লেখালেখি করছি, কয় গোডাউনে চাউল নাই। কাজেই এইহানে যারা আইছেন তার মইদ্যে পরথম বিশজনরে আরাই স্যার কইরা চাল দিমু' (সূ. দী. বা. চ./ দৃ. ৭৫, শট ১৩)। কিন্তু সিনেমায় এতো লোক দেখা যায় না। শটটি লাইনের পিছন, সামনে ও পাশ থেকে নেয়ায় লোকজনের উপস্থিতি বোঝা যায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ জনের মতো। বিশজনকে আড়াই সের করে চাল দিতে পারলে, একই পরিমান চাল উপস্থিত সবাইকে দিলে একজন এক পোয়া করে পাবার কথা নয়। দৃশ্যটি ধারণে আরও সতর্ক হওয়া যেত—হয় উপস্থিতি বাড়িয়ে সংলাপের সত্যতা বজায় রাখা যেত, না হয় কৌশলে লাইনের খণ্ডাংশ দেখিয়ে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া যেত। খুরশিদ মোল্লার কথায় যে ফাঁকি রয়েছে তা বোঝা যায় দৃশ্যে গদু প্রধানের উপস্থিতিতে। সে খুরশিদ মোল্লার রেশনের দোকানের ভিতরে প্রবেশ করে দেখে জমিদার ভবাণীবাবুর চাকর পাশে দাঁড়ানো। ভবাণীবাবু তাকে পাঠিয়েছে নাতির অন্নপ্রাসনের জন্য তিন মন চাল নিতে। খুরশীদ মোল্লা দুই মনের পারমিট লিখে চাকরকে দিয়ে দেয়। এই ফাঁকে গদু প্রধানও নিজের জন্য চালের বন্দোবস্ত পাকা করে। জমিদারের নাতির অন্নপ্রাসনের জন্য দুই মন চাল মিললেও বাইরে অপেক্ষারত অন্নহীন অনাহারী মানুষগুলো বেঁচে থাকার জন্য দুই পোয়া চাল পাবে কিনা সে নিশ্চয়তা তাদের নেই। খুরশিদ মোল্লার ভাই ব্ল্যাক করে চাল বিক্রি করে। এই কথা সবার জানা আছে। তারপরও আশা নিয়ে তারা বাইরে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু যখন ঘোষণা করা হয় লাইনের প্রথম বিশজন চাল পাবে, তখন লাইন ভেঙে আগে যাওয়ার জন্য ধাক্কাধাকি শুরু হয়ে যায়। এখানে সবাই অনাহারী হলেও কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নয়। ফলে এদের মধ্যেও শুরু হয় সবল-দুর্বলের লড়াই। ধাক্কাধাকিতে যে গায়ের জোড়ে জিতে যাবে সে-ই চাল পাবে। নিজের অস্তিত্বের লড়াইটা পৃথিবীর সর্বত্র এক, তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের বৃত্তে একটি নিঃস্ব পরিবারের কাহিনি কিন্তু তা বৃহত্তর অর্থে সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি বিবেচনাকেও স্পর্শ করে। শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটি দেশবিভাগ পরবর্তী বাংলাদেশের এক বিপুল জনগোষ্ঠির জীবনবাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায়।'[৪৬] উপন্যাসে বর্ণিত ঐ সময়ের মূল সুরটিকে চলচ্চিত্রকারদ্বয় সেলুলয়েডে আবদ্ধ করে দর্শকদের সামনে জীবন্ত করতে সক্ষম হয়েছেন—যাতে অবগাহন করে বর্তমান সময়ের দর্শকরাও সেই-সময় ও সমাজ-বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারেন। কেননা উপন্যাসে খুরশীদ মোল্লার বাড়িতে লোকদের জটলা হয়েছিল ঈদের দিন সকালে রেশনের চিনি নেওয়ার জন্য। কিন্তু সিনেমায় চিনি খাওয়ার মতো বিলাসিতার পরিবর্তে বেঁচে থাকার প্রধান উপাদান চালের অনুষঙ্গ আনা হয়েছে। ঐ সমাজে গরীবের জন্য চিনি খাওয়া যে বিলাসিতার সামিল তা উপন্যাসে কাজী খলিল বক্‌শ-এর সংলাপে বোঝা যায়—'কিরে লেদু, চিনি দিয়া কি করবি? ...ভাত জোটে না, চিনি খায়। বাহার ব্যাটা! হেই-যে মাইন্‌ষে কইছিল—ঘর নাই, দুয়ার দিয়া হোয় (সূ. দী. বা. উ./ পৃ. ৩৪)'। অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য যাদের পেটে ভাত জোটে না চিনি খাওয়া তাদের জন্য চরম বিলাসিতা।

খলিল মাতব্বর আসে শফির মার কাছে গদু প্রধানের সঙ্গে জয়গুনের বিয়ের দুতিয়ালি করতে। জয়গুন এই প্রস্তাবে রাজি হয় না। শফির মাকে দিয়ে জায়গা-জমির লোভ দেখিয়েও রাজি করাতে ব্যর্থ হয়। গদু প্রধানের আরও দুই বউ আছে। তা সত্ত্বেও জয়গুনের উপর তার নজর পরে। যে কোন মূল্যে তাকে বিয়ে করতে চায়। আর এই চাওয়াকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী কাহিনির গতি লাভ ও পরিণতি ঘটে। জয়গুনকে পাওয়ার জন্য সে ধর্মের দোহাই তুলে তার চালের ব্যবসা বন্ধ করে। পেটের দায়ে পুনরায় চালের কলে কাজ করতে গেলে আবারও ধর্মের প্রসঙ্গ টেনে জয়গুনের বিচার করতে চায়। কিন্তু ইমাম সাহেব বিচারের জন্য আল্লার উপর ভরসা রাখতে বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেলে গদু প্রধান সামাজিক বিচারের পায়তারা করতে থাকে। অন্যদিকে নিশিরাত্রে জয়গুনের ঘরের চালে ঢিল ছোঁড়ে। করিম বক্‌স জয়গুনকে আবার ফিরে পাবার আশায় ফকিরের দেওয়া গজালগুলো নিশিরাতে পুঁতে দিয়ে আসতে গেলে গদু প্রধানকে হাসুদের ঘরে ঢিল ছুরতে দেখে ফেলে এবং তার কু-মতলব বুঝতে পারে। এ নিয়ে দুজনের কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে খলিল মাতব্বর গলা টিপে

করিম বক্‌শকে খুন করে। ঘরের ভিতর থেকে গদু প্রধান ও করিম বক্‌শ-এর কথোপকথন শুনতে পেয়ে গয়গুন বাইরে তাকিয়ে খুনের দৃশ্য দেখে ভয়ে মুখে আচল চাপা দেয়। উপন্যাসে করিম বক্‌শকে খুন করার দৃশ্য জয়গুন দেখে ফেলার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। ছবিতে জয়গুনের এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা এবং খুনিকে চিনতে পারার পরও তাৎক্ষণিক কোন প্রতিক্রিয়া করতে দেখা যায় না। পুরো সিনেমায় জয়গুনকে প্রতিবাদী-সাহসী হিসেবে দেখা গেলেও প্রাক্তন স্বামীকে চোখের সামনে খুন হতে দেখে তাকে বাঁচানোর কোনরকম উদ্যোগ দেখা যায় না। এটা যে শুধু গদু প্রধানের ভয়ে হয়েছে এমনটিও ভাবা যায় না ; কারণ, তা-ই হলে পরদিন সকালে লেদুর কাছে খুন হওয়ার দৃশ্য নিজে দেখার বিষয়টি সে প্রকাশ করত না। পরিচালকদ্বয় এখানে করিম বক্‌শের কৃতকর্ম ও অন্যায়ের প্রতি জয়গুনের ক্ষমাহীন ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসে আমরা প্রাক্তন স্বামীর প্রতি জয়গুনের বাঙালি নারীসুলভ মমত্ববোধ দেখতে পাই—'আজ বারবার করিম বকশের কথাই মনে পরে জয়গুনের। বেদনায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। দরদর ধারায় পানি ঝরে গাল বেয়ে। আহা বেচারা! জীবনে কাউকে ভালোবাসেনি। কারো ভালোবাসা পায়ও নি সে (সূ. দী. বা. উ./ পৃ. ১০২)।' তাছাড়া সূর্য দীঘল বাড়ির ভূত রহস্য উপন্যাসে যেরকম নাটকীয়ভাবে উন্মোচিত হয়েছে সিনেমায় সেরকম নাটকীয়তা নেই—'ঘন অন্ধকার। তার মাঝেও দৃষ্টি চলে করিম বক্‌শের।—তিনটা ছায়ামূর্তি! ভয়ে তার গায়ের রোম কাঁটা দিয়ে ওঠে। সূর্য দীঘল বাড়ীর তাল গাছের তলায় সে থমকে দাঁড়ায়। কাঁপতে কাঁপতে বসে পরে মাটিতে। ...বার কয়েক টিপটিপ করে হৃদ্‌যন্ত্রটা যেন বন্ধ হয়ে যায়। একটা মূর্তি আরো কাছে সরে আসে তার। করিম বক্‌শের গায়ে ধাক্কা লাগে লাগে। এবার করিম বক্‌শ চিনতে ভুল করে না। হৃদ্‌যন্ত্রটা আবার বার দুই টিপটিপ করে চালু হয়ে যায়। হঠাৎ ঘাম দিয়ে তার ভয়ও কেটে যায়। সে দাঁড়ায়। পাশ থেকে খপ করে ছায়ামূর্তির একটা হাত চেপে ধরে, —গদু পরধান! তোমার এই কাম!!...!!! (সূ. দী. বা. উ./ পৃ. ১০২)।'

পরদিন সকালে খলিল মতব্বর প্রচার করতে থাকে করিম বক্‌শকে জ্বীনে মেরেছে। গ্রামবাসীরাও এ কথায় বিশ্বাস করে। কারণ এই বাড়ির পাশে তার লাশ পাওয়া গেছে। এই বাড়ির পিছনের ইতিহাস ভালো নয়। এটি সূর্য দীঘল বাড়ি। কিন্তু বিশ্বাস করেনি একজন—জয়গুন। সে নিজ চক্ষে গদু প্রধানকে খুন করতে দেখেছে। তাই লেদুর কাছে সব খুলে বলতে চেয়েছে। লেদু পরে শোনবে বলে ওঠে চলে গেলে খলিল মাতব্বর শফির মার কাছে থেকে জয়গুন যে ঘটনার রাতে সব দেখেছে এ বিষয়ে জনতে পারে। তারপর একরাতে জয়গুনদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। চোখের সামনে পুড়ে ছাই হতে থাকে তাদের ঘর। সেই সাথে ভস্মীভূত হয়ে যায় তাদের স্বপ্ন। প্রাক্তন স্বামীকে চোখের সামনে খুন হতে দেখে ঘটনার আকস্মিকতায়ই হোক আর ক্ষোভের কারনেই হোক যে প্রতিবাদ না করে নিশ্চুপ থাকে, নিজের ঘর পুড়তে দেখে সে স্তব্ধ হয়ে বসে না থেকে অতি মাত্রায় চিৎকার করতে থাকে—কারণ এটা তার অস্তিত্বের প্রশ্ন। যে ভাতের জন্য তারা গ্রামে ফিরে এসেছিল, আশ্রয় হারিয়ে সেই ভাতের সন্ধানে আবার গ্রাম ছাড়তে হয়েছে। তবে এবারের উদ্দেশ্য অজানা। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' নামকরনের স্বার্থকতা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের প্রতিচ্চিত্রের কারণে পাঠকের কাছে যেভাবে প্রতীয়মান হয়, চলচ্চিত্রকারদ্বয় সেভাবে দর্শকদের দেখাতে চাননি। তাঁদের সিনেমায় 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন পশ্চাদপসরণের পরিবর্তে অনলগ্রাসী আক্রমনের শিকার হয় অসহায় জয়গুন বিবিরা। উপন্যাসের চিত্রকল্প ও চলচ্চিত্রের রূপকল্প এখানে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং পরিপূরক।'[৪৭]

'সূর্য দীঘল বাড়ী' সিনেমার সবচেয়ে বড় সাফল্য এর চরিত্র চিত্রণ। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, হাঁটা-চলা, ভাষা-ভঙ্গি চরিত্রে ফুটিয়ে তুলতে চলচ্চিত্রকারদ্বয় ছিলেন আপোষহীন। "'সূর্য দীঘল বাড়ি'র প্রাণকেন্দ্র জয়গুনের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য কাকে বলা যায়? কবরী না আনোয়ারাকে? কিন্তু ওঁরা কি ওঁদের ম্যানারিজম এড়াতে পারবেন? শর্মিলীর কথাটা

মনে এলো এই সময়, বেশ কম ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি, ম্যানারিজমটা তাঁর তেমন দাঁড়ায়নি—এরকম ভেবে প্রস্তাব করা হলো তাঁর কাছে। ...শুটিংয়ের তৃতীয় দিনে শর্মিলী আপত্তি করেন ব্লাউজহীন অবস্থায় অভিনয় করতে। পরে ডলি (ডলি আনোয়ার) নির্বাচিত হন জয়গুন হিসেবে। কিন্তু এর মধ্যে শর্মিলীকে নিয়ে আড়াই হাজার ফুট ফিল্ম খরচ হয়ে গেছে।"[৪৮] এই ক্ষতি স্বীকার করেও তাঁরা চরিত্রের স্বাভাবিকতা ফুটিয়ে তুলতে কোন আপোষ করেননি। এটাকে সিনেমায় ন্যাচারালিজম বা সিনেমার ন্যাচারালিজম বলা যায়। আমাদের বাংলা সিনেমার একটা বড় দৈন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মেকআপ ছাড়া অভিনয় করতে একেবারেই নারাজ। মেকআপ বলতে এখানে গ্ল্যামারাল সাজসজ্জাকে বুঝানো হয়েছে। সেই সঙ্গে আমাদের নির্মাতাদের মনস্তত্ত্বে প্রোথিত হয়ে গেছে—গ্ল্যামারই সব। দর্শক শিল্প বোঝে না, গ্ল্যামার খুঁজে। সিনামায় মেকআপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে মানানসই করে মেকআপ করাই চলচ্চিত্র নির্মাণে চরিত্রকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার প্রধান শর্ত। পরিতাপের বিষয় ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিক্ষেত্রেই দেখা যায়, আমাদের দেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে মেকআপ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা তখনও ছিল, এখনও আছে। 'সচিত্র স্বদেশ' পত্রিকার এক নিবন্ধ থেকে বিষয়ে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে—'সেদিন নির্মিতব্য একটি ছবির গান দেখলাম এডিটিং মেশিনে। বুলবুল আহমেদ এ ছবিতে গ্রাম্য বাউল ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। দোতারা বাজিয়ে গান করে বেড়াচ্ছেন এ গ্রাম থেকে ওগ্রামে। কিন্তু চুলের স্টাইল তার হাল ফ্যাশনের। গ্রাম্য মেয়ে কবরীর ভ্রুচর্চাও আধুনিক স্টাইল সম্মত। ...বুলবুল সাহেবকে বিষয়টি উল্লেখ করতে তিনি বলেছিলেন, দর্শক গ্ল্যামার দেখে। এসব কিছুই দেখে না। কবরীর জবাবও ছিল ওই একই রকমের।'[৪৯] অর্থাৎ মেকাপের আড়ালে দর্শকদের বোকা বানানো কিংবা দর্শকদের মেকাপজ্ঞান নিয়ে বোকা-ভাবনা আমাদের চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের মজ্জাগত। এইসব ভুল ধ্যান-ধারণার কারণে গুটিকয়েক চলচ্চিত্র ছাড়া আমাদের দেশীয় সিনেমা আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে পারেনি। চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন কর্মী মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী সেই সত্যটা জানতেন। ফলে এ বিষয়ে তাঁরা অটল ছিলেন। যে কারণে প্রতিটি চরিত্র বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে পেরেছে। মেকআপের পাশাপাশি অভিনয়ের সাবলীলতাও ছিল এই ছবির উল্লেখযোগ্য দিক। তবে জয়গুন চরিত্রে অভিনয়কারী ডলি আনোয়ার ও শফির মা চরিত্রে অভিনয়কারী রওশন জামিলের ভ্রু চর্চা কেন চলচ্চিত্রকারদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল তা বোধগম্য নয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন, 'সত্যজিৎ রায়ের 'অশনি সংকেতে'র ব্রাহ্মণীরও অমন ভুরু দেখা গিয়েছিল। আধুনিকারা যখন সাধারণ মেয়েদের ভূমিকায় নামবেন ভুরুতে একটু গ্রামীণ মেক-আপ দরকার বৈকি! সত্যজিৎ রায়ের দোষটা তো আগেই আমাদের চোখে ঠেকবার কথা, তাতেই সাবধান হতে হত।'[৫০]

উপন্যাসে চরিত্রের বয়সের ক্রমবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হলেও সিনেমায় তেমনটি দেখা যায় না। পুরো সিনেমা জুড়েই শফিকে ছোট্ট ছেলের ভূমিকায় দেখা যায়, কিন্তু উপন্যাসের বর্ণনায়—'বিরাট জায়গা নিয়ে দালান উঠছে। হাসুর আনন্দ হয়। ...হাসুদের দলের সব ছেলেই এখানে কাজে যোগ দিয়েছে। হাসু শফিকে এনে এখানে কাজে ভর্তি করে দেয় (সূ. দী. বা. উ./ পৃ. ৫৫)।' কিংবা শফি যখন তার মাকে ভিক্ষা করতে নিষেধ করে তখন জয়গুনকে বলতে শোনা যায়— 'পোলা তোমার উচিত কতাই কয় গো। ও অহন ষাইডের বড় অইছে। রোজগারও করছে। ওর শরম লাগনের কতাই (সূ. দী. বা. উ./ পৃ. ৫৫)।' —তখন শফির বড় হয়ে ওঠা পাঠকের মানস্পটে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের আরেকটি খারাপ দিক হচ্ছে—অতি অভিনয় অথবা জোর করে অভিনয়। চরিত্র অনুযায়ী অভিনয়ের স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে গিয়ে যদি অভিনয় করার প্রয়োজন না পরে তাহলে তা-ই করা উচিত। এতে ঘটনার স্বাভাবিকত্ত্ব বজায় থাকে। অভিনেতা-অভিনেত্রীরও মানহানি ঘটে না। 'সূর্য দীঘল বাড়ী' চলচ্চিত্রে শফির মা চরিত্রে অভিনয়কারী রওশন জামিল স্বীকার

করেছেন, 'এই একটি মাত্র চরিত্রেই আমি কোন অভিনয় করিনি। কোন মেকআপও দেইনি। বাংলাদেশের গরীব ঘরের মেয়েরা কাঁচা গোবর দিয়ে ঘুঁটে তৈরি করে শুকোতে দেয়, এ ছবিতে আমাকে সে রকম স্বাভাবিকভাবে ঘুঁটে তৈরি করতে হয়েছে। যদিও প্রথম অবস্থায় কাঁচা গোবর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আমার গা ঘিনঘিনিয়ে উঠতো।'[৫১] চরিত্র ও কাহিনির সঙ্গে মিশে গিয়ে যথাযথ অভিনয় করতে পারাই একজন শিল্পীর স্বার্থকতা। 'সূর্য দীঘল বাড়ী' সিনেমার প্রতিটি শিল্পীই একারণে স্বার্থক। বিশেষ করে জয়গুন, হাসু, মায়মুন, শফির মা, করিম বক্শ, লেদু, গদু প্রধান ও লালুর মা চরিত্রে অভিনয়কারী শিল্পীরা শতভাগ কৃতিত্বের দাবি রাখে। তারা কেউ-ই যেন অভিনয় করেননি— প্রত্যেকেই এক একটি চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন 'সূর্য দীঘল বাড়ী' সিনেমায়।

অভিনয়ের পাশাপাশি সংলাপও কাহিনি এবং এতে উল্লেখিত স্থান অনুযায়ী চরিত্র চিত্রনে ভূমিকা রাখে। এই জায়গাটিতে কিছুটা ত্রুটি ধরা পরে। শেখ নিয়ামত আলী অবাঙালি বিধায় সংলাপ রচনার ভার পরে মসিউদ্দিন শাকেরের উপর। তিনি ময়মনসিংহ এলাকার লোক, কিন্তু উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার স্থান নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা এলাকা। তাই সংলাপ রচনার সময় এখানকার আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় সংলাপে ময়মনসিংহ এলাকার ভাষার প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে লালুর মার সংলাপে। এ বিষয়ে মসিহউদ্দিন শাকের বলেছেন, সংলাপ বিষয়ে যতটুকু সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে কিন্তু লালুর মাকে যতই সংলাপ বলার ভঙ্গি শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছিল অভ্যাসবশত সে ময়মনসিংহ অঞ্চলের টানেই সংলাপ বলে যাচ্ছিল। চরিত্রের সঙ্গে তাকে মানিয়ে যাওয়ায় নিতান্ত বাধ্য হয়েই তার সংলাপ ধারণ করা হয়েছিল।[৫২] চলচ্চিত্র অপেক্ষা সাহিত্যের সুবিধা এই যে, সাহিত্যে লেখক যেভাবে চান তার অনুরূপ লেখায় ফুটে ওঠে। কিন্তু চলচ্চিত্রকার সাহিত্য বা কোন গল্পকে যেভাবে চিত্রায়িত করতে চান সবসময় তার অনুরূপ না-ও হতে পারে। কেননা সাহিত্যে লেখকই একমাত্র ব্যক্তি যে তাঁর কর্মযজ্ঞের অধিকর্তা থেকে শুরু করে কর্মীর ভূমিকা সহ সকল কার্য সম্পাদন করে থাকেন। অপরদিকে চলচ্চিত্রকার নিজে অধিকর্তা হলেও কার্য সম্পাদনের জন্য তাঁকে কর্মী-বাহিনীর উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভর করতে হয়। ফলে চলচ্চিত্রকার চাইলেই তাঁর সামগ্রিক পরিকল্পনার নির্ভুল ফলাফল দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন না। একারনেই "আবহ-সুরের কোন শৈল্পিক তাৎপর্য 'সূর্য দীঘল বাড়ী'র কোন চিত্রকল্পে প্রকাশ পেল না। ...ছবির সঙ্গীতাংশ দৃশ্য সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারলনা।"[৫৩]

উপসংহারঃ

বাংলাদেশ সরকারের অর্থানুদানে চলচ্চিত্রকার মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী 'সূর্য দীঘল বাড়ী' সিনেমাটি নির্মাণ করেন। শিল্পমূল্যের বিচারে চলচ্চিত্রটি এ পর্যন্ত বাংলাদেশে নির্মিত চলচ্চিত্রের মধ্যে অন্যতম। সমকালীন বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের বিপরীতে নিরীক্ষাধর্মী এই সিনেমা ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হলেও এর শিল্পমূল্যের কারণে দেশ বিদেশে ঐ সময়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। এর স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয়-আন্তর্জাতিক অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করে। ১৯৮০ সালে জার্মানির 'ম্যানহেইম' চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করে তিনটি বিভাগে পুরস্কার লাভ করে। একই সালে পূর্তগালের 'ফিগুএরা দা ফোজ' চলচ্চিত্র উৎসবে একটি বিভাগে পুরস্কার লাভ করে। এটি শ্রেষ্ঠ পরিচালকসহ ছয়টি বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। এছাড়া 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস)' পুরস্কার ১৯৭৯-এ মোট ছয়টি বিভাগে পুরস্কার লাভ করে। চলচ্চিত্রটি আশাব্যঞ্জকভাবে ব্যবসাসফল না হওয়ার পিছনে বড় কারণ ছিল, বাণিজ্যিক সিনেমা সংশ্লিষ্টদের সিন্ডিকেটের কারণে খুব বেশি সংখ্যক হলে সিনেমাটি প্রদর্শিত হতে পারেনি। এ

কথার সত্যতা পাওয়া যায় সমসাময়িক একটি পত্রিকার সংবাদেও—'...প্রদর্শকদের ঐক্যবদ্ধ বদমাশীর ফলেই ১৯৭৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য ছবি 'মেঘের অনেক রং' মাত্র দেড় দিন পর হল থেকে নামিয়ে ফেলা হয়। গুণ্ডা বদমাশ লেলিয়ে হলে মারপিট করে। এদের ব্যবসার জন্য 'সূর্য দীঘল বাড়ী' আজ পর্যন্ত ঢাকায় মুক্তি পায়নি।'[৫৪] তারপরও কেউ কেউ ছবিটিকে ব্যবসা-সফল হিসেবে দাবি করেছেন। 'ভাল ছবি যে ব্যবসা সফলও হতে পারে তার সাম্প্রতিক প্রমাণ তো হাতের কাছেই রয়েছে, বিশেষভাবে 'সূর্য দীঘল বাড়ী'র নাম উচ্চারণ না করলেও চলে। সকল ধরনের আশংকাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ছবিটি শুধু ব্যবসা-সফল হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও প্রমাণ করেছে যে : ভালো ছবির পৃষ্টপোষকতা করতে দর্শক সমাজ প্রস্তুত।'[৫৫]

সবকিছু ছাপিয়ে একটি মাত্র চলচ্চিত্র দিয়ে মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। চলচ্চিত্র সমালোচক আজমল হুদা মিঠু যথার্থই বলেছেন, "সবাই পরিচালক হতে পারেনা। কেউ কেউ পরিচালক হয়ে থাকে। ...একজন পরিচালকের মধ্যে থাকা উচিৎ কল্পনা শক্তি, চিন্তার সুস্থিতি, আবেগ, দর্শন, সৃজনশীলতা, রাজনৈতিক-সামাজিক চেতনা, দূরদৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। ...ছবি পরিচালনা হচ্ছে আসলে একটি বিশেষ দক্ষতার ব্যাপার, সার্বিক 'এফেক্টের' ব্যাপার। পরিচালককে ক্যামেরার ডান-বাম, উচ্চ-নীচ, ডলি-ট্রলি না জানলেও চলে। এসবের জন্য বিশেষ বিশেষ দক্ষতার 'সহকারী' রয়েছে। কেউ ক্যামেরায়, কেউ লাইটে, কেউ সম্পাদনায়, কেউ সঙ্গীতে, কেউ নৃত্যে। পরিচালক তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী এসব সহকারীদের কাছ থেকে সহায়তা নেবেন কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়ার আশায়।"[৫৬] তবে এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান আনোয়ার হোসেন যে বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাতে মনে হয়েছে 'এই ছবিতে ক্যামেরা কাজ করে জীবন্ত শিল্পীর মতো। মনে হতে পারে যে ক্যামেরাকে অগাধ স্বাধীনতা দিয়ে পরিচালকগণ বসে ছিলেন অনেক পেছনে। একটির পর একটি দৃশ্য সাজান হয়েছে, পরিচালকদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায় না। পেছনে বসে খুব শক্ত ও পরিশ্রমী এবং সর্বোপরি সৃজনশীল হাতে নিয়ন্ত্রণ না করলে ক্যামেরার এই স্বতঃস্ফূর্ততা এভাবে অনুভব করা যেতো না।'[৫৭] এভাবে চলচ্চিত্রকার বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকেন তার সহযোগীদের কাছ থেকে। সাহিত্যিকের সে সুবিধা সীমাবদ্ধ। বড়জোড় রাইটারের সাহায্য নিয়ে টাইপের কাজটি করিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু মূল কাজটি তাকেই করতে হয়—তাকেই সবকিছু জানতে হয়, মানতে হয়, সর্বোপরি লেখায় উপস্থাপন করতে হয়।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঈদ-উল আযহা সংখ্যা (৯ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা), ১৭ অক্টোবর ১৯৮০, দৈনিক বাংলা ভবন, ঢাকা, পৃ. ১১৮

২. নরেন্দ্র দেব, চিত্রনাট্য, বায়স্কোপ : বিশিষ্ট সংখ্যা–১৯৩০। উদ্ধৃত : নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র*, আনন্দধারা, ৭৯/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ২৪৭

৩. স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্য দীঘল বাড়ি, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, (৮ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা), ১১ জানুয়ারী ১৯৮০, দৈনিক বাংলা ভবন, ঢাকা, পৃ. ৭১

৪. আবু ইসহাক, *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, বাংলাবাজার-ঢাকা, একবিংশ সংস্করণ (এপ্রিল-২০১০), পৃ. ৯

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

৬. '*সূর্য দীঘল বাড়ী*' চলচ্চিত্র, পরিচালনা- মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী, প্রযোজনা- জনচিত্রায়ণ,

পরিবেশনা- শাওন সাগর লিমিটেড, DVD Version, Laser Vision, Dhaka, দৃ.- ১, শট ১-৯
৭. আতাউর রহমান, *চলচ্চিত্রপত্র : সূর্য দীঘল বাড়ী বিশেষ সংখ্যা*, চলচ্চিত্রপত্র সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮১, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১০ পুরানা পল্টন, ঢাকা, পৃ. ৪৫
৮. মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী, *সূর্য দীঘল বাড়ী*, প্রযোজনা: জনচিত্রায়ণ, পরিবেশনা: শাওন সাগর লিমিটেড, DVD Version, Laser Vision, Dhaka, কাহিনি সংক্ষেপ, কভার পোস্টার
৯. মৃণাল সেন, *চলচ্চিত্র ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ*, গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১২, ১৩
১০. আবু ইসহাক, *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, বাংলাবাজার-ঢাকা, একবিংশ সংস্করণ (এপ্রিল-২০১০), পৃ. ৯
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গল্পগুচ্ছ* (অখন্ড সংকলন), বিশ্বসাহিত্য ভবন, বাংলাবাজার-ঢাকা
১৩. সত্যজিৎ রায় (পরিচালনা ও প্রযোজনা), *তিন কন্যা*, পরিবেশক ছায়াবাণী প্রাইভেট লি:, কলকাতা
১৪. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, শামসুর রাহমান সম্পাদিত, ৯ বর্ষ ২১ সংখ্যা, ৭ নভেম্বর ১৯৮০, পৃ. ২৮
১৫. মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী, *সূর্য দীঘল বাড়ী*, প্রযোজনা: জনচিত্রায়ণ, পরিবেশনা: শাওন সাগর লিমিটেড, DVD Version, Laser Vision, Dhaka
১৬. আবু ইসহাক, সূর্য-দীঘল বাড়ী, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, বাংলাবাজার-ঢাকা, একবিংশ সংস্করণ (এপ্রিল-২০১০), পৃ. ১১
১৭. সূর্য-দীঘল বাড়ী চলচ্চিত্র, পরিচালনা: মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী, প্রযোজনা: জনচিত্রায়ণ, পরিবেশনা: শাওন সাগর লিমিটেড, DVD Version, Laser Vision, Dhaka
১৮. মসিহউদ্দিন শাকেরের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা: ০৪ জুন ২০১৫ (মসিহউদ্দিন শাকেরের নিজ বাসায় এই গবেষক কর্তৃক মৌখিক গ্রহণকৃত)
১৯. আবু ইসহাক, *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, বাংলাবাজার-ঢাকা, একবিংশ সংস্করণ (এপ্রিল-২০১০), পৃ. ১৩
২০. বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, *কীভাবে ছবি করি কীভাবে ছবি হয়*, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১১; পরম্পরা প্রকাশন, ২০ এ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা
২১. Jean-Lue Comolli and Paul Narboni, 'Cinema/ideology/criticism', *The Film Studies Reader,* Edited by : Joanne Hollows, Peter Hutchings and Mark Jancovich, Oxford University Press Inc., New York; P. 197
২২. দ্রষ্টব্য কোরআন শরীফ, সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৯
২৩. '*সূর্য-দীঘল বাড়ী*' চলচ্চিত্র, পরিচালনা– মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী, প্রযোজনা- জনচিত্রায়ণ, পরিবেশনা– শাওন সাগর লিমিটেড, DVD Version, Laser Vision, Dhaka, দৃ.- ৫৭, শট- ৮, ১৫
২৪. তানভীর মোকাম্মেল, *চলচ্চিত্রপত্র : সূর্য দীঘল বাড়ী বিশেষ সংখ্যা*, চলচ্চিত্রপত্র সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮১, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১০ পুরানা পল্টন, ঢাকা, পৃ. ১৪
২৫. অনুপম হায়াৎ/ সাযযাদ কাদির, প্রচ্ছদ কাহিনি : একটি ছবির কাহিনি, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, শামসুর রাহমান সম্পাদিত, ৯ বর্ষ ২১ সংখ্যা, ৭ নভেম্বর ১৯৮০। পৃ. ২৫
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
২৭. মসিহউদ্দিন শাকের, *চলচ্চিত্রপত্র : সূর্য দীঘল বাড়ী বিশেষ সংখ্যা*, চলচ্চিত্রপত্র সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮১, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১০ পুরানা পল্টন, ঢাকা, পৃ. ৬৩
২৮. '*সূর্য-দীঘল বাড়ী*' উপন্যাস, আবু ইসহাক, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, বাংলাবাজার-ঢাকা, একবিংশ সংস্করণ (এপ্রিল-২০১০), পৃ. ২৩
২৯. '*সূর্য দীঘল বাড়ী*' চলচ্চিত্র, পরিচালনা– মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী, প্রযোজনা- জনচিত্রায়ণ, পরিবেশনা– শাওন সাগর লিমিটেড, DVD Version, Laser Vision, Dhaka, দৃ.- ১১, শট- ৮
৩০. অনুপম হায়াৎ/ সাযযাদ কাদির, প্রচ্ছদ কাহিনি : একটি ছবির কাহিনি, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, শামসুর রাহমান সম্পাদিত, ৯ বর্ষ ২১ সংখ্যা, ৭ নভেম্বর ১৯৮০, পৃ. ২৬
৩১. '*সূর্য দীঘল বাড়ী*' চলচ্চিত্র, পরিচালনা– মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী, প্রযোজনা- জনচিত্রায়ণ, পরিবেশনা– শাওন সাগর লিমিটেড, DVD Version, Laser Vision, Dhaka, দৃ.- ২০, শট- ৭
৩২. বিকাশ মজুমদার, *আবু ইসহাক : সমাজবাস্তবতার কথাকার*, বলাকা, ৪০ মোমিন রোড, কদমমোবারক মার্কেট চট্টগ্রাম, প্রথম প্রকাশ– ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৬, পৃ. ৩০
৩৩. '*সূর্য-দীঘল বাড়ী*' উপন্যাস, আবু ইসহাক, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, বাংলাবাজার-ঢাকা, একবিংশ সংস্করণ

(এপ্রিল-২০১০), পৃ. ২১

৩৪. '*সূর্য দীঘল বাড়ী*' চলচ্চিত্র, পরিচালনা– মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী, প্রযোজনা- জনচিত্রায়ণ, পরিবেশনা– শাওন সাগর লিমিটেড, DVD Version, Laser Vision, Dhaka, দৃ.- ২৭, শট- ২, ৩

৩৫. '*সূর্য-দীঘল বাড়ী*' উপন্যাস, আবু ইসহাক, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, বাংলাবাজার-ঢাকা, একবিংশ সংস্করণ (এপ্রিল-২০১০), পৃ. ৯, ১০

৩৬. তানভীর মোকাম্মেল, সিনেমার শিল্পরূপ, অনার্য, ১০৭/১ বক্সকালভার্ট রোড, পল্টন, ঢাকা- ১০০০, পৃ. ১১১

৩৭. '*গোলাপী এখন ট্রেনে*' চলচ্চিত্র, পরিচালক ও প্রযোজক– আমজাদ হোসেন, মুক্তি ১৯৭৮

৩৮. ওয়াহিদুল হক, *চলচ্চিত্রপত্র : সূর্য দীঘল বাড়ী বিশেষ সংখ্যা*, চলচ্চিত্রপত্র সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮১, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১০ পুরানা পল্টন, ঢাকা, পৃ. ৪

৩৯. অসীম সোম, চলচ্চিত্র-তত্ত্বের মূলসূত্র, *চলচ্চিত্র কথা*, রূপরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, পৃ. ২২, ২৩

৪০. '*সূর্য দীঘল বাড়ী*' চলচ্চিত্র, পরিচালনা– মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী, প্রযোজনা- জনচিত্রায়ণ, পরিবেশনা– শাওন সাগর লিমিটেড, DVD Version, Laser Vision, Dhaka, দৃ.- ৬৩, শট- ৬

৪১. '*সূর্য-দীঘল বাড়ী*' উপন্যাস, আবু ইসহাক, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, বাংলাবাজার-ঢাকা, একবিংশ সংস্করণ (এপ্রিল-২০১০), পৃ. ৮৩

৪২. '*সূর্য দীঘল বাড়ী*' চলচ্চিত্র, পরিচালনা– মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী, প্রযোজনা- জনচিত্রায়ণ, পরিবেশনা– শাওন সাগর লিমিটেড, DVD Version, Laser Vision, Dhaka, দৃ.- ৭৪, শট- ৯, ১০

৪৩. পূর্বোক্ত; দৃ.- ৫৫, শট- ৬

৪৪. ওয়াহিদুল হক, *চলচ্চিত্রপত্র : সূর্য দীঘল বাড়ী বিশেষ সংখ্যা*, চলচ্চিত্রপত্র সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮১, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১০ পুরানা পল্টন, ঢাকা, পৃ. ৭

৪৫. চিত্রনাট্য, '*সূর্য দীঘল বাড়ী*' *বিশেষ সংখ্যা*, চলচ্চিত্রপত্র সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮১, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১০ পুরানা পল্টন, ঢাকা, পৃ. ২০২

৪৬. বিকাশ মজুমদার, *আবু ইসহাক : সমাজবাস্তবতার কথাকার*, বলাকা, ৪০ মোমিন রোড, কদমমোবারক মার্কেট চট্টগ্রাম, প্রথম প্রকাশ– ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৬, পৃ. ৩০

৪৭. স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্য দীঘল বাড়ি, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, (৮ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা), ১১ জানুয়ারী ১৯৮০, দৈনিক বাংলা ভবন, ঢাকা, পৃ. ৭৩

৪৮. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, শামসুর রাহমান সম্পাদিত, ৯ বর্ষ ২১ সংখ্যা, ৭ নভেম্বর ১৯৮০, পৃ. ২৪, ২৬

৪৯. মেক-আপ শিল্প এবং নানাবিধ, *সচিত্র স্বদেশ*, জাকিউদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত, ১ম বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ২০ আগষ্ট ১৯৮১, পৃ. ৬৪

৫০. সন্‌জীদা খাতুন, *চলচ্চিত্রপত্র : সূর্য দীঘল বাড়ী বিশেষ সংখ্যা*, চলচ্চিত্রপত্র সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮১, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১০ পুরানা পল্টন, ঢাকা, পৃ. ৪২

৫১. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, শামসুর রাহমান সম্পাদিত, ৮ম বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ১৬ নভেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ৭৫

৫২. মসিহউদ্দিন শাকেরের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা: ০৪ জুন ২০১৫ (মসিহউদ্দিন শাকেরের নিজ বাসায় এই গবেষক কর্তৃক মৌখিক গ্রহণকৃত)

৫৩. মুহম্মদ খসরু, *চলচ্চিত্রপত্র : সূর্য দীঘল বাড়ী বিশেষ সংখ্যা*, চলচ্চিত্রপত্র সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮১, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১০ পুরানা পল্টন, ঢাকা, পৃ. ৫৪

৫৪. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, শামসুর রাহমান সম্পাদিত, ৯ম বর্ষ ১ সংখ্যা, ২৩ মে ১৯৮০।

৫৫. অনুপম হায়াৎ, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, শামসুর রাহমান সম্পাদিত, ৯ম বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮০

৫৬. অনুপম হায়াৎ, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, শামসুর রাহমান সম্পাদিত, ৯ম বর্ষ ১৬ সংখ্যা, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮০, পৃ. ৫৯

৫৭. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *চলচ্চিত্রপত্র : সূর্য দীঘল বাড়ী বিশেষ সংখ্যা*, চলচ্চিত্রপত্র সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮১, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১০ পুরানা পল্টন, ঢাকা, পৃ. ১৪

উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ : সারেং বৌ

‘সারেং বৌ’ চলচ্চিত্র পরিচিতি

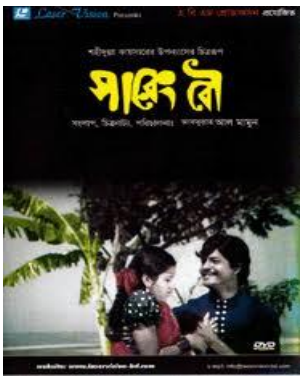

মূল কাহিনি: শহীদুল্লা কায়সার-এর উপন্যাস ‘সারেং বৌ’
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: আবদুল্লাহ আল মামুন
সঙ্গীত পরিচালনা: আলম খান
চিত্রগ্রহণ: রফিকুল বারী চৌধুরী
সম্পাদনা: আমিনুল হক মিন্টু
প্রযোজনা ও পরিবেশনা: এ বি এম প্রোডাকসন

অভিনয়ে:

ফারুক, কবরী, আরিফুল হক, গোলাম মোস্তফা, নাজমুল হুদা বাচ্চু, সূজা খন্দকার, হাসান ইমাম, জহিরুল হক, বিলকিস, বুলবুল ইসলাম, ডলি চৌধুরী, মনোয়ারা বেগম, রত্না চৌধুরী, আবদুল কাদের, কানু ভৌমিক, আবদুল মতিন, মনিরুল ইসলাম বাদল, আহসানুর রহমান ভুঁইয়া, কামরুজ্জামান রুনু, সৈয়দ আকতার আলী, দীন মোহাম্মদ, গোলাম রফিক, নজরুল ইসলাম, সিতারা, সাহরে বানু, মিনু রহমান, সীমা বেগম, আজম, নার্গিস, সুলতানা, দারাসিকো, বাবর প্রমুখ।

মুক্তি: ১৬ জুন, ১৯৭৮।
দৈর্ঘ্য: ১১৩ মিনিট।
ফরম্যাট: ৩৫ মি: মি:।
কালার: রঙিন।

‘সারেং বৌ’ উপন্যাস পরিচিতি

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শহীদুল্লা কায়সারের জনপ্রিয় উপন্যাস ‘সারেং বৌ’। এটি শহীদুল্লা কায়সারের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে তিনি এটি লিখেছিলেন। ১৯৬১ সালের ১লা অক্টোবর উপন্যাসটি লেখা শেষ হয়। ১৯৬২ সালের ১৫ ডিসেম্বর এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[১] দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকার’ (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা) ‘নসর মালুম’ লোক-কাহিনি অবলম্বনে তিনি ‘সারেং বৌ’ রচনা করেন।[২] তবে চট্টগ্রাম অঞ্চলের এ লোককাহিনি অবলম্বনে রচিত হলেও ‘সারেং বৌ’ উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। উপকূলীয় প্রতিকূল পরিবেশ ও ক্ষমতাবান-পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মাঝে টিকে থাকা গ্রামের সাধারণ মানুষ ও এক সংগ্রামী নারীর জীবন লড়াই এই উপন্যাসের বিসয়বস্তু। ‘সারেং বৌ’ উপন্যাসটির জন্য শহীদুল্লা কায়সার আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬২) লাভ করেন।

ভূমিকাঃ

শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লা কায়সারের নন্দিত উপন্যাস 'সারেং বৌ'। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এটি পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।[৩] এই উপন্যাসটির জন্য তিনি পাঠকের কাছে অধিক পরিচিত। ১৯৭৮ সালে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার আবদুল্লাহ আল মামুন উপন্যাসটি অবলম্বনে 'সারেং বৌ' নামেই চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এটিও ঐ সময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। সেইসঙ্গে বোদ্ধামহলে সমাদৃত হয়। ফলে উপন্যাসটি নতুন করে ব্যাপক মানুষের নজর কারে। 'সিনেমাটিক' উপাদান সমৃদ্ধ এই উপন্যাসটি চলচ্চিত্রকার নিজস্ব ভাবনার সংশ্লেষে চলচ্চিত্রে রূপদান করেছেন। কোথাও কোথাও মূল কাহিনির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বাদ দিয়েছেন। কোথাও আবার কাহিনির নতুন দিক সংযোজন করে স্বার্থান্বেষী সমাজ ব্যবস্থার মুখোশ উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। 'সারেং বৌ' উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উঠে এসেছে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের অসহায় নারীদের বহুমুখী সংগ্রামের চিত্র। বিশেষ করে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট। মানুষের প্রেম, বিশ্বাস, কাম-লালসা ; স্বার্থের দ্বন্দ্বে সম্পর্কের টানাপোড়েন, ক্ষুধার জ্বালায় মর্যাদা বিসর্জনের চিত্র 'সারেং বৌ'। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত, সব হারিয়ে নিঃস্ব মানুষের আবার নতুন করে শুরু করার গল্প 'সারেং বৌ'। লেখক উপন্যাসের শেষপ্রান্তে মাত্র দুটি চরিত্রের মাধ্যমে এক বিশাল জনপদের নতুন করে ঘুরে দাড়ানোর বিষয়টিকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। ধ্বংসস্তুপের মধ্যে নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় যে ঔপন্যাসিকের মানসে ছিল তা তাঁর উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—'জীবনের যে অন্তর্নিহিত তাগিদ, স্থবিরতা এবং অবক্ষয়ের বাঁধ ভেঙ্গে সৃষ্টির উৎসকে উন্মুক্ত করে, সে তাগিদ তো আমরা চারপাশেই দেখতে পাচ্ছি, অনুভব করছি। দেশময় আজ সৃষ্টি এবং ভাঙ্গনের দ্বৈত-সঙ্গীত, জনজীবনের সর্বস্তরে আজ জিজ্ঞাসার কোলাহল। এ দ্বৈতচিত্র শিল্পী-সাহিত্যিকদের মহৎ উপাদান, এ কোলাহল সৃষ্টিরই আহবান। আমি তাই আশাবাদীদেরই একজন।'[৪] চলচ্চিত্রকারও ঔপন্যাসিকের মূল সুরটি ধারণ করার চেষ্টা করেছেন, সেইসঙ্গে নিজস্ব দর্শনকেও সংযোজন করতে চেয়েছেন সিনেমায়।

সারেং বৌ : চলচ্চিত্র ও উপন্যাসের মিথস্ক্রিয়া

উপকূলীয় অঞ্চলের সম্মানজনক জীবিকা জাহাজে সারেংয়ের (নাবিক) চাকরি। বংশ পরম্পরায় এক শ্রেণীর মানুষ এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। সমাজে এদের অবস্থান উঁচুস্তরে। দল বেঁধে সারেংরা যখন গ্রামে ফেরে—দূর থেকে তাদের সাম্পান দেখে গ্রামের ছোট-বড় সকলে নদীর পাড়ে ভিড় জমায় কাছে থেকে এক নজর দেখার জন্য। মূল উপন্যাসে উল্লেখ না থাকলেও সিনেমার শুরুতেই এরকম একটি দৃশ্যের মাধ্যমে চলচ্চিত্রকার ঐ সমাজে সারেংদের গ্রহণযোগ্যতা যে সমুন্নত ছিল তা বোঝাতে চেয়েছেন। বাবার কর্মসূত্রে তাদের ছেলেরাও সারেং পেশাটিকে অধিক সম্মানজনক ও লোভনীয় মনে করে। বামনছাড়ি গ্রামের মজল সারেংয়ের ছেলে কদম সারেংও এর ব্যতিক্রম নয়। দেশ-বিদেশ ঘুরে ঘুরে জাহাজে সারেংয়ের কাজ করে। কদমের বাবা-মা বেঁচে নেই। তাদের অবর্তমানে চাচাই একমাত্র অভিভাবক।

একদিন অন্য নাবিকদের সঙ্গে সাম্পানে করে কদম সারেং গ্রামে ফিরে। গ্রামের ছোট-বড় আর সকলের মতো নবিতুনও বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আসে সারেংদের দেখতে। ঘাটের অদূরে কদম সারেংয়ের সঙ্গে নবিতুনের দেখা হয়। কদম সারেং নবিতুনকে ছোটবেলা থেকেই চিনে-জানে। কিন্তু এবার নবিতুনকে দেখে নতুন করে মুগ্ধ হয়। মা-মরা নবিতুনের বাবার সঙ্গেই হাশি-খুশির সংসার। নবিতুনের বাবাও সারেং ছিল। কদমের বাবা আর মন্তু সারেংয়ের সঙ্গে জাহাজে করে দেশ-বিদেশ করেছে। মেয়ের কথা ভেবে জাহাজী-জীবন বাদ দিয়ে গৃহস্থ হয়ে গেছে। লেখকের ভাষায়—'যেদিন নবিতুনকে কোলে নিয়ে অবাক হয়েছিল, অবাক হয়ে বলেছিল, আরে তুই যে ডাঙ্গর হয়ে গেলি! সেদিন কী চোখে বাপজানের দিকে তাকিয়েছিল নবিতুন! হ্যাঁ। ডাঙ্গর অর্থাৎ বড় হয়ে উঠেছিল নবিতুন। তাই অনেক অভাব, অনেক চাওয়া বুঝি ভাষা খুঁজছিল ওর চোখের তারায়। মেয়ের চোখের সেই অস্ফুট ভাষা বুঝতে পেরেছিল বাপজান। নবিতুনের বাপজান তাই আর যায়নি জাহাজের কাজে।'[৫] সিনেমায় দেখা যায়, একদিন বাবা-মেয়ে বাড়িতে মশকরা করছিল, এমন সময় কদম নবিতুনদের বাড়িতে গিয়ে হাজির। কথার ফাঁকে কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই নবিতুনকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় তার বাবার কাছে। কদমের বাবা নবিতুনের বাবার জ্ঞাতিভাই না হলেও তার চেয়েও বেশি—জানিভাই ছিল। কদমের প্রস্তাবে নবিতুনের বাবা সানন্দেই রাজি হয়ে যায়। নবিতুনেরও এতে সায় ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই কদম নবিতুনকে বিয়ে করে ঘরে তুলে।

উপন্যাসে কদম সরাসরি নবিতুনকে বিয়ে করার আগ্রহের কথা জানায়। একদিন নবিতুন ঢেঁকিশাক তুলতে তুলতে আনমনে কান্দির পার অবধি চলে যায়। হঠাৎ শুকনো পাতার মচ মচ শব্দে চমকে তাকিয়ে দেখে কাছেই দাঁড়িয়ে আছে কদম সারেং। সে খেয়াল করেছে কিছুদিন ধরেই কদম তাদের বাড়ির আশপাশে ঘুর ঘুর করছে। আজ সামনে পেয়ে পথ আগলে দাঁড়ায়। গান শোনায়। বিয়ে করার ইচ্ছের কথা জানায়। নবিতুন লজ্জায় কোনরকমে দৌড়ে পালায়। তারপর সুযোগ বুঝে পুতির মালা নিয়ে বাড়িতে হাজির হয়। উপন্যাসে এভাবে বিয়ে করার একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়। সিনেমায় দেখা যায় প্রথমদিনই কদম নবিতুনদের বাড়িতে ঢুকে নবিতুনের হাত ধরে ফেলে, পুতির মালা দেয়। নবিতুনও নিতে আপত্তি করে না। যেন আগে থেকেই তাদের বোঝাপড়া আছে—কিন্তু ঘাটে নবিতুনকে দেখে কদমের চিনতেই কষ্ট হয়েছিল। এখানে দর্শকমনে দ্বান্দ্বিকতার জন্ম দেয়। তারপরের দৃশ্যে মাঠে বুনোফল তুলতে গেলে কদম নবিতুনকে পিছন থেকে চমকে দেয়। গান শোনায়। মূল কাহিনিতে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হলেও সিনেমায় কাহিনির ক্রমান্বয় লঙ্ঘিত হয়েছে।

বিয়ের পর একদিন সকালবেলা কদম বাড়ির সীমানায় একটি বড়ই গাছের চারা রোপণ করতে করতে নবিতুনকে বলে—'আমাগো হিস্যার সীমানায় এই বড়ই গাছের চারার লগে আমি আমার মনডারে এইহানে রাইখ্যা গেলাম। ...আমি যখন থাকুমনা, এই বড়ই গাছটারেই মনে করবি আমি তোর কদম সারেং' (সা. বৌ. চ.)। একথা শুনামাত্রই নবিতুন ফুঁস করে ওঠে—'হ আমি আর কাম পাইলামনা, মানুষ ফালাইয়া পিড়িত করুম বড়ই গাছের লগে, মরদের কথা হুনলেই গাও জ্বলে' (সা. বৌ. চ.)। এখানে একদিকে স্বামীর নিজের অস্তিত্ব সবসময় স্ত্রীর কাছে মূর্ত করে রাখার বাসনা। অন্যদিকে স্ত্রীর মনে স্বামীকে সবসময় কাছে পাওয়ার ব্যাকুলতা। আবহমান গ্রামবাংলার স্বামীরা রোজগারের জন্য ঘরসংসার ছেড়ে যেখানেই থাকুকনা কেন, সে চায় স্ত্রী সবসময়ই তার কথা মনে

Dhaka University Institutional Repository

করুক, তারই পথ চেয়ে বসে থাকুক। তেমনি স্ত্রীও চায় কোন রকম শাক-ভাত খেয়ে বেঁচে থাকলেও স্বামী যেন সবসময় তার সঙ্গে থাকে। স্বামীই তার সবচেয়ে বড় ধন, গায়ের অলংকার। তারপরও পুরুষ মানুষকে জীবিকার সন্ধানে চলে যেতে হয়। যাযাবর শিকারী সমাজে পুরুষের অনুগামী হতে বাধ্য হওয়া নারী-শিশুরা আধুনিক সমাজে প্রবেশ করে স্থায়ী বসবাসের স্বাদ পেয়ে তুষ্ট থেকেছে। কিন্তু আজ অবধি পুরুষের রক্ত প্রবাহে আদিম জিনোম সঞ্চরিত হয় যাযাবর জীবিকার অকারণ তাগিদে। 'আদিম মানবসন্তান কালক্রমে বাসা বেঁধেছে, ঘর বেঁধেছে, শান্ত হয়েছে। তবু আদি স্বাধীন যাযাবরত্বকে কোনোদিনই ভুলতে পারেনি; তাই যুগে যুগে মানুষের মধ্যে স্থাবরতা ও জঙ্গমতার নিত্য লীলা।'[৬] স্থলকে জয় করে পুরুষ কালক্রমে সমুদ্রে অবগাহন পূর্বক জীবিকা অন্বেষণ করতেও দ্বিধা করেনি। তাইতো অসীমে বিচরণের দূর্বার চ্যালেঞ্জ পিপাসু পুরুষকে নারী তার আঁচলে বেশিদিন জড়িয়ে রাখতে পারেনা। অন্যদিকে নারীর সতত ভয়, স্বামী ভিনদেশে গিয়ে যদি পর হয়ে যায়। এখানে একদিকে মমতা, অন্যদিকে পুরুষের প্রতি নারীর নির্ভরশীলতা এই দ্বৈত মনস্তত্ত্ব কাজ করে। গ্রামবাংলার নারী চায় স্বামীর উপর নির্ভর করে সে নিরাপদে থাকতে। তাই তারা ভয় পায়—বিদেশ বিভূঁইয়ে স্বামী যদি অন্য নারীর মায়াজালে আটকে যায়। নবিতুনেরও সেই ভয়—'আমার ডর করে, ...আমি হুনছি বিদেশের ফর্শা ফর্শা মাইয়ারা জাদু জানে, জাদুর ফাঁদ পাইত্যা মরদ পোলাগ আটকাইয়া ফালায়' (সা. বৌ. চ.)। সে আরও শুনেছে বিদেশের মেয়েগুলো বেলাজ, বেশরম। কদমের কাছে গ্রামের রইছউদ্দি সারেংয়ের বিদেশি মেম বৌয়ের ফটো দেখে নবিতুনের গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। স্বল্পবসনা মেমকে দেখে সে আরও বিচলিত হয়ে পরে। স্বামীকে সে আর বিদেশে দিতে চায়না। সে চায় স্বামী গৃহস্থালি করুক, তার সঙ্গে গ্রামে থাকুক।

কিন্তু কদমের গায়ে সারেংয়ের রক্ত। সমুদ্রের গর্জন আর কাড়িকাড়ি টাকা তাকে হাতছানি দেয়। গৃহস্থালিতে সে তৃপ্ত নয়। কদম নবিতুনকে কথা দেয়—সে তারই থাকবে। তাতেও নবিতুন ভরসা পায়না। অবশেষে নবিতুনের গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে—'এই আমি তর গাও ছুঁইয়া কইলাম, কসম খাইলাম, আল্লার কসম' (সা. বৌ. চ.)। নবিতুন এতে নিমরাজি হয়। একদিন বাবার বন্ধু মস্ত সারেং এসে তাড়া দেয় জাহাজের কাজে যাওয়ার জন্য। রুতুন্দা জাহাজে কাজ পাওয়ার জন্য আগে থেকেই উদগ্রীব ছিল কদম। এবার মস্ত সারেংয়ের কাছে প্রস্তাব পেয়ে সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। পরদিনই জাহাজের উদ্দেশ্যে রওনা দিবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু নবিতুনের মন কিছুতেই সায় দেয় না। সে চায় স্বামী জমি কিনুক। চাষাবাদ করুক। কিন্তু সারেংয়ের কাজে মোটা অংকের টাকার মায়া কদম ত্যাগ করতে পারে না। তাছাড়া এই একটি কাজই সে করতে শিখেছে। নবিতুন উদাহরণ হিসেবে অন্য সারেংদের কথা বলে—যারা জাহাজের কাজ ছেড়ে দিয়েছে, জমি কিনে গৃহস্থালি করে বৌ-সন্তান নিয়ে সুখী জীবনযাপন করছে। কিন্তু কদম শুনেনা নবিতুনের কথা, তার শিরায়-শিরায় সারেংয়ের রক্ত। ঔপন্যাসিকের ভাষায়, 'সমুদ্র ওদের জীবিকা, সমুদ্র ওদের জীবনের গান। সাগর উর্মি ওদের কল্লোল গীত। সাগরের বুকে ডিঙ্গি ভাসিয়ে ওরা মাছ ধরে। সাগরের তরঙ্গে চড়ে ওরা চলে যায় দূরদেশে। ওরা নাবিক।'[৭] কদমের মনে পড়ে, বাপজানের সঙ্গে চৌদ্দ বছর বয়সে প্রথম সমুদ্র যাত্রায় কথা। খিদিরপুর থেকে কলম্বো। বাপের সঙ্গে এটাই তার প্রথম এবং শেষ সমুদ্র যাত্রা। চারদিকে বিশ্বযুদ্ধ, এরই মধ্যে মজল সারেং আর মস্ত সারেং বেরিয়ে পড়ে আটলান্টিকের পথে। শত্রুপক্ষের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে মিত্রপক্ষের বন্দরে অতি দরকারী ঔষধ-রসদ নিয়ে আর পৌঁছতে পারেনি। তার আগেই জার্মান টর্পেডো ধ্বংস করে দেয় তাদের জাহাজ। মস্ত সারেং প্রাণ নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ফিরতে পারলেও চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায় মজল সারেং। তবুও সমুদ্র তাকে ডাকে, তার মৃত বাবা তাকে দরিয়ায় আহ্বান করে। সে দৃঢ়, সে নির্ভীক। দরিয়ার পানির শব্দের সঙ্গে বাবার ডাক তার কানে ভেসে আসে। এই ডাককে কোনভাবেই সে উপেক্ষা করতে পারেনা—'নবিতুন বাজান আমারে ডাক পারে, আমি হুনতে পাই। দরিয়ার পানি বাজান হইয়া আমারে ডাকে, বাজানের ডাক আমি না হুইন্না পারি না, আমি ঘরে থাকতে পারি না। ...অই ডাক হুইন্যা ঘরে থাকুন যায় না।'[৮]

কদম শুনেনি নবিতুনের কথা। দরিয়ার পানি, দূর সাগরের ওই ঝিকিমিকি আভা—নবিতুনের চিরকালের দুশমন। কদম সারেং সেই কথাটি কোনদিন বুঝতে পারেনি। নতুন বৌকে রেখে কদম সারেং জাহাজে চলে যায়। শুরু হয় নবিতুনের একাকিত্বের জীবন। 'সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে মানুষের অগ্রযাত্রার অনুগামী হয়েছে একাকীত্ব বা বিচ্ছিন্নতাবোধ। গোষ্ঠীবৃত্তে সঙ্ঘবদ্ধ হবার পর মানুষ যতই সমাজের সঙ্গে মেলবন্ধনের চেষ্টা করেছে, ততই সে ব্যক্তিগত সম্পত্তিবৃদ্ধির আত্মস্বার্থজনিত কারণে ভিতরে-ভিতরে বিচ্ছিন্নতার বেদনায় হয়েছে পীড়িত। বিচ্ছিন্নতার সংক্রাম ও সভ্যতার ইতিহাস সমান্তরাল গতিতেই হয়েছে বিকশিত।'[৯] এই বিচ্ছিন্নতাবোধ কদমের মধ্যেও সংক্রমিত হয়—আক্রান্ত করে নবিতুনকেও। বিদেশের জেলখানা, উত্তাল সমুদ্রে ভাসমান জাহাজ কিংবা কয়াল নদীর পাড়ের সরল জনজীবন, কোনখানেই এর থেকে পরিত্রাণ নেই।

"'সারেং বৌ' উপন্যাসে সমান্তরালভাবে চিত্রিত হয়েছে সমুদ্র মোহনায় করাল নদীর তীরের বামনছাড়ি গ্রামের কদম সারেং-এর বৌ নবিতুনের মামুলি দিনযাপন আর সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়ানো কদম সারেং-এর সংঘাতবিক্ষুব্ধ জীবন।"[১০] চলচ্চিত্রের কাহিনি অনুসারে কদমের শেষ সমুদ্র যাত্রার পাঁচ বছর কেটে যায়। শরবতির মায়ের সংলাপে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, 'কিগো সারেংয়ের বৌ, খোঁজ খবর আইল কিছু, পাঁচ বছরেও খবর আইল না। দেহ গিয়া কোনহানে, কোন বন্দরে সংসার পাইত্যা বইয়া রইছে' (সা. বৌ. চ.)। কদম আর বাড়ি ফিরে না। এমনকি তার কোন খোঁজও মেলেনা। নবিতুনের মেয়ে আক্কি বড় হয়ে যায়। জন্মের পর সে তার বাবাকে দেখেনি। গুজাবুড়ির কথায় সেই প্রমাণ মেলে, 'হেই কবে গেছে বিদেশে, খোঁজ নাই, খবর নাই। আস্তা একখান হারামী। কুনু চিন্তা নাই। কেমনে অর বৌয়ের দিন কাটব, রাইত কাটব। ...অই তুই কদমের মাইয়ানা? দেখতে দেখতে এত ডাঙ্গর হইয়া গেছসগা। হায়রে পোড়া কপালী, জন্মের পর থেইক্যা আজ পর্যন্ত বাপের মুখ দেখলি না' (সা. বৌ. চ.)। ধান না পেয়ে খালি কোরা নিয়ে নবিতুনের বাড়িতে ফেরার সময় দোকানদার অছিম্মদ্দির সঙ্গে কথোপকথনেও এর প্রমান পাওয়া যায়, 'হেই যে কদমটা গেল, একটা না দুইটা না পাঁচটা বছর গেল। এমন বেক্কল হয়নি মানুষ। তোমাগ আক্কি আহে, আমার টুনির লগে খেলে, দেহি, আর আমার পরানডা কান্দে' (সা. বৌ. চ.)। কিন্তু উপন্যাসে কদম বিয়ের পর থেকে শেষবার নিখোঁজ হওয়ার আগ পর্যন্ত, কয়েকবার সমুদ্রযাত্রা করেছে। 'সেই বার বছর বয়সে বিয়ে হয় নবিতুনের। আর এখন, তা প্রায় এক কুড়ি পেরিয়েও বছর তিনেক হতে চলল বই কি? এর মাঝে-কতবার বিদেশ করতে গেল মানুষটি। এক নাগাড়ে দু'বছর, একবার মাত্র তিন বছর থেকেছে বিদেশে। ...কিন্তু এবার কি হল। গেছে সেই যেবার মুরগির মড়ক লাগল গ্রামে—সেই বছর। তারপর দু'বছরের জায়গায় তিনটি বছর কেটে গেল, না একটা খবর, না একটা চিঠি।'[১১] এই হিসেব অনুযায়ী নবিতুনের বিয়ে হয়েছে এগার বছর। শেষবার কদম নিখোঁজ থেকেছে পাঁচবছর। এরমধ্যে তিনবছর বিদেশের জেলে। বাকী দু'বছর রুতুন্দা জাহাজে। সিনেমায় আক্কিকেও ছোটশিশু

Dhaka University Institutional Repository

দেখানো হয়েছে—বিয়ের পর কদম প্রথম জাহাজে চলে যাওয়ার পরই জন্ম হয়েছে আক্‌কির। উপন্যাসের আক্‌কি বড়, দুই বছর বাদেই বিয়ে দিতে হবে তাকে—'আক্‌কির বাড়ন্ত শরীরটার দিকে তাকিয়ে অন্য চিন্তা জাগে নবিতুনের। দশে পড়েছে আক্‌কি। কথায় বলে, এগারোয় মেয়ে সেয়ানা, বারোয় মেয়ে বিয়ের লায়েক।'[১২] আবদল্লাহ আল মামুন হয়ত কাহিনি সংক্ষেপের জন্য সচেতনভাবে কদম-নবিতুনের দাম্পত্য জীবনের কয়েকটি বছর বাদ দিয়েছেন। সেইসঙ্গে বেশ কয়েকটি সমুদ্র যাত্রাও। এখানে পাঠক-দর্শকের মনে দ্বন্দ তৈরি হওয়ার অবকাশ থেকে যায়। সিনেমায় কাহিনির সময়রেখাকে না কমিয়ে ছোট ছোট দৃশ্যের মাধ্যমে উপন্যাসের পুরো ঘটনাটি চিত্রায়িত করারও অবারিত সুযোগ ছিল। আর এটি করতে পারলে সিনেমার গল্পটি আরও বোধগম্য হওয়ার অবকাশ পেতো। উপন্যাসে আক্‌কির ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠা, শরবরতির বিয়ে হওয়া, বাচ্চা হওয়ার বিষয়গুলো স্পস্ট। সিনেমাটি একটি যায়গায় এসে আটকে গেছে। যেন তাড়াতাড়ি শেষ করতে চেয়েছেন পরিচালক। David Bordweel and Kristin Thompson বলেছেন, 'The story is the series of causal events as they occur in chronological order and presumed duration and frequency. Usually the events are not presented in exact chronological order; the order in which they occur in the actual film is their plot order.'[১৩] বিয়ের আগে শরবতির লুকিয়ে চাল দিয়ে সাহায্য করার দৃশ্যের পাশাপাশি বিয়ের পর শরবতির শূন্যতায় নবিতুনের অসহায়ত্বের একটি ছোট দৃশ্য থাকলে যে সহানুভূতির আবেদন সৃষ্টি হতো দর্শক-মনে, তা একদিকে যেমন দর্শকদের আপ্লুত করতে পারত, অপরদিকে সিনেমায় দর্শকদের একাত্ম করার প্রয়াস পেত। এরকম ছোট-ছোট শট বা দৃশ্য কাহিনির একগুঁয়েমি কাটিয়ে চলচ্চিত্রে গতি সঞ্চার করতেও ভূমিকা রাখে। 'যতখানি সময় একটি শট পর্দায় থাকে তা সেই নির্দিষ্ট সময়েই একটি মনস্তাত্বিক উত্তেজনা দর্শকের মনে সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, এক একটি শটকে ক্রমান্বয়ে যত সংক্ষিপ্ত করা হবে উত্তেজনাও তত বেশি হবে।'[১৪]

স্বামী বিহনে নবিতুনের ভরা যৌবন বয়ে যায়। গ্রামের গুজাবুড়ি কারণে অকারণে আসে নবিতুনকে কুমন্ত্রণা দিতে। তাই বাড়িতে ঢোকার পথে আক্‌কি ঢিল দেয় গুজাবুড়ির গায়ে। ছোট আক্‌কিও বুঝতে শিখেছে গুজাবুড়ি ভালো মানুষ না, মা তাকে সহ্য করে না। ঢিল খেয়েও নবিতুনের বাড়িতে যায় বুড়ি। তাকে যেতেই হয়, কারণ তার মনে খারাপ উদ্দেশ্য আছে। নবিতুন আকিক্‌কে চৌধুরি বাড়ি থেকে ধান নিয়ে আসার সময় পোস্টঅফিসে খোঁজ নিতে বললে বুড়িকে মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলতে শোনা যায়, 'পোস্টঅফিসে আর কত পাডাবি, এত বছরেও খবর আইল না, আর আইজ আইব খবর, তর এই জোয়ান্তি ছুরুত একবার ডুইব্যা গেলে আর কি ওটবরে নবিতুন (সা. বৌ. চ.)।' বুড়ির কথা শুনে নবিতুন তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে—'গুজাবুড়ি, হারামখাকি, ভাতারখাকি, লুন্দর শেখের কুটনী মাগী, জ্বালাইয়োনা আমারে (সা. বৌ. চ.)।' এত গালাগালির পরও বুড়ি হাল ছাড়েনা। বলে 'ভাইব্যা দেখরে নবিতুন, আমার কথাডা ভাইব্যা দেখ। পালঙে বইস্যা, পায়ের ওপর পা তুইল্যা, খাবি থুবি হুকুম চালাবি, গা হাত পা টিইপ্যা দিব, গোসল করাইয়া দিব, চুল আচড়াইয়া দিব, এরই নাম সে-না ঘর করা (সা. বৌ. চ.)।' এ কথায় আবারও খেপে ওঠে নবিতুন—'দূর হ, দূর হ তুই, শকুনি কোনানকার। কুটনী, গেলি তুই, আমার গায়ের জ্বালা, গলার বিষ (সা. বৌ. চ.)।' নবিতুনের কথায় বুড়ি কিছুই মনে করেনা। সিদ্ধি হাসিলের জন্য সে লেগে থাকে নবিতুনের পিছনে। তাইতো তাকে বলতে শোনা যায়, 'পরতম পরতম বেক্তেই এইরম করে, শরম করে, তেজ দেহায়,

Dhaka University Institutional Repository

পরে আস্তে আস্তে নরম হয়, টোপ গিলে—কত দেখলাম (সা. বৌ. চ.)।' কিন্তু নবিতুন সে ধাতুতে গড়া নয়। এতক্ষণ চুপ করে শুনলেও এবার আর সহ্য করতে না পেরে বুড়িকে একেবারে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে বলে—'বাইরহ তুই, মাইয়া খাকি, পোলা খাকি, ভাতার খাকি, তর মুখ দেখলেই গুনা (সা. বৌ. চ.)।' বুড়ি কোনরকমে হাতে ভর করে মাথাটা ওপরে তুলেই নিরাশ হয়ে বলতে থাকে—'তর সারেং আর আইবনা, বিদেশের ছোঁয়া যে একবার পাইছে, সে আর দেশে ফিরে না রে, সে আর দেশে ফিরে না।' বুড়ির কথাগুলো নবিতুনের কানে বাজে, ভিতরে ভিতরে মুষড়ে পরে সে। এইবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিড়ি দিয়ে ঢিল দেয়। পিড়িটা মাথার পাশ দিয়ে চলে যাওয়ায় ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় বুড়ি। কোন রকমে পড়িমরি করে পালায় সে। যাওয়ার সময় বলে, 'মাগীর তেজ কত'। এই তেজই নবিতুনকে সুরক্ষা দিয়েছে এতোদিন, দিয়েছে মনোবল। যা দিয়ে দুষ্টু লোকদের কু নজরকে কঠোরভাবে মোকাবেলা করতে পেরেছে। সগির মাকে (গুজাবুড়ি) চলচ্চিত্রকার ঠিকঠাক মতো চিত্রণের চেষ্টা করলেও উপন্যাসে তাকে আরও বেশি আত্মপ্রত্যয়ী বলে মনে হয়, 'কত দেখল সগির মা। কুলকন্যার কুল দেখল, তেজ দেখল, মান দেখল। সতী বৌর সতীত্ব দেখল। সবই লুন্দর শেখের দাসী বান্দীর খেদমতের লোভ, দু-পদ জেয়ড়, বড় জোর কিছু নগত টাকার কাছে গাঙ্গের পানি। গাঙ্গের পানির মতোই ভেসে যায়। কত দেখল সগির মা।'[১৫]

বুড়ির কথায় নবিতুন কান্নায় ভেঙে পরলে শরবতি সান্তনা দেয়। চলচ্চিত্রে শরবতিকে সবসময় পাশে থেকে সাহস দিতে দেখা যায় নবিতুনকে। সে 'বারা বান্ধনের' কাজেও সাহায্য করে। তা থেকে পারিশ্রমিক বাবদ যে চাল পায়, তা দিয়েই নবিতুনদের হাড়ি চলে। নবিতুন নিজের ঘর থেকে চাল দিয়েও সাহায্য করে। একদিন নবিতুন পুকুর ঘাটে জল আনতে গেলে শরবতির সঙ্গে দেখা হলে সে জানতে চায় রান্না করেছে কিনা? জবাবে নবিতুন বলে— 'হইছে'। শরবতি এবার জিজ্ঞেস করে 'কি রানছ'? নবিতুন জবাব দেয় 'খুদ'। এই জবাবের মধ্যে চাল ভাঙ্গা খুদের মতোই নবিতুনের ভাঙ্গা হৃদয়ের অভিব্যাক্তি ফুটে ওঠে। উপন্যাসে না থাকলেও দৃশ্যটি পরিচালকের নিজস্ব চিন্তার ফসল। সিনেমায় শরবতি চরিত্রটিকেও নবিতুনের সর্বক্ষণের সহচরী হিসেবে দেখা যায়। সে হতাশায় আশা জাগিয়েছে, বিপদে পাশে দাড়িয়েছে, লুকিয়ে চাল দিয়ে নবিতুনদের ক্ষুধা মিটিয়েছে। এখানে শরবতি আদ্যোপান্ত অবিবাহিতা। উপন্যাসের শরবতির বিয়ে হয়, তার একটি ছেলে হয়। একাধিকবার স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে নাইয়র আসতেও দেখা যায়—"শ্বশুর বাড়ি বছর কাবার করে আবারও নাইয়র এসেছে শরবতি। ওর ছেলেটা এখন হাঁটতে শিখেছে।"[১৬]

বরই গাছের দিকে তাকিয়ে নবিতুন স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে। সেই যে যাওয়ার আগে কদম সারেং বরই গাছটি লাগানোর সময় বলেছিল, এর দিকে তাকালেই তার কথা মনে পরবে। তা আজও ভুলেনি নবিতুন। সিনেমার বরই গাছটি সবুজ, পাতায় পাতায় ভরপুর। তা দেখে নবিতুনকে আনমনে বলতে শোনা যায়, 'বরই গাছে কতবার ফুল ধরল, বরই আইল, পাতা ঝরল, আবার নতুন পাতা গজাইল, এইবারও নতুন ফুল আইছে। আহেনা খালি আমার সারেং, একটা চিডিও আহেনা (সা. বৌ. চ.)।' উপন্যাসের বরই গাছটি কখনো সবুজ, কখনো ন্যাড়া—সব পাতা মরে গেছে। দু একটি মরা পাতা যা আছে, তা যেন বিগত দিনের কোন ব্যার্থতার কান্না। 'গাছটির দিকে চেয়ে চেয়ে নবিতুনের চোখ আসে ঝাপসা হয়ে। টন টন করে চোখজোড়া। তবু চেয়ে থাকে নবিতুন! বুঝি ওই বরই গাছটির কাঁটায় কাঁটায় আটক নবিতুনের যত দীর্ঘশ্বাস। বুঝি ওই বরই গাছটির রুক্ষ গায়ে জমাট বাঁধা ওর যত

Dhaka University Institutional Repository

মনের বিলাপ। ...একেবারে মগডালের দিকে নতুন পাতার প্রথম কুঁড়ির ক্ষীণ সবুজটি শাদা চোখে এখনো অপরিস্ফুট।'[১৭] উপন্যাসে এরকম একটি চিত্ররূপময় বর্ণনা পেয়েও চলচ্চিত্রে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন পরিচালক। পৃথিবীর তাবৎ বড় বড় পরিচালকেরা যেখানে সংলাপ বাদ দিয়ে বিভিন্ন রূপক, উপমা ব্যবহার করেন চলচ্চিত্রে ব্যাঞ্জনা সৃষ্টি করার জন্য। সেখানে ঔপন্যাসিকের এমন ব্যাঞ্জনাময় বর্ণনাকে কাজে লাগানোর সুযোগকে হাতছাড়া করেছেন আবদুল্লা আল মামুন। একটি ন্যাড়া, রুক্ষ, কাটাময় বরই গাছের মগডালে নতুন পাতার প্রথম কুঁড়ির ক্ষীণ সবুজ অংশের কয়েক সেকেন্ডের একটি দৃশ্যই হয়ে ওঠতে পারত; নবিতুনের মনের হাজারও না বলা কথা, এতোদিন ধরে মনের গহীনে জমতে থাকা ব্যাথার বহিঃপ্রকাশ। কুঁড়ির সবুজ অংশ নবিতুনের মনের ক্ষীণ অথচ তীক্ষ্ণ আশাটিকে দর্শকদের সামনে মূর্তমন্ত করে তোলার উৎকৃষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পরিচালক উপন্যাসে বর্ণিত বরইগাছ সংক্রান্ত অংশগুলো থেকে চলচ্চিত্রের জন্য অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ চিত্রায়িত করেছেন। নবিতুনের মুখে কতগুলো সংলাপ বসিয়ে দিয়ে চিত্ররূপময় বর্ণনাকে বাঙময় করে তোলার সম্ভাবনাকে গলাটিপে হত্যা করেছেন। আমেরিকার প্রখ্যাত পরিচালক Terrence Malick তাঁর 'The Tree of Life' (২০১১) সিনেমায় গাছ ও পাতার বিভিন্ন শটের মাধ্যমে পৃথিবীর বদলে যাওয়া, জলবায়ুর পরিবর্তন ও মানব মনের গহীনে লুকায়িত সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করেছেন অনবদ্যভাবে।[১৮] চমৎকার দৃশ্যবর্ণনার কারণে ২০১২ সালে Best Cinematography, Best Director and Best Picture ক্যাটাগরিতে তিনটি Academy Award লাভ করে সিনেমাটি। এছাড়া ২০১১ সালে cannes film Festival হতে Plame d'Or সহ অসংখ্য পুরস্কার লাভ করে এবং বিখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচকদের ভূয়সী প্রশংসা পায়।

ঢেঁকিতে অন্যের ধান ভেনে কোনরকমে খেয়ে না খেয়ে নবিতুন ও আক্কির দিন কাটে। ঢেকির ওঠানামার সঙ্গে নবিতুনের ভিতরটাও উথাল-পাথাল করে স্বামীর জন্য। ব্যাকুল হৃদয়ে নানা ভাবনা উঁকি দেয়। খারাপ কিছু সে ভাবতেও পারেনা। যৌবন তার উপচিয়ে পরে। ভারাক্রান্ত মন, ক্লান্ত দেহের বিমর্ষ বদনে নবিতুনের ভিতরে ভিতরে ভেঙ্গে পরা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শরবতি সাহস দেয়, 'কেন যে তুই এত ভাইঙ্গা পরস বুয়া। মাইনষের কথায় কান দেইস না, আমার মনে কয় এইবার ঠিক একটা খবর টবর আইয়া পড়ব। দেহিস (সা. বৌ. চ.)।, নবিতুন যেন আশার আলো দেখতে পায় শরবতির কথায়। হঠাৎ তার মুখ খুশিতে ভরে ওঠে। নবিতুন এবার নিশ্চিন্তে পা চালায় ঢেঁকিতে।

আক্কি ধান আনতে গেলে ছোট চৌধুরী তাকে বলে—'তর মারে ক গিয়া, ধান-ফান আর পাওয়া যাইব না। বাজারে চাইর-চাইরখান ধানের কল বইছে। সেই কলে টিপ দিলে ফর্শা ফর্শা চাইল বের হয়। ধান-ফান আর কোন এইহানে পাবিনা, যা (সা. বৌ. চ.)।' খালি হাতে ফিরে আসা আক্কির মুখে বাজারে চালের কল বসার কথা শুনে নবিতুনের মাথায় আকাশ ভেঙে পরে। দিশেহারা হয়ে যায় সে। পোস্টঅফিসেও গিয়েছিল আক্কি। পোস্টমাস্টার সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে—'নাই, চিডিও নাই, ট্যাকাও নাই। যা এইহানতন। চিডি, ট্যাকা, পাডাইলেত আইব (সা. বৌ. চ.)।' পোস্টমাস্টার গাঁয়ের মোড়ল লুন্দর শেখের পরামর্শে কদমের পাঠানো টাকা ও চিঠি বারবার আত্মসাৎ করে। সে কথা নবিতুন জানতে পারেনা। গুজাবুরির কথা নবিতুনের কানে বেজে ওঠে—'বিদেশের ছোঁয়া যে একবার পাইছে, সে আর দেশে ফিরে নারে'। নবিতুনের মনে ভয় ঢুকে যায়। আনমনা হয়ে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আক্কির ডাকে সম্বিৎ ফিরে পায়। খেতে চায় আক্কি। পান্তা ছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

তাদের আর খাওয়ার কিছুই থাকে না। অনাহারি আক্‌কি বাসি পান্তাই গাপুসগুপুস করে খায়। জন্মাঅনাহারী সে নয়। পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছে। প্রাণীকূলের মধ্যে মানুষই পারে যেকোন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে। তবুও নবিতুনের একটাই চিন্তা, এতটুকু খাবারই আর কতদিন জুটাতে পারবে সে। তাইতো নবিতুনের জিজ্ঞাসা—'সব ধান কলে ভানব, আমি একটুও পামুনা? (সা. বৌ. চ.)।' এ জিজ্ঞাসা যেন যান্ত্রিক সভ্যতার কাছে পৃথিবীর সকল খেটে খাওয়া মানুষের জিজ্ঞাসা। চৌধুরী বাড়ির বড় বৌ বৈষ্টমদের ভিক্ষা দেয়, কিন্তু নবিতুনকে ধান দেয় না। তার কথা—কল থাকতে ঢেঁকিতে ধান দিব কেন? যেন খেটে খাওয়ার অধিকারও গরিবের নেই। তবে খারপ সমাজেও কুটিল মানুষগুলোর ভিড়ে কিছু ভাল মানুষ থাকে। তেমনি একজন চৌধুরী বাড়ির ছোট বৌ। সে দয়ালু। নবিতুনের খোঁজ-খবর নেয়। সারেংয়ের খোঁজ নেয়। শরবতি ছাড়া একমাত্র ছোট বৌকেই সে ভরসা করে। কষ্টের কথাগুলো তার কাছে বলে। সমালোচক বলেছেন, 'পঞ্চাশের দশকের পূর্ববাংলার গ্রামীন জীবনযাত্রার নীচতা ও উদারতার পরিচয় অঙ্কিত এই রচনায়।'[১৯]

সেই যে ছয়মাস চালাইয়া নেওয়ার টাকা দিয়ে গেল কদম সারেং। আর কোন খবর নাই। ছয়মাসের টাকায় এক বছর চালিয়েছে নবিতুন। তারপর ধরেছে বাড়া বান্ধার কাজ। আজ সে বাজারে কল বসার কথা শুনে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। অসহায় বদনে তাই ছোট বৌকে বলতে শোনা যায়, 'অহন কেমনে চলুম ছোডমা, কেমনে বাচুম (সা. বৌ. চ.)।' নবিতুনকে সহায়তার আশায় তাদের বাড়িতে কাজ করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সারেং বাড়ির বৌ হয়ে নবিতুন কেমনে কাজ করবে পরের বাড়ি, এই দ্বিধায় ভুগে। ছোট বৌ ভেবে দেখতে বলে নবিতুনকে। সে কিছুই ভেবে পায়না। ধান ছাড়া খালি হাতে ফেরার পথে দেখে গাড়ির পর গাড়ি বোঝাই ধান যাচ্ছে কলে। এ যেন যান্ত্রিক সভ্যতার নিষ্পেষণে খেটে খাওয়া মানুষগুলো কলে ধান মাড়াইয়ের মতোই দুমড়ে মোচড়ে যাচ্ছে নিয়ত। একদিন হয়ত তাদেরও ধানের কুড়োর মতো ধুলায় মিশে যেতে হবে। ধান বোঝাই গরুর গাড়িগুলোর দিকে নবিতুন অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কলের মুখ দিয়ে টগবগিয়ে চাল বের হওয়ার মতো তার ভিতরটাও বোবা কান্নায় টগবগ করতে থাকে। চলচ্চিত্রকার এখানে সভ্যতার বিকাশ ও পরিবর্তনের ফলে খেটে খাওয়া মানুষের অসহায়ত্বের দিকটিকে শৈল্পিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন নবিতুন চরিত্রের মাধ্যমে।

পথে দোকানদার অছিমদ্দির সঙ্গে নবিতুনের দেখা হয়। অছিমদ্দির জিজ্ঞাসার উত্তরে নবিতুন জানায় তার অসহায়ত্বের কথা। নবিতুনের অভিব্যক্তিতে বুকের ভিতরের চাপা কান্না স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অছিমদ্দি আক্‌কির জন্য কয়েকটা বাতাসা দেয়। নিরুপায় নবিতুন হাত বাড়িয়ে বাতাসা নিয়ে কোন কথা না বলে চলে যায়। যেন সে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। বাড়িতে ফিরে দেখে, বারান্দায় মাটিতে পড়ে আক্‌কি ঘুমাচ্ছে। মায়ের ডাকে আক্‌কির ঘুম ভাঙে—বাতাসা দেখে বিস্মিত হয়। কারণ সে জানে তাঁর মা ঠিকমতো ভাতই জোগার করতে পারেনা। মূল কাহিনি বিবর্জিত অছিমদ্দি সংশ্লিষ্ট এই দৃশ্যগুলো কিছুটা অবান্তর মনে হলেও পরিচালক হয়ত অছিমদ্দি চরিত্রটির মাধ্যমে সমাজের মুষ্টিমেয় সহানুভূতিশীল মানুষদের চিত্রিত করতে চেয়েছেন। অথবা সহানুভূতির অন্তরালে নবিতুনের ভিতরের কষ্ট ও বোবা কান্নাটাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এখানে আক্‌কির বাতাসা খাওয়ার দৃশ্যটিকে আরও উপভোগ্য করে তোলা যেত। আক্‌কি মনের আনন্দে বাতাসা খাচ্ছে, নবিতুন উদাস নয়নে তা দেখছে। আক্‌কির আনন্দ তাকে আন্দোলিত করছেনা। তার মনে শঙ্কা পরের বেলা খাবারটা জুটবে

Dhaka University Institutional Repository

কী না। এমন সময় শরবতি আঁচলে করে লুকিয়ে কিছু চাল নিয়ে আসে। এতে নাটকীয় আবহ তৈরির অবকাশ ছিল। 'সারেং বৌ' উপন্যাসটি এমনিতেই চলচ্চিত্রধর্মী। সমালোচক বলেছেন, "'সারেং বৌ' জীবন রহস্য উদঘাটনের প্রয়াস নয়, জীবন রূপ তুলে ধরার চেষ্টা। তাই গভীর জীবন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে লেখক চান নি। তা ছাড়া উপন্যাসকে চলচ্চিত্র ধর্মী করার সচেতন প্রয়াসে তার শিল্পরূপ ব্যাহত হয়েছে।"[২০]

শরবতির লুকিয়ে চাল দেওয়াটা নবিতুবের বিবেকে বাঁধে। শরবতি তাকে বড়বোন জ্ঞান করে বলে সেই দাবি থেকে সে চাল নিয়ে আসে। নিরুপায় নবিতুন সে চাল রাখতে বাধ্য হয়। শরবতির দেওয়া চালে কোনরকমে রাতের খাবারের সংস্থান হয়। আঁধার গড়িয়ে আবার প্রভাত আসে। রাঙা সূর্য আলোকিত করে চারদিক। শুধু নবিতুনদের জীবনের আঁধার কাটেনা। সূর্যরশ্মি আক্কির মুখের বিষাদের ছায়া মুছে দিতে পারেনা। ক্ষুধায় মুখখানি পাংশে হয়ে থাকে। ক্ষুধার জ্বালায় হাটতে পারে না। পেটে ক্ষুধা লাগলে তার কিছুই ভাল লাগেনা। মা শুধু শাপলা তুলে নিয়ে আসে। রোজ রোজ তার শাপলা খেতে ভাল লাগেনা। তাই ক্ষুধার তাড়নায় টুনিকে বলতে শোনা যায়, 'অই টুনি তোগ দোকান থেইক্কা আমারে দুইডা বাতাসা আইন্যা দিবি, ক্ষিদায় আমি মইরা যাইতাছিরে (সা. বৌ. চ.)।'

গভীর রাতে ঘরের বাইরে কুহু কুহু শব্দে নবিতুনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। নবিতুন বুঝতে পেরে মুহূর্তেই রুদ্রমূর্তি ধারন করে। ঘরের বেড়ায় গুঁজে রাখা দা হাতে নিয়ে বীর কণ্ঠে হুঙ্কার দেয়— 'কেডা, কোন হারামির বাচ্চা, কোপাইয়া তরে শেষ কইরা ফালামু (সা. বৌ. চ.)।' মুহূর্তেই ভুলে যায় সে এক অবলা নারী, হয়ে উঠে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। বজ্রমুষ্টিতে দা উঁচু করে বের হয়ে দেখে কোরবানের আবছা চেহারা। নবিতুনের এই তেজস্বী চেহারা দেখে ভয় পেয়ে কোরবান পালিয়ে যায়। এভাবে নিজেকে রক্ষা করে চলা নবিতুনের জন্য দিন দিন কঠিন হয়ে পরছে। সহ্যের বাঁধ তার ভেঙ্গে গেছে। তার মনে একটাই প্রশ্ন বারবার জেগে ওঠে— সারেং কি আর আসবে না? চিন্তায় তার মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। লেখক–সমালোচকের মতে, "'সারেং বৌ' একটি আঞ্চলিক জীবন চিত্র। এই জীবন-স্বভাবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ। কিছুটা অনবধানতা এবং কিছুটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে এতদিন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলের এই 'সারেং' জীবনের বিচিত্র কাহিনিকে আমাদের শিল্পীরা রূপ দিতে পারেন নি। তাই জীবনের এক বিচিত্র রূপ আমাদের শিল্পকর্মে অনুপস্থিত ছিল। এই দিক থেকে শহীদুল্লা কায়সারের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রসংসনীয়।"[২১] শহীদুল্লা কায়সার যেমন 'সারেং বৌ' উপন্যাসে আঞ্চলিক জীবনচিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজের বিচিত্র জীবন-প্রবাহ তুলে ধরেছেন, আবদুল্লাহ আল-মামুনও তাঁর চলচ্চিত্রে একটি অঞ্চলের প্রেক্ষাপট চিত্রায়ণের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজের অন্তঃরূপকে চিত্রিত করেছেন।

বিদেশের জেলে কদম স্বপ্ন দেখে নবিতুন বলে চিৎকার দিয়ে ওঠে। বাইরে কর্তব্যরত সেপাইদের বুটের খট খট শব্দের মতো তার বুকের ভিতরটাও খট খট করে। পোটলা থেকে নবিতুনের পাঠানো ভাঁজকরা জীর্ণপ্রায় একটি চিঠি খুলে পড়তে থাকে। এই একটি চিঠি সে অসংখ্যবার পড়েছে। তিন বছর একটি জেলেই সে কাটিয়ে দিয়েছে, মুক্তির দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু একটি চিঠি ছাড়া নবিতুনের আর কোন সংবাদ পায়নি। তবুও সে নবিতুনকে ভুলতে পারে না। কদম সারেং এর মতো সৎ নাবিকের জেল খাটার কথা নয়। জাহাজ থেকে নামার সময় মস্ত সারেং কৌশলে

Dhaka University Institutional Repository

কদমের কোটের পকেটে অবৈধ জিনিসের প্যাকেট ঢুকিয়ে দেয়। মূল উপন্যাসে র‍্যাভেনপোর্ট জাহাজের সারেং জব্বরের সঙ্গে কদম ঐ জাহাজে কাজ পাওয়ার আশায় দেখা করতে যায়। আসার পথে একটা চামড়ার প্যাকেট কদমকে রাখতে দেয় জব্বর সারেং। 'কদমের পরিচিত জাহাজ। বার দুই এই জাহাজেই দুনিয়াটা চক্কর দিয়ে এসেছে ও, এবারও এই জাহাজেই বহাল হবার ইচ্ছে ওর। ...স্থানীয় জাহাজের সুকানী হারেস এসে বলল, চল জব্বর ভাইকে দেখে আসি ...জব্বর র‍্যাভেনপোর্টের সারেং... পার থেকে ওরা নিয়ে গেছিল খিলি পান, জর্দা কিমাম। সে পান ছুড়ে দিল জাহাজে। জাহাজ থেকে জব্বর সারেং উপুড় হয়ে ছোট্ট একটা চামড়ার প্যাকেট তুলে দিল কদমের হাতে। বলল– রেখে দাও, পড়ে নিয়ে নেব।'[২২] চলচ্চিত্র ও উপন্যাস উভয় কাহিনিতেই শুল্ক কর্মকর্তার আরদালি দূর থেকে তা দেখতে পায়। নামার সঙ্গে সঙ্গে সে উৎকোচ হিসেবে কদমের কাছে হংকং থেকে আনা ঘড়িটি দাবি করে। কিন্তু সৎভাবে, বৈধ উপায়ে কষ্টার্জিত টাকায় কেনা ঘড়িটি দিতে কদম অস্বীকৃতি জানায়। চলচ্চিত্র অনুযায়ী কদম বুঝতে পারেনি মন্ত সারেং গোপনে তার পকেটে অবৈধ মাল ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই নীতিবান কদম আরদালির অনৈতিক আবদারে রাগে ফুসতে থাকে। ধাক্কা দিয়ে সে আরদালিকে ফেলে দেয়। আরদালি পকেট থেকে ছোরা বের করলে দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এক পর্যায়ে কদমের কোটের পকেট থেকে অবৈধ প্যাকেটটি পড়ে যায়। আরদালির চিৎকারে কাস্টমস পুলিশ এসে অবৈধ প্যাকেটটি দেখতে পায় এবং কদমকে গ্রেফতার করে জেলে দেয়। কলেবর কমানোর জন্য এখানে জব্বর সারেংয়ের চরিত্রটি বাদ দেয়া হয়েছে। যেহেতু জব্বর সারেং ও মন্ত সারেং উভয়েই অবৈধ মাল পাচারে জড়িত এবং উভয়ের কাজও একই তাই পরিচালক একটি চরিত্র দিয়েই চালিয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন। তবে চলচ্চিত্র দেখে দর্শকদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—যে মন্ত সারেংয়ের কারনে তাকে তিনবছর জেল খাটতে হয়েছে, কোন প্রতিবাদ ছাড়াই খুশিমনে পরবর্তী সমুদ্রযাত্রাও একই জাহাজে একই সাথে হল কিভাবে?

উপন্যাসটি অনেক চরিত্রবহুল। শরবতির দাদা কামিজ বুড়ো, কোরবানের বৌ এরকম চরিত্রগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে কোরবান চরিত্রটিকে চলচ্চিত্রকার নিজের মতো করে ভেঙ্গে গড়েছেন। উপন্যাসে কোরবান জাহাজ ফেরত সারেং। গৃহস্থালি করে বউ সন্তান নিয়ে বাড়িতেই দিন যাপন করছে। চরিত্রটি এখানে প্রায় গুরুত্বহীন। কিন্তু চলচ্চিত্রে তাকে বেশ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমনটি দেওয়া হয়েছে লুন্দর শেখকে। দুঃচরিত্র, অর্থলোভী ও ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ হিসেবে কোরবান চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন চলচ্চিত্রকার। লুন্দর শেখ চরিত্রটিকে প্রাধান্য দিতে গিয়েই তার সহযোগী হিসেবে এই চরিত্রটি গড়া হয়েছে।

সারেং বাড়ির বৌ বলে নবিতুন অন্যের বাড়িতে কাজ করতে চায়নি। রোজগারের পথগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে সে চৌধুরীদের বাড়িতে বান্দীর কাজ নিতে বাধ্য হয়েছে। সেখানে প্রতিনিয়ত চৌধুরীদের বড় বৌয়ের মুখ ঝামটা নিরবে সহ্য করে কাজ করতে হয়। ছোট চৌধুরী খোঁচা দিতে তচ্ছিল্যের সুরে কদমের খোঁজ জিজ্ঞেস করে। লুন্দর শেখের মতো ছোট চৌধুরীরও কুদৃষ্টি পড়ে নবিতুনের উপর। ছোট বৌ বুঝতে পারে তার স্বামী নবিতুনের ছেড়া কাপড়ের ফাঁক দিয়ে লুলুপ দৃষ্টি দেয়। তাই লুকিয়ে সে নবিতুনকে পরার জন্য কাপড় দেয়। শরবতির পর সে-ই একমাত্র নারী যে নবিতুনের দুঃখ বুঝে, পাশে দাঁড়াতে চায়। বড় বৌ শহরে অসুস্থ স্বামীর কাছে চলে গেলে বাড়িতে একা পেয়ে ছোট চৌধুরী নবিতুনকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে বলে, 'দুইটা বৌ থাকলে

Dhaka University Institutional Repository

আমারও ইজ্জত বাড়ব, তরও একটা গতি হইব।' এতে বোঝা যায় সমাজে তখন বহু বিবাহ পুরুষের জন্য ছিল গৌরবের বিষয়। রাজি না হওয়ায় নবিতুনের হাত ধরে জোরাজোরি করতে থাকে ছোট চৌধুরী। আওয়াজ পেয়ে ছোট বৌ অসুস্থ শরীর নিয়ে বাইরে এসে নবিতুনকে রক্ষা করে। চৌধুরি বাড়ির ছোট বৌ ধনী ঘরের হলেও সে নিজেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নির্যাতিত, নিরুপায়। তাই নবিতুনের নিরাপত্তার কথা ভেবে ছোট বৌকেও অসহায়ের মত বলতে হয়, 'তর সারেং বাইচ্চা থাকলে এতদিন চলে আসত। দেখেশুনে একটা বিয়া কর। স্বামী ছাড়া মাইয়া মাইনসের কোন ভরসা নাই (সা. বৌ. চ.)।' মূল কাহিনি বিবর্জিত এই অংশটির অবতারনা করে চলচ্চিত্রকার সমাজে নারীদের প্রতি পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

গুজাবুড়ি নবিতুনকে বাগে আনতে ব্যর্থ হওয়ায় লুন্দর শেখ নিজেই মাঠে নেমে পড়ে। বড় হিস্যার দাওয়ায় এসে বসে সে। শরবতির বাপকে বলে, 'বান্দির কাম করব সারেং বাড়ির বৌ, কেন তোমরা মইরা গেছ না আমরা বাইচ্চা নাই (সা. বৌ. চ.)।' ক্ষুধার জ্বালায় আক্কি আর নবিতুন যখন ছটফট করে তখন শরবতি ছাড়া কেউ এক মুঠো চাল নিয়ে এগিয়ে আসেনি। আর আজ অন্যের বাড়িতে কাজ করে বলে লুন্দর শেখের মান–ইজ্জত চলে যায়। শরবতির বাপকে সে উস্কে দেয়। আসলে এর পিছনে লুকিয়ে আছে লুন্দর শেখের কাম-বাসনা। নবিতুনের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে লুন্দর শেখ চায় নবিতুন তার কাছে ধর্না দেক, তার লালসার শিকার হোক। নবিতুন যখন বড় হিস্যার উপর দিয়ে বাড়িতে ঢুকে—লুন্দর শেখ নবিতুনকে লালসার চোখ দিয়ে এমনভাবে দেখে যেন চোখ দিয়েই তার সমস্ত কামনা মিটিয়ে ফেলবে। এসব পুরুষের কাছে নারী কখনও মানুষ নয়, শুধু লালসা মেটাবার একটা উপকরণ মাত্র। কদম দূর সম্পর্কের ভাগিনা দাবি করে লুন্দর শেখ কর্তৃত্ব ফলাতে চায় নবিতুনের উপর। আসলে সে নবিতুনকে লালসার গুটি বানাতে চায়। নবিতুন লুন্দর শেখের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে তার সামনে যেতে চায় না। কিন্তু আক্কির হাতে লুন্দর শেখের দেওয়া টাকা দেখে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে টাকা ফেরত নিয়ে আসে। টাকায় থু দিয়ে লুন্দর শেখের মুখের সামনে ছুরে মারে। অবলা নবিতুনের এই সাহসী প্রতিবাদে প্রথমে লুন্দর শেখ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। সহচর কালুর কথায় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে শরবতির বাপকে নবিতুনের দুঃসাহসী কাণ্ডের স্বাক্ষী বানায়—কদম আসলে যেন তাকে এ ঘটনার কথা বলে। লুন্দর শেখ টাকা কুড়াতে কুড়াতে নবিতুনের উপর বদনাম রটায়। ছোট চৌধুরীর সঙ্গে ফস্টিনস্টির ইঙ্গিত দেয়। রাগে গজরাতে গজরাতে যাবার সময় নবিতুনকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়। নবিতুনের এই প্রতিবাদ পুরুষ শাসিত সমাজের প্রতি প্রতিবাদ। শরবতি খুশি হয়, নবিতুনের পা ছুঁয়ে সালাম করে। খুশিতে মাটিতে গড়াগড়ি খায়। তারপর হঠাৎ তেজোদীপ্ত হয়ে নবিতুনের হাত ধরে বলে, 'পারবি বুয়া, পারবি এইরহম কইরা সগ্গলরে ঠেকাইতে, পারবি? (সা. বৌ. চ.)।' নবিতুনের চোখেও প্রতিবাদের আগুন দেখতে পাওয়া যায়। সেও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে বলে, 'আমাকে পারতেই হইব বইন, আমাকে পারতেই হইব' (সা. বৌ. চ.)। উপন্যাসের নবিতুনের চেয়ে আরও বেশি প্রতিবাদী, আরও বেশি আত্মমর্যাদাশীল ও সর্বংসহা নারীরূপে দেখতে পাওয়া যায় সিনেমার নবিতুনকে।

পরিচালক এই সিনেমায় একদিকে মস্ত সারেং চরিত্রটি খাটো করে ফেলেছেন, অপরদিকে লুন্দর শেখ ও ছোট চৌধুরী চরিত্রদুটিকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এতে শটের যেমন অপচয় হয়েছে, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় বাদ পড়ে গেছে। নবিতুনের প্রতি মনোযোগ

Dhaka University Institutional Repository

আরও কেন্দ্রীভূত করতে পারলে চরিত্রটি আরও সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠার অবকাশ পেত। উপন্যাসে বাড়াবান্দা, বান্দিগিরি করার পাশাপাশি নবিতুন সময় বের করে বাঁশ–বেত দিয়ে চাটাই, কোরা, ডুলা বানায়, জাল বুনে। হাঁস-মুরগি পালে। এইদিকগুলো চিত্রিত করতে পারলে তাঁর সংগ্রামী দিকগুলো বিশদভাবে ফুটে উঠত। উপন্যাসে নবিতুনকে কাজের সন্ধানে গ্রাম ছাড়িয়ে গঞ্জে যেতেও দেখা গেছে। 'বছরখানিক হল হাটের পাশে জেলে বসতিকে ঘিরে রীতিমত গঞ্জ গড়ে উঠেছে একটা। ...দিন দিন ফেঁপে উঠেছে ফড়ে ব্যাপারীর কারবার। নবিতুন শুনেছে এখানে মেয়েরাও আজকাল কাজ করছে। কাজের সন্ধানেই এসেছে ও।'[২৩] অন্নসংস্থান করা ছাড়াও মেয়ের প্রতি তাঁর কর্তব্য, দায়িত্ববোধের বিষয়গুলোও ফুটে ওঠেনি সিনেমায়। উপন্যাসে দেখা যায়, মায়ের ছেঁড়া শাড়ি পড়ে আক্‌কি। মেয়েকে নতুন শাড়ি কিনে দেওয়ার বাসনা জাগে নবিতুনের মনে। টাকার জন্য সে বাসনা পূর্ণ হয় না। তার একটি জাল বোনা শেষ। আরেকটি শেষের পথে। প্রতি জালের মজুরি দুই টাকা। 'এই জালখানি শেষ হলেই নগদ চারটি টাকা জমবে নবিতুনের হাতে। সেই টাকা দিয়ে আক্‌কিকে নতুন একটা শাড়ি কিনে দেবে ও। যুগিদের বাড়িতে গিয়ে একটি রংদার শাড়ির নমুনাও দেখে এসেছে নবিতুন।'[২৪] এই যে দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে মেয়েকে নতুন শাড়ি কিনে দেওয়ার দীর্ঘদিনের সুপ্ত বাসনা, টাকা যোগাড় করার আগেই শাড়ির নমুনা দেখে আসা, কিনে না দিতে পারার কারনে দীর্ঘদিনের চাপাপড়া কষ্ট—সিনেমায় এগুলো ফুটে ওঠেনি। মেয়ের বিয়ের চিন্তা আগাম মাথায় আসা তার কর্তব্যপরায়নতার ঈঙ্গিত দেয়। সিনেমায় নবিতুন যতটা প্রতিবাদী, সংযমী, ততটা সংগ্রামী নয়—অনেক ক্ষেত্রে অসহায়। চলচ্চিত্রে দেখা যায়, একদিন নবিতুন ঘরে ঢুকে দেখে চৌধুরী বাড়ি থেকে ছোট বৌয়ের দেওয়া পুরাতন শাড়ি পড়ার চেষ্টা করছে আক্‌কি। মাকে দেখে তা পড়িয়ে দেওয়ার বায়না করে আক্‌কি। নবিতুন সেই শাড়ি পড়িয়ে দিতে দিতে অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। আক্‌কিকে বুকে টেনে নিয়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে, 'কদম সারেং এর মাইয়া আজ পরথম শাড়ি পড়ল, ভিক্ষার শাড়ি (সা. বৌ. চ.)।' –এই সংলাপটি চলচ্চিত্রে নবিতুনের অসহায়ত্বের দিকটি প্রকাশ করে।

বহুদিন পর পোস্টঅফিসে কদমের একখানি চিঠি আসে, সেইসঙ্গে পাঁচশ টাকা। পোস্টমাস্টার তা দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে মানিঅর্ডারটি পাঞ্জাবির পকেটে পুরে নেয়। পোস্টঅফিসের জানালার শিক ধরে দাড়িয়ে থাকা লোকগুলো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে প্রিয়জনের চিঠি–টাকার আশায়। উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখার চেষ্টা করে তাদের আপনজনের কোন সংবাদ এল কিনা। পোস্টমাস্টারও ধমকের সুরে তাদেরকে উঁকি দেওয়া থেকে নিবৃত করার চেষ্টা করে। এ যেন পাড়া-গাঁয়ের এক চিরচেনা দৃশ্য। পরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুন এখানে আরেকটি বিষয় ফুটিয়ে তুলেছেন, গ্রামে হিন্দু-মুসলিমের সহবস্থান—পোস্টমাস্টারের রহিমউদ্দিন, গেন্দু মিয়া, নিতাই সেন এদের মধ্যে চিঠি বিলি করার মাধ্যমে। পরিচালক এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চিরবিচ্ছিন্ন গ্রামীন সমাজে বাইরের জগতের খবর পাওয়ার আকাংক্ষাও যে কারো কারো মধ্যে ছিল তা দেখা যায় জনৈক ব্যাক্তির পোস্টঅফিসে এসে খবরের কাগজ আসার খোঁজ করার মাধ্যমে। উপন্যাসে বর্ণিত উপকূলীয় সমাজের জীবন-যাপনের বাইরে গিয়ে চলচ্চিত্রকার সার্বজনীন গ্রাম-বাংলার অন্দরকে চিত্রিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন এই সিনেমায়। পোস্টমাস্টার মোড়লের কথামতো আগের সব চিঠি ও টাকা মেরে দিলেও দীর্ঘদিন নিখোঁজ থাকার পর হঠাৎ টাকা ও চিঠি আসাতে ঘাবড়ে যায়। যথারীতি মোড়লের কথামতো টিপসই দিয়ে এবারও টাকা-চিঠি গায়েব করে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

হঠাৎ চারদিকে বান ডেকে আসে। সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। উপকূলীয় মানুষ প্রাণভয়ে ছুটতে থাকে। এ যেন প্রকৃতির সঙ্গে উপকূলবাসীর নিরন্তর সংগ্রামের দৃশ্য। দূরে বিপদসংকেত বাজতে থাকে। দুর্যোগে সবাই আতংকিত হয়ে পরে। সৃষ্টিকর্তার কাছে সাহায্য চাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকেনা তাদের। বিপদে গ্রামের এই মানুষগুলো শুধু নিজেদের নিরাপত্তাই দেখেনা। অন্যের খোঁজও নেওয়ার চেষ্টা করে। এই বানের মধ্যেও শরবতির বাপ নবিতুনদের কথা ভুলেনা। এক সময় বান কেটে যায়। পুরো ঘটনাটি দৃশ্যায়নে সমুদ্রের গর্জন, ফিল্টার ব্যবহার করে আলো আধারি পরিবেশ সৃষ্টি করলেও একটি বড় ধরনের ত্রুটি রয়ে যায়। এতো বড় ঝড়ের দৃশ্যায়নে প্রবল বাতাসের শব্দ ব্যবহার করলেও গাছের পাতাগুলো ছিল স্থির। পরের শটে সমুদ্রের শান্তরূপ দেখানোর মাধ্যমে ঝড় থেমে যাওয়ার ইঙ্গিত করা হয়েছে। গ্রামের ইমামকে বান সম্বন্ধে বলতে শোনা যায়, 'গুনায় দুনিয়া ছাইড়ে আহে বান, বান আহে গুনায় দুনিয়া ছাইড়ে, একবার আইছিল নূহনবীর কালে, আর আইছিল বার বছর আগে। মিয়ারা আল্লা রসুলের নাম লও (সা. বৌ. চ.)।' এই ডায়ালগটি উপকূলীয় মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে একেরারেই বেমানান। সেখানে ঝড়-ঝঞ্ঝা তাদের নিত্য সঙ্গী। জন্মের পর থেকেই তারা এসবের সঙ্গে অভ্যস্ত। এগুলো বড় ধরনের নির্মাণ ত্রুটি। তাছাড়া এই দৃশ্যগুলোরই কোন প্রয়োজন ছিল না। এটি শুধুই কালক্ষেপণ মাত্র।

ঝড় শেষে আবার নতুন দিন আসে। সানকিতে মা-মেয়ে পান্তাভাত লবন-পানি দিয়ে খেয়ে তাড়াহুড়ো করে নবিতুন কাজের উদ্দেশ্যে চলে যায়। পাটক্ষেতের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়। যাওয়ার সময় কিসের যেন শব্দ শুনতে পায়। খানিক থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু আজ এমনিতেই তার কাজে যেতে দেরি হয়ে গেছে। সাতপাঁচ ভাবার সময় নেই। পাটক্ষেতের ভিতর দিয়ে দ্রুত পা চালায় সে। দেরি করে কাজে গেলে বড় বৌয়ের ঝামটা খেতে হবে আজও। বড় বৌ ছোট চৌধুরীর অভিসন্ধি বুঝতে পেরে নবিতুনকে দিয়ে ছোট বৌয়ের আপত্তি সত্বেও দেবরের ঘরে নাস্তা দিয়ে পাঠায়। আবহমান গ্রাম-বাংলায় সারাজীবন পোড় খাওয়া নারীরা শক্তিমান পুরুষের সঙ্গে পেরে ওঠতে না পেরে তার চেয়ে আপেক্ষাকৃত দুর্বল নারীদের ওপর তার কর্তৃত্ব ফলাতে চায়। এর ফলে নারীই হয়ে ওঠে নারীর প্রধান শত্রু। পুরুষের দোসর হয়ে ওইসব নারীরা হিংস্র হয়ে ওঠে অন্যসব নারীদের ওপর। তেমনি দেবরকে খুশি রাখতে বড় বৌ অন্য নারীর সর্বনাশ করতেও দ্বিধাবোধ করেনা। নিজে নারী হয়ে সে অন্য নারীকে পুরুষের লালসার শিকার বানাতে চায়। কিন্তু নবিতুন সহজে শিকার হওয়ার পাত্রী নয়।

সিনেমায় বাড়ি ফেরার পথে পাটক্ষেতের কাছে এসে তার মনটা ধক্ করে ওঠে। বড় ভয়-ভয় লাগে নবিতুনের এই জায়গাটাতে এসে। দুরু-দুরু বুকে সামনে আগায়, আবার থমকে দাঁড়ায়। কিসের যেন নড়াচড়া দেখতে পায়। ততক্ষণে একেবারে সামনে এসে পড়ে মোড়ল। পাটক্ষেতের নির্জনে জোর করে ইজ্জত লুটার চেষ্টা করে নবিতুনের। কোনভাবেই সে মোড়লের সঙ্গে পেরে ওঠেনা। উপায়ান্ত না দেখে জোড়ে কামড় বসিয়ে দেয় মোড়লের কাঁধে। কোনরকমে রক্ষা পায় সে। দৃশ্যটিতে খুব বেশি নাটকীয়তা নেই, গদবাঁধা। অথচ উপন্যাসের বর্ণনায় চমৎকার নাটকীয়তা ছিল। 'ভয় পেল নবিতুন। ভয়ে যেন স্তব্ধ হল, কাঠ হল। আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে হাত দুটো হয়তো উঠে আসতে চাইল উপরের দিক। গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল একটা চিৎকার। কিন্তু আচানক ভয়টা বুঝি একেবারেই কাবু করে ফেলেছে ওকে। ...এতটুকু প্রতিরোধ এল না নবিতুনের কাছ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

(সা. ব. উ./ পৃ. ৬৯)।' এই যে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া এটাও প্রতিপক্ষের জন্য ভয়ের কারণ। লুন্দর শেখও ভয় পেয়ে যায় এতে, '...সেই মানুষ অথবা জানোয়ারটা, এতক্ষণে সেও যেন ভয় পেল। কোন কারণ নেই তবু যেন ভয় পেয়েছে। ...ধস্তাধস্তি পাছড়াপাছড়ি কিছুই হল না। তবু সে যেন একটু ক্লান্ত। তাই হাতের বেষ্টনী শিথিল করে সে যেন হাঁপিয়ে নিল কয়েক সেকেন্ড (সা. ব. উ./ পৃ. ৬৯)।' নবিতুনের এই নিঃস্পৃহতা কিন্তু শিকারীর কাছে অসহায় সমর্পণ নয়। বরং এক ধরনের বোবা প্রতিবাদ। এই অব্যক্ত প্রতিবাদ লুন্দর শেখকে তাড়িত করে—ভয়ে ক্লান্ত হয়ে যায়। এই নির্জনে নবিতুনের আত্মসমর্পণহীন নিঃস্পৃহতা, উল্টো ভয়ে লুন্দর শেখের ক্লান্ত হয়ে যাওয়া পাঠকের মনে দারুণ নাটকীয়তার জন্ম দেয়। পরের লাইনগুলো পরার আগে পাঠক দ্বিধান্বিত হয়ে যায় কি হতে যাচ্ছে, কি হতে যাচ্ছে! —এই ভেবে। শক্তি সঞ্চয় করে লুন্দর শেখ যখন নবিতুনকে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে পাটক্ষেতের জঙ্গলে নিয়ে প্রতিরোধহীন শায়িত দেহের উপর চেপে বসল, পাঠকের মনে নবিতুনের সর্বনাশের শঙ্কায় নাটকীয়তা চরমে উঠল। হঠাৎ ভয় পেয়ে যেমন নবিতুন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, তেমনি হঠাৎ হুঁশ ফিরে পেয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি ফিরে পেল। 'আচানক ভয় পেয়েছিল নবিতুন। ভয়ে স্তব্ধ হয়ে ছিল, কাঠ হয়ে ছিল। তেমনি আচানক হুঁশটাও পেয়ে গেল নবিতুন। হুঁশ পেয়ে শরীরের শক্তিটাকেও যেন ফিরে পেল নবিতুন। ...নবিতুনের ডান হাতখানি কেমন করে যেন আলগা হয়ে গেল। খাপ থেকে যেমন বেরিয়ে আসে তলোয়ার তেমনি সরাক করে মাটি থেকে উঠে লক্ষ্যের দিকে ছুটে গেল নবিতুনের হাতখানি। সে হাত ধরে ফেলল জানোয়ারটার অণ্ডকোষ। প্রাণপণে দাঁতে দাঁত ঘষে শক্তি টানল নবিতুন। ...শক্ত করে, আরও শক্ত। আরো জোরে। প্রাণপণে' (সা. ব. উ./ পৃ. ৬৯, ৭০)।' যেন সে সমূলে উৎপাটন করতে চাইছে কামাতুর মানুষের পশুত্বকে। নবিতুনের এই প্রতিরোধীরূপে ফিরে আসায় ঘটনাটি নাটকীয়তার চূড়ান্ত রূপ পায় উপন্যাসে। এখানেও এতো সুন্দর একটি সিনেমাটিক উপাদানকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন পরিচালক—যেন নবিতুন চরিত্রটিকে ভিতর থেকে নিষ্প্রভ করে রাখা হয়েছে। 'একটি চরিত্রের পক্ষে যেমনটি প্রয়োজন, ঠিক তেমনি করে যদি না কথা বলতে, হাঁটতে বা নড়াচড়া করতে পারা যায় তাহলে তো সে চরিত্রের অন্তর্নিহিত সজীব আত্মাটিকে ঠিক প্রতিফলিত করতে পারা যায় না।'[২৫]

নবিতুনের তীব্র প্রতিরোধে জানোয়ারটা চিৎকার করতে করতে পালায়। একটু আগে শরীর থেকে খুলে ফেলা শাড়িটা পড়ে আছে হাত দুই দূরে। বাঁ হাতে শাড়িটা তুলে নিয়ে পাটক্ষেত মাড়িয়ে ছুটে এল আলোর পথে। রাস্তা ছেড়ে ডাঙ্গায়। 'আঁধারে চেনা যায় না পথ। কাঁটা ফুটে পায়। রক্ত ঝরে। উঁচুনিচু মাটিতে ঠোক্কর খেয়ে বসে পড়ে নবিতুন। গাছের গুড়িতে বাড়ি খেয়ে ছিটকে পড়ে শরীরটা। ...এইটুকু তো পথ। তবু নবিতুনের মনে হয় সেই কখন থেকে ছুটছে ও। ছুটতে ছুটতে এক সময় ও পৌঁছে গেল বরই গাছের সীমানা দেয়া উঠোনে (সা. ব. উ./ পৃ. ৭১)।' নবিতুনের না ফুরানো পথচলা, ক্ষণে ক্ষণে মনে হওয়া—এখনো বুঝি তাকে জানোয়ারটা ধাওয়া করছে পিছন থেকে। চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে তার পা অসাড় হয়ে যাওয়া—এরকম একটি উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য উপন্যাস পাঠ পূর্বক সহজেই পাঠকের কল্পচিত্রে ভেসে ওঠে। উপন্যাসের এই বিষয়টিকেও পরিচালক ধরতে পারেননি ক্যামেরায়। অত্যন্ত সাদামাটাভাবে এটির দৃশ্যায়ন করা হয়েছে। শট বাঁচাতে এখানে খুবই তাড়াহুড়ো করা হয়েছে। কিন্তু এর পরপরই একটি অপ্রয়োজনীয় গানের দৃশ্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এটি কালক্ষেপণেরই নামান্তর। সেইসঙ্গে শটের অপচয়। এখানে আরেকটি অসঙ্গতি দেখা যায়। উপন্যাসে বর্ণিত সময়টা ছিল পাখিদের নীড়ে ফেরার সময়। অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলা। সিনেমায় দৃশ্যটি প্রথমে দেখানো

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে, চৌধুরী বাড়ি থেকে কাজ শেষে প্রায় সন্ধ্যায় নবিতুন বাড়ির পথে রওনা দিয়েছে। কিন্তু পাটক্ষেতের দৃশ্যধারণের সময় ছিল ভর দুপুর। নবিতুন পাটক্ষেতে প্রবেশের আগে দেখা যায় তার শরীরের ছায়া পড়েছে ঠিক পায়ের নিচে। আবার পাটক্ষেত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও দেখা যায় পাটগাছের ছায়া পরছে প্রায় লম্বভাবে, অর্থাৎ সময় ঠিক দুপুর। যদিও ক্যামেরায় ফিল্টার ব্যবহার করে আলোর তীব্রতা কমানো হয়েছে। তারপরও সচেতনতার অভাবে এই ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারেননি চলচ্চিত্রকার। এখানে সবচেয়ে বড় অসঙ্গতি হচ্ছে—নবিতুন পাটক্ষেত থেকে বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে দিন থেকে একেবারে রাত হয়ে গেছে। যদিও কাহিনিতে স্পষ্ট বলা আছে পাটক্ষেত থেকে বাড়ির দূরত্ব একেবারে অল্প। পরিচালক হয়ত দৃশ্যবিভাজন করে শুট করতে গিয়ে সময়জ্ঞানকে গুলিয়ে ফেলেছেন। নয়ত আর্থিক সংকটহেতু দ্রুত শুটিং শেষ করার তাড়া থেকে বিষয়গুলোকে এড়িয়ে গেছেন। সিনেমার বহুমুখী সংকটের মধ্যে আর্থিক সংকট অলঙ্ঘনীয়। কেননা 'সিনেমায় এককালে অনেক টাকা লগ্নী করা হয়। অন্য যে কোনো শিল্পের চাইতে সিনেমায় বেশী টাকা প্রয়োগ করতে হয় এবং সেই কারণে লগ্নীকারকের চাহিদাও বেশী। সেই কারণে, এবং বিশেষ করে এই চাহিদা যখন মেটে না তখন, এই সংকট দেখা দেয়। এবং এই চাহিদা শুধু যে লগ্নীকারকের একারই তা নয়। চাহিদা নানান জায়গায় থাকে। চাহিদা দর্শকের থাকে, চাহিদা প্রদর্শকের থাকে। চাহিদা প্রদর্শকের, পরিবেশকের, তারপর প্রযোজকের। এবং যখন এই চাহিদার ভেতরে কোনো দ্বন্দ্ব ঘটে, যখন কোনো ঘাত-প্রতিঘাত ঘটে তখনই সংকট দেখা দেয়।'[২৬] তবে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি যে দিক থেকেই হোক না কেন এর দায় প্রধানত পরিচালককেই নিতে হয়।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কদম আবার সারেং এর কাজ শুরু করে রুতুন্দা জাহাজে। এখানে কত মানুষের চিঠি আসে। কিন্তু কদমের কোন চিঠি আসেনা। নবিতুনের মুখটা তার চোখে ভেসে ওঠে। জাহাজে আবারও অবৈধ মাল রাখার আনুরোধ করে মন্ত সারেং। কদম কিছুতেই রাজি হয়না। একবার না জেনে অবৈধ মালসহ ধরা খেয়ে তিনবছর জেল খেটেছে। এর মধ্যে স্ত্রী-সন্তানের কোন খবর পায়নি। জানেনা তারা কেমন আছে। নতুন করে আর কোন ঝামেলায় জড়াতে চায়না সে। জাহাজ বিদেশের বন্দরে ভিড়ে। নানাধরনের প্রলোভন হাতছানি দেয়। মদ, নারী কিছুই আকৃষ্ট করেনা তাকে। 'সারেং বৌ' উপন্যাসে শহীদুল্লা কায়সার বিশাল, বিচিত্র নিঃসর্গের সান্নিধ্যে উপনীত। বিশাল সমুদ্র আর তার মুগ্ধকর দৃশ্যাবলির বর্ণনাত্মক ও চিত্রাত্মক বিন্যাসে পাঠককে যুগপৎ মুগ্ধ ও বিস্মিত করে তোলে। সমুদ্রবাসী মানুষের মনের নানা রঙের বর্ণনাও অলংকৃত হয়ে এসেছে উপন্যাসে।'[২৭] এরই মধ্যে মন্ত সারেং কৌশলে আবারও কদমের পকেটে অবৈধ মাল ঢুকিয়ে দিয়ে পাচার করে। তবুও তাকে কিছু বলতে পারেনা কদম। মন্ত সারেং কদমের সারেং জীবনে অনেক প্রভাব ফেলেছে। সে তার শিক্ষাগুরু। সাগরের অলিগলি তার চেনা। জাহাজের সব কলকব্জা তার নখদর্পে। কদমের কাছে মন্ত সারেং এক বিস্ময়। তাকে অমান্য করা কদমের দুঃসাধ্য। তারপরও নৈতিকতার স্বার্থে অবৈধ কাজের প্রস্তাবকে সে না করে দেয়ার স্পর্ধা দেখিয়েছে সিনেমায়। কদম জানে এর পরিনতি কি হবে। পরেরবার রুতুন্দা জাহাজে আর কাজ পাবে না। প্রাক্তন সহকর্মীর ছেলে ও অত্যন্ত বিশ্বস্ত বলেই কদমকে রুতুন্দায় স্থান দিয়েছে। মন্ত চাচার হাতেই দিন দিন কদম পাকা সারেং হওয়ার স্বপ্ন দেখে। জাহাজেও সে প্রভাবশালী, বন্দরে-বন্দরেও সে প্রভাবশালী। এমন একটি চরিত্রকে পরিচালক প্রথম থেকেই অবজ্ঞা করে এসেছেন। কদমের বিয়েতেও তাকে একজন সাধারণ অতিথি হিসেবে দেখানো হয়েছে। যদিও সমুদ্র যাত্রায় তার প্রভাব কিছুটা দেখা গেছে। কিন্তু তার পুরোটাই দেখানো

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে। অবৈধ মাল পাচার করা ছাড়া মন্ত সারেং একজন মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন মানুষ। অধঃস্তনদের মুখ দেখেই মনের কথা বুঝতে পারে। কদমের মন খারাপ থাকলেও সে বুঝে যায়। 'ভাইপোর যখন মন খারাপ, আজ তোমার ছুটি। যাও উপরে গিয়ে হাওয়া খাও। স্নেহ মেশানো নরম স্বর মন্ত সারেংয়ের। ...শুধু আজ নয় সব সময়ই মন্ত সারেংয়ের স্নেহে কেমন গলে যায় কদম। ...নিষিদ্ধ দ্রব্যের গোপন কেনাবেচার নীতিহীন বিবেক বর্জিত মন্ত সারেং। সেই গোপন হাটের প্রলোভনটা কদমের কানে এখনো ফিস ফিসিয়ে বলে মন্ত সারেং। ...তবু কোনদিন মন্ত সারেংয়ের মুখের উপর একটা কড়া জবাব দিতে পারল না কদম, কেননা মন্ত সারেংয়ের দিলে রয়েছে মহব্বত' (সা. ব. উ./ পৃ. ৮০, ৮১)।

চলচ্চিত্রে অনাহারে অর্ধাহারে বহু কষ্টে দিন কেটেছে নবিতুনের, কিন্তু কোন প্রলোভনে বিপথে পা বাড়ায়নি। অপরদিকে কদমও তার নাবিক জীবনে ঘাটে ঘাটে নারী ও অবৈধ অর্থের প্রলোভনের হাতছানি পেয়েছে। কিন্তু একটিবারের জন্যও পথভ্রষ্ট হয়নি। এর কারণ ছিল একে অপরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস। দুজনেই এটি ধারণ করেছে এবং কঠোরভাবে লালন করেছে। এখানে চলচ্চিত্রকার আমাদের যাপিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি আস্থাশীলতার দিকটি তুলে ধরেছেন। মূল গল্পে বিদেশের বন্দরের কাহিনিটি অনেক বিস্তৃত। বন্দরের জাদুতে কদম কিছু সময়ের জন্য অন্য কদম হয়ে ওঠে। অন্যদের মতো সেও রক্তমাংশের মানুষ। বন্দরের মাদক আর নারীদের রূপের জোয়ারে সবাই যখন ভেসে যাচ্ছে। কদমও কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে ভিনদেশি এক বন্দর মেয়ের মায়াজালে ক্ষণিকের জন্য আটকে পড়ে। অসচেতনভাবে জেগে ওঠে তার আদিম পিয়াস। '...পরিচয় ওদের যুগযুগান্তরের, অনন্তকালের, মজল সারেংয়ের ব্যাটা কদম সারেং আর ওই শুভ্র মেয়েটির। তাই তো কদম সারেংয়ের রক্তে আজ আদ্যিকালের সেই প্রথম নাবিকের জাগরণ। প্রথম নাবিকের পিপাসা। ...আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল মেয়েটি। কদমের গলায় পরিয়ে দিল ওর শঙ্খশুভ্র হাতের বলয়' (সা. ব. উ./ পৃ. ৫১)। এ যেন অন্য কদম। নিজের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। 'বন্দর মেয়েটির কাঁধে ঢলে পড়ে কদমের মুখখানি। কদমের মুখ কদমের ঠোঁট স্পর্শ পেল কী এক উষ্ণতার, তীব্রতার, উগ্রতার, যাদুকরী এক মাদকতার। বিশাল এক সমুদ্র বুঝি আর এক সমুদ্রের বুকে এসে আছড়ে পড়বে, দুই সমুদ্র লীন হবে অনন্ত বারির মহাকল্লোলে। ...আস্তে আস্তে পা ফেলল ওরা। পা ফেলল সেই আধো-আঁধারের নিভৃতির দিকে' (সা. ব. উ./ পৃ. ৫২)। কিন্তু কদম এরকম নয়। সে কসম খেয়েছে নবিতুনের কাছে। 'মুহূর্তে ছিটকে এল কদম। ছিটকে এসে বসে পড়ল চেয়ারে। বসে বসে হাঁপিয়ে চলল দৌড় প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়া প্রতিযোগীর মতো' (সা. ব. উ./ পৃ. ৫১)। এরকম অসাবধানী ক্ষণে চূড়ান্ত মুহূর্তে যে নিজেকে বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পারে, সে-ই চরিত্রবান, সে-ই প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী। বন্দর পাড়ের দৃশ্যায়নে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দেয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষার এরকম বর্ণনা উপন্যাসে থাকলেও পরিচালক সিনেমায় তা ব্যবহার করেননি। কদম সারেং চরিত্রে অভিনয়কারী নায়ক ফারুক এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'কদম সারেংয়ের প্রতি পরিচালক সুবিচার করেননি। এই চরিত্রটিকে তার প্রাপ্যতার চেয়ে গৌণ করে রাখা হয়েছে। এখানে একটি কারণ ছিল। পরিচালকের সঙ্গে প্রযোজকের কোন বিষয় নিয়ে ঝামেলা হয়। পরিকল্পনায় ছিল বন্দরের দৃশ্যায়ন হবে সিঙ্গাপুরের বন্দরে। বাস্তবানুগভাবেই ফুটিয়ে তোলা হবে দৃশ্যগুলো। দু'জনের মধ্যকার ঝামেলায় পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। পরে কক্সবাজারে সাগরপাড়ে কৃত্রিম সেট বানিয়ে এর দৃশ্যায়ন করা হয়। তাড়াহুড়ো করে

Dhaka University Institutional Repository

করতে গিয়ে অনেক দৃশ্য বাদ দিয়ে কোনরকমে সিনেমাটি শেষ করা হয়।'[২৮] এই তাড়াহুড়ো করা, কোনরকমে শেষ করা এ বিষয়গুলো সিনেমার বিভিন্ন যায়গায় পরিলক্ষিত হয়েছে।

বড় হিস্যার উঠোনে মোড়লের নেতৃত্বে নবিতুনকে না জানিয়েই তার বিয়ে নিয়ে মজলিশ বসে। মজলিশে সবাই সিদ্ধান্ত নেয় কোরবানের সঙ্গেই নবিতুনের বিয়ে হবে। কাজ শেষে বাড়ি ফিরে এসে নবিতুন দেখে তার বিয়ের সিদ্ধান্ত পাকা। সাধারণ্যে আমরা যাকে পুরুষ শাসিত সমাজ বলি—যার বদৌলতে নারীকে সবসময় দাবিয়ে রাখা হয়। প্রকৃতপক্ষে তা যতটা না পুরুষ শাসিত সমাজের প্রকরণ এবং বহিরাবরণে তা যতটা পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ ; অন্তঃকরণে তা দুর্বলের ওপর সবলের নিপীড়নেরই নামান্তর। হোক সে পুরুষ কিংবা নারী, দুর্বল মানেই শোষিত। ছবিতে লুন্দর শেখের মতো গাঁয়ের মোরল চরিত্রের মাধ্যমে সমাজে দুর্বলের ওপর সবলের লোভ ও নিষ্ঠুরতার বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন পরিচালক। মাঠে গরিব অনাহারী চাষারা ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য লুন্দর শেখের কাছে তিন মাস সময় চেয়ে আকুতি করলেও তার মন গলেনা। তিনমাসের পরিবর্তে তিনদিনের সময় দিয়ে তাদের হালের লাঙ্গল, গরু, জমি ছিনিয়ে নেয়ার ফন্দি আঁটে। ধুর-ধুর করে তাদের তাড়িয়ে দেয়। এখানে পুরুষ হয়েও চাষারা সমাজে দুর্বল হওয়ার কারণে সবল পুরুষের শোষনের শিকার। অন্যদিকে চৌধুরী বাড়ির বড় বৌয়ের কাছে ছোট বৌ মূল্যহীন। নবিতুনের ওপর কোরবানের মা-ও প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। এ সবই অপেক্ষাকৃত দুর্বলের ওপর সবলের প্রভাব বিস্তার করার সহজাত তাড়না। এটা অনেকটা শৃঙ্খলের মতো। সবাই তারচেয়ে সবলদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে, আবার নিজেরাই অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের শাসন করছে। তাই সমাজের সিদ্ধান্তকে নবিতুন চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। এতদিন ধরে নবিতুনকে সাহস জুগিয়ে যাওয়া শরবতিও সমাজের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বলে। যেন সমাজ চাইলেই যে কোন মানুষকে যে কিছু করতে পারে। হোক তা ন্যায় কিংবা অন্যায়। চলচ্চিত্রে যেমন প্রান্তিক জীবনাচার ও সমাজবাস্তবতা বিধৃত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায় তেমনি উপন্যাস হিসেবে "'সারেং বৌ' জীবন রহস্য উদঘাটনের প্রয়াস নয়, জীবন রূপ তুলে ধরার চেষ্টা।"[২৯]

সমাজ-সংসারের জটিলতা ও কর্তৃত্ববাদকে সিনেমায় গুরুত্ব দিতে গিয়ে উপন্যাসের খোল নলচে পাল্টে চলচ্চিত্রকার কদমের অনুপস্থিতিতে নবিতুনের বিয়ের আয়োজন করে। রীতি অনুযায়ী রাতে আক্কিকে নবিতুনের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়নি। রাতে নবিতুন স্বপ্ন দেখে তার কদম ফিরে এসেছে। কদমের ডাকে নবিতুনের ঘুম ভাঙ্গে। ঘুম থেকে ওঠে নবিতুন বুঝতে পারেনা এটা কি স্বপ্ন, না সত্যি! অবশেষে নবিতুনেরই জয় হয়। তার কদম সত্যিই ফিরে এসেছে। সমুদ্রের জোয়ারের মতো বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস দুজনের ভিতরে খেলা করে। চলচ্চিত্রকার এখানে চমৎকার একটি রূপক ব্যবহার করেছেন—'সাগরের ঢেউ প্রবল উচ্ছ্বাসে তীরে আছড়ে পড়ে মাটিতে মিশে যাচ্ছে'। দীর্ঘ বিরহের পর মিলনের যে আকাঙ্ক্ষা, একে অপরের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়ার কামনা, তা মাটির সঙ্গে সাগরের মিলনের একটি ক্ষুদ্র দৃশ্যের মাধ্যমে যথার্থভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন চলচ্চিত্রকার। কদমের আগমনকে চলচ্চিত্রে নাটকীয় রূপ দিতে ভোরে সবাই ঘুম থেকে ওঠে বিয়ে বাড়ির আমেজ নিয়ে। শরবতি যায় নবিতুনকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে। কিন্তু অনেক ডাকাডাকির পরও যখন ভিতর থেকে কোন সাড়া মেলেনা। সবাই এসে জড়ো হয় উঠানে। শরবতির বাপ ভয় পায় এই ভেবে যে বিয়ের চাপে নবিতুন গলায় দড়ি দিয়েছে! নবিতুন যে ধীরচেতা, সমাজের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে না পেরে

Dhaka University Institutional Repository

এমনটা করা তার জন্য খুবই স্বাভাবিক। চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে কোরবান যখন দরজা ভাঙতে যায়, এমন সময় কদম দরজা খোলে। সবাই ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যেই এতোদিন ধরে চলে আসা দৃশ্যপট বদলে যায়—শুধুমাত্র একটি পুরুষ লোকের আগমনে। কোরবানের সঙ্গে নবিতুনের বিয়ে বিষয়ক ঘটনা অবতারণা করার পিছনে মোড়ল চরিত্রটিকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টিও গুরুত্ব বহন করে। লুন্দর শেখের লালসাকে চরিতার্থ করার পথ সুগম করার ঘটনা চিত্রণে চিত্রনাট্যকারের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। চিত্রনাট্যকারের নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত এই ঘটনাটি সিনেমাতে একদিকে যেমন নাটকীয়তা এনে দিয়েছে, অপরদিকে পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান-ধারনার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

কদমের হঠাৎ আগমনে সবাই ইতস্তত হয়ে পড়লেও নবিতুনের আজ বড় সুখের দিন। কদম আর আক্কির স্নেহ-ভালবাসার আলিঙ্গনে আবেগঘন মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হলেও মলিন মুখে ঘটনাস্থল থেকে কোরবান পালিয়ে যেতে চায়। কোরবানকে থামিয়ে কদম কৈফিয়ত চাইলে নবিতুনের সুপ্ত হাসি থামেনা। এ হাসি তার বিজয়ের হাসি। সবাই চলে গেলে নবিতুন লাগেজ খুলে শাড়ি, চুড়ি, পাউডার বের করে। জোরে জোরে অন্যদের শুনায়। এতদিন সে কথা বলছে চোরের মতন, আজকে তার গলা ফাটাইয়া, চিল্লাইয়া কথা বলার দিন। আজকে তার সারেং ঘরে। আজ তার পরাণ খুলে কথা বলার দিন। নবিতুনের দুঃখের রাত শেষ হয়ে নতুন প্রভাত আসে। দুই হাতে বাজার করে আনে কদম। 'তাদের জীবনধারা কৃষিভিত্তিক পূর্ব বাঙলার জীবন স্বভাবের মতো নয়। তাদের জীবনে দুঃসাহসিকতা আছে, রোমাঞ্চ আছে, বিলাসিতা আছে, দারিদ্র্য আছে, সংগ্রাম আছে আর আছে বহুদর্শিতা এবং জীবন সম্পর্কে একটি উদার মুক্ত ধারণা। তাদের পারিবারিক জীবনও বিচিত্র। যখন তারা বিদেশ থেকে আসে তখন ঐশ্বর্যে, প্রাচুর্যে ও বিলাসিতায় জীবনকে পূর্ণ করে রাখে।'[৩০] তাই নতুন শাড়ি পড়ে নবিতুন সাজগোজ করে। কিন্তু বাজার নিয়ে এসে এই সাজ দেখে যেখানে কদমের খুশিতে পুলকিত হওয়ার কথা সেখানে মুখ ভার করে থাকে কদম। বাজার নিয়ে নবিতুন একাই কতক্ষণ বকবক করলেও কদমের কোন সাড়া শব্দ নাই। বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে দোকানদার অছিমদ্দি তাকে এতদিন তার নিখোঁজ থাকার ফলে নবিতুনের দুঃখ কষ্টের কথা জানিয়েছে। পেটের দায়ে অন্যের বাড়িতে বান্দির কাজ করার কথাও জানিয়েছে। তাতেই কদম ভীষণ কষ্ট পেয়েছে। কারণ জেল থেকে বের হয়ে সে টাকা পাঠিয়েছে নবিতুনের নামে, তাতে ঘরে অভাব থাকার কথা নয়। কিন্তু টাকা তো নবিতুনের হাত পর্যন্ত পৌঁছায়নি। মাঝপথে মোড়ল আর পোস্টমাস্টার মিলে টাকা আত্মসাৎ করেছে। এ কথা না টের পেয়েছে নবিতুন, না জানে কদম। তাই অভিমানের সুরে কদম জিজ্ঞেস করে টাকার যদি এতই অভাব ছিল তবে সে চিঠি লিখে জানায়নি কেন? নবিতুন প্রসঙ্গ ফেরানোর চেষ্টা করলে কদম রেগে গিয়ে কৈফিয়ত চায়। এতে নবিতুনের ভিতরে এতোদিন ধরে জমে থাকা কষ্টটা দুমড়ে মোচড়ে ওঠে। কোন রকমে কষ্টটা চাপা দিয়ে আক্কিকে খোঁজার ভান করে কদমের কথাকে এড়িয়ে যায়। চাপাস্বভাবের নবিতুন খোলাসা করে কিছু বলে না। এতে করে কদমের সঙ্গে তার ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হয়।

টাকা ও চিঠির ব্যাপারে খোঁজ নিতে কদম পোস্টঅফিসে যায়। পোস্টমাস্টার উল্টো টাকা চিঠি গায়েব হওয়ার পিছনে নবিতুনকে ইঙ্গিত করে, কদমকে লুন্দর শেখের সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দেয়। শেখের সঙ্গে দেখা করলে সেও নবিতুনের উপর নজর রাখার পরামর্শ দেয়। কদমের মনেও

Dhaka University Institutional Repository

সন্দেহর বীজ দানা বাঁধতে শুরু করে। নবিতুনের সঙ্গে অকারণে তেজ দেখায়। তার হাসি সহ্য হয় না। এত টাকা পাঠানোর পরও ঘরের জীর্ণ দশার কারণ নবিতুনকে জিজ্ঞেস করে। এতে নবিতুনের ভিতরটা ফেটে যায়। এই টাকার অভাবে নবিতুন কি-না করেছে। দিনের পর দিন উপোস করেছে। খুদ, শাপলা খেয়ে থেকেছে। উপায়ান্তর না দেখে অন্যের বাড়িতে বান্দিগিরি খেটেছে। আজ তার স্বামী টাকার কৈফিয়ত চায়! —অভিমানী নবিতুন তারপরেও মুখ খুলেনা।

অনেক অপকর্মের দোসর গুজাবুড়িকে এখন আর লুন্দর শেখ চেনেনা। তাকে দিয়ে সব ধরনের কুকাজ করিয়ে নবিতুনকে বশে আনতে না পারায় এখন লাথি দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। তাইতো ছোট বৌয়ের কাছে দুঃখ করে গুজা বুড়িকে বলতে শোনা যায়—'আমি মুখ খুলিনা দেইখ্যা, আমি বেবাক জানি, আমি মুখ খুললে মজল সারেং এর ব্যাটা শেখেরপোর কইলজাডা ছিড়া লইব। দিমু আমিও একদিন হাটে হাড়ি ভাইঙ্গা দিমু... এত ট্যাহা, এত চিডি গেল কই' (সা. ব. চ.)। ছোট বৌ এই ফাঁকে গরম ভাতের সঙ্গে গোস্তের ছালুন দিয়ে খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে সব ঘটনা জেনে নেয়। কিন্তু কদম সন্দেহের আগুনে নিয়ত জ্বলতে থাকে। অছিমুদ্দিকে সে বলে 'কইলজাডা আমার খালি পাক খায়। পায়ের তলায় আগুনের মতো দ্বীপ বাইড়া বাইড়া খালি জ্বলে' (সা. ব. চ.)। কদম আর গ্রামে থাকতে চায় না। জাহাজে ফিরে যেতে চায়। অছিমুদ্দি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে। বর্গা নিয়ে ক্ষেতের কাজ করার পরামর্শ দেয়। অছিমুদ্দি চরিত্রটিও পরিচালকের সৃষ্টিজাত। উপন্যাসে এর কোন অস্তিত্ব নাই। এই চরিত্রটি দ্বারা কদমের পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল সমাজের একজন ভালো মানুষের ভূমিকা দেখানো হয়েছে।

নবিতুনের উপর কদমের ঘনীভূত সন্দেহের বহিঃপ্রকাশ চরমে উঠলে শরবতি নবিতুনকে সবকিছু খুলে বলতে বলে। কিন্তু অভিমানী নবিতুনের জবাব, 'আমি কমু কেন। হেয় বুঝেনা, হেয় জানেনা। আমার মুখ ফুইট্যা কইতে হইব কেন। কত কষ্ট কইরা বছরের পর বছর আধাপেট খাইয়া না খাইয়া সংসার চালাইছি, অই আক্‌কিডারে কতদিন শাপলা খাওয়াইয়া রাখছি। আইজ আমারে জিগায় জিনিস বিক্রি করছি কেন বান্দিগিরি করছি কেন? সে নিজে বুঝেনা (সা. ব. চ.)।' এই দৃশ্যে শরবতিও চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনা। নবিতুন হঠাৎ অসহায় ভঙ্গিতে শরবতিকে জিজ্ঞেস করে, 'সংসারডা এমন কেন্‌রে শরবতি? এক আসমানের তলে একই ঘরের মধ্যে দুইটা মানুষ বুকের লগে বুক মিলাইয়া থাকে। একজনের লাইগ্যা আরেকজনের কইলজা ফাইট্টা যায়। এরপরেও একজন আরেকজনের মন বুঝেনা। কেন বুঝেনা শরবতি? ...না আমি কিচ্ছু কমুনা (সা. ব. চ.)।' মানুষের বিচার না পেয়ে নবিতুন সৃষ্টিকর্তার কাছে বিচার দেয়। সে আশাবাদী এই বিচার সে পাবেই। 'সামাজিক পশুশক্তির বিরুদ্ধে তার বেঁচে থাকার সংগ্রাম এবং সম্মান রক্ষার জন্য আত্মপ্রচেষ্টা তাকে যেমন মহান করে তুলেছে, তেমনি স্বামী কদমের সন্দেহ এবং উপেক্ষার জবাবে তার নীরবতা এ চরিত্রকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক অসাধারণ নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।'[৩১]

কদমের কাছে লুন্দর শেখ নবিতুনের সম্পর্কে অপবাদ রটায়। চৌধুরী বাড়িতে রাত কাটানোর মতো জগন্য কথা বলতেও সে দ্বিধা করে না। একথা শুনে কদমের মাথা বিগরে যায়। লুন্দর শেখ নবিতুনের বয়সের প্রতি ইঙ্গিত করে বলে, 'রাইত কাটাইছে, বেশুমার কাটাইছে, তুমার বৌয়ের বয়সটাতো দেখবা ভাইগনা। বড়ই পিছলা বয়স। রাইত কি আর এমনে কাটায়? (সা. ব. চ.)।' এমনকি নবিতুনের পেটের বাচ্চাও ছোট চৌধুরীর বলে কদমকে বোঝায়। এতে কদম আর স্থির

Dhaka University Institutional Repository

থাকতে পারেনা। ক্রোধোন্মত্ত হয়ে বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে। পথে নবিতুনকে দেখতে পায় চৌধুরী বাড়ি থেকে ফেরত আসতে। তা দেখে নবিতুনকে টেনে হিঁছড়ে বাড়িতে নিয়ে চৌধুরির সঙ্গে অবৈধ সর্ম্পক ও পেটের বাচ্চাকে নিয়ে সন্দেহের কথা জানায়। এক পর্যায়ে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে পেটে লাথি দেয়। এ কারণে নবিতুন মরা বাচ্চা জন্ম দেয়। নবিতুনের চিৎকার যেন সাইক্লোন হয়ে ফিরে আসে। পুরুষ-শাসিত সমাজ নারীকে নিষ্পেশন করে বিভিন্ন কৌশলে। পেটের দায় থাকলেও তাকে উপার্জন করার ও চলাচলের স্বাধীনতা দেয় না, তাকে রাখতে চায় নিজের নিয়ন্ত্রণে। কেউ তাকে মানুষ হিসেবে ভাবে না। যখন পুরুষ তাকে মুঠোয় পুরতে ব্যর্থ হয় তখন তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এমনকি প্রিয় পুরুষটিও তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তবুও নারী পরাজিত হয় না। এগিয়ে চলে। জন্ম দেয় অনাগত পৃথিবীর। "বইটির 'সারেং বৌ' নাম সার্থক। কেননা তার সমগ্র অবয়বব্যাপী সমস্ত ধমনীতে সারেং বৌ নবিতুন যেমনভাবে তরঙ্গিত এমন আর কেও নয়। আখ্যানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় সারেং বৌ-এর সঞ্চরণ অবারণ। এর পরে কদম। কিন্তু এই পুরুষ-প্রকৃতি প্রেমে, আস্থায়, উৎকণ্ঠায়, ধৈর্য, ক্ষমা এবং সহনশীলতায় নারী-প্রকৃতি নবিতুনের উপরে উঠতে পারেনি।'[৩২] সিনেমার শেষ অংশে কাহিনির এগিয়ে চলা অর্থাৎ কাহিনির গতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'চিত্রনাট্যের ঘটনার মধ্যে থাকবে গতি। ঘটনার গতি নির্ভর করে action এর ওপর। অনবরত setting এর পরিবর্তন করলে ঘটনার গতি আসে না। ঘটনার গতি আসে setting এর কেন পরিবর্তন হল তার কারণের ওপর। চিত্রনাট্যকারের লক্ষ্য থাকবে কেথায় ঘটনা ঘটছে, তার ওপর নয়—কেন ঘটছে তার দিকে। এই ঘটনা প্রবাহের মধ্যে নাট্যোৎকণ্ঠা (suspense) থাকবে। কেননা নাট্যোৎকণ্ঠা হোল চলচ্চিত্রের কাহিনির গতিময়তার একটি প্রধান অঙ্গ।'[৩৩]

আবার ভয়ানক বান ডেকে আসে। 'কোন কথা, কোন কণ্ঠ আর শোনা যায় না। সমস্ত শব্দ ভয় পেয়েছে সেই একটি মাত্র ভয়ংকর শব্দ গর্জনে- শোঁ ওঁ গোঁ ওঁ ওঁ গোঁ ওঁ শোঁ শোঁ ওঁ ওঁ। বুঝি বেজে উঠেছে ইস্রাফিলের শিংগা। বেজে উঠেছে রুদ্র দেবতার প্রলয় বিষাণ। আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে পৃথিবীর বুকে। খান খান চুর চুর হয়ে মাটির পৃথিবীটা ছিটকে পড়ছে, লীন হতে চলেছে কোন শূন্যলোক। বুঝি মহাসৃষ্টি ধ্বংস আজ।'[৩৪] উপন্যাসের এই বর্ণনা চলচ্চিত্রে কয়েকটি ছোট ছোট 'কাট' শটের মাধ্যমে মূর্তমান হয়েছে। সমুদ্রে ভয়াল জলোচ্ছ্বাস, আকাশে বজ্রের হুঙ্কার, প্রলয়ঙ্করী বাতাস—এই দৃশ্য বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে দর্শক যেন চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করেছে দুর্যোগ। যেসব পাঠকের বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই তারা তাদের কল্পনায় উপন্যাসের বর্ণনা ঠিকমত ধারণ করতে সক্ষম না-ও হতে পারে। কিন্তু চলচ্চিত্রে তা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। চলচ্চিত্রকার দৃশ্যটিকে যতটুকু তুলে ধরবেন, সকল দর্শক সমানভাবে তার পুরোটাই দেখতে পারবে। এখানেই চলচ্চিত্রের বিশিষ্টতা। 'উপন্যাসে বা গল্পে আমরা চোখে কিছু না দেখলেও বর্ণনা থেকে মনে মনে সমস্ত দৃশ্য কল্পনা করে নিতে পারি। কিন্তু নিছক ভাষা দিয়ে অতি বড় প্রতিভাবান লেখকের পক্ষেও যা করা সাধ্যের অতীত, দিব্যচক্ষু ক্যামেরার ভাষা দিয়ে চলচ্চিত্র তা সম্ভব করতে পারে বলেই শিল্প হিসেবে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মূল্যবান।'[৩৫]

প্রলয়ংকর বিপদে কদম সবকিছু ভুলে যায়। যেমন ভুলে যেতে দেখা যায় *Tidal Wave* সিনেমার *Hwi* কে। ২০০৪ সালে ভারত সাগরে সৃষ্ট সুনামি ও এর ধ্বংসাত্মক প্রভাবের উপর ভিত্তি করে ২০০৯ সালে দক্ষিন কোরিয়ার নির্মিত হয়েছে *Tidal Wave* সিনেমাটি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের

Dhaka University Institutional Repository

চরম মুহূর্তে Hwi ও তার স্ত্রী Yoo-jin অতীতের সব তিক্ততা ভুলে গিয়ে সুনামিতে ভেসে যাওয়ার আগ পর্যন্ত একে অপরকে জরিয়ে ধরে রেখেছিল।[৩৬] ঠিক একই রকম দুর্যোগলগ্নে বাঁধ ভেঙ্গে জলোচ্ছ্বাস এগিয়ে আসতে থাকে 'সারেং বৌ' সিনেমায়। এই বান যতটা আঘাত হেনেছে প্রকৃতিতে তারচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছে নবিতুনের মনে। তাই দুর্যোগ মূহুর্তেও কদম যখন লুন্দর শেখ ও পোস্টমাস্টার তার সমন্ধে মিথ্যা কথা বলেছে কিনা জানতে চাইলে নবিতুনকে পূর্বের ন্যায় নিরুত্তর থাকতে দেখা যায়। মুহূর্তেই বান সবকিছু ভাসিয়ে নিতে আসে। লন্ডভন্ড করে দেয় সবকিছু। কদম আক্‌কিকে কাঁধে নিয়ে বাইরে বের হয়। নবিতুনকে লুন্দর শেখের দোতলা বাড়ির দিকে যেতে বলে। সবাই সেই দিকেই যাচ্ছে। নবিতুন এতে অস্বীকৃতি জানায়। বাধ্য হয়ে উঁচুগাছে আশ্রয় নেয় তারা। ওখানে বসে নবিতুন দেখতে পায় চৌধুরি বাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছোট বৌয়ের জন্য তার আফসোস হয়। জলোচ্ছ্বাস যেমন বাঁধ ভেঙে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি নবিতুনের মনের সকল বাঁধ ভেঙে আচমকা কদমের কাছে সব গুমর ফাঁস করে দেয়। ছোট বৌ গুজাবুড়ির কাছ থেকে যা যা জেনেছে একে একে সব কদমের কাছে বলে। আক্রোশে ফেটে পড়ে কদম। একদিকে ঝড় অন্যদিকে পুনর্মিলনের জন্য তৈরি ক্ষেত্র। এই বৈপরীত্য দর্শকমনে দারুণ অভিঘাতের সৃষ্টি করে। 'শটের পর শট সাজানোর বৈপরীত্য বা বিরোধের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র-নির্মাতা দর্শকমনে একটা আবেগ অনুভূতির সৃষ্টি করেন। ...এভাবে গতির বৈপরীত্য, আলোছায়ার বৈপরীত্য, শব্দের বৈপরীত্য ইত্যাদি গুণের জন্য চলচ্চিত্রের ফর্ম শিল্পমণ্ডিত হয়ে ওঠে। আবার বিষয়বস্তুর দিক থেকে ঘটনার প্রকৃতি ও চরিত্রের মানসিকতা অনুযায়ী যে ভাবের বৈপরীত্য ও রসের বৈপরীত্য তার ফলে ছবির কনটেন্টের শিল্পগুণ ঘটে।'[৩৭]

সবাই লুন্দর শেখের দোতলা বাড়িতে আশ্রয় নিতে চাইলেও সে কাউকেই আশ্রয় দেয় না। এমনকি এতোদিনের দোসর গুজাবুড়ি ও পোস্টমাস্টারকেও না। সে একাই বাঁচতে চায়। অন্যদের উদ্দেশ্যে বলে 'মরার সময় কবরে একাই যেতে হয়'। কিন্তু সে-ও বাঁচতে পারে না এই দুর্যোগ থেকে। বানের পানি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বান আরও ভয়ানক হয়ে ওঠে। কদমের কাছ থেকে নবিতুন ও আক্‌কি ছিটকে যায়। পাগলের মতো সে নবিতুনকে যতটা খুজতে থাকে। আক্‌কিকে ততটা নয়। একসময় সবাই হারিয়ে যায়। লুন্দর শেখ তার সর্বস্ব সুটকেসে ভরে পানিতে ভাসতে থাকে। বারবার সুটকেস তার হাত থেকে ছুটে যায়। কিন্তু ঘোর বিপদেও সে জানের চেয়ে সম্পদের মায়া কাটাতে পারে না। সুটকেস ফেরত আনতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা যায়। একসময় ঝড় থেমে যায়। চারদিকে তাকালে দেখা যায় আকাশে অশুভ শকুনের উড়াউড়ি। আর নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাশ। কোথাও অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই। দিগন্তজোড়া বিরানভূমি। এরমধ্যে একটি দেহ হঠাৎ নড়েচড়ে ওঠে। কর্দমাক্ত দেহে নবিতুনের অবয়ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোন রকমে দাড়িয়ে নবিতুন দেখে চারদিকে লাশ আর লাশ। ক্লান্তদেহে পাগলের মতো আপনজনদের খুঁজতে থাকে সে। এরমধ্যে ক্ষীণ একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, চারদিকে খুঁজতে খুঁজতে অর্ধেক কাদার মধ্যে ডুবে থাকা কদমকে খুঁজে পায়। তৃষ্ণার্ত ঠোটদুটো পানি-পানি করতে থাকে। দৌড়ে গিয়ে নবিতুন দু'হাত বন্দি করে পানি নিয়ে আসে। কদমের কাছে আসার আগেই আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি পড়ে যায়। একাধিকবার চেষ্টা করেও নবিতুন সফল হয়না। উপায়ান্ত না দেখে কদমকে বালির ভিতর থেকে বের করে টেনে হিঁচড়ে পানির কাছে নিয়ে যায়। দুইহাত তালুবন্দি করে মুখে পানি দিতেই কদম থু করে ফেলে দেয়। নবিতুন কোন দিশা খুঁজে পায়না। নিজে একটু পানি মুখে দিয়ে দেখে খাওয়ার অযোগ্য লবণাক্ত পানি।

Dhaka University Institutional Repository

একদিকে কদমের পানির জন্য হাহাকার। অন্যদিকে নিরুপায় নবিতুন। হঠাৎ নিজের মধ্যে মাতৃরূপ আবিষ্কার করে। মা যেমন তৃষ্ণার্ত শিশুকে মাতৃদুগ্ধ দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে, তেমনি নবিতুন নিজের স্তনদুগ্ধ দিয়ে স্বামীর জীবন বাঁচায়। দৃশ্যটি সরাসরি না দেখালেও পরিচালক এখানে একটি স্থিরচিত্র ব্যবহার করেন। তৎসময়ে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের বাইরে গিয়ে এই অংশটি নির্মাণ করা ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জ। তাই চলচ্চিত্রকার এখানে রূপক ছবি ব্যবহার করে কৌশলী ভূমিকার পরিচয় দিয়েছেন। স্প্যানিশ পরিচালক J. A. Bayona নির্মিত *The Impossible* সিনেমায় Henry Bennett বড়দিনের ছুটি কাটাতে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে থাইল্যান্ডে যান। সেখানে সুনামির কবলে পড়ে পুরো পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়ার সময় ছেলে Lucas ও মা Maria পুনরায় একত্রিত হয়। পানির সঙ্গে জীবনপণ লড়াই করতে করতে তারা বেঁচে যায়। দুর্যোগ কেটে গেলে মা-ছেলে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটতে থাকে। চলতে চলতে Lucas মায়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নেয়। মা Maria প্রথমে এর কারণ বুঝতে না পারলেও পড়ে দেখতে পায় সুনামির আঘাতে তার পরনের কাপড় ছিড়ে বক্ষদেশ উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। চরম দুর্যোগে যেখানে বেঁচে থাকাই চরম সার্থকতা, সেখানে লজ্জা-ভয়, অনুশাসন বড় নগণ্য ব্যাপার।[৩৮]

হুশ ফিরে এলে কদম আঁতকে ওঠে বলে, 'এইডা তুই কি করলি নবিতুন? এইডা তুই কি করলি? তুই আমারে পর কইরা দিলি নবিতুন? পর কইরা দিলি?...জানসনা এতে স্বোয়ামী পর হইয়া যায়। এতে স্বোয়ামী পর হইয়া যায়। আমার লগে তুই দুশমনি করলি?' (সা. ব. চ.)। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্ত্রীর স্তন্যপান করলে তাদের মধ্যে আর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু নবিতুন সকল রীতিকে চ্যালেঞ্জ করে বলিষ্ঠ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'দুশমনি? কিয়ের দুশমনি? একটা মানুষের জান বাঁচান ফরজ কাম না?' (সা. ব. চ.)। সে ভেঙে ফেলে এতদিন ধরে সমাজে প্রচলিত ঘুণে ধরা সংস্কার ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের বেড়াজাল। সাহিত্য রচনায় শহীদুল্লা কায়সার দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যিকের এই দুঃসাহসিকতা নিয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—'আজ তাকে বিদ্রোহী মনে হতে পারে, প্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থার পাশে হয়ত তার রচনা আজ অদ্ভুত দেখাবে, কিন্তু সাহিত্য ত খবরের কাগজ নয়। বর্তমানের প্রাচীর তুলে দিয়ে ত তার চতুঃসীমানা সীমাবদ্ধ করা যায় না। গতি তার ভবিষ্যতের মাঝে। আজ যাকে চোখে দেখা যায় না, আজও যে এসে পৌঁছেনি, তারই কাছে তার পুরস্কার, তারই কাছে তার সম্বর্দ্ধনার আসন পাতা আছে।'[৩৯] আবদুল্লাহ আল মামুন চলচ্চিত্রে উপন্যাসের দৃশ্যকে সরাসরি ধারণ করার করার সাহস দেখাতে পারেননি সমাজ বাস্তবতা থেকে বের হয়ে।

নতুন চরের বুক চিরে ওঠে নতুন সূর্য। নতুন সমাজের, নতুন জীবনের আহবানে কদম আর নবিতুনকে তাড়িত করে সেই সূর্য। অতীতের সব জঞ্জাল ও কদর্য স্মৃতি মুছে ফেলে নবিতুন ও কদম এগিয়ে চলে নতুন সমাজ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় বুকে নিয়ে। লোভ-লালসাহীন, ক্ষুধামুক্ত প্রেমময় এক নতুন সময় তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। দুইজনে মিলে তারা আবার দুনিয়াটাকে আবাদ করবে—এই প্রত্যয়কে সামনে রেখে ঔপন্যাসিক ও চলচ্চিত্রকার যুগপৎ আশাবাদী দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তাদের স্ব স্ব মাধ্যমে।

জাপানে সুনামির প্রভাবে পারমানবিক চুল্লি বিস্ফোরণে ফুকুশিমার উপকূলীয় অঞ্চলে যে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়—এর উপর ভিত্তি করে জাপানি পরিচালক Sion Sono ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

সালে *The Land of Hope* নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এখানেও দেখা যায় সুনামিতে বিধ্বস্ত পরিবারগুলোর বেঁচে যাওয়া সদস্যরা আবার যার যার বাড়িতে ফিরে যায় নতুন করে সব শুরু করার জন্য।[৪০] পৃথিবীর সব জায়গায়ই জীবন যুদ্ধে মানুষকে লড়ে যেতে হয়। সব হারিয়ে আবার নতুন করে শুরু করতে হয়। শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ যা-ই হোক না কেন মানুষই পারে সব সংস্কারকে পায়ে দলে জীবনের জয় ঘোষণা করতে। তবে পৃথিবীর সব জায়গায় সমাজ, সংস্কার ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করার সমান সুযোগ পুরুষের মতো নারীরা পেয়ে থাকে না। নবিতুন তার একটি উদাহরণ। তারপরও জয় হয় নবিতুনের। জয় হয় প্রেমের। কিন্তু প্রেমের কাছে মাতৃত্ব হেরে যায় যখন দেখা যায়—বানের পরে নবিতুন হন্যে হয়ে কদমকে খুঁজেছে কিন্তু একটিবারের জন্যও মেয়ে আক্কির কথা মনে করেনি। এখানে মাতৃত্বের চরম অবমাননা করা হয়েছে। ২০১১ সালে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ সুনামি নিয়ে পরের বছর আমেরিকান পরিচালক Stuart J. Levy নির্মাণ করেন তথ্যচিত্র *Pray for Japan*। সেখানে দেখা যায় সুনামিতে নিহত ও নিখোঁজ শিশুদের বেঁচে যাওয়া আপনজনেরা কিভাবে তাদের জন্য ব্যকুলতা প্রকাশ করছে। ধ্বংসস্তুপের মধ্যে পড়ে থাকা বাচ্চাদের সাইকেল, পুতুল ও খেলাধুলার সরঞ্জামগুলো দেখিয়ে দেয় তাদের ভিতরের দহন কতটা তীব্র।[৪১]

ঔপন্যাসিক শহীদুল্লা কায়সার উপন্যাসে ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী দুজন নগ্ন আদিম মানুষের পৃথিবীতে প্রথম আগমন ও গন্ধম উদ্যানে প্রথম প্রেমের লগ্নে আদম আর বিবি হাওয়ার নগ্ন দেহে একে অপরের দিকে তাকিয়ে প্রথম লজ্জা আবিষ্কারের দৃশ্য বর্ণনা করতে চেয়েছেন। যেখান থেকে সভ্যতার বীজ বপন হয়েছে। কিন্তু চলচ্চিত্রকার আবদুল্লা আল মামুন না পেরেছেন আদিম মুহূর্তের সেই নগ্নরূপকে তুলে ধরতে, না পেরেছেন সন্তানের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসার দৃশ্য তুলে ধরতে।

নারীর যে কত রূপ, নবিতুন চরিত্রটির মধ্যে তা ফুটে ওঠেছে। একটি নারী কখনও কারো সন্তান, কখনও বোন, কখনও মা, কখনও স্ত্রী ; এভাবে বয়সের বাঁকে বাঁকে তাকে বদলাতে হয়। এসব সম্পর্কের বাইরে গিয়েও নবিতুন কখনো সহজ-সরল অবলা, কখনো প্রতিবাদী-তেজস্বিনী, কখনো প্রেমময়ী-সর্বংসহা। 'নারী হচ্ছে সমাজের সিমেন্ট স্বরূপ, আর পুরুষ হচ্ছে তার ইট-পাথর।'[৪২]

উপসংহার

সারেং বৌ উপন্যাসকে মূল্যায়ন করতে হলে শহীদুল্লা কায়সারের নিজের অভিমতটি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন—'নিজের মানদণ্ডেই যদি উত্তীর্ণ না হলাম তবে অন্যের সুমুখে উপস্থিত হব কেমন করে? সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডে যে-রচনা উত্তীর্ণ হল না তা সাধারণ্যে পরিবেশন করাটা প্রবঞ্চনা বলেই তো মনে হয় আমার।'[৪৩] 'সারেং বউ' উপন্যাসের প্রকৃতি, সমাজের প্রতিকূলতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী নবিতুনের চরিত্রে বাস্তবানুগ ও মর্মস্পর্শী অভিনয়ের জন্য কবরীকে ১৯৭৮ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।'[৪৪] এই চরিত্রটিই 'সারেং বৌ' চলচ্চিত্রটিকে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে উচ্চাসন দিয়েছে—যার কৃতিত্বের দাবিদার আব্দুল্লাহ আল মামুন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সরিফা সালোয়া ডিনা, *শহীদুল্লা কায়সারের উপন্যাস : বিচিত্র বীক্ষণ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, বেজমেন্ট ৫৫, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, ২৫৩-৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড, কাঁটাবন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৮, পৃ. ৩২

২. জয়ন্তী সেন, *বসুমতী*, ৮ জুলাই ১৯৬৫ সংখ্যা, কলকাতা

৩. সরিফা সালোয়া ডিনা, *শহীদুল্লা কায়সারের উপন্যাস : বিচিত্র বীক্ষণ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, বেজমেন্ট ৫৫, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, ২৫৩-৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড, কাঁটাবন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৮, পৃ. ৩২

৪. শহীদুল্লা কায়সার, *সারেং বৌ*, তৃতীয় মুদ্রনে লেখকের ভূমিকা, উদ্ধৃত : *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী*, গোলাম সাকলায়েন সম্পাদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ১৩৫

৫. *সারেং বৌ*, শহীদুল্লা কায়সার, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ৪৬ বাংলাবাজার ঢাকা, নবম মুদ্রণ ১৯৮৮, পৃ. ৯

৬. গুরুদাস ভট্টাচার্য, 'সুবর্ণরেখা', *চলচ্চিত্র সমালোচনা ৫০*, সম্পাদনা– অবনীন্দ্রনাথ বেরা, সুজন প্রকাশনী, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১৩২

৭. *সারেং বৌ*, শহীদুল্লা কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

৮. আবদুল্লাহ আল-মামুন, *সারেং বৌ* (চলচ্চিত্র), বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থায় নির্মিত, প্রযোজনা: এ বি এম প্রোডাকসন, DVD Version, Laser Vision, Dhaka

৯. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা, পরিমার্জিত সংস্করণ, মে ২০১৩, পৃ. ২০

১০. সুব্রত বড়ুয়া, *কথাশিল্পী শহীদুল্লা কায়সার : জীবন ও কর্ম*, প্রথম প্রকাশ– ফেব্রুয়ারি ২০১৪, চারুলিপি প্রকাশন, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ৫৭

১১. শহীদুল্লা কায়সার, *সারেং বৌ*, জোনাকী প্রকাশনী, ৩৯/৪ নর্থ ব্রুক হল রোড, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০০, পৃ. ১৫

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

১৩. David Bordweel and Kristin Thompson, *Film Art : An Introduction*, Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi-110001; P. 52

১৪. বাদল রহমান, *চলচ্চিত্রের ভাষা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ৩২

১৫. শহীদুল্লা কায়সার, *সারেং বৌ*, জোনাকী প্রকাশনী, ৩৯/৪ নর্থ ব্রুক হল রোড, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০০, পৃ. ১১

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২, ৬৩

১৮. *The Tree of Life* (Film- 2011), Directed and Written by Terrence Malick, River road entertainment and Plan B entertainment, United States.

১৯. ভুঁইয়া ইকবাল, *বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৭৪

২০. মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ১০ সাহেব বাজার ঢাকা, পৃ. ৭২

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

২২. শহীদুল্লা কায়সার, *সারেং বৌ*, জোনাকী প্রকাশনী, ৩৯/৪ নর্থ ব্রুক হল রোড, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০০, পৃ. ২৯

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

২৫. ব্রজসুন্দর দাস (অনুবাদক), *অভিনেতার চরিত্র নির্মাণ*, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৭, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১

২৬. মৃণাল সেন, 'সিনেমার সংকট', *সিনেমা সময় সমাজ*, সম্পাদনা– রজত রায় ও সোমেশ্বর ভৌমিক, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১

২৭. আরজুমন্দ আরা বানু, *শহীদুল্লা কায়সার ও জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : বিষয় প্রকরণ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ৬ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা, পৃ. ৪১

২৮. সারেং বউ চলচ্চিত্রের নায়ক ফারুকের (পুরো নাম: আকবর হোসেন পাঠান দুলু) সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, উত্তরা, ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ (ফারুকের নিজ বাসায় এই গবেষক কর্তৃক ভিডিও ক্যামেরায় ধারণকৃত)

২৯. মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ১০ সাহেব বাজার ঢাকা, পৃ. ৭২

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

৩১. আরজুমন্দ আরা বানু, *শহীদুল্লা কায়সার ও জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : বিষয় প্রকরণ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ৬ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা, পৃ. ৩৩

৩২. শাহাবুদ্দিন আহমদ, মাসিক *পূবালী*, ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। উদ্ধৃত : *কথাশিল্পী শহীদুল্লা কায়সার : জীবন ও কর্ম*, সুব্রত বড়ুয়া, চারুলিপি প্রকাশন ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ৫১

৩৩. নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র*, আনন্দধারা, ৭৯/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ২৫১

৩৪. শহীদুল্লা কায়সার, *সারেং বৌ*, জোনাকী প্রকাশনী, ৩৯/৪ নর্থ ব্রুক হল রোড, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০০, পৃ. ১১৮

৩৫. সূচনা, *চলচ্চিত্র : প্রথম পর্যায়*, আশ্বিন ১৩৫৭ সংখ্যা, কমল মজুমদার, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, নরেশ গুহ, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ সেন সম্পাদিত, প্রকাশক- দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড, কলিকাতা- ২০, পৃ. ৩

৩৬. *Tidal Wave* (Film- 2009), Directed by- Yoon Je-kyoon, Produced by- Yoon Je-kyoon, Lee Sang-yong and Gil Yeong-min, CJ Entertainment, South Korea.

৩৭. অসীম সোম, চলচ্চিত্র-তত্ত্বের মূলসূত্র, *চলচ্চিত্র কথা*, রূপরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, পৃ. ২৬, ২৭

৩৮. *The Impossible* (Film- 2012), Directed by J. A. Bayona, Produced by Álvaro Augustin, Belen Atienza and Enrique López Lavigne, Telecinco Cinema, Spain.

৩৯. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি, *ভারতবর্ষ-শরৎ স্মরণ সংখ্যা*, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, নাথ ব্রাদার্স ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ৭৬

৪০. *The Land of Hope* (Film- 2012), Director and Screenwriter- Sion Sono, Producers: Mizue Kunizane, Yuji Sadai, Yuko Shiomaki, Japan.

৪১. *Pray for Japan* (Japanese documentary film- 2012), directed and produced Stuart J. Levy.

৪২. হুমায়ুন কবির, শরৎ-সাহিত্যের মূলতত্ত্ব, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় অনূদিত, শোভা প্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট, ঢাকা-১০০০। দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই ২০১৩, পৃ. ৩৫

৪৩. ১৯৬০ সালের ১০ ডিসেম্বর ঔপন্যাসিক রাজিয়া খানকে লেখা এক চিঠিতে এক বছর ধরে লেখা নিজের প্রথম উপন্যাস নষ্ট করে ফেলার সপক্ষে তিনি এ অভিমত দেন। উদ্ধৃত : *কথাশিল্পী শহীদুল্লা কায়সার : জীবন ও কর্ম*, সুব্রত বড়ুয়া, চারুলিপি প্রকাশন ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ৩৭

৪৪. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, শামসুর রাহমান সম্পাদিত, ৮ম বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ২৩ নভেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ৭৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গল্প হতে সিনেমা : রামের সুমতি

‘রামের সুমতি’ চলচ্চিত্র পরিচিতি

মূল কাহিনি: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত গল্প ‘রামের সুমতি’
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: শহিদুল আমিন
সঙ্গীত: মনসুর আহমেদ
প্রযোজনা ও পরিবেশনা: জাভেদ ফিল্মস
সম্পাদনা: লুৎফর রহমান
চিত্রগ্রাহক: মোহাম্মদ সাঈদ খান
পরিস্ফুটন: এফ ডি সি ও বেঙ্গল স্টুডিও
মুদ্রণ: ইউসুফ আলী খান খোকা
স্থিরচিত্র: প্রতিচ্ছবি
রূপসজ্জা: জাহাঙ্গীর
ব্যবস্থাপনা: মনসুর আলী, খোরশেদ আলম
শিল্পনির্দেশনা: কলন্তর

অভিনয়ে: জয় (রামলাল), ববিতা (নারায়ণী/বউদি), প্রবীর মিত্র (শ্যামলাল), সুচন্দা (নেত্যকালী/নৃত্যকালী), রওশন জামিল (দিগম্বরী/নারায়ণীর মা), নার্গিস (শিখা), সাদেক বাচ্চু (নরেশ), সাইফুদ্দিন (জগেশ্বর), এটিএম শামসুজ্জামান (স্কুল শিক্ষক), আশীষ কুমার লোহ (পুরোহিত), ওবায়দুল হক সরকার (জমিদার), দুলারী চক্রবর্তী (নরেশের মা), জলি কাদের, সিতারা, হাসি, রকিবুল হোসেন, নুরুর রহমান, আফগানী, হিমাংশু দাস হিমু, ননী দাস, কালী বাবু, পরাণ বাবু, ফটিক পাল, এম এ সামাদ, আলী ইমাম, লুৎফর রহমান, নাহিদ, সুমন, বিপ্লব, তুরিন, উজ্জল, জাভেদ, টুকু, রিংকু, কেয়া চৌধুরী, পলা, রিপা, তুহিন, শাখি, মিমি, সুমি, দিম্পল প্রমুখ।

নেপথ্য কণ্ঠে: সাবিনা ইয়াসমিন, দীবা, নওশিন ও রুনা।

মুক্তি : ১৯৮৫।
সময় : ১১৫ মিনিট (পূর্ণদৈর্ঘ্য)।
ফরম্যাট : ৩৫ মি: মি:।
কালার : রঙিন।

‘রামের সুমতি’ গল্প পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত শিশুতোষ গল্প ‘রামের সুমতি’। বাংলা ১৩১৯ সালে ফনীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত মাসিক ‘যমুনা’-এর ফাল্গুন-চৈত্র দুই সংখ্যায় ‘রামের সুমতি’ প্রকাশিত হয়েছিল।[১] গল্পে একদিকে বয়ঃসন্ধিকালের দুরন্তপনা অন্যদিকে সম্পর্কের বেড়াজাল ছিঁড়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক বন্ধনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

ভূমিকা

"শরৎচন্দ্রের রচনাবলীকে চারটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, তাদের উদ্দেশ্যের অনুপাতে। এমন কি যেগুলি বাহ্যত নিছক আর্টধর্মী মনে হয়, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা সেগুলির মধ্যেও গুপ্ত উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পড়ে— 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' বা 'একাদশী বৈরাগী' নামক গল্পগুলি।"[২] সমালোচকের এ কথার সূত্রে দুটি বিষয় সামনে আসে— এক. 'রামের সুমতি' শরৎচন্দ্রের আর্টধর্মী রচনাগুলির একটি ; দুই. এই গল্পের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য নিহিত আছে। আর তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শরৎচন্দ্রের অন্যান্য রচনার মূল বিষয়ের মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের বহুরূপী সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিরূপণ আলোচ্য গল্পেরও মূল বিষয়। মা-বাপ হারা দুরন্ত কিশোর রামলাল বৌদির আশ্রয়-প্রশ্রয়ে মানুষ। তার দুরন্তপনায় সবাই অতিষ্ঠ। গ্রামে তার একটা দল আছে। তাদের দুষ্টুবুদ্ধি ও কর্মকাণ্ডের কারণে গ্রামের সবাই সন্ত্রস্ত থাকে। আশেপাশের গ্রামের লোকজনের কাছেও এ সংবাদ অজানা নয়। রামের একান্ত সহযোগী তাদের ভৃত্য ভোলা। বৈমাত্রেয় বড় ভাই শ্যামলালের স্ত্রী নারায়ণী যে বছর স্বামীর ঘরে আসে তখন রামের বয়স ছিল মাত্র আড়াই বছর। নারায়ণীর হাতে রামকে তুলে দিয়ে সে বছরই রামের মা মারা যান। সেই থেকে নারায়ণী তাকে আদর যত্নে লালন-পালন করছে। রামের দুরন্তপনা ভৃত্য ভোলা ও নেত্যকালী এমনকি বড় ভাই শ্যামলালের উপর খাটালেও বউদিকে সে মান্য করে। তার প্রশ্রয়েই রামলালের দুষ্টুমি দিন দিন বেড়ে চলেছে বলে ঘরে-বাইরে সবার অভিযোগ। সামাজিক সম্পর্কের বেড়াজাল ভেঙে নারায়ণীর সঙ্গে রামের মা-সন্তানের মতো এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই সম্পর্কে ফাটল ধরে নারায়ণীর মা দিগম্বরী আর ছোট বোন সুরধুনীর আগমনে। দিগম্বরীর কুমন্ত্রণায় শ্যামলাল দুই ভাইয়ের সম্পত্তি ভাগাভাগি করে এবং স্ত্রী নারায়ণীকে রামের সঙ্গে কথা না বলতে দিব্যি দেয়। মাতৃসম বৌদির স্নেহবঞ্চিত হয়ে রামলাল একসময় তার ভুলগুলো বুঝতে পারে। আর দুষ্টুমি-দুরন্তপনা করা উচিত নয়—এমন উপলব্ধি তার মনে আসে। সুমতি হয় রামের। জিতে যায় মমতার বন্ধন।

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি চলচ্চিত্রকারদের আকর্ষণের প্রধান কারণ কাহিনির চিত্রময়তা, নাট্যধর্মিতা ও চলচ্চিত্রোপযোগী সংলাপ। তাছাড়া তাঁর কাহিনির জনপ্রিয়তার কথাও সর্বজন বিদিত। 'রামের সুমতি' গল্প অবলম্বনে ১৯৪৭ সালে ভারতে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। 'রামের সুমতি' নামেই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। এরপর হিন্দি ও বাংলা উভয় ভাষায় চলচ্চিত্র, নাটক এবং টিভি সিরিয়াল নির্মিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালে এই গল্প নিয়ে শহিদুল আমিন বাংলাদেশে একই নামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এটি দর্শক ও সমালোচক মহলে ঐ সময় ব্যাপক সমাদৃত হয়। রাম চরিত্রে অভিনয়ের জন্য 'জয়' শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী ও নারায়ণী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য ববিতা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। বাল্য-জীবনের দুরন্তপনা ছাড়াও চলচ্চিত্রটিতে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সমাজের পারিবারিক সম্পর্কের অনুভূতিগুলো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একে অনেকে শিশুতোষ চলচ্চিত্র হিসেবেও বিবেচনা করে থাকেন।

রামের সুমতি : গল্প ও চলচ্চিত্রের সংশ্লেষ

"কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অমর সৃষ্টি 'রামের সুমতি' গল্পটি ছোট বিধায় চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে এর কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হয়েছে। আশা করি সুধী দর্শকবৃন্দ এই প্রচেষ্টাকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন।"[৩] সিনেমার শুরুতেই এই ঘোষণা দিয়ে চলচ্চিত্রকার দর্শকদের সামনে আত্মপক্ষ সমর্পণ করেছেন। এর মাধ্যমে তাঁর আশঙ্কা স্পষ্ট হয়েছে যে—প্রকাশিত গল্প থেকে সিনেমা করতে গিয়ে কাহিনির সততা ঠিকমতো রক্ষা করতে না পারলে দর্শক বিষয়টিকে খারাপভাবে নিতে পারেন। কারণ দর্শকরা সাধারণ্যে চলচ্চিত্র বিচার করার প্রয়াসী হন না। পূর্ব থেকে জানা গল্প থেকে নির্মিত চলচ্চিত্র দেখার পর প্রথমেই কাহিনির তুলনামূলক বিচার তাদের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। যদি চলচ্চিত্রটি নিজস্ব শিল্পগুণে স্বতন্ত্র সত্ত্বা লাভ না করে তাহলে কাহিনি বিকৃতির দায়ে দর্শকদের কাঠগড়ায় দায়ী হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। 'Non-defined কোন বিসয়বস্তু নিয়ে কাজ করতে গেলে যেমন তাকে extend করার সুযোগ থাকে, তেমনি সেই extended বিষয়টিকে দর্শকের কাছে একদম ঠিক ঠিক, তার অনুভূতিগ্রাহ্য করে উপস্থাপনার বিষয়টিও ভীষণ গুরুত্বের দাবি করে। এখানেই আসে ফিল্মের টেকনিক্যাল ধ্যানধারণার ব্যাপারটা।'[৪] শুধু লাইট, ক্যামেরা, সাউন্ড, এডিটিং এসব টেকনিক্যাল বিষয়গুলো জানলেই হয় না, সিনেমায় এগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগের টেকনিক জানাটাও জরুরি। চলচ্চিত্রকারের জন্য মূলত এটাই মূখ্য বিষয়। পূর্ব প্রকাশিত সাহিত্য থেকে সিনেমা করতে গিয়ে দর্শকদের অনুভূতি ধরে রাখতে সফল চলচ্চিত্রকাররা নিজস্ব কিছু টেকনিক ব্যবহার করেন। সে টেকনিকগুলো শিল্প ও নন্দনের। আর এটার ঠিকমত সন্নিবেশ না ঘটলে গল্প যতই ভাল হোক কিংবা চিত্রনাট্য যতই চমৎকার হোক ভালোমানের সিনেমা আশা করা যায় না। হুবহু গল্প তুলে ধরাই সিনেমা নির্মাণের শেষকথা নয়। ভারতীয় চলচ্চিত্রকার গৌতম ঘোষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে 'পদ্মা নদীর মাঝি' সিনেমা নির্মাণের পর দর্শক প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন—'পাঠ্যপুস্তকে পাঠ্য ছিল মানিক বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাসটি। ছেলেমেয়েরা একাধিকবার পড়েছে, তারপর তারা চলচ্চিত্রটি দেখেছে। সিনেমাটি দেখার পর, তারা আমাকে প্রচুর চিঠি লিখল। তাদের অভিযোগ, অনুযোগের বিষয় হল, কেন আমি নানা জায়গায় পরিবর্তন এনেছি। কখনো ভাবি, কে বড়? সাহিত্যিক না চলচ্চিত্রকার? আসলে এ ব্যাপারটি একান্তই শিল্পের। শিল্পের জায়গা থেকে চলচ্চিত্রটি কতটা উত্তীর্ণ হল, সেটাই বিবেচ্য বিষয়।'[৫] এই উতরে যাওয়ার ব্যাপারটিতে সফলকাম হওয়াই চলচ্চিত্রকারের অভীষ্ট। সঠিকভাবে উতরে যেতে পারলে খারাপ গল্প থেকেও ভালোমানের চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প 'অরণ্যের দিনরাত্রি' অবলম্বনে নির্মিত সিনেমায় সত্যজিৎ রায় এই মুন্সিয়ানাই দেখিয়েছেন। চলচ্চিত্র সচেতন দর্শকমাত্রই জানেন সাহিত্য আর চলচ্চিত্র এক বিষয় নয়। সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র নির্মিত হলে অবশ্যই চলচ্চিত্রটিকে সাহিত্যের দায় থেকে মুক্ত করে নিজস্ব অস্তিত্ব তৈরি করে নিতে হয়। কারণ সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে অনুবাদ হয় না, রুপান্তর হয়। এই রূপান্তর হওয়াটা ঠিকমতো না হলে দর্শক মূল কাহিনির দায় নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন।

সিনেমার প্রথম দৃশ্যে দেখা যায়, নারায়ণী তার দেবর রামলাল ও ছেলে গোবিন্দকে ভাত খাওয়াচ্ছে। ভাতের থালা থেকে জুম-আউট শটে ক্যামেরা পিছিয়ে গিয়ে তিনজনের উপর স্থির হয়। ভাতের লোকমা কার মুখে আগে দিবে তা নিয়ে রাম-গোবিন্দ দুজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। কিন্তু

নারায়ণী ছেলেকে না দিয়ে দেবরের মুখে আগে ভাত দেয়। 'রামের সুমতি' গল্পের প্রথম প্যারায় বর্ণিত আছে, 'শ্যামলালের পত্নী নারায়ণী যেবার প্রথম ঘর করিতে আসেন, —সে আজ তের বছরের কথা—সেই বছরে রামের বিধবা জননীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি আড়াই বৎসরের শিশু রাম এবং এই মস্ত সংসারটা তাঁহার তেরো বছরের বালিকা পুত্রবধূ নারায়ণীর হাতে তুলিয়া দিয়া যান'[৬] (রা. সু. গ.)। গল্পের এই অংশটুকু চলচ্চিত্রে রূপান্তরের প্রয়াসে চলচ্চিত্রকার প্রথম দৃশ্যটি নির্মাণ করেছেন। রামের আড়াই বছর বয়স থেকে নারায়ণী তের বৎসর ধরে রামকে লালন-পালন করে আসছে। বৈমাত্রেয় দেবরকে সে কিরূপে বড় করেছে এই দৃশ্য দেখার পর দর্শকদের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। রামলালকে সে ছেলে গোবিন্দের মতোই ভালবাসে। তবে নারায়ণীকে নিজের ছেলের চেয়ে দেবরকে বেশি প্রাধান্য দিতে দেখা যায় সিনেমার প্রথম দৃশ্যে এবং পুরো সিনেমা জুড়েই এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়—ভাত খাওয়ানোর দৃশ্যের মাধ্যমে চলচ্চিত্রকার সে বিষয়টি দর্শকদের সামনে প্রথমেই পরিষ্কার করতে চেয়েছেন।

সম্পর্কে যা-ই লাগুক মাতৃজ্ঞানেই সে রামকে স্নেহ করে। এই আবেগকে সাহিত্যে বর্ণনা করা যতো সহজ, চলচ্চিত্রে ধারণ করা ততো কঠিন। সাহিত্যে লেখক একাই তাঁর লেখনীর বর্ণনায় পাঠকের মনে আবেগ সঞ্চার করতে পারেন। সিনেমায় এই কাজটি করতে হয় যৌথভাবে। চলচ্চিত্রকার যা চান অভিনেতা যদি অভিনয়ের মাধ্যমে ঠিকঠাক ফুটিয়ে তুলতে না পারেন, ক্যামেরাম্যান যদি সঠিক কোণে তা ধারণ করতে না পারেন তাহলে সিনেমায় সেটা সঠিকভাবে ফুটে ওঠে না। রবীন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে নির্মিত তপন সিংহের 'কাবুলিওয়ালা' সিনেমায় ছোট্ট মিনির প্রতি কাবুলিওয়ালার যে ভালবাসা, ছবি বিশ্বাস তাঁর অভিনয়ের নৈপুন্যতায় গল্পের বর্ণনাকেও ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁর দুর্দান্ত অভিনয় দর্শকদের মাঝেও মমত্ববোধের সৌরভ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।[৭]

খাবার শেষে নারায়ণী যখন দুজনকেই আঁচলে মুখ মুছে দিচ্ছিল এমন সময় বাড়ির ভৃত্য ভোলা মাছ ধরার বড়শি নিয়ে হাজির হয়। মাছ ধরার প্রতি বালক শরৎচন্দ্রের যে বিশেষ ঝোঁক ছিল, পরিণত বয়সেও তাতে ভাটা পরেনি। "শরৎচন্দ্র বাল্যকালে মাছ ধরার প্রতি যে খুব আগ্রহী ছিলেন—তা তাঁর লেখার বিভিন্ন কাহিনির মধ্যে ফুটে উঠেছে। ব্রহ্মদেশে থাকাকালীনও তাঁর এই নেশা যে বর্তমান ছিল তা একটি চিঠিতে পরিস্কারভাবে জানা যায়। তিনি লিখেছিলেন : '৪/৫ জোড়া গায়ে গাঁথা বড়শি বড় সাইজের, মাঝারি সাইজের ২/৩ জোড়া এবং কিছু ছিপ-বাঁধা কডা ও হাতে ভাঙ্গা মূগার সুতা ভাই নিশ্চয়ই দিও।' সামতাবেড়ে থাকাকালীনও তিনি মাছ ধরতে ভালবাসতেন।"[৮] মাছ ধরার প্রতি ভালোবাসার প্রচ্ছন্ন প্রভাব রয়েছে শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন লেখাতে। শহিদুল আমিনও চলচ্চিত্রে এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন—যদিও গল্পে রামের মাছ ধরার প্রত্যক্ষ বর্ণনা নেই। তবে মাছের প্রতি ভালোবাসার উল্লেখ আছে। 'বহুদিনের পুরাতন গোটা-দুই বড় গোছের রুইমাছ ঘাটের কাছে সর্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইত। ...রাম বলিত, এরা তার পোষা মাছ এবং নাম দিয়াছিল কার্তিক গনেশ।'[৯]

বৌদির সরব সম্মতিতে ভোলা আর গোবিন্দকে নিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ার প্রক্কালে বৌদি রামলালকে কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে নিষেধ করে। সিনেমায় রামলালের দুরন্তপনার আভাষ এই দৃশ্যেই পরিচালক দিয়ে রেখেছেন। গল্পের বর্ণনায়— 'রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টুবুদ্ধি কম ছিল না। গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচার যে তাহার কখন কোন দিক দিয়া কিভাবে দেখা দিবে, সে কথা কাহারও অনুমান করিবার জো ছিল না' (রা. সু. গ./ পৃ. ৫৪৭)। সিনেমায় রাম

চলে যাওয়ার পর কথা প্রসঙ্গে নেত্যকালীকে নারায়ণী যখন প্রশ্ন করে 'তুই রামকে একেবারেই সহ্য করতে পারিসনি কেন?' উত্তরে নেত্য বলে— 'সে কি তুমি বোঝনা? ওর দুষ্টামির জন্য, ওর শয়তানির জন্য। ওর মত দুষ্ট ছেলে আশে পাশে পাঁচ গাঁয়ে খুঁজলে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।' — এই সংলাপে রামের দুষ্টুমির সীমা সম্বন্ধে মোটামোটি ধারণা পাওয়া যায়। তেমনি পরের সংলাপে রামের প্রতি নারায়ণীর প্রশ্রয় দেওয়া সম্পর্কে বোঝা যায়— 'তোরা ওর দুষ্টামিটাই দেখিস। ওর মনটা দেখিসনে। আসলে ও খুব ভাল ছেলে। ওর মতো মন কজনের আছে' (রা. সু. চ.)[১০]। বৌদির প্রশ্রয়ে রামের দুষ্টুমি যেমন স্বাভাবিকতা লাভ করেছে তদ্রুপ শরৎচন্দ্রের বাল্য জীবনও কেটেছে ঠাকুরমার কাছ থেকে অনুরূপ প্রশ্রয় পেয়ে। 'ঠাকুরমা ...শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত আদর দিতেন, নাতির হরেক রকম দুষ্টামি দেখেও তাঁর হাসিখুশি একটুও ম্লান হত না।'[১১]

গল্পের শুরুর তিনটি লাইনকে শহিদুল আমিন যথাসম্ভব extend করেছেন রামের দুষ্টুমি ও দুরন্তপনার ছবি আঁকতে। গল্পে রামকে গ্রামবাসীর জন্য ভয়ের এক উপদ্রব হিসেবে বর্ণনা করলেও চলচ্চিত্রকার রামের দুরন্তপনার মাঝে সুবোধ, বুদ্ধিমত্তা এবং প্রতিবাদী মনোভাব যোগ করেছেন। ছবিতে দেখা যায়— রামের দল পুকুর থেকে মাছ ধরছে। এমন সময় তারই দলের মধু এসে খবর দেয়— 'কালু ময়রা কাল রাতে পাশের গ্রামে তার (মধুর) বাবার সঙ্গে গিয়েছিল যাত্রা দেখতে। কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসে দোরগোড়ায় চৌকি ফেলে ধুমছে ঘুমাচ্ছে' (রা. সু. চ.)। কালু ময়রা ঘি'য়ে ভেজাল দেয়। তাই ময়রাকে শায়েস্তা করার সুযোগ পেয়ে সদলবলে মিষ্টির দোকানে লুট করতে যায় রাম। কালু ময়রা তখনও নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল। দোকানের বোকাসোকা বামন কর্মচারীটিকে হাত করে, তাকে মিছে-মিছি বেঁধে রেখে সবাই মিলে দোকানের সব মিষ্টি লুট করে নিয়ে যায়। এখানে রামের দুষ্টুমিকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করার অবকাশ রেখেছেন চলচ্চিত্রকার। শিশুমনে অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেওয়ার মানসিকতা থেকে যে প্রতিবাদী চেতনা জেগে ওঠে—সিনেমায় রামকে সেভাবেই দেখতে পাওয়া যায়। এসব কারণে বলা যায়, শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের অভিপ্রায় থেকে শহিদুল আমিন সদ্‌গুণ ও প্রখর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন বালক হিসেবে রামলালকে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় পরের দৃশ্যে— চুরিকরা মিষ্টি নিয়ে রামের দল যখন মজা করে মিষ্টি খাচ্ছিল, তখন গ্রামের মাতব্বর যজ্ঞেশ্বর তার ভৃত্যসমেত সেখানে উপস্থিত হলে কৌশলে তাদেরকেও মিষ্টি খাইয়ে দেয়া হয়। পড়ে কালু ময়রা সালিশ বসালে যজ্ঞেশ্বরও যে ঐ লুটের মিষ্টির ভাগ পেয়েছে তা ভৃত্য বাসুকে ডেকে এনে কানে কানে বলে দিয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেয়ার হুমকি দেয়। একথা জানার পর যজ্ঞেশ্বর চুপসে যায়। ফলে উল্টো কালু ময়রা যে ঘিয়ে ভেজাল দেয়— রাম এই অভিযোগ সবার সামনে নিয়ে আসে। রামের বুদ্ধিমত্তায় বিচারের রায় রামের পক্ষে চলে যায়। সিনেমাটি যে বিশেষত শিশুদের উদ্দ্যেশে নির্মাণ করার অভিপ্রায় ছিল তা সিনেমার বিভিন্ন অনুষঙ্গ থেকে পরিষ্কার হওয়া যায়। ময়রাকে শায়েস্তা করতে যাওয়ার সময় সবাই যখন ধুতির উপর যখন শার্ট পরিধান করছে, রামের তখন মনে পড়ে যায় যে—সে ভোলাকে বলেছিল আসার সময় তাদের জন্য শার্ট নিয়ে আসতে। কারণ মাছ ধরা শেষ করেই সকলের সঙ্গে পাশের গাঁ লক্ষীপুরে যাওয়ার কথা ফুটবল খেলার দিনক্ষণ ঠিক করতে। ভোলা শার্ট আনতে ভুলে যাওয়ায় রাম যখন তাকে গালমন্দ করছিল, তা দেখে গোবিন্দকে বলতে শোনা যায়— 'কাকা ভোলাকে শুধু শুধু বকছ কেন? তুমিও তো ভুলে গেছ, আমরা তো বাড়ি থেকে একসঙ্গেই বেড়িয়েছি' (রা. সু. চ.)। এখানে

গোবিন্দের শিশুসুলভ সরলতা ও সততা পরিলক্ষিত হয়। সিনেমায় বিভিন্ন জনের সংলাপে রাম সম্বন্ধে যে মন্দ ধারণা দেয়া হয়েছে কার্যকরণে তা দৃষ্ট হয় না। রামের দুষ্টুমিকে চলচ্চিত্রকার বয়সসুলভ চপলতা হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, কারো উপদ্রব হিসেবে নয়।

শরৎচন্দ্র রামের বড় ভাই শ্যামলাল সম্বন্ধে বলেছেন, 'তাহার (রামের) বৈমাত্রেয় বড়ভাই শ্যামলালকেও ঠিক শান্ত প্রকৃতির বলা চলে না।'[১২] চলচ্চিত্রে আমরা শ্যামলালকে শান্ত প্রকৃতির অনেকটা ভালমানুষের মতোই দেখতে পাই। যদিও যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে তাকে চলাফেরা করতে দেখা যায়। যজ্ঞেশ্বর চরিত্রটি মূল গল্প বহির্ভূত। কুটকৌশলী ও নারীলোভী এক সমাজপতি হিসেবে তাকে সিনেমায় চিত্রিত করা হয়েছে। রামের দলের সঙ্গে লুটের মিষ্টি খাওয়ার সময় গ্রাম্য বালিকা শিখার প্রতি যে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তাতে বুড়ো যজ্ঞেশ্বরকে প্রথমেই কামতাড়িত নীচ প্রবৃত্তির লোক হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। তবে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে শ্যামলালের চলাফেরা করার একটি কারণ হতে পারে—গ্রামের জমিদারের কাছারিতে কাজ করলেও শ্যামলাল নিজে ছিল অবস্থাসম্পন্ন। শরৎচন্দ্রের গল্পে এর বর্ণনা পাওয়া যায়, 'গ্রামের জমিদারী কাছারিতে সে কাজ করিত এবং নিজের জমিজমা তদারক করিত। তাহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল। পুকুর, বাগান, ধানজমি, দু'-দশ ঘর বাগদী প্রজা এবং কিছু নগদ টাকাও ছিল।'[১৩] সমাজে মর্যাদাশালী হওয়ায় যজ্ঞেশ্বরের মতো সমাজপতিদের সঙ্গে চলাফেরা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু শ্যামলালের চরিত্রে অতটা কলুষতা পরিলক্ষিত হয়নি। বরং স্ত্রীকে সে কিছুটা ভয় করত। নিজে সে রামলালকে শাসন করতে চাইত না। তাই নিজের অসহায়ত্ব নিয়ে নারায়ণীর উদ্দেশ্যে বলতে শোনা যায়, 'দশজনকে নিয়ে আমাকে সমাজে চলতে হয়, প্রতিদিন যদি একটা না একটা অভিযোগ আসে তাহলে মাথা ঠিক রাখা যায়। শুধু তুমি, তোমার জন্য পারি না, নইলে কবে চাবকে ওর পিঠের ছাল আমি তুলে নিতাম' (রা. সু. চ.)। স্ত্রীকে ভয় করার কথা গল্পেও উল্লেখ আছে, 'শ্যামলাল মনে মনে স্ত্রীকে ভয় করিতেন' (রা. সু. গ./ পৃ. ৫৫৩)। রামের প্রতি কোন অভিযোগকেই নারায়ণী ততটা আমলে নিত না। কারণ রামের প্রতি তার রয়েছে অতিরিক্ত ভালবাসাজনিত আবেগ ও বিশ্বাস। তাই শ্যামলাল যখন বলে, 'কালু ময়রা বিচার বসিয়েছে। রামের দল ওর মিষ্টির দোকান লুট করেছে।' নারায়ণীকে তখন বলতে শোনা যায়, 'কালুর দোকান লুট করল কেন? ...নিশ্চয়ই কালু কোন অন্যায় করেছে' (রা. সু. চ.)। 'শরৎচন্দ্রের গল্প যে স্নেহাতুরতা রস জমিয়েছে তা সহজ কিন্তু স্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ সচরাচর যা দেখা যায় তা নয়, তা যেন তির্যক। এখানে ভালবাসা যেন গর্ভধারিণী মায়ের চেয়ে সৎমায়েরই বেশি। সাধারণ জীবনে এই তির্যক স্নেহবৃত্তির অসচ্ছলতা শরৎচন্দ্রের গল্পের বিশেষ স্বাদ। এ ব্যাপার কিন্তু লেখকের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। তিনি ঘরের লোকের স্নেহাভিষেখ পাননি, তাই বাইরের লোকের স্নেহের কাঙাল ছিলেন।'[১৪] এই স্নেহকাতরতা শরৎচন্দ্রের বেশিরভাগ রচনার প্রধান পুরুষ চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক। আর স্নেহদায়ী নারী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তুলনামূলক দূরসম্পর্কীয়।

সিনেমায় কাহিনি সম্প্রসারিত করতে গিয়ে নরেশ ও শিখার প্রেমোপাখ্যান যোগ করায় শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের যে চেষ্টা শহিদুল আমিনের ছিল তা ব্যহত হয়েছে। মূল কাহিনিকে বর্ধিত করতে গিয়ে চলচ্চিত্রকার এখানে গতানুগতিক সিনেমার প্রেম কাহিনি, স্বার্থ-সংঘাত, সামাজিক কুটিলতা ও হাস্য রসিকতা যোগ করেছেন। সবকিছুর মিশ্রনে সিনেমাটি জগাখিচুড়ি রূপ নিয়েছে। না হয়েছে শিশুদের উপযোগী, না হয়েছে রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যান, না হয়েছে বস্তুনিষ্ঠ সিনেমা।

অপরদিকে শরৎচন্দ্র 'অতুলনীয় গল্পকার ও বর্ণনাকারী। তাঁর বর্ণনার মধ্যে যে স্বাচ্ছন্দ ও সাবলীলতা আছে, তাতে তাঁর ঘটনা-বিন্যাসের সকল ত্রুটি এবং চরিত্র-চিত্রণের সকল বিচ্যুতি ভুলে যেতে হয়। তাঁর গল্পগুলি প্রচন্ড স্রোতের মত বেগে বয়ে যায় এবং পাঠক নিরুদ্ধ উৎকণ্ঠায় তাঁর সঙ্গে ভেসে চলে।'[১৫] সিনেমায় শুরুতে ঠিকঠাক থাকলেও কাহিনি বর্ধিত করতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের গল্পের গতিময়তা থেকে চলচ্চিত্রকার হঠাৎ ছিটকে বেড়িয়ে গেছেন ; পুনরায় ফিরে এসে আর মূল সুরটি ধরতে পারেননি। এতে মূলগল্পের ভাবার্থ ক্ষুণ্ন হয়েছে। তারপরেও সিনেমার কিছু কিছু দিক দর্শক সমালোচকদের নজর কাড়তে সমর্থ হয়েছে শরৎচন্দ্রের গল্পের প্রভাবের কারনে। সিনেমার বর্ধিত অংশে দেখা যায়— নরেশ যজ্ঞেশ্বরের বিধবা মেয়ের সন্তান, তারই আশ্রয়ে থেকে পড়াশোনা করে। শিখাকে সে ভালবাসে। ওদিকে শিখাকে দেখার পর যজ্ঞেশ্বরও তাকে বিয়ে করতে চায়। বৈঠকখানায় একদিন নাতি নরেশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উপস্থিত সবাইকে বলে, 'পরের ছেলে পরই হয়। অনেকদিন থেকে ইচ্ছা একটা বিয়ে করি। ...আমার চেয়ে বেশি বয়সের লোকে বিয়ে করে। আমার কি ইচ্ছে হয় না একটা ছেলের মুখ দেখি' (রা. সু. চ.)। এই ইচ্ছার পিছনে যে অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে দর্শকদের তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এখানে চলচ্চিত্রকারেরও একটি অভিসন্ধি ছিল— তা হল নরেশ ও শিখার মিলন ঘটাতে গিয়ে কৌশলে যজ্ঞেশ্বরকে শিক্ষা দিয়ে রামের বুদ্ধিমত্তা ও পরোপকারিতার চিত্র তুলে ধরা। শিশুদের কর্মকাণ্ড-অনুপযোগী ও সমাজ-বাস্তবতা বহির্ভূত শহিদুল আমিনের এই বর্ধিত অংশ শরৎচন্দ্রের গল্পের মূল ভাবার্থের সঙ্গে কোনভাবেই মিশ খায়না। কেননা শরৎচন্দ্রের মানবিক-অনুভূতি নির্ভর গল্প হতে নির্মিত শিশুতোষ চলচ্চিত্রে একটি শিশুর বুদ্ধিমত্তা প্রকাশের অনেক সুযোগ থাকা স্বত্তেও এরকম প্রাপ্তবয়স্ক প্রেমোপাখ্যান জোর করে কাহিনির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া চলচ্চিত্রকারের চিন্তার দৈন্য প্রকাশ করে। অন্যদিকে একে শুধুমাত্র মানবিক-কাহিনি নির্ভর সিনেমা হিসেবে চিন্তা করলেও বিষয়টি বেমানান প্রতিভাত হয়। এটাকে চলচ্চিত্রের extension জনিত missing link বলা যেতে পারে। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাই প্রেম-কাহিনি নির্ভর, বলা যায় প্রথাবিরুদ্ধ গোপন প্রেমই তাঁর লেখার মূল অনুষঙ্গ। কিন্তু 'রামের সুমতি' মানবিক প্রেমের গল্প। প্রাপ্তবয়স্ক প্রেম কাহিনি নির্ভর সিনেমা নির্মাণই যদি চলচ্চিত্রকারের অভীষ্ট হতো তাহলে প্রেম-কাহিনি নির্ভর শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত সব রচনা বাদ দিয়ে জেনেশুনে এই গল্পটি নির্মাণে প্রয়াশী হতেন না। চলচ্চিত্রকার হয়তো গল্পটির মানবিক সম্পর্কের দিকটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন নতুবা রামকে প্রাধান্য দিয়ে শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী ছিলেন। '...শিল্পের যে- দর্পণে মানুষ নিজেকেই বিশ্বস্তরূপে প্রতিফলিত দেখতে চায়, তা যাত্রা, থিয়েটার, উপন্যাস অথবা চলচ্চিত্র যাই হোক, যদি তা সৌন্দর্যের নিয়ম অনুযায়ী নির্মিত হয়, তাহলে মানুষকে হয়ে উঠতে হয় ব্যক্তি ও টাইপের সমন্বয়। উৎকৃষ্ট শিল্পের সেটাই চরিত্র-লক্ষণ। চলচ্চিত্রে মানুষকে তার এই স্ব-রূপে দেখানো হলেই আমরা তাকে বলতে পারি মানুষের সঠিক বাস্তবনিষ্ঠ রূপায়ন। তা না-হলে চলচ্চিত্রে মানুষ হয়ে যায় অলীক, অবাস্তব, নির্মাতার উদ্ভট কল্পনায় ছাড়া জীবনে যার অস্তিত্ব নেই। কিন্তু চলচ্চিত্রে এরকম সৃষ্টিছাড়া মানুষকে দেখতে চাই না আমরা, কেননা সিনেমায় আমরা দেখতে চাই প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরই, আমাদের ব্যক্তি ও সামাজিক, উভয় সত্তায়।'[১৬]

সিনেমায় পরের দৃশ্যে দেখা যায় স্কুলের মাস্টারমশাই ছাত্রদের কাছ থেকে লাউ, শশা, বাতাবি লেবু, পেঁপে প্রভৃতি উপঢৌকন ডুলা ভরে যদু-মধু নামের দুই ছাত্রকে দিয়ে বাড়িতে পাঠানোর সময় দৌড়ে রাম শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে। রামের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যদু-মধু পড়ে যায়। এতে পাকা

পেঁপে মাটিতে পড়ে চৌচির হয়ে যায়। মাস্টারমশাই এ নিয়ে রামকে ভৎর্সনা করে বলে, 'নিজে ত কিছুই আনবে না, হতচ্ছাড়া বাঁদর কোথাকার' (রা. সু. চ.)। উত্তরে রাম বলে, 'বলেছিলাম বৌদিকে। তিনি বললেন তোদের মাস্টার বাবুকে বলবি বাড়ি এসে খেয়ে যেতে। স্কুলে কোন কিছু নিয়ে গিয়ে মাস্টারকে দেওয়া অন্যায়। এটা ঘুষ' (রা. সু. চ.)। এ কথা শোনে মাস্টার অগ্নিশর্মা হয়ে রামকে মারতে থাকে। এখানে স্কুল মাস্টারের অন্যায়ের বিরুদ্ধেও রামকে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। তৎকালীন সমাজে মাস্টারদের উপঢৌকন নেয়া প্রথাসিদ্ধ থাকলেও জোর করে বা বাধ্য করে তা আদায় করা অন্যায় ছিল। রাম সে অন্যায় মেনে নিতে পারেনি। তাই শিক্ষা দেয়ার জন্য সে পরদিন একটি পিঁপড়ার বাসা মাস্টারের টেবিলের নিচে রেখে দেয়। মাস্টার ক্লাসে এসে নাম ডাকার সময় পিঁপড়া তাকে কামড়াতে থাকে। সহ্য করতে না পেরে মাস্টারমশাই ক্লাস ছেড়ে দৌড়ে পালায়। নিজেকে আড়ালে রেখে রামের এই দুষ্টুমির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের স্কুল জীবনের দুষ্টুমির মিল পাওয়া যায়। 'ছাত্রবৃত্তি-কেলাসে শরৎচন্দ্র ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের দুষ্টুবুদ্ধি সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। ইস্কুলের যে-ঘড়ি দেখে ছুটি দেওয়া হত, শরৎচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীরা রোজ কাঁধাকাঁধি করে দেওয়ালের উপরে উঠে সেই বড় ঘড়িটার কাঁটা এত এগিয়ে দিতেন যে, অনেক সময়ে প্রধান শিক্ষক সে বেঠিক ঘড়িকে বিশ্বাস করে এক ঘণ্টা আগেই ইস্কুল বন্ধ করতে বাধ্য হতেন। শেষে যেদিন ছেলেরা ধরা পড়ল, সেদিন কিন্তু দোষীদের দলে শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করা যায়নি। তিনি অভিমন্যু-জাতীয় বালক ছিলেন না, বিপদের মুহূর্তে বুহ্য ভেদ করে সরে পড়তে পারতেন যথাসময়ে।'[১৭] স্কুল ছেড়ে পালানোর সময় পথে জমিদারের সঙ্গে মাস্টারমশাই দেখা হয়। জমিদার উপঢৌকন নেয়ার অভিযোগের কথা জানালে সে চিরতরে স্কুল পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে জানিয়ে দৌড় দেয়। দৌড়ে পালানোর সময় একলোকের কলা থেতলে দিয়ে যায়। কলাওয়ালাও কলার দামের জন্য তার পিছনে পিছনে দৌড়াতে থাকে। এতে হাস্য রসাত্মক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়—যা মূল গল্প অনুযায়ী অপ্রাসঙ্গিক। তবে সিনেমায় ব্যবহৃত বর্ধিত এই বিষয়টি মূল গল্পের সঙ্গে মানানসই। কেননা এখানে শিশু মনস্তত্ত্ব ও তাদের কর্মোপযোগী কাহিনির মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। মাস্টারমশাই-এর ভাঁড়ামো হাস্যরস সৃষ্টি করলেও এরকম চলচ্চিত্রে বিষয়টি অতিরঞ্জন ও দৃষ্টিকটু।

সিনেমায় রামকে নরেশ-শিখার প্রেমের দূতিয়ালি করা ও তাদের সহায়তা করা সমাজ বাস্তবতা হিসেবে সত্য বলে ধরে নিলেও শিশুতোষ সিনেমায় রামের পক্ষে এ কাজ করা ইঁচড়ে পাকামো ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজের প্রতি শিল্পীর দায়বদ্ধতা থেকে বিচার করলেও তা অনৈতিক। বটগাছের নিচে শিখা ও নরেশের লুকিয়ে প্রেম করা এবং দূর থেকে তা দেখে যজ্ঞেশ্বরের ভাঁড়ামো করার মধ্য দিয়ে যজ্ঞেশ্বর চরিত্রের বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। একদিকে তাকে কূট, নারীলোভী, ক্ষমতাবান হিসেবে দেখানো হয়েছে অন্যদিকে তার ভাঁড়ামো—চরিত্রের প্রভাবকে নষ্ট করে দিয়েছে। শিশু-কিশোরদের বিনোদন দিতে গিয়ে শহিদুল আমিন ভাঁড়ামোর বিষয়টি প্রাধান্য দিয়েছেন নিঃসন্দেহে একথা বলা যেতে পারে। যজ্ঞেশ্বর ছাড়াও তার ভৃত্য বাসু, কালু ময়রার বামুন কর্মচারী এমনকি স্কুল মাস্টারকেও ভাঁড় চরিত্র হিসেবে দেখা যায়। ভাঁড়ামোর বাড়াবাড়ি সিনেমায় স্থূল হাস্যরস সৃষ্টি করলেও মূল কাহিনির স্বার্থকতা বিনষ্ট হয়েছে। শরৎচন্দ্রের একটি লাইন যেমন পরের লাইনে পাঠককে টেনে নিয়ে যায়, বাড়তি রস যোগ করার পরও শহিদুল আমিনের সিনেমা দর্শককে সেভাবে টানে না। চলচ্চিত্রকার হয়ত বাজার কাটতির জন্য সমকালীন দর্শক চাহিদার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই সমকালীন চাহিদার বিষয়টি সাহিত্যের বেলায়ও একই রকম—'এক একটি বিশেষ

কালে, বিশেষ দেশের মানব সমাজে, সাহিত্য মানুষের মন থেকে, অনুভব থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ। এটি কোন দেশে কেমন রঙের কেমন আকৃতির হবে, —কেমন গন্ধের আর স্বাদের হবে সেটি নির্ভর করে সেই দেশের মাটির আর জল হাওয়া রৌদ্রের উপর। ...বিভিন্ন দেশের সমাজে মানব-মন বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস, মূল্যবোধ আর সংস্কারে গড়ে ওঠে। সাহিত্যে এরাই বিভিন্ন ধরনের মাটি।'[১৮] তেমনি চলচ্চিত্রও কোন নির্দিষ্ট দেশ, কাল ও মানুষের রুচি-চাহিদার উপর গতি প্রকৃতি বদলাবে—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন সাহিত্যে বর্ণিত কোন নির্দিষ্ট সময় ও সমাজকে চলচ্চিত্রে ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন তার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা চলচ্চিত্রকারের জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাড়ায়। আর এটি করতে হয় অবশ্যই শিল্পসম্মত উপায়ে—নতুবা শিল্পী তাঁর দায় এড়াতে পারেন না। তাছাড়া দর্শকের সমকালীন চাহিদা আর চলচ্চিত্রে সমকালীনতা এক জিনিস নয়। শুধুমাত্র বাহ্যিক উপাদানের প্রয়োগ বা সন্নিবেশ চলচ্চিত্রকে সমকালীন করে তোলে না। শত বছরের পুরানো সিনেমা যদি আজকের কথা বলে, আজকের চিন্তাকে ধারণ করে তবে তা বহু অতীতে নির্মিত হলেও সমকালীন। 'যে-কোনো ঘটনা, যে-কোনো গল্প, যা কিছু আজকের মানুষকে আজকের কথা মনে করিয়ে দিতে পারবে, আজকের কথা ভাবিয়ে তুলবে, আজকের বস্তুজগতের সঙ্গে একটা যোগসূত্র খুঁজে বার করতে সাহায্য করবে, তাই সমকালীন বলে নির্ণীত হবে। শুধুমাত্র আজকের ব্যবহারিক জীবনের উপাদান দিয়ে তৈরি কাহিনিই নয়, যে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা, পৌরণিক ধর্মীয় বা অ-ধর্মীয় আখ্যান অথবা উপকথা রূপকথা সব কিছুই তাদের প্রাচীনত্ব ঘুচিয়ে সমকালীন শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে পারে, যদি অবশ্য বর্তমানের সমস্যা সংকট সংঘাতের সঙ্গে সেই যুগের আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এবং যদি, সর্বোপরি, সেই কাহিনি একালের মনস্তত্ত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।'[১৯]

যজ্ঞেশ্বর হাতে পট্টি লাগিয়ে শিখার বাবা যতিনের কাছে গিয়ে বলে, মা দুর্গা তাকে স্বপ্নে দেখিয়েছেন শিখাকে যেন সে বিয়ে করে। হাতে পাঁচশ টাকা গুঁজে দিয়ে তাকে রাজি হতে বলে। যতিনের না বলার কোন উপায় নেই। তার ভিটে-মাটি সব যজ্ঞেশ্বরের কাছে বাঁধা। তারপরও এসব ভাওতাবাজি বোঝা সত্ত্বেও আমতা-আমতা করে কিছু একটা বলতে চায় কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না। যাবার আগে যজ্ঞেশ্বর হুমকি দিয়ে যায় কোন কারণে যদি সে অমত করে তাহলে এই ভিটে-মাটিতে ঘুঘু চড়াবে। যজ্ঞেশ্বর চলে গেলে যতীন তার মেয়েকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য ভগবানের কাছে কান্নাকাটি করে সাহায্য চায়। —এই দৃশ্যে যজ্ঞেশ্বরকে চরম মিথ্যাবাদী, কূটকৌশলী ও ক্ষমতাবান হিসেবে দেখা গেলেও মদ খেয়ে বাসুর সঙ্গে মাতলামি, বিয়ের রাতে শিখার পরিবর্তে বাসুকে দেখে ভাঁড়ামো করতে দেখা যায়। সিনেমাতে বাণিজ্যিক মসলা ঢোকাতে নরেশ-শিখা জুটির আমদানি করা হয়। সুরা খেয়ে যজ্ঞেশ্বর মাতলামি করে কল্পনায় শিখার সঙ্গে নাচ-গান করে সিনেমায় বাণিজ্যিক অনুষঙ্গের যোগান দিয়েছে। যেকোন মাধ্যমের স্রষ্টাকে একটি কথা বেদবাক্যের মতো মনে রাখতে হয়—অর্থকরী কার্য কখনো শিল্প হতে পারে না। সিনেমার প্রথম অংশ অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বরের বিয়ে ভণ্ডুল হওয়া পর্যন্ত প্রায় পুরোটা যজ্ঞেশ্বরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এই পর্যন্ত রাম চরিত্রটি শুধুমাত্র অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। এই অংশে শুধুমাত্র উপন্যাসের বর্ণনানুযায়ী নারায়ণীর জ্বরে পড়া, ডাক্তার নীলমণি সরকারের সঙ্গে রামের বোঝাপড়া এবং বাধ্য হয়ে নারায়ণীকে দেখতে ডাক্তারের আসা ছাড়া বাকিটা চলচ্চিত্রকার বর্ধিত করেছেন। কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়ও একই গল্প অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণের সময় কাহিনিকে বর্ধিত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায় ...চিত্র পরিচালনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কেননা রামের

সুমতি'র কাহিনি একখানি পূর্ণাঙ্গ বাণীচিত্রের উপযোগী ছিল না অথচ পরিচালক একে পূর্ণাঙ্গ চিত্রেই পরিনত করেছিলেন। তার ফলে কোন কোন জায়গায় তিনি কাহিনিকে টেনে বাড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। কাহিনিকে বাড়াতে গিয়ে মূল কাহিনিকে কিংবা তার প্রতিপাদ্য বিষয়কে কোথাও বিকৃত করার চেষ্টা হয়নি। যে গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে শরৎচন্দ্র মূল কাহিনিটির সন্নিবেশ করেছিলেন সে পরিবেশ চিত্ররূপে যথাযথ ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল।'[২০]

শিখাকে বিয়ে করতে যজ্ঞেশ্বরের জেদ দেখে নরেশের মা সমূহ বিপদ আঁচ করতে পেরে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। নরেশের মার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই। এমনিতেই বিধবা হয়ে সে বাপের গলগ্রহ হয়ে পড়ে আছে। শিখাকে না পেলে নরেশ আত্মঘাতী হবে বলে মাকে হুমকি দেয়। এমন পরিস্থিতিতে রাম এগিয়ে আসে নরেশকে সাহায্যের জন্য। চলচ্চিত্রকার এখানে রামের পরোপকারী রূপটি চিত্রিত করতে চেয়েছেন। পরের দৃশ্যে যজ্ঞেশ্বরের দাবা খেলার রূপকে দেখানো হয় কিস্তি মাতের জন্য কিভাবে যতিনকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। এমন সময় রাম সেখানে উপস্থিত হয়। এতে যজ্ঞেশ্বর প্রথমে বিরক্ত হলেও রামের কৌশলী কথায় যজ্ঞেশ্বর খুশি হয়। রাম অভিমানের সুরে বলে, 'মনে বড় দুঃখ পেলাম, কোথায় দাদুর বিয়েতে একটু আনন্দ ফুর্তি করব বলে এসেছিলাম, আর তুমি কি না' (রা. সু. চ.)। এবার যজ্ঞেশ্বর খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'মানে, মানে, তুই আমার বিয়ের বিপক্ষে নস' (রা. সু. চ.)। তার বুক থেকে একটা পাষাণ নেমে যায়। রামের দলকে ভয় পেয়েছিল সে। রাম এবার বিয়েতে বাজি ফোটানোর আবদার করে। যজ্ঞেশ্বরের মনে কোন সংশয় থাকে না। রামের অভিসন্ধিও বুঝতে পারে না।

বিয়ের দিন রামের দল পুরোহিতকে ধরে নিয়ে আসে রামের সামনে। পুরোহিত প্রথমে তাকে ধরে আনার পরিণাম দেখিয়ে যজ্ঞেশ্বরের ভয় দেখায়। পরে রামের পরিচয় পেয়ে উল্টো সে-ই ভয় পেয়ে যায়। কারণ রামের দল সমন্ধে পূর্ব থেকেই তার জানা ছিল। রাম শর্ত দেয় দুটো বিয়েই তাঁকে পড়াতে হয়ে। দুই বিয়েতেই পাত্রী এবং তার পিতার নাম এক। একই পিতা দুই জায়গাতেই কন্যা সম্প্রদান করবে। পুরোহিত এর মাথামুন্ডো কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু রামের কথামত কাজ করতে সম্মত হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী নরেশের সঙ্গে শিখার বিয়ে হয়। এরপর রাম তার দলের সঙ্গে বাগানের মধ্যে সাক্ষাৎ করে বিয়ের রাতে। এই দৃশ্যে ব্যাঙের ডাকে রাতের আবহ নিয়ে আসার চেষ্টা করা হলেও স্পষ্ট বোঝা যায় দিনের আলোতে এর শুটিং করা হয়েছে। এমনকি কোনরূপ ফিল্টারও ব্যবহার করা হয়নি। দিনের মতো ফর্শা আকাশ, গাঁয়ের লাল শার্ট এবং এবং গাছে ফোটা লাল জবা ফুল তা-ই প্রমাণ করে। চাঁদের আলো হলে স্পষ্ট লাল বোঝা যেত না।

পরিকল্পনামতো পরবর্তী কাজের জন্য তারা উদ্যোগ নেয়। যজ্ঞেশ্বর বাসররাতে শুভদৃষ্টি বিনিময় করতে গিয়ে দেখে বৌয়ের জায়গায় শিখার পরিবর্তে বাসু বেনারশি শাড়ি পড়ে বসে আছে। এই দেখে যজ্ঞেশ্বর বাসুকে পিটাতে পিটাতে দৌড়াতে থাকে। বাসুও পরিকল্পনা অনুযায়ী জায়গামতো নিয়ে যায় যজ্ঞেশ্বরকে। রামের দল যজ্ঞেশ্বরকে ঘিরে ধরে। তারা যজ্ঞেশ্বরের গলায় রশি আটকিয়ে শর্ত দেয়, 'নরেশ শিখার বিয়ে মেনে নিতে হবে। বাসুকে ক্ষমা করে চাকরিতে বহাল রাখতে হবে। যতীনের জায়গা সম্পত্তি সব ফিরিয়ে দিতে হবে, জীবনে আর বিয়ের নাম নিতে পারবেনা' (রা. সু. চ.)। অবশেষে যজ্ঞেশ্বরও সব শর্ত মেনে নিয়ে এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরে ছাড়া পায়। বর্ধিত অংশে রামের এই ইঁচড়ে পাকামো ও নরেশ শিখার প্রেম বাঁচাতে তার যে উদ্যোগ ও কর্মযজ্ঞ—তা

রামের সুমতি গল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। 'চিত্রনাট্যেরও প্রধান কাহিনির সঙ্গে একাধিক উপকাহিনি থাকতে পারে। নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক যে ভাবে উপকাহিনিকে প্রধান কাহিনির সহায়করূপে গড়ে তোলেন, চিত্র নাট্যকারও সেইভাবে উপকাহিনিকে প্রধান কাহিনির সহায়করূপে গড়ে তুলবেন।'[২১] তা না হলে সিনেমা নির্মানের অভিষ্ট লক্ষ কখনোই পূরণ হবে না। শহিদুল আমিনের যে প্রয়াস প্রথমে লক্ষ করা গেছে পরবর্তীতে কোন বিচারে সেটি শিশু কিশোরদের জন্য আদর্শস্থানীয় কাহিনি হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখেনি। কেননা সিনেমার মাধ্যমে দর্শকদের অনুপ্রাণিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়-এর 'রামের সুমতি' সিনেমায়ও 'কাহিনিকে বাড়াতে গিয়ে কিছু কিছু স্থানে ছবিটির দ্রুতগতি ব্যাহত হয়েছিল। নারায়ণীর কিশোর বোন সুরোর কণ্ঠে যে ভাটিয়ালি গানখানি দেওয়া হয়েছিল, তা ছবিতে বেমানান ছিল।'[২২] তবে কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায় গল্পটির মূল সুরকে ডিঙ্গিয়ে যাননি।

যজ্ঞেশ্বর, নরেশ, শিখা আখ্যানটি চলচ্চিত্রকার কাহিনির বর্ধিতরূপ হিসেবে নির্মাণ করেছেন। অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এখানে যুক্ত হয়েছে। বিশেষ করে নরেশ শিখার প্রেম ও বিয়ের উপাখ্যানটি। বাংলা সিনেমার বাণিজ্যিক ধারার প্রভাবে গতানুগতিকভাবে নায়ক নায়িকা ও তাদের প্রেম কাহিনি দেখিয়ে গল্পকে বড় করায় মূল বিষয়টি ক্ষুণ্ন হয়েছে। সিনেমায় দৈর্ঘ্যের প্রয়োজনে মূল বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে এবং তাকে আবর্তন করে কাহিনি বর্ধিত হতে পারে। তাছাড়া কাছাকাছি ব্যাপ্তির গল্প অবলম্বনে নির্মিত 'অযান্ত্রিক'[২৩] সিনেমাটিও পূর্ণ দৈর্ঘ্যে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু সেখানে কোন প্রকার missing link দেখা যায়নি। পুরো সিনেমাতে বিমল ও তার পুরোনো গাড়িটাই মুখ্য বিষয় ছিল। কোন প্রকার রোমান্টিক নায়ক নায়িকা সেখানে আমদানি করতে হয়নি। তারপরও বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এটি একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। 'অযান্ত্রিক' সম্পর্কে ঋত্বিক ঘটক নিজে বলেছেন, 'কতখানি সার্থক হয়েছি সেটা আপনারা বলবেন—তবে আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। সুবোধ বাবুর মূল বক্তব্যের প্রতি আমি চেষ্টা করেছি বিশস্ত থাকতে।'[২৪]

কাহিনির বিশুদ্ধতা ছাড়াও সংলাপ, পোশাক-পরিচ্ছদ, পাত্র-পাত্রীর যথাযোগ্য আচার-আচরণের প্রতিও পরিচালকের সজাগ দৃষ্টি থাকা উচিত। এখানে সাহিত্যিকগণ এক ধরনের সুবিধা ভোগ করে থাকেন। কারণ তাদের ভাবনাগুলো সাহিত্যিক বর্ণনায় প্রকাশ করে দিলেই তাঁদের দায় শেষ। পাঠক এখানে নিজের কল্পনাশক্তি দিয়ে গল্প বা চরিত্রকে একেকজন একেকভাবে ব্যাখ্যা করার অবকাশ পান। কিন্তু চলচ্চিত্রে দৃশ্যজাত সীমাবদ্ধতা থাকায় চলচ্চিত্রকারকে অত্যন্ত সাবধানী হতে হয়। চলচ্চিত্রে মেকাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মেকাপের বদৌলতে চরিত্র বিশ্বাসযোগ্য রূপ লাভ করে। আমাদের দেশে মেকাপ শিল্প নিয়ে তেমনটা ভাবা হয় না। 'অন্যান্য অনেক কিছুর মতোই মেকাপের ব্যাপারটা জোড়াতালি দিয়ে চালানো হচ্ছে। এ দেশের মেকাপ মানে দর্শককে বোকা বানানোর একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা মাত্র।'[২৫] আমাদের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যেও ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। তাঁরা মনে করেন পর্দায় নিজের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলাই তাঁদের পক্ষে লাভজনক। যে কারনে চরিত্র যা-ই হোক না কেন তাঁদের পোশাক, সাজ-সজ্জা, স্টাইল হাল ফ্যাশনের হওয়া চাই। ফলে গল্পের সঙ্গে সিনেমার চরিত্রের বেমানান উপস্থিতির কারণে হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। সচেতন চলচ্চিত্রকার এ বিষয়ে কোন আপোষ করেন না। চলচ্চিত্র নির্মাণে অগ্রগামী দেশগুলোতে মেকাপকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও চরিত্র অনুযায়ী যে কোন মেকাপ নিতে অনীহা

থাকে না। এতে তাঁদের বাস্তবিক সৌন্দর্য কিংবা ইমেজ নষ্ট হতেও দেখা যায় না, ক্যারিয়ারেও ভাটা পড়ে না। রাশিয়ান এক ছবিতে অস্কার জয়ী অভিনেত্রী 'এলিজাবেথ টেলর লোলচর্ম কিম্ভুত-কিমাকার ডাইনী বুড়ির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ...এতে তাঁর গ্ল্যামারের ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে বলে শোনা যায়নি।'[২৬] অনেক সময় ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চলচ্চিত্রকার জেনেশুনে উদ্ভট মেকাপ দিয়ে থাকেন। ইদানিং বাংলা ও হিন্দি সিরিয়ালগুলোতে দেখা যায় সকালে ঘুম থাকে উঠার দৃশ্যে স্ত্রীর পড়নে একদম নতুন জরির শাড়ি ও ভারী গহনা, স্বামীর পড়নে ভাঁজ ছাড়া সিল্কের পাঞ্জাবী। এখানে দৃশ্যটি উদ্ভট দেখালেও এর পিছনে রয়েছে ব্যবসায়িক স্বার্থ। কৌশলে এখানে পোশাক ও গহনা বিক্রয়ের প্রচারণা চালানো হয়ে থাকে। শহিদুল আমিনের এ বিষয়ে অনেক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সিনেমায় ভোলা এবং নেত্যর পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ, বিশেষ করে নেত্যর রূপসজ্জায় তাদেরকে কাজের লোক মনে হয় না। 'অভিনেতাদের এবং বিশেষ করে অভিনেত্রীদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা চরিত্ররূপায়ণের কথা বা অন্যের চরিত্রে নিজ সত্তার নিমজ্জনের কথা ভাবেন না, ভাবেন কেবল নিজের ব্যক্তিগত আবেদন-সঞ্চারের কথা। ...যদি তাদের সুন্দর আকৃতি দর্শকদের হৃদয় জয় করতে সাহায্য করে, তবে তারা তাই প্রদর্শন করতে থাকে। যদি তাদের চক্ষু বা মুখ বা কণ্ঠস্বর বা ভাবভঙ্গি, দর্শকদের মুগ্ধ করে, তবে যা মুগ্ধ করে, সেই অঙ্গই তারা প্রকাশ করে বেশী করে।'[২৭] ভোলাকে হাবাগোবা হিসেবে দেখালেও নেত্যর আচরণ প্রথমদিকে দাসীর মতো ছিল না। ঘরের একজন ভাগীদারের মতো রামকে সে সুনজরে দেখত না বলে মনে হয়েছে। কিন্তু নারায়ণীর মা দিগম্বরী আসার পর থেকে রামের জন্য তার মনে এক ধরনের মমতা ও শঙ্কা কাজ করতে দেখা গেছে। কারণ দিগম্বরী প্রথম থেকেই রামকে সহ্য করছিল না।

বাইরের সকল দুষ্টকর্ম সম্পাদনের পর রামলাল ঘরে ঢুকে দেখতে পায় তার বিছানায় অপরিচিত এক মেয়ে ঘুমিয়ে আছে ; তা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে বৌদির কাছে সে সম্বন্ধে জানতে চায় এবং পুনরায় বাইরে যাওয়ার সময় বলে যায়—ফিরে এসে কাউকে তার বিছানায় যেন দেখতে না হয়। নারায়ণীর মা দিগম্বরী দশ বছরের কন্যা সুরধুনীকে নিয়ে কেবল এ বাড়িতে উঠেছে। রামের বিছানায় সুরধুনীকে দিগম্বরীই শুইয়ে রেখেছিল। তাই রামের কথা শুনে দিগম্বরী জ্বলে ওঠে। নারায়ণীকে সাবধান করে দিয়ে বলে, রামকে নিয়ে তোকে ভুগতে হবে, ঠিক আছে আমি যখন এসে পড়েছি তোর আর কোন ভয় নেই। ওকে শাসন করার ভার আমি নিচ্ছি। নারায়ণী মায়ের কথায় বিচলিত হয়ে বলে তোমাকে শাসন করতে হবে না। এখান থেকেই রামের প্রতি দিগম্বরীর বিদ্বেষ শুরু হয়ে যায়। 'দিগম্বরী দশ বছরের কন্যা সুরধুনীকে লইয়া এতদিন কোনমতে তাঁহার ভাইয়ের বাড়িতে দিন কাটাইতেছিলেন। হঠাৎ সেই ভাইটির মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। নারায়ণী স্বামীকে সম্মত করাইয়া তাঁহাদিগকে আনাইতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা আসিলেন এবং আসিয়াই দিগম্বরী মেয়েকে ত ডিঙাইয়া গেলেনই, সেই সুবাদে রামকেও ডিঙাইবার জন্য পা বাড়াইতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই তিনি রামকে বিদ্বেষের চোখে দেখিতে লাগিলেন' (রা. সু. গ./ পৃ. ৫৫০)। দিগম্বরীর এহেন আচরণ দেখে নেত্যকালীর উপলব্ধি হয়—এই সুখের সংসারে এবার আগুন লাগল।

যজ্ঞেশ্বর পর্ব শেষ হওয়ার পর চিত্রনাট্য আবার মূল কাহিনি অনুসরণ করে এগুতে থাকে। গল্পে শরৎচন্দ্র এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যা প্রায় চিত্রনাট্যের শামিল। চলচ্চিত্রকারও সে সুযোগটা হুবহু ব্যবহার করতে চেয়েছেন। বাড়ির উঠোনের মাঝখানে রাম অশ্বত্থের চারা লাগিয়ে ভাইপোকে

ঘটি করে জল আর ভোলাকে মোটা দেখে একটা বাঁশ কেটে আনতে বলে। গোবিন্দ ঘটিতে করে জল নিয়ে আসে। ভোলা বাঁশ এনে বেড়া দেয়। সুরধুনী ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে এসে মাকে ডেকে এনে গাছ লাগানোর দৃশ্য দেখায়। দিগম্বরী ওদিকে তাকাতেই রাম বলে, 'অশ্বত্থ-গাছটা বড় হলে বেশ ছায়া হবে গো! মাস্টারমশাই বলেছে, অশথের ছায়া খুব ভাল' (রা. সু. চ.)। গল্পের বর্ণনায়—'আজ সকালবেলা রাম দুই-তিন হাত একটা অশ্বত্থ-চারা আনিয়া উঠানের মাঝখানে পুঁতিতে আরম্ভ করিয়া দিল। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া দিগম্বরী মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, ওটা কি হচ্চে রাম? রাম তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, অশ্বত্থ-গাছটা বড় হলে বেশ ছায়া হবে গো! মাস্টারমশাই বলেছে, অশথের ছায়া খুব ভাল' (রা. সু. গ./ পৃ. ৫৫০)।' এতে দিগম্বরী জ্বলে ওঠে, 'উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ-গাছ! এমন ছিষ্টিছাড়া কান্ড কখনও বাপের বয়সে দেখিনি বাবা!' (রা. সু. চ.)। গোবিন্দ ছোট ঘটিতে আবার জল নিয়ে আসলে রাম বলে, 'এটুকু জলে কি হবে রে পাগলা! তুই বরং দাঁড়া এইখানে, আমি জল আনি গে' (রা. সু. চ.)। রাম বালতিতে করে জল নিয়ে আসে। এখানে ঘড়ার পরিবর্তে বালতি ব্যবহার করা হয়েছে। গল্পের বর্ণনায় 'তাহার পর ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া সমস্ত উঠানটা কাদা করিয়া, রাম যখন গাছ-পোঁতা শেষ করিয়াছে, তখন নারায়ণী নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন' (রা. সু. গ./ পৃ. ৫৫০)। এই বর্ণনা অনুযায়ী চলচ্চিত্রে দৃশ্যায়ন হয়নি। নারায়নীকে গোসল করে আসার পরিবর্তে কলসী কাঁখে পানি নিয়ে আসতে দেখা গেছে। দৃশ্যটিতে কিছুটা বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। কেননা যে বাড়িতে দুটো চাকর রয়েছে সে বাড়ির কর্ত্রীর কলসি কাঁখে জল আনার কথা নয়। সিনেমা নির্মাণের সময় গল্পে উল্লেখিত বিভিন্ন উপকরণ অনেক সময় পরিবর্তিত হতে পারে, তবে তা অবশ্যই ঘটনা ও ঘটনার সময়ের সঙ্গে মিল রেখে। এখানে ঘড়ার পরিবর্তে টিনের বালতি ব্যবহার করে চলচ্চিত্রকার কাহিনির সময় সম্পর্কে অসচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ মূল কাহিনিতে যে সময়টি ফুটে ওঠেছে এবং চলচ্চিত্রকারও যে সময়টিকে ফিল্মে ধারণ করতে চেয়েছেন, ঐ সময়ে ঐ সমাজে বালতি ব্যবহারের প্রচলন প্রায় অস্বাভাবিক। তাছাড়া বাড়ির উঠোনে অশ্বত্থের চারা রোপনের মতো দুরন্তপনামিশ্রিত যে বোকামী থাকা দরকার মূল গল্পের রামকে সেরকম দেখা গেলেও চলচ্চিত্রে নিজ বুদ্ধিতে যজ্ঞেশ্বরের মতো দুষ্টলোকের বিয়ে ভেঙে দেওয়ার মতো কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করে এবং তাকে শাস্তি দিয়ে যে পরিপক্বতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে তারপর তার হাতে বাড়ির উঠোনে চারা লাগানোর মতো দৃশ্য সংযোজন হাস্যকর। একারনেই সাহিত্য থেকে সিনেমা নির্মাণের সময় কাহিনি বর্ধিত করলে মূলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে কিনা তা যেমন বিচার করতে হয় তেমনি মূল কাহিনির সব দৃশ্য চলচ্চিত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সেদিকেও খেয়াল রাখতে হয়। 'শিশু-সাহিত্যের সুবর্ণযুগ যাদের পরিচিত তারা শিশু চলচ্চিত্রের পর্দায়ও দেখতে চায় একটি অবাক হওয়া মুগ্ধতার আকাশ যেখানে মূক পশু, নীলিমা, তরুলতা ও তরুণ মানব-সন্তান নিজেকে বিরহহীনভাবে খুঁজে পায় : পণ্ডিতেরা যাকে বলবেন Organic linkage, যা শৈশবের গঙ্গোত্রীকে পৌঁছে দেয় পরিচ্ছন্ন পরিণতির মোহনায়।'[২৮]

সিনেমায় কাহিনির দ্বিতীয় ভাগ থেকে প্রায় পুরোটাই মূল গল্পের হুবুহু চিত্রায়ণ করা হয়েছে। যেমনঃ 'দিগম্বরী মেয়েকে দেখিতে পাইয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দেখ্ নারাণি, চেয়ে দেখ্! তোর দেওরের কাণ্ডটা একবার দেখ্। উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ-গাছ পুঁতে বলে কিনা ছায়া হবে। আবাব ওদিকে চেয়ে দেখ্ হারামজাদা ভোলার কাণ্ড। একটা আস্ত বাঁশঝাড় কেটে নিয়ে ঢুকছে—বেড়া

দেওয়া হবে।' এই অংশটুকু সংলাপসহ হুবহু চিত্রায়ন করা হয়েছে। আবার কখনো কখনো গল্পের বিশাল বর্ণনাকে সংকোচিত করে দুই-একটি দৃশ্যে দেখানো সম্ভব হয়েছে। গল্পের বর্ণনা অনুযায়ী— 'নারায়ণী চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই একরাশ বাঁশ ও কঞ্চি টানিয়া আনিয়া ভোলা উঠানে ঢুকিতেছে। ভোলা রামের প্রায় সমবয়সী। নারায়ণী হাসিতে লাগিলেন। ওদিকে মায়ের ক্রুদ্ধ ব্যস্ত ভাব, এদিকে রামের এই পাগলামি, সমস্ত জিনিসটাই তাঁহার কাছে পরম হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া ঠেকিল। হাসিয়া বলিলেন, উঠানের মাঝধানে অশ্বত্থ-গাছ কি হবে রে?' চলচ্চিত্রে শুধুমাত্র নারায়নীর মুখের এক চিলতে হাসি ও শেষ বাক্যটি 'উঠানের মাঝধানে অশ্বত্থ-গাছ কি হবে রে?' সংলাপটি দিয়ে পুরো ঘটনাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। গল্পের বর্ণনা এখানে অল্প কথায় বোঝানো সম্ভব হয়েছে চরিত্রের অভিব্যক্তি ও চলচ্চিত্রে দৃশ্যগত সুবিধার কারণে। চলচ্চিত্রের রয়েছে স্থান-কাল-ঘটনাকে অতিক্রম করে যাওয়ার এক বিশেষ ক্ষমতা। 'In real life every experience or chain of experiences is enacted for every observer in an uninterrupted spatial and temporal sequence. …There are no jerks in time or space in real life. Time and space are continuous. Not so in film. The period of time that is being photographed may be interrupted at any point. One scene may be immediately followed by another that takes place at a totally different time.' [২৯]

দুপুরবেলা নারায়ণী নিজের ঘরে বসে বালিশের অড় সেলাই করছিল, এমন সময় নেত্য এসে খবর দিল, দিগম্বরী রামের গাছ উপরে ফেলে দিয়েছে। নারায়ণী বাইরে এসে আঁতকে উঠে, দেখে সত্যিই গাছ নেই। দিগম্বরি বারান্দায় বসেছিল। তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে সে উপড়ে ভেঙে চুড়ে ফেলে দিয়েছে। এ সময় রাম দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করে, 'বৌদি আমার গাছ? ...কৈ আমার গাছ? —এই অংশটুকুও প্রায় হুবহু চলচ্চিত্রায়ন করা হয়েছে। কিছু জায়গায় সংলাপে সামান্য রদবদল হয়েছে। সিনেমায় দেখা যায়, ভোলা বাড়িতে এসে দেখে গাছ নেই। সে দৌড়ে যায় রামকে জানাতে এবং রামও তার মারফত খবর পেয়েই দৌড়ে আসে। গল্পে বর্ণিত আছে— 'নেত্য ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, মা, সর্বনাশ হয়েচে! দিদিমা ছোটবাবুর গাছ ফেলে দিয়েছে। সে ইস্কুল থেকে এসে কাউকে বাঁচতে দেবে না! ...ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাম সর্বাগ্রে তাহার গাছটি দেখিতে গিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বই-খাতা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, বৌদি, আমার গাছ?' স্কুলের ব্যাপারটিকে সিনেমার এই দৃশ্যে একেবারে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। একারনে নেত্যর মুখেও স্কুল প্রসঙ্গ আসেনি। রামকেও স্কুল থেকে এসে বই-খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেখা যায়নি। এই দৃশ্যে ভোলার ভূমিকাও গল্প বহির্ভূত। তাকে এখানে আমদানি করা হয়েছে রামের কানে খবরটা পৌঁছানোর জন্য।

গল্পের কিছু কিছু অংশ এমনভাবে চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে যেন, গল্প থেকে চলচ্চিত্রে রূপান্তর না হয়ে হুবহু অনুদিত হয়েছে। এরকম ক্ষেত্রে চলচ্চিরত্রকারের কোন কৃতিত্ব থাকে না। কোন কারণে চলচ্চিত্রটি আংশিক বা পুরোপুরি কৃতিত্ব অর্জন করলেও এর জন্য ধন্যবাদ পায় অন্যান্য কুশীলবরা। গল্পে বর্ণিত নিচের অনুচ্ছেদটি সিনেমার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এর সত্যতা পাওয়া যাবে—

> দিন-চারেক পরে একদিন ভাত খাইতে বসিয়া 'উঃ আঃ' করিয়া বার-দুই জল খাইয়া রাম ভাতের থালাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া নাচিতে লাগিল—ঐ ডাইনী-বুড়ীর রান্না আমি খাব না, কখ্খন খাব না, ঝালে মুখ জ্বলে গেল, বৌদি—ও—বৌদি—। চীৎকার-শব্দে নারায়ণী

আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন। কি হ'ল রে? রাম রাগে কাঁদিয়া ফেলিল—আমি কখ্খন খাব না, কখ্খন খাব না—ওকে দূর করে দাও। বলিতে বলিতে ঝড়ের বেগে সে বাহির হইয়া গেল। নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিলেন, মা, বার বার বলি, তরকারিতে এত ঝাল দিও না, অত ঝাল খাওয়া এ বাড়ির কারো অভ্যাস নেই। দিগম্বরী অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন, ঝাল আবার কোথায়? দুটি লঙ্কা শুধু গুলে দিয়েচি, এতেই এত কাণ্ড! নারায়ণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, নাই দিলে মা দুটো লঙ্কা। কেউ যখন খায় না, তখন—। চুপ কর্ নারাণি, চুপ কর্। রান্না শিখোতে আসিস নে আমাকে, চুল পাকালুম এই করে, এখন পেটের মেয়ের কাছে রান্না শিখতে হবে। ধিক্ আমাকে! নারায়ণী আর কোন কথা না বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া নূতন করিয়া রাঁধিবার যোগাড় করিতে লাগিলেন। দিগম্বরী দুয়ারে পা ছড়াইয়া বসিয়া কপালে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, ভাই রে! কোথায় আছিস, একবার ডেকে নে! আর সহ্য হয় না। যা মুখে আসে, আমাকে তাই বলে গাল দেয় রে! আমি বুড়ী! আমি ডাইনী! আমাকে দূর করে দিতে বলে। আমি এমন মেয়ে-জামায়ের ভাত খেতে এসেচি—আমার গলায় দেবার দড়ি জোটে না! এর চেয়ে পথে ভিক্ষে করা শতগুণে ভাল। সুরো, আয় মা, আমরা যাই, এ বাড়িতে আর জলস্পর্শ করব না। সুরধুনী কাঁদ-কাঁদ হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দিগম্বরী তাহার হাত ধরিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। নারায়ণী বঁটি কাত করিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। দিগম্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, না, আটকাস্ নে আমাদের নারাণি, যেতে দে। আমরা অনাহারে গাছতলায় মরব সেও ভাল, কিন্তু তোদের ভাত খাব না, তোদের ঘরে শোব না। নারায়ণী হাতজোড় করিয়া কহিলেন, কার ওপর রাগ করে যাচ্চ মা? আমরা কি কোন অপরাধ করেছি? দিগম্বরীর ক্রন্দন অধিকতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, নাকিসুরে বলিলেন, আমি কচি খুকি নই, নারাণি, সব বুঝি। তোর ইশারা না থাকলে কি ওর কখন অত সাহস হয়? আমি ডাইনী! অ্যাঁ, আমাকে দূর করে দাও! আচ্ছা, তাই যাচ্ছি। আমরা তোদের আপদ-বালাই—গলগ্রহ! পথ ছাড় বলচি। নারায়ণী মায়ের দুই পায়ে হাত দিয়া বলিলেন, মা, আজকের মত মাপ কর। আচ্ছা, উনি আসুন, তার পরে যা ইচ্ছে হয় ক'রো। (রা. সু. গ./ পৃ. ৫৫২)

সিনেমায় পরের অংশটিতে দৃশ্যবর্ণনায় চলচ্চিত্রকার গল্পের কাহিনি বর্ণনাকে কিছুটা ভেঙে গড়েছেন। গল্পে যে পাখা দিয়ে নারায়ণী তার মাকে শান্ত করার জন্য বাতাস করেছে, সে পাখা দিয়ে চলচ্চিত্রে স্বামীকে বাতাস করতে দেখা যায়। গ্রাম-বাংলার স্বামীরা আহারে বসলে তাদের স্ত্রীরা পাখা দিয়ে বাতাস করবে এ-ই ছিল ওই সময়ের সামাজিক রীতি। চলচ্চিত্রকার এ বিষয়ে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে সিনেমায় দিগম্বরীকে কপাটের অন্তরালে ফুঁপাইয়া কাঁদতে দেখানো হয়নি এবং একারণে শ্যামলালকেও হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে থাকতে দেখা যায়নি। বরং দিগম্বরীকে এখানে খোলাখোলি উপস্থাপন করা হয়েছে। গল্পে দিগম্বরীর আড়ালে কান্না করা ও শ্যামলাল এর কারণ বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে থাকার মধ্যে যে শিল্পগুন ছিল পরিচালক তা ফুঁটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। আবার আড়াল থেকে বের হয়ে শ্যামলালের কাছে ইনিয়ে-বিনিয়ে নালিশ করার পর নিজ থেকে বিষয়টা উপলব্দি করার মাঝে যে নাটকীয় ব্যাপার ছিল তাও যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারেননি। এই উপলব্ধিজাত রাগের মধ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় মনোবৃত্তির এক প্রকার সূক্ষ বিষয় ফুটে ওঠে। শাশুড়ির সব কথা সে বিশ্বাস করবে, না রামকে শায়েস্তা করবে তা পাঠকের মনে এই প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে দেয়। সিনেমায় একপেশে প্রতিক্রিয়ায় শ্যামলালকে উত্তেজিত করা হয়েছে। উত্তেজিত হয়ে

শ্যামলাল ঘরে বাইরে রামকে খুঁজতে গিয়ে যে চপলতা দেখিয়েছে তা চরিত্রের গাম্ভীর্যতা নষ্ট করে দিয়েছে।

নেত্য বাইরে উঠোন ঝাড় দিচ্ছিল। সে সহ্য করতে না পেরে ঘরে এসে দিগম্বরিকে মুখের উপর বলে দিল 'দিদিমা, জেনেশুনে ইচ্ছে করে বাবাকে খেতে দিলে না! চোখের জল ত তোমার শুকিয়ে যাচ্ছিল না দিদিমা, না হয় দু'মিনিট পরেই বার করতে! (রা. সু. গ./ পৃ. ৫৫৩)'। একথা শুনে জ্বলে ওঠে সে, রামকে শায়েস্তা করার পর নেত্যকে ঝেটিয়ে বিদায় করার হুমকি দেয়। কিন্তু গল্পে নেত্যর কথার পর তাকে নিরুত্তর থাকতে দেখা যায়। 'দিগম্বরী মুখ কালি করিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন, (রা. সু. গ./ পৃ. ৫৫৩)। কখনো কখনো নিরবতাও অনেক কথা বলে। সিনামা ভাষায় তা সংলাপ ছাড়াই প্রকাশ করা সম্ভব। বেশি সংলাপ ব্যবহার করলে সিনেমা তার স্বকীয়তা হারিয়ে মঞ্চ নাটকের মতো হয়ে যায়। যেখানে সংলাপই প্রধান ভাষা। বইয়ের হুবহু চিত্রায়ণ সিনেমার জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি প্রয়োজনে বইয়ের গল্প থেকে বেড়িয়ে গিয়ে দৃশ্যনির্মাণ করতে হলে গল্পের মেজাজ বুঝে চিত্রায়ণ করতে হয়। সত্যজিৎ রায় তাঁর 'পথের পাঁচালী' নির্মানের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, 'এই যে কাহিনির যেটা বীজ, তার বিষয়ে কোনও প্রত্যক্ষ ধারণা আমার ছিল না। ফলে মূল বইয়ে যে বর্ণনা পাচ্ছি, তারই উপরে নির্ভর করতে হয় আমাকে। ...তবে শুধু তার উপরে নির্ভর করলে যে চলবে না, তাও আমি জানতাম। ...গ্রামীণ পরিবেশের যে রহস্য, সেটা বুঝে নিতে চাইতাম। সেই পরিবেশ দৃশ্যময়, কিন্তু নিঃশব্দ। প্রত্যূষ আর প্রদোষকালের মধ্যে যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, সেটা বোঝা চাই।'[৩০]

সিনেমায় দেখা যায় বাইরে থেকে ঘুরেফিরে রাম বাড়িতে এসে বৌদির কাছে খেতে চায়। বৌদি তার ঘরে খাটের উপর একা শুয়েছিল। আজ উল্টোদিকে ফিরে রামের কথার উত্তর দিচ্ছে। নিজে খাবার দিতে পারবেনা জানিয়ে নেত্যর কাছে খাবার চাইতে বলে। রাম কিছু একটা হয়েছে আঁচ করতে পেরে চলে যায়। গল্পের বর্ণনায়— 'দুপুরবেলা রাম কোথা হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া, এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া তাহার বৌদির ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি গোবিন্দকে লইয়া শুইয়া আছেন। ব্যাপারটা তাহার বড় ভাল বোধ হইল না। তথাপি আস্তে আস্তে বলিল, ক্ষিদে পায় যে! বৌদি কথা কহিলেন না। সে আর একটু জোর করিয়া বলিল, কি খাব? নারায়ণী শুইয়া থাকিয়াই বলিলেন, আমি জানিনে, যা এখান থেকে। না, যাব না—আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি! নারায়ণী মুখ ফিরাইয়া রুষ্টভাবে বলিলেন, আমাকে জ্বালাতন করিস নে রাম, নেত্য আছে, তাকে বল্‌গে' (রা. সু. গ./ পৃ. ৫৫৩)। এখানে গল্পের বর্ণনার সঙ্গে প্রায় মিল রয়েছে শুধু ঘটনাস্থলে গোবিন্দ ছিল না। কিন্তু এই মিলই সাহিত্য ও চলচ্চিত্র আলোচনার শেষ কথা নয়। চলচ্চিত্র সমালোচক বলেছেন, "'সাবজেক্টিভ এক্সপ্রেশন'ই চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড় সমস্যা। একজন লোক তাকিয়ে আছে। কী ঘটছে তার মনের মধ্যে, মুখের অন্তরালে? সাহিত্যে লেখক নিজেই তা বলে দিতে পারেন, নাটকে স্বগতোক্তি ছাড়াও চরিত্রের আত্মকথনের অজস্র অবকাশ, চিত্রকলায় অবয়বের বিকৃতি দ্বারা অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ হতে পারে। ...চলচ্চিত্রে ছবির কোন সাংকেতিক ভাষা নেই যাতে আইডিয়ার প্রকাশ হয়। কেবল বাস্তবের বিস্তৃত দৃশ্য বর্ণনা দিয়েই বাস্তবকে বোঝান যায়।'[৩১] কিন্তু সমালোচকের এই কথা চলচ্চিত্রের জন্য সব সময় সত্য নাও হতে পারে। কেননা সাহিত্যের পাঠকের মতো ভাবনার অবারিত স্বাধীনতা না থাকলেও চলচ্চিত্রে দর্শকের রয়েছে চরিত্রের ভিতরে অবাধ প্রবেশের সুযোগ। চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে

বিলীন করে নিজেই চরিত্র হয়ে ওঠার স্বাধীনতা। চলচ্চিত্র এখন শুধু আর দেখার বিষয় নয়, ভাবারও বিষয়। চলচ্চিত্রকার যেভাবে দেখাতে চান দর্শক তার থেকে ভিন্নভাবে ভাবার অবকাশও পেয়ে থাকেন—যদি চলচ্চিত্রকার দৃশ্য বা চরিত্রের মাধ্যমে বহুমাত্রিক উপস্থাপনার মুন্সিয়ানা দেখাতে পারেন। এখানেই চলচ্চিত্রকারের স্বার্থকতা। তাইতো আমরা দেখতে পাই কোন চরিত্রের নিদারুণ দুঃখে নিজের অজান্তেই চোখে জল গড়িয়ে পড়তে কিংবা চরিত্রের সাফল্যকে নিজের সাফল্য মনে করে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠতে। আলোচ্য দৃশ্যে শহিদুল আমিন নারায়ণী চরিত্রের মাধ্যমে সেই ভাবনার বিষয়কে উন্মুক্ত করে দিয়ে দর্শককে নারায়ণীর অব্যক্ত দুঃখ-যন্ত্রণার সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে সফলতা দেখিয়েছেন।

নেত্য রামকে দুধ মুড়ি খেতে দিলে না খেয়ে কোঁচড়ে করে নিয়ে পুকুর ঘাটে গিয়ে বসে। কিন্তু বৌদি না খেয়ে আছে জেনে সে নিজেও মুড়ি মুখে তোলেনি। পুকুরের পানিতে ছুড়ে ফেলে দেয়। জুম শটে দেখা যায় পানিতে মুড়িগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ভেসে যাছে। এর দ্বারা রামের মনের ভিতরের বিক্ষিপ্ত রূপটিও দর্শকদের সামনে ভেসে উঠে। রাতে শ্যামলাল বাড়ি ফিরে রামকে আলাদা করে দেওয়ার কথা বলে। এতে নারায়ণী বাঁধা দিয়ে এমনটি হলে মরে যাওয়ার দিব্যি দেয়। দুপুরে রামের সঙ্গে রাগ-অভিমানে খারাপ ব্যবহার করলেও এখন তার জন্য মাতৃত্বের স্থানটি জেগে ওঠে। গল্পের সঙ্গে মিল রেখে শহিদুল আমিন এই দৃশ্যটিতে আবেগ সঞ্চার করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কবি তার ভাবকে কবিতায় বিলীন করে দিয়ে নিজে নির্ভার হতে পারেন—ঔপন্যাসিক বা গল্পকারকে কাহিনির মধ্যে নিজেকে একাত্ম করে দিতে হয়। 'কবিরা অন্তরের বোঝা নামিয়ে হালকা হতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের এক-একটি গানে কী অনাবিল মুক্তি, হৃদয়ের গ্লানি-ধৌতি, যন্ত্রণা-উত্তরণের আরাম নিহিত, ঔপন্যাসিকের তো ঠিক সেইভাবে আত্ম-কথনের সুযোগ হয় না। তাঁরা ঢুকে পড়েন নিজের ভিতরে নিজে। আরও—আরও ভিতরে। আরও গভীরে। নিজেকেই কুরে কুরে খান। শেষ পর্যন্ত প্রসূত হয় একটি উপন্যাস।'[৩২] চলচ্চিত্রের বেলায়ও এ কথাটি খাটে।

পরের দৃশ্যদুটি মূলগল্প বহির্ভূত। গল্পে ছিল— 'গ্রামের স্কুলে জমিদারদের একটি ছেলে পড়িত। আজ টিফিনের সময় তাহার সহিত রামের তর্ক বাধিল। বিষয়টা জটিল, তাই মীমাংসা না হইয়া মারামারি হইয়া গেল। জমিদারদের ছেলে বলিয়াছিল, শাস্ত্রে লেখা আছে, শ্মশানকালী রক্ষাকালীর চেয়ে অধিক জাগ্রত। কেননা, শ্মশানকালীর জিভ বড়! রাম প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, শ্মশানকালীর জিভ একটু চওড়া বটে, কিন্তু অত বড়ও নয়, অমন রাঙাও নয়। কিছুদিন পূর্বে পাড়ায় চাঁদা করিয়া রক্ষাকালীর পূজা হইয়া গিয়াছিল, সে স্মৃতি রামের মনে উজ্জ্বল ছিল। জমিদারদের ছেলে রামের কথা অস্বীকার করিয়া নিজের করতল তুলিয়া ধরিয়া, বলিল, রক্ষাকালীর জিভ ত এতটুকু! রাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, কি, অতটুকু? কখ্খনো না। এই এত বড়। অতটুকু জিভ হলে কি কখনও পৃথিবী রক্ষা করতে পারে? পৃথিবী রক্ষে করে বলেই ত রক্ষাকালী নাম। তার পর আর দুই-একটা কথা, এবং তার পরই ঘুষাঘুষি। জমিদারদের ছেলের গায়ে জোর ছিল কম, সুতরাং মার সে-ই বেশী খাইল। নাক দিয়াও ফোঁটা-দুই রক্ত বাহির হইল, (রা. সু. গ./ পৃ. ৫৫৬)। এই অংশটি নির্মিত হওয়া এই সিনেমার জন্য লাভজনকই হতো, কেননা শিশুতোষ চলচ্চিত্রে স্কুলের দৃশ্য থাকবে এটিই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এর পরিবর্তে যাত্রাপালার মতো বিষয় সামনে এনে এবং তা নিয়ে জমিদার পুত্রের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পড়া চলচ্চিত্রের মূল সুরকে বিঘ্নিত করেছে। ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্র নিজেই অনেক দুরন্তপনা

করতেন। "তিনি সুবোধ বা শান্ত বালক ছিলেন না। লেখাপড়ায় তাঁর মন বসত না। যখন পাঠশালায় যাবার কথা, শরৎচন্দ্র তখন পাড়ার আরো কতগুলি তাঁরই মতন 'শিষ্ট' ছেলের সঙ্গে দুপুরের রোদে হাটে-বাটে-মাঠে টো-টো করে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো ঘাটে বাঁধা নৌকো নিয়ে নদীর জলে ভেসে যেতেন, কখনো খালে-বিলে ছিপ ফেলে মাছ ধরতেন। কখনো যাত্রার দলে গিয়ে গলা সাধতেন।"[৩৩] কিন্তু শহিদুল আমিন শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলাকে সঙ্গায়িত করতে গিয়ে করতে গিয়ে মূল কাহিনিকে বর্ধিত করেছেন বলে মনে হয় না। কিছু কিছু দিক কাকতালীয়ভাবে মিলে গেলেও নরেশ-শিখার প্রেম সংক্রান্ত জটিলতায় রামের ভূমিকার মতো শরৎচন্দ্রের বাল্যকালের এরকম কোন কর্মের প্রমান পাওয়া যায় না।

স্কুলফাঁকি দিয়ে রামলাল গাছে ওঠে পেয়ারা খাচ্ছিল। দিগম্বরীর ক্রমাগত জ্বালাতনে সে মনে মনে ক্ষিপ্ত হতে থাকে। এরমধ্যে নারায়ণী এলে তার কাছে ইনিয়ে-বিনিয়ে নালিশ করায় রাগ নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে রামলাল গাছ থেকে কাঁচা পেয়ারা ছিড়ে ঢিল ছুড়ে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ঢিল দিগম্বরীর মাথায় না লেগে নারায়ণীর মাথায় লাগে। নারায়ণীর মাথা ফেটে গেলে ভয়ে রাম দৌড়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনার পর রামকে তার দাদা আলাদা করে দেয়। বউকেও দিব্যি দেয় রামের সঙ্গে কথা না বলতে। রাম এসবের ধার ধারে না। উঠোনের মাঝখানে ভাগ করে দেওয়া সীমানা অতিক্রম করে বৌদির কাছে ছুটে যায়। কিন্তু বৌদি দিব্যির কারণে তার সঙ্গে কথা না বলে সুরধুনীকে বলে— 'যেতে বল ওকে'। উত্তরে রামলাল বলে— 'যেতে বল ওকে, আমার খিদে পায়না বুঝি। সে কখন খেয়েছি' (রা. সু. চ.)। দৃশ্যের এই সংলাপটিতেও রামের অভিব্যক্তিতে দর্শকদের মনে যে অভিঘাত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। গল্প পড়ে সে উপলব্দি হয় না। চলচ্চিত্রের দৃশ্যজনিত সুবিধার পুরোটাই চলচ্চিত্রকার এখানে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছেন। ফলে দর্শকদের মনে এক ধরনের করুণ রসের উদ্রেগ ঘটেছে। যা পরবর্তী দৃশ্যগুলোর মাধ্যমে প্রবলতর হয়েছে। Nobody needs to be convinced that film has been one of the most influential media for over one hundred years. Not only can you recall your most exciting or tearful moments at the movies, you can also probably remember moments in ordinary life when you tried to be graceful, as selfless, as though, or as compassionate as those larger-than-life figures on the screen.[৩৪] ভোলাকে নিয়ে রামের রান্না করা, দাদাকে শুনিয়ে দিব্যি না মানার কথা বলা, নেত্যকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া এবং বৌদির মাথা ফাটানোর জন্য আনমনে একবার নিজেকে দায়ী করা আবার আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করা—এসব কারণে দর্শক রামের দুঃখে আপ্লুত হয়ে সিনেমার সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রয়াস পান। অবশ্য মূল গল্পেও এ অংশে এসে পাঠককে আন্দোলিত করে, তাঁদের মনে দুঃখানুভূতির জন্ম দেয়—

> পরদিন সকাল হইতে রামের কথাবার্তা বদলাইয়া গেল। সম্পূর্ণ দুইটা দিন কাটিয়া গিয়াছে, বৌদি ডাকে নাই, বকে নাই, খাইতে দেয় নাই, এ-রকম সে তাহার জ্ঞানে দেখে নাই। আজ সে বাস্তবিক ভয় পাইয়াছিল। প্রথমটা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া সে নানারূপ উল্টা-পাল্টা জবাবদিহি করিল। একবার বলিল, বেড়াল মারিতে পিয়ারা ছুড়িয়াছিল; একবার বলিল, হাত ফসকাইয়া পড়িয়া গিয়া বৌদির কপালে লাগিয়াছিল; একবার বলিল, কাঁচা পিয়ারা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিল। তারপর একবার বলিল, কাহাকেও সে গাল দেয় নাই; একবার বলিল, গোবিন্দকে দিয়াছিল; একবার বলিল, ভোলাকে দিয়াছিল। কিন্তু কোন কৈফিয়তেই কাজ হইল না। ও-ধারের কেহ জবাব দিল না,

প্রতিবাদ করিল না, হাঁ, না একটা কথাও বলিল না। একবার বহু কষ্টে লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া 'আর কোনদিন করব না' বলিয়া ফেলিয়াও যখন ফল হইল না, তখন সে চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ...বৌদির না জানি কত লাগিয়াছে! একটা কাঁচা পিয়ারা লইয়া বার বার কপালের উপর ঠুকিয়া সে আঘাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া, শেষে ভাবিতে বসিয়াছিল, কি করিলে এই কুকর্মটা মুছিয়া ফেলিতে পারা যায়। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল, কিছুদিন পূর্বে বৌদি তাহাকে এখানে থাকিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শেষে স্থির করিল, সে আর কোথাও চলিয়া গেলে বৌদি খুশী হইবে। তাহার মামার বাড়ি তারকেশ্বরের ওদিকে, অথচ কোথায়, সে ঠিক জানে না। সেইখানে গিয়া খুঁজিয়া লইবে সঙ্কল্প করিয়া সে একটি ছোট পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া প্রভাতের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল, (রা. সু. গ./ পৃ. ৫৬০)।

ডা. দীনেশচন্দ্র সেন শরৎচন্দ্রের এই করুণ রসসৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে উদাহরণ স্বরূপ 'রামের সুমতি' গল্পের আলোচনা করে বলেছেন— "...বৌদিকে সে পেয়ারা ছুঁড়িয়া ব্যথা দিয়াছিল, এ কষ্ট তাহার রাখিবার জায়গা ছিল না। সে নিজের কপালে পেয়ারা ঠুকিয়া বুঝিতে চেষ্টা পাইতেছিল, সে আঘাতের পরিমাণ কত। সে নিজেকে কত মিথ্যা স্বান্তনা দিবার প্রয়াস পাইয়াছিল ; বাহিরে নিজের তেজ বজায় রাখিবার জন্য কত বিফল চেষ্টা পাইয়াছিল ; —কিন্তু যেদিন বৌদি তাহাকে ডাকেন নাই, খাইতে দেন নাই, সেদিন তাহার উদ্দামভাব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া রেনু হইয়া গিয়াছিল। অত অল্প জায়গায় এরূপ প্রবলভাবে করুণরস সৃষ্টি করিতে বঙ্গীয় অন্য কোন আধুনিক লেখক পারিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না।"[৩৫] চলচ্চিত্রে বিশেষ করে রামরূপী জয় ও নারায়ণীরূপী ববিতার অনবদ্য অভিনয়ে সে ভাবটি বজায় থেকেছে। তবে 'রামের সুমতি' সম্পর্কে শরৎচন্দ্র স্বয়ং বলেছেন, "গল্প পারতপক্ষে tragedy করতে নেই। ...গল্প শেষ করে যদি না পাঠকের মনে হয় আহা বেশ! তবে আবার গল্প কি? আমি এই লাইনে চলেছি। রামের সুমতি, পথনির্দেশ, বিন্দুর ছেলে সব এই ছাঁচে ঢালা। শেষ করে মনের মধ্যে gloomy ভাব আসে না। তোমাদের হরিদাসবাবুর মত যেন লোকে মন্তব্য প্রকাশ করে 'রামের সুমতির নারায়নীর মত একটি স্ত্রী পেতে ইচ্ছা করে। এই সমালোচনাই শ্রেষ্ঠ সমালোচনা'।"[৩৬]

রামকে ছাড়া এবং না খেয়ে থেকে নারায়ণী অসুস্থ হয়ে পরে। রাতে স্বামীর কাছে তার দেওয়া দিব্যি ফিরিয়ে নেওয়ার আবেদন জানায়। এতে নীরব সম্মতি পেয়ে পরদিন সকালে রামের জন্য রান্নার আয়োজন করতে থাকে। মা হারা রামকে সৎ ভাইয়ের বউ হয়েও নারায়ণী যেভাবে মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছে তা কেবল গল্পের প্রয়োজনেই নয়— শরৎচন্দ্রের মধ্যেই এই মমত্ববোধ ছিল। 'শুধু মানুষের দিকেই তিনি তাঁর দরদটুকু সীমাবদ্ধ রাখেন নি ; পথের কুকুর, ছাগল, গরু আর পাখীদের প্রতিও শরৎচন্দ্রের দরদের সীমা ছিলনা। তাঁর সাহিত্যে এদের অসহায়তার কথাটি অন্তর নিঃসৃত মমতা দিয়ে চিত্রিত করে গেছেন—যা মনকে একান্ত সমবেদনায় ভরে তোলে।'[৩৭] নারায়ণী মাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় তার আর এ বাড়িতে থাকা হবে না। কারণ তার অত্যাচারে রামের আজ এই দুর্দশা। নেত্যকে পাঠায় রামকে খুঁজে আনার জন্য। চলচ্চিত্রে এর পরের দৃশ্যে আবার শিখাকে টেনে আনা হয়েছে। রাম তার কাছে যায় দুটো টাকার জন্য। রামের উপকারের প্রতিদানস্বরূপ শিখা বিনাবাক্যে টাকা দিয়ে দেয়। রাম যাওয়ার সময় বলে যায় সে গ্রাম ছেড়ে তার মামার বাড়ি চলে যাছে। একথা শুনে শিখা রামের পিছু ছুটতে থাকে। পথে ভোলার সঙ্গে দেখা হলে তার হাতে রামের লেখা একটি চিঠি দেয়। চিঠি পরে শিখা ছুটে যায় বৌদির (নারায়ণী) কাছে। কেননা সে জানে বৌদি

ছাড়া রামকে অন্য কেউ ফিরিয়ে আনতে পারবে না। ভোলাকে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে চিঠিটি বৌদির কাছে দেয়। বৌদি চিঠি পরে শিখার পরামর্শে রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য দৌড়াতে থাকে। তার পিছু পিছু সবাই দৌড়াতে থাকে। শেষদিকে শিখাকে নিয়ে এসে গতানুগতিক সিনেমার মিলনাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার না করে যদি মূলগল্প অনুসারে সিনেমার উপসংহার টানা যেত কিংবা মন্তাজের ব্যবহারে বিষয়টিকে নাটকীয় করা যেত তবে সিনামাটি গতানুগতিকতা থেকে বেড়িয়ে আসার সুযোগ পেত। দৃশ্যটিতে অতিমাত্রায় আবহ-সঙ্গীত ব্যবহার করে বিয়োগান্তক গাম্ভীর্যতা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। চলচ্চিত্রে ধ্বনি কিংবা মন্তাজ, কিংবা উভয়ের সমন্বিত ব্যবহার যথামাত্রায় প্রয়োগ করতে না জানলে একটি আরেকটির ক্ষতির কারণ হতে পারে। আইজেনস্টাইন বলেছেন, 'এইভাবে ধ্বনি ব্যবহার করলে, মঁত্যাজ নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে, কারণ দৃশ্য-মঁত্যাজের অংশের সঙ্গে ধ্বনিসাযুজ্যে মঁত্যাজ অংশহিসাবে এর ওজন বেড়ে যায় এবং এর অর্থের নিরপেক্ষতার পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে। তাই এর ক্রিয়া প্রধানত অংশগুলির উপর না হয়ে তাদের সহস্থাপনার উপর হয় বলে, নিঃসন্দেহে সামগ্রিকভাবে মঁত্যাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।'[৩৮] মূল গল্পে দেখা যায়— 'নারায়ণী রান্না শেষ করিয়া একখানি থালায় সমস্ত দ্রব্য পরিপাটি করিয়া সাজাইতেছিলেন। দ্বারের কাছে ভোলা আসিয়া ডাকিল, মা! নারায়ণী ফিরিয়া ভোলাকে দেখিয়া বলিলেন, কি রে ভোলা? ...ভোলা আস্তে আস্তে বলিল, চুপি চুপি একটা কথা আছে, মা। নারায়ণী কাছে আসিতেই ভোলা ফিসফিস করিয়া বলিল, তুমি যা বলেছিলে মা, তাই হয়, যদি দুটি টাকা দাও। নারায়ণী বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, কি হয় রে? কাকে টাকা দিতে হবে? ভোলা একটুখানি আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুমি দাঠাকুরকে চলে যেতে বলেছিলে না! তিনি যেতে রাজী আছেন—আচ্ছা, দুটো না দাও, একটি টাকা দাও। নারায়ণী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কোথায় যেতে রাজি আছে রে? কোথায় সে? ভোলা বলিল, বাইরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন! বাবার থানের ওদিকে কোথায় তেনার মামার বাড়ি আছে যে! যা ভোলা, শিগগির ডেকে আন—বল, আমি ডাকচি। ভোলা ছুটিয়া গেল, নারায়ণী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনতিকাল পরেই রাম একটি ছোট পুঁটুলি হাতে লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই নারায়ণী নিঃশব্দে তাহার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেলেন'। গল্পে যেরকম কাহিনি সমাপ্তির প্রত্যক্ষ সমাধান ছিলো চলচ্চিত্রকার তা ব্যবহার না করে গতানুগতিক উপসংহারে গিয়ে মূল আবেদনটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছেন।

নারায়ণী আর রামের মধ্যে যে 'selfless love' তৈরি হয়েছে গ্রীক পুরাণ অনুযায়ী তাকে 'Agápe'[৩৯] বলে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। যেখানে কোন স্বার্থ নেই, চাওয়া পাওয়ার হিসেব নেই। এ ধরনের ভালবাসার জন্য মানুষ যেকোন ধরনের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও ত্যাগ স্বীকার করতেও কসুর করে না। সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প 'অযান্ত্রিক' অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' ছবিতে দেখা যায় যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের প্রেমের এক বিরল দৃষ্টান্ত।[৪০] ছবির নায়ক ড্রাইভার বিমলের মমত্ববোধ তৈরি হয় তার পুরোনো গাড়িটির প্রতি। সে ট্যাক্সিটির নাম রেখেছিলেন 'জগদ্দল'। ট্যাক্সিটিই তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। এক সময় গাড়িটি পুরোনো হয়ে গেলেও সে আর এটাকে পরিত্যাগ করতে পারেনি। সবাই এটা বিক্রি করে নতুন একটা কিনতে পরামর্শ দেয়। মিস্ত্রি যখন জানায় এটা আর কখনোই ঠিক হবে না। সে কষ্ট পায়। মুমূর্ষু সন্তানকে সর্বস্ব দিয়ে বাঁচিয়ে তোলার জন্য পিতার যে আকুতি গাড়িটির জন্য বিমলেরও একইরূপ আকুতি। সে-ও সবকিছুর বিনিময়ে আবার গাড়িটিকে ভাল করে তুলতে চায়। একই রকম ভালবাসার চিত্রায়ণ রামের সুমতি সিনেমায়ও দেখা যায়। রামের কারণে শত গঞ্জনা সহ্য করেও নারায়ণীর ভালবাসা কমে না। রামের জন্য নিজের মাকেও দূরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে

কুণ্ঠাবোধ করে না। এই অভেদ্য ভালবাসার মাঝে কোনকিছুই বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সবকিছু উপেক্ষা করে সে রামকে ফিরিয়ে আনে। সমালোচক বলেছেন, 'শরৎচন্দ্রের পুরুষ চরিত্রগুলি সকলেই খামখেয়ালী ও অহংসর্বস্ব আর তাঁর নারী চরিত্রিগুলির অধিকাংশই স্বাভাবিকতা ও কোমলতার আধার। সকল সময়েই তাদের আচরণে মাতৃস্নেহের একটি আবেদন দেখা যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের নায়িকারা তাদের প্রেমাস্পদের জননীর মতই স্নেহ করে।'[৪১] শুধুমাত্র কয়েকদিন বৌদির ভালবাসা না পেয়ে রামের নিজের মধ্যে যে শূন্যতা উপলব্ধ হয়েছে সেই ভালবাসাকে ফিরে পেতে এতদিন ধরে রামের নিজের মধ্যে ধারণ করা যে স্বকীয়তা, সেই দুষ্টুমি, সে উদ্যাম দুরন্তপনা বিসর্জন দিয়েছে। তার নিজের মধ্যে সুমতি হয়েছে, কারণ যে কোন মূল্যে বৌদির স্নেহ-মমত্ববোধ ধরে রাখতে হবে।

উপসংহার

সিনেমায় রামের আচরণে তেজ প্রকাশ পেলেও করুণ রসের কোন ছায়া পড়েনি। শুধু শিখার কাছে দুটো টাকা চেয়ে বিদায় নেয়ার বর্ধিত অংশে একটু আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তবে নারায়ণীর আচরণে করুণ রসের আবহ তৈরি হয়েছে এবং নেত্য তার কিছুটা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। শরৎচন্দ্র শব্দের জাদুতে, সৃষ্টির নিপুণতায় অল্প কথায় যেভাবে মানুষের মনের গহীনের স্বরূপ উন্মোচিত করতে সক্ষম চলচ্চিত্রকার সেভাবে বিষয়টি তুলে ধরতে পারেননি। বরং মূল গল্প বহির্ভূত দৃশ্যের অবতারণা করে সাময়িক আবেগ সৃষ্টি করলেও গল্পের মূল সুরটি সিনেমায় ওঠে আসেনি। শেষ দৃশ্যে রামের নিরুদ্দেশ যাত্রা, শিখার মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে বৌদির আলু-থালুভাবে রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য দৌড়ানো সিনেমার গতানুগ ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। বৌদির সাড়া না পেয়ে ভিতর থেকে টুকরো টুকরো হয়ে রামের তেজ মিইয়ে গিয়ে স্পর্শানুভূতির যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে এবং তা থেকে উৎপন্ন অভিমানে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার উদ্যোগ, বৌদির কথায় ফিরে আসার মধ্যে যে অসহায়ত্ব সিনেমায় তা ফুটে উঠেনি। বরং শিখার কাছে টাকা নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার মাঝে আগের সেই জেদই কাজ করেছে। অনেক সমালোচক বলেছেন শরৎচন্দ্রের লেখায় বেদনাই বেশি। জীবন কী শুধুই বেদনার? শরৎবাবু শুধু মানুষকে কাঁদাতেই পেরেছেন, হৃদয়কে রক্তাক্তই করতে পেরেছেন, চিত্তকে প্রফুল্লিত করতে পারেননি। সমালোচকদের ঐসব কথা 'রামের সুমতি'র বেলায় খাটেনা। দুঃখ জীবনের অপরিহার্য অংশ। বিরহের পড়ে আনন্দ-অশ্রু মথিত মিলনের যে উচ্ছ্বাস তা শরৎচন্দ্রের রামের সুমতির শেষাংশে যেভাবে এসেছে শহিদুল আমিনের সিনেমায় সেভাবে চিত্রায়িত হয়নি। সর্বোপরি রাম চরিত্রে জয়ের প্রাঞ্জল অভিনয় এবং নারায়ণী চরিত্রে ববিতার অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা চলচ্চিত্রটিকে মূল্যায়নের পথ সুগম করে দিয়েছে। যেমনটি কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায় নির্মিত 'রামের সুমতি' সিনেমায়ও 'অভিনয়ে সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন নারায়ণীর ভূমিকায় মলিনা দেবী। সংযত সুন্দর অভিনয়ের সাহায্যে তিনি মাতৃহৃদয়ের ব্যথা বেদনাকে নিখুঁত রূপ দিয়েছিলেন।[৪২]

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. গোপালচন্দ্র রায়, *শরৎচন্দ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, ISBN 81-7756-334-3, পৃ. ১৩০

২. হুমায়ুন কবির, *শরৎ-সাহিত্যের মূলতত্ত্ব*, বিশু মুখোপাধ্যায় অনূদিত, শোভা প্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট, ঢাকা-১০০০, দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই ২০১৩, পৃ. ৪৭

৩. 'রামের সুমতি' চলচ্চিত্রে টাইটেল দৃশ্যে ইমেজের মাধ্যমে দেয়া লিখিত বক্তব্য (চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: শহিদুল আমিন, প্রযোজনা ও পরিবেশনা: জাভেদ ফিল্মস)

৪. বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, *কীভাবে ছবি করি কীভাবে ছবি হয়*, পরম্পরা প্রকাশন, ২০ এ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৩৫

৫. গৌতম ঘোষ, ভারতীয় চলচ্চিত্রকার, সাক্ষাৎকার: জয়ন্ত সাহা, গ্লিটজ, বিডি নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, তারিখ- ১৫ জানুয়ারি ২০১৮
Link-https://bangla.bdnews.24com/glitz/article.1447530bdnews

৬. রা. সু. গ. দ্বারা 'রামের সুমতি' গল্প বোঝানো হয়েছে

৭. দ্রষ্টব্য: *কাবুলিওয়ালা* (চলচ্চিত্র), পরিচালক- তপন সিংহ, প্রযোজনা- চারুচিত্র, ভারত, মুক্তি- ১৯৫৬

৮. তারাপদ সন্ত্র, *শরৎচন্দ্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য*, ঋক প্রকাশনী, ১৫৪ আচার্য প্রফুল্ল রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬, পৃ. ৩০

৯. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎ রচনাসমগ্র ২, মলি প্রকাশনী, ২২ রাফিন প্লাজা, মিরপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫, পৃ. ৫৫৪

১০. রা. সু. চ. দ্বারা 'রামের সুমতি' চলচ্চিত্র নির্দেশ করা হয়েছে

১১. হেমেন্দ্রকুমার রায়, *সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র*, এম সি সরকার এন্ড সন্স লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা, পৃ. ১২

১২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎ রচনাসমগ্র ২, মলি প্রকাশনী, ২২ রাফিন প্লাজা, মিরপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫, পৃ. ৫৪৭

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৭

১৪. সুকুমার সেন, ভূমিকা: *শরৎ রচনাসমগ্র*- ২, মলি প্রকাশনী, ২২ রাফিন প্লাজা, মিরপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫, পৃ. ৩

১৫. হুমায়ুন কবির, *শরৎ-সাহিত্যের মূলতত্ত্ব*, বিশু মুখোপাধ্যায় অনূদিত, শোভা প্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট, ঢাকা-১০০০, দ্বিতীয় প্রকাশ: জুলাই ২০১৩, পৃ. ১৯

১৬. মলয় দেব, 'বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে সমাজ ও মানুষ', *সিনেমা সময় সমাজ*, সম্পাদনা– রজত রায় ও সোমেশ্বর ভৌমিক, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১৭

১৭. হেমেন্দ্রকুমার রায়, *সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র*, এম সি সরকার এন্ড সন্স লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা, পৃ. ১৯

১৮. রাধারানী দেবী, *শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পৃ. ১৯১

১৯. মৃণাল সেন, *চলচ্চিত্র ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ*, গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ২১

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১

২২. নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র*, আনন্দধারা, ৭৯/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১০৭

২৩. *অযান্ত্রিক* (চলচ্চিত্র), পরিচালক- ঋত্বিক কুমার ঘটক, প্রযোজনা- এল. বি. ফিল্মস্ ইন্টারন্যাশনাল, ভারত, মুক্তি- ১৯৫৮ এবং অযান্ত্রিক (ছোটগল্প), গল্পসমগ্র- ১: সুবোধ ঘোষ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৪৫১-৪৫৫

২৪. বিকাশপিডিয়া, *ঋত্বিক কুমার ঘটকের কিছু অজানা কথা*, http://bn.vikaspedia.in/InDG

২৫. *মেক-আপ শিল্প এবং নানাবিধ–* , সচিত্র স্বদেশ, জাকিউদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত, ১ম বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ২০ আগষ্ট ১৯৮১, পৃ. ৬৪

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

২৭. টর্টসভ্, *অভিনেতার চরিত্র নির্মাণ*, ব্রজসুন্দর দাস (অনুদিত) প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৭, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১৮
২৮. *অর্ন্তবর্তী প্রতিবেদন*, প্রকাশক- ফজলে রাব্বি, ডিসেম্বর ১৯৭১, বাএ ৯৮৭, পাণ্ডুলিপি : অনুবাদ বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৮৪
২৯. Rudolf Arnheim, *Film as Art,* University of California Press, London, England, ISBN: 0-520-24837-6, P. 20, 21
৩০. সত্যজিৎ রায়, *অপুর পাঁচালি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, ISBN 81-7215-367-8, অপৃ. ৬৯
৩১. চিদানন্দ দাশগুপ্ত, চলচ্চিত্রের শিল্পপ্রকৃতি, *চলচ্চিত্র কথা*, অসীম ঘোষ সম্পাদিত, রূপরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, পৃ. ১৬, ১৭
৩২. রাধারানী দেবী, *শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পৃ. ৬
৩৩. হেমেন্দ্রকুমার রায়, *সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র*, এম সি সরকার এন্ড সন্স লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা, পৃ. ১৩
৩৪. Kristin Thompson and David Bordweel, *Film History,* McGraw-Hill Companies, 1221 Avenue of the America, New York, ISBN 0-07-038429-0; P. 1
৩৫. গোপালচন্দ্র রায়, *শরৎচন্দ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, ISBN 81-7756-334-3, পৃ. ২০৭
৩৬. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উদ্ধৃত- *প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস*, ডঃ অরুণ সান্যাল সম্পাদিত, ডঃ শিবেশ চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধ 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : দরদী জীবনশিল্পী', ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ৪ কলেজ রোড, কলিকাতা-৯, পৃ. ১৩১
৩৭. তারাপদ সন্ত্র, *শরৎচন্দ্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য*, ঋক প্রকাশনী, ১৫৪ আচার্য প্রফুল্ল রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬, পৃ. ২৪
৩৮. তপন দাস (অনুবাদক), *সের্গেই আইজেনস্টাইনের অ্যান অ্যামেরিকান ট্র্যাজেডি*, বাক্‌শিল্প, ১৭-সি তেলিপাড়া লেন, কলকাতা ৭০০০৩১, পৃ. ১৩০
৩৯. https://medium.com/@krisgage/there-are-several-types-of-love-59141dea1689
৪০. *অযান্ত্রিক* (চলচ্চিত্র), পরিচালক- ঋত্বিক কুমার ঘটক, প্রযোজনা- এল. ডব. ডফল্মস্ ইন্টারন্যাশনাল, ভারত, মুক্তি- ১৯৫৮ এবং অযান্ত্রিক (ছোটগল্প), গল্পসমগ্র- ১: সুবোধ ঘোষ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৪৫১-৪৫৫
৪১. হুমায়ুন কবির, *শরৎ-সাহিত্যের মূলতত্ত্ব*, বিশু মুখোপাধ্যায় অনূদিত, শোভা প্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট, ঢাকা-১০০০। দ্বিতীয় প্রকাশ: জুলাই ২০১৩, পৃ. ৩৫
৪২. নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র*, আনন্দধারা, ৭৯/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯। পৃ. ১০৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাটকের চলচ্চিত্ররূপ : নবাব সিরাজউদ্দৌলা

নবাব সিরাজউদ্দৌলা (চলচ্চিত্র) পরিচিতি

মূল কাহিনি : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সিকান্দার আবু জাফর ও মো: নেজামতুল্লা।
চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও সঙ্গীত : খান আতাউর রহমান।
প্রযোজনা : মাহবুবা রহমান
চিত্রগ্রহণ : বেবী ইসলাম
সম্পাদনা : বশীর হোসেন
পরিস্ফুটণ : কাসেম চিশতী
মুদ্রণ : কায়সার রিজভী
প্রচার : আবদুস সবুর
রূপসজ্জা : আবদুস সোভান
সাজসজ্জা : কস্টিউম হাউজ
ব্যবস্থাপনা : আমীর আলী
শিল্পনির্দেশনা : আবদুস সবুর
শব্দগ্রহণ : এম. এ. জহুর
এফডিসি স্টুডিওতে নির্মিত, এফ এ দোসানী নিবেদিত, সেভেন আর্টস এর শ্রদ্ধার্ঘ্য।

অভিনয়ে : আনোয়ার হোসেন, আনোয়ারা জামাল, আতিয়া চৌধুরী, তন্দ্রা ইসলাম, জরিনা, ওয়াহিদা রহমান, সুলতানা, তুলিপ, এম. এ. খালেক, এম. এ. সামাদ, রানু, আলি মনসুর, মডি কোহেন, তেজেন চক্রবর্তী, আবদুস সামাদ, কুতুবুল আলম, রফিক, তাহের, আনিস, আলি কাওসার, আবদুল মতিন, মঞ্জুর, রাজ, মেহফুজ, নুরুল ইসলাম, খায়রুল আলম, সেলিম রেজা, ফরিদ, আবুল, আলম, মান্নান, মহিউদ্দিন খান, মোজাম্মেল হুসেন, হুদা আরিফ, ফারুক, আনোয়ার, মনিরুল হক, প্রশান্ত শফিউদ্দিন, গিয়াসুদ্দিন, শাজাহান, শাহ্ গোলাম আহমেদ, নুরুদ্দিন, গীতা, মিথুন রহমান প্রমুখ।

নেপথ্য কণ্ঠে : মাহবুবা রহমান, আব্দুল আলিম, ফেরদৌসী বেগম, আব্দুল জব্বার, শাহনাজ বেগম, সাবিনা ইয়াসমিন, শাহীন আখতার।

মুক্তি : ১২ জানুয়ারি, ১৯৬৭।
দৈর্ঘ্য : ২ ঘণ্টা ১১ মিনিট।
ফরম্যাট : ৩৫ মি. মি.।
কালার : সাদাকালো।

নাটক পরিচিতি

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজদ্দৌলা'। দেশপ্রেমের প্রেরণায় ১৯৩৮ সালে এটি রচিত ও প্রকাশিত হয়। একই বছরের ২৯ জুন নাট্যনিকেতন মঞ্চে এর প্রথম মঞ্চায়ণ হয়।[১]

সিকান্দার আবু জাফর রচিত ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা'। 'ইতিহাসের ভুলভ্রান্তি নিরসনের তাগিদে ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি নাটকটি রচনা করেন। প্রথম মঞ্চায়ণ হয় ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে। ১৯৬৫ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক এটি প্রথম পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়।'[২]

মো: নেজামতুল্লা কোন প্রসিদ্ধ নাট্যকার নয়। ধারণা করা যায় মঞ্চ নাটকের উদ্দেশ্যে রচিত হস্তলিখিত কোন পাণ্ডুলিপি সিনেমায় ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু সংরক্ষণের গুরুত্ব না থাকায় তাঁর রচিত 'সিরাজউদ্দোলা' নাটকের কোন পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত 'সিরাজদৌলা' ও রমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত 'বাংলা দেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)' ঐতিহাসিক গ্রন্থ। নাটকটি যেহেতু ইতিহাস আশ্রিত এবং চলচ্চিত্রকার এই দুটি গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, স্বাভাবিকভাবে চলচ্চিত্র আলোচনায় এগুলো আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে।

মুখবন্ধ

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা (১৭৩৩-১৭৫৭) ঐতিহাসিকভাবে ভারতবর্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। এই নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইংরেজদের কাছে পরাজয় বরণ করে বাংলার স্বাধীনতা হারানোর কলঙ্কজনক ইতিহাস। কতিপয় স্বার্থান্বেষীর ব্যক্তিগত লোভ-লালসার কারণে বিশাল সৈন্যদল ও ব্যাপক প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও নবাব সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হন। ফলে ঐ দিনই পলাশীর আম্রকাননে অস্তমিত হয় বাংলার স্বাধীনতার সূর্য। কারণ বন্দি সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করার পর প্রকারান্তরে ইংরেজরাই বাংলার প্রকৃত শাসকে পরিণত হয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এসব গ্রন্থের আলোকে পরবর্তীতে রচিত হয়েছে বহু নাটক ও পালা; যেগুলো মঞ্চস্থ হয়েছে গ্রাম্য নাট্যশালা থেকে শহুরে থিয়েটার পর্যন্ত। বাদ যায়নি চলচ্চিত্র নির্মাণও। এই অধ্যায়ে আলোচনার বিষয়বস্তু নাটক থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ। ইতিহাসের স্বরূপ উন্মোচন এই গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। তারপরও ইতিহাসের আলোকে রচিত নাটক ও তা থেকে নির্মিত চলচ্চিত্রের আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাস সামনে এসে পড়ে। গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে এখানে যে চলচ্চিত্রটিকে নির্বাচন করা হয়েছে তা নাটক ছাড়াও ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে উপাদান নিয়ে নির্মিত হয়েছে—চলচ্চিত্রকার নিজেই সিনেমার নাম ভূমিকায় তা উল্লেখ করেছেন। ফলে আলোচনার অত্যাবশ্যকতায় ইতিহাসের যে অংশটুকো সামনে এসে যায় এই অধ্যায়ে তার আলোচনাও বাঞ্ছনীয়।

মির্জা মুহম্মদ সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন নানা আলীবর্দী খানের প্রিয়পাত্র ও আস্থাভাজন। সে কারণে আলীবর্দী খানের ইচ্ছায় তাঁর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা বাংলার মসনদে আসীন হন। সিরাজউদ্দৌলার জন্মের পরপরই আলীবর্দী খান বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর প্রতি পিতামহের ছিল বিশেষ স্নেহ ও পক্ষপাত।[৩] এটা নিকট আত্মীয়দের অনেকে পছন্দ করতেন না। বিশেষ করে সিরাজউদ্দৌলার বড় খালা মেহের উন্-নিসা (যিনি ঘসেটি বেগম নামে অধিক পরিচিত) ও মেঝো খালার পুত্র শওকত জঙ্গ। তারা উভয়েই আলীবর্দীর মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভের আশায় ছিল। নবাব-মসনদের নির্মম ইতিহাসে আলোকপাত করলে দেখা যায়, আলীবর্দী খাঁ নিঃস্ব অবস্থায় ভারতে এসেছিলেন। ভারতবর্ষে আসার পর আলীবর্দী নবাব শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খানের আনুকূল্যে প্রতিপালিত হন এবং পরবর্তীতে বিহারের শাসক নিযুক্ত হন। সুযোগ সন্ধানী আলীবর্দী খাঁ শুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খানকে হত্যা করে মুর্শিদাবাদের অধিকর্তা হন।[৪] ঠিক একইভাবে মীরজাফরও নিঃস্ব অবস্থায় ভারতে এসে আলীবর্দীর আনুকূল্যে প্রতিপালিত হয়ে সেনাপতির পদ অধিকার করে। প্রতিপালকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আলীবর্দীর মৃত্যুর পর সেও সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করে নবাব হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করে।[৫] তাছাড়া 'সিংহাসনে বসার কিছুদিনের মধ্যে সিরাজউদ্দৌলা কঠিনভাবে ঘরের শত্রু দমন করেন এবং শাসনব্যবস্থার দরকারী পরিবর্তন আনেন। পরবর্তীতে সিরাজ বিদেশি শত্রু দমনের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেন। এক্ষেত্রে সিরাজ ফরাসি বনিকদের সাহায্য নিয়ে ইংরেজ শত্রুদের নিধনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন।'[৬] এসব কারণে নবাব পদে অভিষিক্ত হবার পর ঘসেটি বেগম, শওকত জঙ্গ, মীরজাফর ও তার অনুসারী জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ প্রমূখ ব্যক্তিদের বিরাগভাজন হন। এসব ব্যক্তিরা স্বীয়স্বার্থে ইংরেজদের সঙ্গে আঁতাত করে সিরাজউদ্দৌলাকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ফলে সিরাজের এক বছরের কিছু অধিককাল শাসনামলে (১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল থেকে ১৭৫৭ সালের জুন পর্যন্ত) তাঁকে প্রাসাদের ভেতরের এবং বাইরের শত্রুদের বিভিন্নভাবে মোকাবেলা করতে হয়েছে।

সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনে থাকাটা ইংরেজদের পক্ষে ছিল হুমকিস্বরূপ। তাই তাঁর পরিবর্তে ইংরেজরা এমন একজন ব্যক্তিকে খুঁজতে থাকে যার দ্বারা তাদের সকল স্বার্থ রক্ষা হবে। ইংরেজদের এই চেষ্টা সফল হয়। অচিরেই নবাবের বিরুদ্ধে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মীরজাফর, জগৎশেঠ ও রাজবল্লভসহ তাঁর প্রতি বিভিন্ন কারণে ক্ষুব্ধ অমাত্যদের সমর্থন লাভ করে। এমনকি খালা ঘসেটি বেগমও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। শাসন-ক্ষমতালোভের বাইরে অর্থ উপার্জনের লিপ্সাও নবাবের প্রতি বিরুদ্ধাচারণের আরেকটি কারণ। 'এদেশীয় শেঠ, বনিক ও তাদের এজেন্টরা বিদেশি বনিকদের সঙ্গে বিশেষ করে ইংরেজদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়—বলা বাহুল্য, বিদেশি পুঁজির সহায়তায় নিজেরা লাভবান হতে থাকে। স্বাভাবিক কারণে ইংরেজদের সাথে এদের স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।'[৭] এসব ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় পলাশীর প্রান্তরে রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নবাব পরাজিত হন এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে যেতে বাধ্য হন। মুর্শিদাবাদে গিয়ে পুনরায় সৈন্য যোগাড় করতে অসমর্থ হয়ে এবং রাজধানী রক্ষার কোনরূপ উপায় করতে না পেরে সাধারণ বেশে পাটনার পথে রওনা করেন।[৮] পথে মীরকাশিমের সৈন্যদের হাতে বন্দি হয়ে কারান্তরীণ হন। বন্দী অবস্থায় তাঁকে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে আনা হয়। পরে মীরজাফরের পুত্র মীরণের নির্দেশে আলীবর্দীর স্নেহধন্য মহম্মদী বেগ অর্থলোভে সিরাজউদ্দৌলাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।[৯]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মীরজাফরকে বাংলার নতুন নবাব ঘোষণা করে। শুরু হয় বাংলার ইতিহাসে পরাধীনতার অধ্যায়। কেননা মীরজাফরকে পিছন থেকে ইংরেজরাই পরিচালিত করত। এই যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হয়েছিল সামরিক শক্তির কারণে নয়, সিরাজউদ্দৌলার চারপাশের লোকজনের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। তাছাড়া প্রজাদের রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকা এবং 'রাজা যায় রাজা আসে' এমন মনোভাবাপন্নতাও এর একটি কারণ ছিল। মীরজাফর মুর্শিদাবাদে নবাব হওয়ার পর রবার্ট ক্লাইভ ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি কমিটিতে ভাষণদানকালে সগর্বে বলেছিলেন, 'লাখ লাখ লোক দাঁড়িয়ে দেখছিল সে ঘটনা। ইংরেজদের ধ্বংস করার কোনো ইচ্ছা যদি তাদের থাকত, তাহলে কেবল লাঠি এবং ঢিলের সাহায্যেই তারা তা করতে পারত।'[১০] সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপমহাদেশে তাদের প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। যার ফলস্বরূপ প্রায় দুইশ বছর পরাধীনতার গ্লানি এই উপমহাদেশকে বয়ে বেড়াতে হয়েছে।

ইতিহাসের এই কাহিনি নিয়ে রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের কোন কোনটিতে সিরাজউদ্দৌলাকে নৃশংস, দুষ্কৃতকারী, মদপ্য ও নারীলোভী নেতিবাচক চরিত্র হিসাবে দেখানো হয়েছে। এর প্রধান কারণ পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সিরাজউদ্দৌলা নিহত হওয়ার পর ইংরেজরা একশ নব্বই বছর এই উপমহাদেশ শাসন করেছে। দীর্ঘ শাসনামলে তারা পলাশীর যুদ্ধ ও সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেতে তাদেরই অনুগত কিছু লোকদের দিয়ে মনগড়া গ্রন্থ রচনা করিয়েছিল। নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর তাঁর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন:

> এক যুগের ইতিহাসের কাছ থেকে পরবর্তী যুগ নানা জ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করে। এই পাঠগ্রহণ সার্থক হয় না ইতিহাস অখন্ড সত্য নির্ভর না হলে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে এক একটি জাতি যুগের সীমা অতিক্রম করে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখবার জন্যে ইতিহাসকে খুশিমত নির্মাণ করে গেছে; অথবা তাদের স্বার্থানুযায়ী ইতিহাস নির্মিত হওয়ার মত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। ফলে অসংখ্য অসত্যের স্তূপে সত্যের হয়েছে সমাধি। নূতন নূতন কণ্ঠে অসত্য নূতন নূতন সুরে ঝংকৃত হয়েছে। জমে উঠেছে বিভ্রান্তির পাহাড়। ইতিহাস নির্মাণের এই কৌশলে ইংরেজের ক্ষমতা বিস্ময়কর। দূরদর্শিতা, অভীষ্ঠ সিদ্ধির জন্যে সজাগ তৎপরতা, ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা, নির্লজ্জ চাতুরী প্রভৃতির সমন্বয়ে তারা তাদের স্বার্থানুযায়ী ইতিহাস অনেকের দ্বারা লিখিয়েছে (শক্তি প্রয়োগে নয়— তাদের কৌশল সৃষ্ট পরিবেশের বিভ্রান্তিতে উদ্বুদ্ধ করে) এবং জনসাধারণকে তা যথাসম্ভব বিশ্বাসও করিয়েছে। আমাদের ইতিহাসে সিরাজ-উ-দ্দৌলার নামটি কলঙ্ক এবং নৃশংসতার সঙ্গে সমার্থবোধক করে তোলা ইংরেজের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কীর্তি।[১১]

সত্য বেশিদিন চাপা পড়ে থাকেনি। দেশপ্রেমিক জনগণ ঠিকই একদিন ইংরেজদের চালাকি বুঝতে সক্ষম হয়েছে এবং সিরাজউদ্দৌলার আসল ইতিহাস লেখায় উদ্যোগী হয়েছে। রচনা করেছে ঐতিহাসিক সত্য অবলম্বনে অনেক গ্রন্থ ও সাহিত্য। নবাব সিরাজউদ্দৌলা সেখানে স্থান পেয়েছে ন্যায়পরায়ণ দেশপ্রেমিকের আসনে। এর ধারাবাহিকতায় সিরাজউদ্দৌলার শাসনামল ও পলাশীর যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে পরবর্তীতে মঞ্চায়ণ হয়েছে পালা ও নাটক, নির্মিত হয়েছে তথ্যচিত্র ও চলচ্চিত্র। ইতিহাসের এই সত্য ঘটনা নিয়ে ১৯৬৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে খান আতাউর রহমান নির্মাণ করেন পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা'। বাংলার শেষ নবাব আখ্যা পেলেও সিরাজউদ্দৌলা কোনভাবেই বাঙালি ছিলেন না। তারপরও বাংলার জনগণ তাদের মানসপটে মুক্তিকামী এক বাঙালি বীর হিসেবে তাঁকে কল্পনা করে থাকে। একারণে তৎকালীন সময়ে পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে এই

সিনেমাটি বাংলার জনগণের মাঝে প্রবল দেশপ্রেম জাগ্রত করতে সমর্থ হয়েছিল। গবেষক অধ্যাপক আহমেদ আমিনুল ইসলাম এ বিষয়ে লিখেছেন, "খান আতাউর রহমান পরিচালিত নবাব সিরাজউদ্দৌলা চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে এও স্মর্তব্য, নবাব সিরাজ চরিত্রটি জন্মসূত্র, ভাষাগত এমনকি সংস্কৃতিগত বিবেচনায়ও বাঙালি নয়। ইতিহাসে কেবল 'বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব' পরিচয়টুকু বহন করেই তিনি বৃহত্তর বাঙালির কাছে ট্র্যাজিক নায়কে পরিণত হয়েছিলেন। আবার ষাট দশকে পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে বাঙালির উত্তাল রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনায় সিরাজউদ্দৌলার করুণ পরিণতি স্বাধীনতাকামী বাঙালি মননেও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তাঁর আত্মপরিণতি দেখে সিরাজকে নিজস্বভাবে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নাই বাংলাদেশের মানুষ।"[১২] তবে সিরাজউদ্দৌলা চরিত্রটির একদিকে মিথ্যা অতিরঞ্জন, অন্যদিকে মহানায়কোচিত উপস্থাপন— কোনটাকেই শতভাগ মেনে নেওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে রমেশ্চন্দ্র মজুমদারের একটি উদ্ধৃতি স্মর্তব্য— "কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে সিরাজের যে কলঙ্কময় চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাও যেমন অতিরঞ্জিত, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও সিরাজউদ্দৌলাকে যে প্রকার স্বদেশবৎসল ও মহানুভব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও ঠিক তদ্রূপ।"[১৩]

সিরাজউদ্দৌলা নাটক ও চলচ্চিত্রের সংযোগ বিচার

সিনেমার প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায় ইংরেজ কর্তৃক সাধারণ জনগণের নির্যাতিত হওয়ার চিত্র। জনৈক ঘোড়সওয়ার ইংরেজ এক সাধারণ লবন বিক্রেতাকে তাদের কাছে লবন বিক্রি না করার অজুহাতে চাবুক মেরে নির্যাতন করছে। এমন সময় এক অচেনা লোক সেখানে আবির্ভূত হয়। নির্যাতিত লবণ ব্যবসায়ী ঐ আগন্তুকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এতে ঘোড়সওয়ার ইংরেজ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। চিৎকার করে বলে, 'কেউ তাকে (লবন চাষীকে) বাঁচাতে পারবে না, এমনকি ইংল্যান্ডের কিং-ও না' (ন. সি. চ.)। আগন্তুক ইংরেজের এহেন কাণ্ডের প্রতিবাদ করে। ইংরেজ তাকে সাধারণ লোক মনে করে উত্তেজিত হয়ে গালমন্দ করতে করতে মারতে উদ্ধত হয়। এর প্রতিবাদস্বরূপ আগন্তুক ছুরি চালিয়ে ঐ অত্যাচারী ইংরেজকে হত্যা করে। লবন ব্যবসায়ী এই ঘটনায় হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। কারণ সে জেনে এসেছে নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বে হত্যা করার অধিকার কারো নেই। লবন ব্যবসায়ীকে আশ্বস্ত করে আগন্তুক বলে, 'অত্যাচার যদি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে অত্যাচারীকে হত্যার অধিকার আছে' (ন. সি. চ.)। এরপর আগন্তুক কিছুক্ষণের জন্য আনমনা হয়ে পরে, নেপথ্যকণ্ঠে শোনা যায়, 'দেখবি ওরা বাণিজ্যের নামে কি অমানষিক অত্যাচার করবে এদেশের নিরীহ মানুষগুলোর ওপর। তুই কঠোর হাতে তাদের দমন করিস দাদু' (ন. সি. চ.)। এই পর্যন্ত দেখার পর দর্শকের আর বোঝার বাকি থাকেনা যে আগন্তুকটি 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা'। সম্বিত ফিরে এলে আগন্তুক লবণ ব্যবসায়ীকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'কেউ জিজ্ঞেস করলে বলো, নবাব সিরাজউদ্দৌলা নিজ হাতে ইংরেজকে হত্যা করেছে। আমার খঞ্জর তাঁর স্বাক্ষী' (ন. সি. চ.)। অতঃপর সিরাজউদ্দৌলা ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কিংবা সিকান্দার আবু জাফর রচিত নাটকের কোথাও সরাসরি ইংরেজদেরকে লবন ব্যবসায়ীদের ওপর নির্যাতন করার উল্লেখ পাওয়া যায় না। সিকান্দার আবু জাফর রচিত নাটকে এক উৎপীড়িত লবন ব্যবসায়ীকে

নবাবের দরবারে উপস্থিত হয়ে ইংরেজদের অত্যাচারের বর্ণনা দিতে দেখা যায়—'লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। ষণ্ডা ষণ্ডা পাঁচজন মিলে আমার পোয়াতি বউটাকে—ওহ হো হো (কান্না), আমি দেখতে চাই না। কিন্তু চোখ বুজলেই... ওদের আর একজন আমার নখের ভেতরে খেজু কাঁটা ফুটিয়েছে। আমার বউকে ওরা খুন করে ফেলেছে হুজুর।'[১৪] নাটকের এই দৃশ্যটিকে চলচ্চিত্রকার মঞ্চের আবদ্ধতা থেকে বের করে চলচ্চিত্রপযোগী করে তোলার জন্য খোলা প্রান্তরে নিয়ে গেছেন। মঞ্চ থেকে চলচ্চিত্রের স্বাধীনতা এই জায়গাতেই। মঞ্চে যা সংলাপ বা প্রকাশভঙ্গিতে বাস্তবানুগ করে তোলা সম্ভব নয় চলচ্চিত্রে ক্যামেরায় তা সম্ভব। স্থানিক সীমাবদ্ধতা জয় করে চলচ্চিত্র পৌঁছে যেতে পারে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে। 'A typage tendency may be rooted in theater; growing out of the theater into film, it presents possibilities for excellent stylistic growth, in a broad sense-as an indicator of definite affinities to real life through the camera.'[১৫]

চলচ্চিত্রে প্রথম দৃশ্যটি দিয়েই চলচ্চিত্রকার পুরো ঘটনার কিছুটা সারসংক্ষেপ দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। একদিকে ইংরেজদের অত্যাচারে এদেশের সাধারণ জনগণের ত্রস্ত অবস্থা। অন্যদিকে প্রজাবৎসল-ন্যায়পরায়ণ শাসক নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভূমিকা। একদিকে অত্যাচার, অন্যদিকে ন্যায় প্রতিষ্ঠা—এই দুয়ের ঘাত-প্রতিঘাত; এর মধ্যে যড়যন্ত্রের বিস্তীর্ণ জালবুনন পুরো সিনেমাকে নিয়ে গেছে পরিণতির দিকে। যাদের ঐতিহাসিক গ্রন্থ কিংবা নাটক আশ্রয় করে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন বলে চলচ্চিত্রকার ঘোষণা করেছেন, সেগুলোর কোনটিতে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ছদ্মবেশে একা ঘুরে ঘুরে প্রজাদের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করতে দেখা যায়নি। চলচ্চিত্রকার সিরাজউদ্দৌলার মহিমান্বিতরূপ ও তাঁকে প্রজাহিতৈষী নবাব হিসেবে দর্শকের সামনে উপস্থাপনের অভিপ্রায়ে এই দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। ইতিহাসে অনেক শাসককে ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রজাদের সুখ দুঃখ স্বচক্ষে দেখার জন্য একা একা ঘুরে বেড়াতে দেখা গেলেও সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে তা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কারণ সিরাজউদ্দৌলা ক্ষমতা গ্রহণ করার পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তাছাড়া ইংরেজরাও সার্বক্ষণিক ওঁৎ পেতে থাকত তাঁকে ঘায়েল করার জন্য। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে একা একা বাইরে যাওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এখানে ইাতহাস কিংবা নাটককে সরাসরি অনুসরণ নয়, চলচ্চিত্রকারের ব্যক্তিগত দর্শনই প্রকাশ পেয়েছে। ইতিহাসকে আশ্রয় করে লেখা নাটক যেমন ইতিহাস নয়, নাটক আশ্রিত সিনেমাও তেমনি নাটককে অনুসরণ করে না। নাটক সিনেমায় রূপান্তর হয় মাত্র। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর মতে, 'ইতিহাস ঘটনা-পঞ্জি। নাটক তা নয়। ঐতিহাসিক লোকের ঘটনাবহুল জীবনের মাত্র একটি ঘটনা অবলম্বন করেও একাধিক নাটক রচনা করা যায়। যায় এই জন্যই যে-ঘটনা নয়, ঘটনাটি ঘটবার কারনই নাট্যকারের বিষয়-বস্তু।'[১৬] তেমনি নাটকের যে কোন অংক কিংবা চরিত্র নিয়ে চলচ্চিত্রকারের দৃষ্টিভঙ্গি সহযোগে চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারে। তবে নাটকের মতো করে নয়, চলচ্চিত্রের ভাষায় সেটি নির্মাণ করতে হয়।

পরের দৃশ্যে সিরাজউদ্দৌলা প্রাসাদে ফিরে মসনদের সামনে গিয়ে মাতামহকে স্মরণ করে বলতে শোনা যায়—'বাংলা বিহার উড়িষ্যার মহান অধিপতি তোমার শেষ উপদেশ আমি ভুলিনি জনাব। তুমি বলেছিলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের কিছুতেই প্রশ্রয় দিওনা। তুমি বলেছিলে সুযোগ পেলেই তারা এদেশ কেড়ে নিবে। আমি তাদের প্রশ্রয় দিব না। আমি বেঁচে থাকতে তোমার

রাজ্যে তারা দুর্গ তৈরি করতে পারবে না। সৈন্য সমাবেশে সক্ষম হবে না। আমার জন্যে, দেশের জন্যে দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে তুমি চলে গেছ। তাই বুঝি তোমার এই নিষ্ঠ আহবান। তোমার অন্তিম সময়ে, তোমার মসনদ স্পর্শ করে যে প্রতিজ্ঞা আমি করেছিলাম, আমরণ আমি তা পালন করব। তুমি শান্ত হও, প্রসন্ন হও' (ন. সি. চ.)। দীর্ঘ এই স্বগত সংলাপটি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত সিরাজদ্দৌলা নাটকের প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যের শুরুতেই রয়েছে। সংলাপটি হুবহু চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। সিনেমায় সাধারণত এত বড় সংলাপ ব্যবহার করা হয় না। থিয়েটার কিংবা মঞ্চে দর্শকদের মনকে আন্দোলিত করার জন্য নাটকে আবেগপূর্ণ এরকম বড় বড় সংলাপ ব্যবহার করতে দেখা যায়। 'এমন অনেক নাটক আছে যাহাতে অভিনেতাকে প্রায় দুই পৃষ্ঠা এনরূপ স্বগত উক্তি করিতে হয়। অনেকে বলেন, এনরূপ লম্বা বক্তৃতায় দর্শকবৃন্দের ধৈর্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। বলিতে জানিলে, ভাল করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিলে বোধহয় অর্ধঘন্টা দর্শককে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যায়।'[১৭] ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের (১৮৯৩-১৯৬৮) এই উদ্ধৃতির সূত্র ধরে বলা যায়, আলোচ্য সিনেমায় এই দীর্ঘ সংলাপের ব্যবহার দর্শকদের মাঝে কোনরূপ ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়নি। বরং উপস্থাপনার পারদর্শিতায় সংলাপটি দর্শকদের মনে প্রচন্ড ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। চলচ্চিত্রকার এই সংলাপটির মাধ্যমে সিনেমায় সিরাজউদ্দৌলা চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন করতে চেষ্টা করেছেন। ফলে মাতামহ আলীবর্দী খাঁর আদর্শের প্রতি অবিচল, দেশের প্রতি অনুগত, অত্যাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার এক দেশপ্রেমিক নবাবকে আমরা দেখতে পাই সিনেমার এই দৃশ্যে।

সিনেমার তথ্যানুযায়ী চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মো: নেজামতুল্লা ও সিকান্দার আবু জাফর—এঁদের রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও নাটক থেকে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর পূর্বসূরি নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ সর্বপ্রথম তাঁর রচিত নাটকের মাধ্যমে সিরাজউদ্দৌলাকে ইতিবাচক চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করেছেন। অক্ষয়কুমারও গিরিশভাবনার বশবর্তী হয়ে 'সিরাজদ্দৌলা' নামে একই ধারার একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন।[১৮] রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাংলা দেশের ইতিহাস' (মধ্যযুগ) গ্রন্থে সিরাজউদ্দৌলার ভাল-মন্দ উভয় দিক নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও সিকান্দার আবু জাফর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়'র পদাঙ্ক অনুসরণ করে নাটক রচনা করেছেন। অন্যদিকে চলচ্চিত্রকার খান আতাউর রহমান নির্মিত নবাব সিরাজউদ্দৌলা সিনেমা পাঠ করলে দেখা যায়, উল্লেখিত লেখকদের রচনা থেকে সিরাজ চরিত্রের উত্তম দিকগুলো বাছাই করে তাঁর চলচ্চিত্রে সন্নিবেশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটকটিই তিনি সিনেমা নির্মাণের মূল উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আলোচনার সুবিধার্থে এই নাটকটিকে গবেষণায় মূল নাটক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সিরাজউদ্দৌলা চরিত্রটিকে বাংলার জনগণের হৃদয়ে অনন্য উচ্চতায় স্থান দিতে চেষ্টা করেছেন চলচ্চিত্রকার। মূলত সিরাজ চরিত্রটিকে দেশপ্রেমের প্রতিমূর্তি হিসেবে গড়ে তুলে পূর্ববাংলার জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করাই চলচ্চিত্রকারের অভিপ্রায় ছিল বলে আন্দাজ করা যায়।

সিনেমায় সিরাজউদ্দৌলার স্বগতোক্তির পরই আলেয়া নাম্মী এক তরুণী দরবার কক্ষে প্রবেশ করে। ঘুঙুরের শব্দে নবাব উপস্থিতি টের পেয়ে তাকে ধরে ফেলে। ক্রোধান্বিত হয়ে গোলামহোসেনকে বলে হারেমের হাবসী-প্রতিহারিণীকে ডেকে পাঠাতে। গোলামহোসেন ভয়ে ভয়ে

চলে গেলে নবাব তরুণীর কাছে জানতে চায়, 'তোমার কোন ভয় নেই'? আলেয়া উত্তর দেয়— না। সিরাজউদ্দৌলা অবাক হয়ে বলে—'কেন! তুমি কি শোননি, নবাব সিরাজউদ্দৌলা নারীর সম্ভ্রমের কোন মর্যাদাই দেয় না। ...তুমি কি শোননি, নারীত্বের চরম লাঞ্ছনায় নারী যখন ডুকরে কাঁদে, সিরাজ তখন আনন্দে হাসে? ...তুমি কি শোননি, সিরাজের ছায়া যেখানে পড়ে সেখানকার ঘাস পুড়ে যায়, পানি শুকিয়ে যায়, মাটি তেতে ওঠে' (ন. সি. চ.)। এই সংলাপে সিরাজের নামে যেসব অপপ্রচার ও রটনা তাঁর বিরুদ্ধচারীরা লোকসমাজে রটিয়েছিল তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আলেয়া চরিত্রটি অনৈতিহাসিক। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর নাটকে এই চরিত্রটিকে সংযোজন করেছেন। ড. পুষ্পেন্দুশেখর গিরি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ঐতিহাসিক নাটকে অনৈতিহাসিক চরিত্র নির্মাণ করেন নাট্যকার কয়েকটি গূঢ় অভিপ্রায়কে সামনে রেখে। কখনো ইতিহাসের তথ্য বাহুল্যের মধ্যে, নীরস আবহাওয়ার মধ্যে বাস্তবতা আনয়নের জন্য; কিংবা, ইতিহাসের রসকে ঘনীভূত করার আন্তরিক অভিপ্রায়ে। আবার, কখনো ঐতিহাসিক চরিত্রের কোন বিশেষ অনালোকিত দিককে উদ্ভাসিত করার জন্য।'[১৯] আলেয়া চরিত্রটিকে নাট্যকার কাহিনির শেষপর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন। নবাবকে ভালবেসে যেসকল মানুষ নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন এবং অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি এই চরিত্রটিকে তাদেরই প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া এর মাধ্যমে নবাবের গুপ্তচর-দলের কর্মকাণ্ডের কিছুটা ধারণা দেয়া হয়েছে। চরিত্রটি সৃষ্টির আরেকটি বড় উদ্দেশ্য ছিল। সিরাজ চরিত্রে ঐতিহাসিকদের দ্বারা যে কালিমা লেপন করা হয়েছিল নাট্যকার আলেয়া চরিত্রের মাধ্যমে সুচতুর কৌশলে তা খণ্ডানোর চেষ্টা করেছেন। তাই বিরুদ্ধচারীদের কথাগুলো মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করতে দেখা যায় আলেয়ার এই উক্তিতে, 'আমি সে সব কথা বিশ্বাস করিনি। ...জানি জাঁহাপনা। ওই সিংহাসনের ওপর লোভ রয়েছে অনেকের ; কিন্তু শক্তির পরিচয় দিয়ে সিংহাসন অধিকার করবার সাহস যাদের নেই, তারাই প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্য এই কুৎসা রটায়"[২০] নাট্যকারের মতো চলচ্চিত্রকারও তাঁর সিনেমায় আলেয়াকে ব্যবহার করেছেন সিরাজউদ্দৌলাকে নিষ্কলুষ রূপ দেওয়ার জন্য।

ইতিহাসের কলঙ্ক থেকে সিরাজউদ্দৌলাকে মুক্তি দেওয়ার প্রচেষ্টায় যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কলম ধরেছেন, তাঁর লেখায়ও সিরাজের কিছু কুঅভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'সিরাজ যৌবনোদ্গমের পূর্বেই সঙ্গদোষে একটু একটু করিয়া সুরাপান করিতে শিখিয়াছিলেন! যখন যৌবন-জল-তরঙ্গে দেহমন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, তখন সঙ্গগুণে আনুষাঙ্গিক পাপ-লিপ্সাও চরিতার্থ করিতে শিক্ষা করিলেন'।[২১] চলচ্চিত্রকার এই লেখকের কাছ থেকে কাহিনির উপাদান সংগ্রহ করলেও তিনি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। কোথাও কোথাও তাঁর চেয়েও সতর্ক থেকে সিরাজউদ্দৌলাকে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক রূপদান করতে চেয়েছেন। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটকে দেখা যায় সিরাজউদ্দৌলার খোঁজে লুৎফা দরবারে এসে উপস্থিত। দু'জনের কথোপকথনের এক পর্যায়ে নবাব লুৎফাকে উদ্দেশ্য করে বলতে শোনা যায়—'হারেমের নর্তকীদের নীরস গান শুনে, কুৎসিত নাচ দেখে আমি ঝিমিয়ে পড়েছিলাম।'[২২] –এই উক্তির দ্বারা নাট্যকার নাচ-গানের প্রতি সিরাজউদ্দৌলার আসক্তিহীনতার পরিচয় দিতে চেয়েছেন। এমনকি মদ্যপানের বিষয়টিও সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। যদিও তৎকালীন সময়ে নবাবদের, এমনকি আমাত্য কিংবা সম্ভ্রান্তদের নাচ-গান দেখা বা মদ্যপান করাকে দোষের চোখে দেখা হতো না। চলচ্চিত্রকার তাঁর সিনেমায় এসকল বিষয় একেবারেই পরিহার করেছেন। ইতিহাস থেকে নাটক রচনায় নাট্যকার যেমন নিজের মতো করে লেখার স্বাধীনতা ভোগ

করেছেন, নাটক থেকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরের সময়ও চলচ্চিত্রকার নিজের মতাদর্শ প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। সিনেমা নির্মাণকালীন সময়ে পাকিস্তানি হানাদারদের কবল থেকে মুক্তির জন্য স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের প্রেরণা যোগানোর অভিপ্রায়ে, দেশের সম্মানের জন্য জীবন উৎসর্গকারী সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার জনগনের কাছে নিষ্কলুষ দেখানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন খান আতাউর রহমান।

আলেয়াকে দেশান্তপ্রাণ এক সাহসী নারী হিসেবে চলচ্চিত্রকার নির্মাণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে সরাসরি অনুসরণ করেছেন। আলেয়া নিজের প্রাণ তুচ্ছজ্ঞান করে নর্তকী পরিচয়ের আড়ালে নবাবপক্ষের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করে। শত্রুপক্ষের আসরে নেচে-গেয়ে গোপন খবর সংগ্রহ করে তা মোহনলালের কাছে পৌঁছে দেয়। সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা'য় আলেয়া চরিত্রের কোন অস্তিত্ব নেই। এমনকি কোন নারী গুপ্তচরকেও সেখানে দেখা যায় না। তবে রাইসুল জুহালা পরিচয়ধারী নবাবের প্রধান গুপ্তচর নারানসিংয়ের[২৩] উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষ করা যায়। খান আতার 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' সিনেমায় আলেয়া নবাবের মনোনীত গুপ্তচর নয়। বরং কাশিম বাজার কুঠিতে মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ ইংরেজদের জলসায় আমন্ত্রিত হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে—এ খবর প্রাসাদে পৌঁছে দিতে এলে সিরাজউদ্দৌলা আলেয়াকে ইংরেজদের গুপ্তচর হিসেবে সন্দেহ করে। তাঁর মুখে উচ্চারিত সংলাপে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে—'অস্বীকার করতে পার তুমি গুপ্তচর নও? ...যারা তোমাকে পাঠিয়েছে তারা ভেবেছে নারীর মুখ দেখে আমি গলে যাব। তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে কতটুকু খবর রাখি কৌশলে তা-ই জেনে নিয়ে তুমি তাদের সব বলে দিবে' (ন. সি. চ.)। পরক্ষণে সিরাজউদ্দৌলা ক্ষিপ্ত হয়ে আলেয়াকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়ার আদেশ দেন। সেইসাথে হুশিয়ার করেন, গুপ্তচর নয় নিজেকে এমন প্রমাণ করতে না পারলে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে। 'জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক লাঞ্ছনা আমাকে সইতে হয়েছে। কলঙ্ক কালিমায় নাম পরিচয় সবই ঢাকা পড়েছে। বেঁচে থাকবার মত একটু গৌরববোধ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। গুপ্তচরের কলঙ্ক দিয়ে তাও নষ্ট করে দেবেন না জাঁহাপনা' (ন. সি. চ.) — আলেয়ার এই আবেগঘন সংলাপও নবাবকে কিছুমাত্র বিচলিত করেনি। তবে সে আলেয়াকে নির্দোষ প্রমাণ করার সুযোগ দেয়। এখানে একদিকে নবাবকে ন্যায়পরায়ণ ও অন্যদিকে শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন রূপে দেখা যায়। আত্মপ্রত্যয়ী আলেয়া জানায়, রাজা মোহনলাল তার পরিচয় জানেন এবং মৃত্যু ভয়ে সে ভীতু নয়। এখানে আলেয়ার নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায়। দৃশ্যটির এই পর্যন্ত মূল কাহিনির প্রতি আনুগত্যতা বজায় রেখে কাহিনির সততা রক্ষা করা হয়েছে। যদিও অনেক সংলাপই বাদ দেয়া হয়েছে। সিনেমায় সংলাপ বাদ দেয়ার একটি বড় সুবিধা হচ্ছে শুধুমাত্র অভিব্যক্তি দিয়ে বা দৃশ্যবর্ণনার দ্বারা চলচ্চিত্রে অনেক সময় সংলাপের কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু নাটকে পারিপার্শ্বিকতা বোঝাতে অধিক সংলাপ প্রয়োগ করতে হয়। চলচ্চিত্রে যেভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে তা দর্শকের চোখে বিশদভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব, নাটকের মঞ্চায়নে তা ভাবাও যায় না। 'the film artist is thereby able to do what is very hard for the theater director, namely, to show the world from the standpoint of an individual, to take man as the center of his cosmos—that is, to make a very subjective experience accessible to the eyes of all.'[২৪]

আলেয়ার সঙ্গে কথোপকথনের এক পর্যায়ে নবাবের স্ত্রী লুৎফুন্নিসা দরবারে প্রবেশ করেন। লুৎফাকে দেখে অসময়ে দরবারে আসার কারণ জানতে চান। উত্তরে লুৎফা বলেন, 'সারাদিন আপনার সন্ধান পাইনি। আপনি পরিশ্রান্ত, মহলে চলুন জাঁহাপনা। বিশ্রাম করবেন (ন. সি. চ.)'। আলেয়াকে বন্দি করার জন্য গোলামহোসেনকে আদেশ দিয়ে নবাব লুৎফার সঙ্গে অন্দর মহলে চলে যান। এখানে সিরাজউদ্দৌলাকে বিশ্রাম ভুলে গিয়ে দেশের জন্য নিরলস কাজ করে যেতে দেখানো হয়েছে। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটকে নিশীথ রাতে আলেয়ার সঙ্গে নবাবের কথোপকথনের এক পর্যায়ে লুৎফা দরবারে প্রবেশ করেন। এখানে দাড়িয়েই সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে কথা বলে লুৎফা প্রস্থান করেন। সিরাজউদ্দৌলাকে লুৎফার সঙ্গে মহলে যেতে দেখা যায়নি। বরং লুৎফা চলে যাওয়ার পর দরবারে দাড়িয়ে আলেয়ার সঙ্গে নবাবের বিস্তারিত কথোপকথন হয় এবং এখানেই মোহনলালকে ডেকে এনে আলেয়ার পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা হয়। কিন্তু সিনেমায় দেখা যায়, পরদিন মোহনলাল এলে আলেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে জানিয়ে সিরাজউদ্দৌলা লুৎফার সঙ্গে মহলে চলে যান। একই চিত্রনাট্যে ১৯৮৯ সালে পুনঃনির্মিত 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা'[২৫] (রঙ্গিন) সিনেমায়ও ঘটনাটি হুবহু চিত্রায়িত হয়েছে। যদিও পরের দৃশ্যে দেখা যায়, নবাব ঐ রাতেই পুনরায় ফিরে এসে কারাগারে গিয়ে আলেয়া ও মোহনলালকে মুখোমুখি করে সত্যতা নিশ্চিত করেছিলেন। মূলত দেশান্তপ্রাণ সিরাজউদ্দৌলাকে চিত্রায়নের পাশাপাশি পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল কর্তা হিসেবে দর্শকদের কাছে তুলে ধরাও চলচ্চিত্রকারের অভিপ্রায় ছিল।

মহলে যেতে যেতে আলেয়া শত্রুপক্ষের গুপ্তচর কি না লুৎফার এমন প্রশ্নে নবাবের মুখ থেকে 'জানিনা' উত্তরে লুৎফা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই তাকে বলতে শোনা যায়—'কিন্তু দরবারে দাড়িয়ে কি নির্ভয় কথা বলছিল। অথচ শুনেছি এই দরবার কক্ষে কথা বলতে গিয়ে মীরজাফর, রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠেরও গলা কেঁপে ওঠে (ন. সি. চ.)'। লুৎফার এ কথায় এক ধরনের শ্লেষ পরিলক্ষিত হয়। মূল নাটকে লুৎফা কে বলতে শোনা যায় 'শুনেছি এই দরবারে বীর মীরজাফরের, বিচক্ষণ রাজবল্লভের, ধনকুবের জগৎশেঠের আসন টলে উঠেছে। নবাব কি এখন থেকে ওই নর্তকীর মতো নারীদের নিয়েই দরবার বসাবেন?"[২৬] চলচ্চিত্রেও দেখা যায় লুৎফা কিছুটা সন্দেহ করেছে আঁচ করতে পেরে নবাব বলেন—'দরবারে দাড়িয়ে অকম্পিত কণ্ঠে কথা বলতে গেলে যে সততার প্রয়োজন, এই রাজ্যের বীর সেনাপতি আর বিচক্ষণ মন্ত্রিদের অন্তরে সেই সততা নেই। তারা দিনরাত ষড়যন্ত্র করছেন সিরাজকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে পথের ভিখারি করে ছেড়ে দিতে' (ন. সি. চ.)। এই সংলাপে বোঝা যায় নবাব ভাল করেই জানতেন তাঁর বিরুদ্ধ ষড়যন্ত্রকারীদের কথা। তারপরও তাদের বিরুদ্ধে দৃশ্যত কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি চলচ্চিত্রে। এখানে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিচক্ষণতার চরম ঘাটতি দেখা যায়। সিনেমায় শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে অনুকরণ করে নবাবের ক্ষমাশীল মনোভাব ফুটিয়ে তোলা এর একটি কারণ হতে পারে। রমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত বাংলাদেশের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে, 'সিরাজ নবাব হইয়া সেনাপতি মীরজাফর ও দিওয়ান রায়দুর্লভকে পদচ্যুত করেন এবং জগৎশেঠকে প্রকাশ্যে অপমানিত করেন। এই তিনজনই ছিলেন সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা।'[২৭] এই সূত্র থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় সিরাজউদ্দৌলা ষড়যন্ত্রকারীদের ব্যাপারে ভালোভাবেই জ্ঞাত ছিলেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। নাট্যকার ও চলচ্চিত্রকার উভয়েই এখানে সিরাজউদ্দৌলার মহানুভবতা তুলে ধরতে চেয়েছেন। লুৎফার সন্দেহ খণ্ডানোর জন্য সিনেমায় নবাবকে আবেগের আশ্রয় নিতে দেখা যায়।

সিরাজউদ্দৌলার আবেগপূর্ণ কথায় বিগলিত লুৎফার পরবর্তী সংলাপে বোঝা যায়, 'যেদিন থেকে সিরাজউদ্দৌলা মসনদে বসেছে, সেদিন থেকে লুৎফা তাঁকে আর বিশ্রাম নিতে দেখেননি, একদিনের জন্যও শান্ত দেখেননি, হাসতে দেখেননি। সুযোগ বুঝে সিরাজউদ্দৌলাও বলে ওঠে—'শুধু আমি কেন লুৎফা, সাড়া বাংলাদেশে কেউ হাসতে জানে না। বাঙালি জানে শুধু কাঁদতে। দিক থেকে দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হয় শুধু রোদনধ্বনি। আমি আর তা সইতে পারিনা লুৎফা, আমি আর তা সইতে পারিনা' (ন. সি. চ.)। এই সংলাপটি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটকে আলেয়াকে উদ্দেশ্য করে নবান বলেছিলেন।[২৮] চলচ্চিত্রকার এখানে লুৎফার কাছ থেকে সিরাজের সহানুভূতি আদায়ের উপায় হিসেবে সংলাপটির স্থানবদল করে দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রজাদের দুঃখ-কষ্টের জন্য সিরাজের মনের ভিতর হাহাকার করার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া লুৎফার আহ্বানে দরবার ত্যাগ করে মহলে চলে গিয়ে নবাব যে দ্বায়িত্বশীল স্বামীর ভূমিকা পালন করেছে তাও দেখানো হয়েছে।

আলেয়া ও মোহনলালের কথোপকথনে জানা যায় মোহনলাল আলেয়ার দাদা। দেশের জন্য আলেয়া নর্তকীর পথ বেছে নিয়েছে। মোহনলাল তাই পরিচয় দিতে চায় না। নবাব পুনরায় কারাগারে এসে মোহনলালের কাছে আলেয়ার পরিচয় জানতে চাইলে প্রথমে তাকে চিনে না বলে জানায়। একথা শুনে আলেয়া কান্নায় ভেঙ্গে পড়লে উপায় না দেখে গোলামহোসেন মুখ খুলে। পরক্ষণে মোহনলাল স্বীকার করে আলেয়া তার বোন। প্রাসাদের বাইরে নবাবের যে ক'জন হিতৈষী আছে, ও তাদেরই একজন। শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহ করে সে মোহনলালকে জানায়। কিন্তু সে জনসম্মুখে বোনের পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করে লজ্জায়। কারণ পর্তুগীজ দস্যুরা তাকে অপহরণ করেছিল। একারণে সমাজে তার ঠাঁই নেই। যে নিজের দোষে নয়, দুর্বৃত্তদের কবলে পড়ে সর্বহারা, দরবারের উচ্চপদস্থ হয়ে সেই বোনকে সে আশ্রয় দেয়নি, বোন বলে স্বীকার করেনি! —এসব শুনে নবাব অবাক হয়। বোনের প্রতি এরকম আচরণ দেখে মোহনলালকে ভৎর্সনা করে আলেয়ার কাছে ক্ষমা চান নবাব। এখানে নবাবকে তীক্ষ্ণ মানবিকতাবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নবাব নিজেই আলেয়াকে প্রাসাদের বাইরে রেখে আসতে চায়। জবাবে আলেয়া বলে, 'ধামি অলক্ষ্যে এসেছি অলক্ষ্যে যাওয়া উচিত' (ন. সি. চ.)। মূল নাটকে বর্ণিত আছে—'সিরাজ আলেয়াকে সাদরে ধরিয়া কক্ষের বাহির হইয়া গেলেন। গোলামহোসেন আর মোহনলাল চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল'[২৯] চলচ্চিত্রকার এখানে আলেয়াকে সবার অলক্ষ্যে রাখতে চেয়েছেন। একজন গুপ্তচরকে কতটুকু সঙ্গোপনে থাকতে হয় সেই সম্বন্ধে তাঁর সজাগ দৃষ্টি এখানে প্রতিভাত হয়।

আলেয়া মীরজাফর পুত্র মীরনের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে গোপনে সব খবর সংগ্রহ করতে থাকে। ঘসেটী বেগমের মতিঝিল প্রাসাদে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের গোপন বৈঠক হবে—এ খবর আলেয়া জানতে পারে। প্রেমের জালে ফেলে সে মীরনের সঙ্গে মতিঝিল প্রাসাদে উপস্থিত হয়। নারীর প্রতি মীরনের ছিল অসম্ভব দুর্বলতা। আলেয়া সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই মীরনের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। মূল নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ও সিকান্দার আবু জাফর রচিত নাটকের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিবেশের পুরোটা জুড়েই ঘসেটি বেগমের মতিঝিল প্রাসাদের বৈঠকের সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে। চলচ্চিত্রকার উভয় নাটক থেকে উপাদান নিয়ে নিজস্ব চিন্তার সংমিশ্রণে, সিনেমায় মতিঝিল প্রাসাদে বৈঠকের দৃশ্যটি নির্মাণ করেছেন। উভয় নাটকের কোনটিতেই উক্ত বৈঠকে মীরনের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ নেই। চলচ্চিত্রকার কাহিনিকে নাটকীয়

রূপ দেয়ার জন্য এই দৃশ্যে মীরনের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। এবং তারই সূত্র ধরে আলেয়াকে মতিঝিল প্রাসাদে উপস্থিত করে ষড়যন্ত্রের খবর নবাবের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। তবে সিকান্দার আবু জাফর রচিত নাটকে রাইসুল জুহালা নামক এক গুপ্তচরের উপস্থিতির কথা উল্লেখ আছে।[৩০] যে চরিত্রটি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটকের আলেয়া চরিত্রের আদলে নির্মাণ করা হয়েছে।

ঘসেটি বেগম রাতের অন্ধকারে পূর্ণিয়া পালিয়ে গিয়ে শওকত জঙ্গ–এর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে—একথা আলেয়া লুকিয়ে জেনে যায়। দ্রুত লোক মারফত এ খবর নবাবের কাছে পাঠানো হয়। এমন সংবাদ পেয়ে নবাব লুৎফাকে সঙ্গে নিয়ে তৎক্ষণাৎ মতিঝিল প্রাসাদে গিয়ে দেখেন ঘসেটি বেগম সবকিছু গুছিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এমতাবস্থায় বেগমসহ নবাবের উপস্থিতিতে ঘসেটি ঘাবড়ে যায়। নিজেকে ধাতস্থ করে জানায়, নবাবের প্রাসাদের দিকেই সে যাচ্ছিল। সুযোগ পেয়ে লুৎফাও একথার সূত্র ধরে বলে ওঠেন, তারাও হীরাঝিল প্রাসাদেই তাকে নিয়ে যেতে এসেছে। অতঃপর বাধ্য হয়েই ঘসেটি বেগমকে তাদের সঙ্গে হীরাঝিল প্রাসাদে যেতে হয়। সিকান্দার আবু জাফরের নাটকে দেখা যায় সিরাজউদ্দৌলা মোহনলালকে সঙ্গে নিয়ে ঘসেটি বেগমের জলসায় উপস্থিত হন এবং সেখানে উপস্থিত উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ ও রায়দুর্লভকে স্বচক্ষে দেখতে পান। কিন্তু মীরজাফরের উপস্থিতির কথা উল্লেখ নেই। অন্যদিকে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটকে সিরাজ রায়দুর্লভের সঙ্গে লুৎফাকে মতিঝিল প্রাসাদে পাঠান ঘসেটি বেগমকে নিয়ে আসার জন্য। এই নাটকে মতিঝিল প্রাসাদের দৃশ্যে শুধুমাত্র ঘসেটি বেগম ও তার মন্ত্রণাদাতা রাজবল্লভের উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। চলচ্চিত্রকার দুই নাটক থেকেই চরিত্র নিয়ে এবং সেইসাথে মীরজাফর, মীরণ, আলেয়া চরিত্রগুলোর সন্নিবেশ ঘটিয়ে দৃশ্যটি নির্মাণ করেছেন। যাতে দর্শকরা সহজেই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বিষয়টি সবিস্তারে বুঝতে পারে। চলচ্চিত্রকার সংলাপের ব্যবহার ও ঘটনার সংশ্লেষে সিনেমাকে অনেকটা উপন্যাসের মত বর্ণনাবহুল করে তুলেছেন। সিনেমাভাষার ব্যবহার এখানে একেবারেই অনুপস্থিত। সিনেমার অন্তরঙ্গে প্রতীক কিংবা রূপকের ব্যবহারও পরিলক্ষিত হয় না। পূর্বেই বলা হয়েছে পরিচালক পুরো সিনেমার মূল ভাবটিকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করে স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার জনগণকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছেন। এ অভিষ্ট সাধন করতে গিয়ে খান আতা সকল শ্রেণির দর্শকের কথা মাথায় রেখে, পড়ার মতো করে সহজপাঠ্য সিনেমা নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন।

মতিঝিল প্রাসাদ থেকে ফিরে মীরমর্দান ও মোহনলালের কাছ থেকে সিরাজউদ্দৌলা জানতে পারেন পূর্ণিয়ার নবাব শওকত জঙ্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। শওকত জঙ্গ দিল্লি থেকে সনদ পেয়েছে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব হিসেবে। জগৎশেঠ সে সনদ নিজে পৌঁছে দিয়েছে শওকত জঙ্গকে। এই খবর শুনে সিরাজউদ্দৌলা অস্থির হয়ে বলে—'শওকত জঙ্গকে নবাব করতে পারলে তাদের বড় সুবিধে হয়। তার মতো একটা অপদার্থকে নবাব করতে পারলে ষড়যন্ত্রকারীরা দেশটাকে লুটেপুটে ইংরেজ কুঠিয়ালদের কাছে বিক্রি করে দিতে পারবে। ...'আমি কি করব মোহনলাল? জগৎশেঠ, রাজভল্লব, আমীরচাঁদ (উমিচাঁদ) তাদের কি বন্দি করব? নির্বাসন দিব? না দেশদ্রোহিতার অপরাধে ফাঁসি দিব?' (ন. সি. চ.)। মোহনলাল বাধা দিয়ে বলে 'সে সময় এখনো আসেনি জাঁহাপনা'। (ন. সি. চ.)। সিরাজউদ্দৌলা উত্তেজিত হয়ে বলে, 'কবে আসবে মোহনলাল। জেনেশুনে এইসব বিশ্বাসঘাতকদের সহ্য করতে হবে আর কতদিন?' (ন. সি. চ.)। কাশিমবাজার কুঠির জলসা কবে জেনে নিয়ে সৈন্য প্রস্তুত করে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করতে মোহনলালকে নির্দেশ দেন এবং যাওয়ার

সময় বলে যান—কাল দরবারে জগৎশেঠ যেন হাজির থাকে। মোহনলাল বিনীতভাবে অনুরোধ করে দরবারে যাতে নবাব উত্তেজিত না হন। এই দৃশ্যটির বর্ণনা শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কিংবা সিকান্দার আবু জাফরের নাটকে উল্লেখ নেই। চলচ্চিত্রকার অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত ইতিহাস থেকে তথ্য নিয়ে নিজের মতো করে দৃশ্যটির অবতারণা করেছেন।[৩১] এখানে সিরাজের অস্থির ও কিংকর্তব্য মনোভাবাপন্নতার পরিচয় পাওয়া যায়—যা ঐতিহাসিক সত্যতাকে সমর্থন করে।

পরদিন দরবারে আসন গ্রহণ করে সিরাজউদ্দৌলা একে একে উপস্থিতদের উদ্দেশ্য করে বলতে বলতে জগৎশেঠের কাছে জানতে চান, সনদ আনানো হয়েছে কিনা? জগৎশেঠ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে, বার বার বর্গিদের সাথে সন্ধি করতে গিয়ে টাকশালের বহু ঘাটতি পরেছিল। সেই কারণে এতদিন সনদ আনতে পারেনি। নবাব জানতে চান, রাজকোষে অর্থের অভাব এতদিন বলেনি কেন? বিদেশি কুটিয়ালদের উপর নতুন কর চাপানো যেত। জগৎশেঠ বলে 'সেটা কি ভাল হত জাঁহাপনা। ওরা সাত সমুদ্রের পাড় থেকে আপনারই আশ্রয়ে বাণিজ্য করতে এসেছে জাঁহাপনা। তাদের উপর কর চাপানো...' (ন. সি. চ.)। —কথাটা শেষ করার আগেই নবাব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। নবাবের চিৎকারে দরবারের সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর গলার স্বর স্বাভাবিক করে নবাব বলে, 'বেশ। যত টাকার প্রয়োজন আমি দিচ্ছি। সনদ আনিয়ে দিন, (ন. সি. চ.)। নবাবের কথায় জগৎশেঠ আমতা আমতা করে। কারণ সে ইতোমধ্যে একবার শওকত জঙ্গ-এর নামে সনদ আনিয়েছে। পরক্ষণে নবাব জানতে চান—'শওকত জঙ্গ-এর নামে সনদ এল কি করে? তার কাছ থেকে কত টাকা ঘুষ খেয়েছিলেন শেঠজী, যে দেশের শাসনভার শওকত জঙ্গ-এর মত অপদার্থের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন? আপনার টাকার বড় লোভ। কিন্তু এই দেহটা যখন চিতায় জ্বলবে তখন কি এই মুল্যবান পাথরের মালাগুলো আপনার গলায় থাকবে'? (ন. সি. চ.) —এই বলে নবাব টান দিয়ে জগৎশেঠের গলার মালাগুলো ছিঁড়ে ফেলে। এতে ভয়ে সবার মুখ পাংশু হয়ে যায়। নকিবকে দরবারের সমাপ্তি ঘোষণা করতে বলে নবাব বেরিয়ে যায়। এই দৃশ্যটিও পূর্বের ন্যায় পূর্বোল্লিখিত দুজন ঐতিহাসিকের গ্রন্থ থেকে তথ্য নিয়ে দৃশ্যায়ণ করেছেন। তবে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়'র উল্লেখ মতে, জগৎশেঠকে অপমান নয়, কারারুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেলেন নবাব।[৩২]

এই ঘটনার পর সবাই দরবার ত্যাগ করলে মোহনলাল বিমর্ষ হয়ে নবাব সমন্ধে বলে, 'শুধু যদি একটু ধৈর্যজ্ঞান থাকত' (ন. সি. চ.)। মীরমর্দান বলে, 'কিন্তু অন্তরের সবটুকুই সোনা। তা-ই যথেষ্ট' (ন. সি. চ.)। মোহনলাল বলে 'কিন্তু রাজাকে রাজনীতি জানতে হয়' (ন. সি. চ.)। মোহনলালের এই কথার ঐতিহাসিক সত্যতা মিলে। কারণ 'সিরাজ কূট রাজনীতি এবং লোকচরিত্র এই উভয় বিষয়েই অনভিজ্ঞ ছিলেন। ...সিরাজের অস্থিরমতিত্ব, অদূরদর্শিতা, লোকচরিত্রে অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি ছাড়াও তাঁহার চরিত্রে আরও অনেক দোষ ছিল।'[৩৩] ইতিহাসে আলোকপাত করলে মোহনলাল চরিত্রটিকে দেখা যায়—সে অত্যন্ত চুরতার সঙ্গে নবাবের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। শুরুতে তার কোন পদই গৌরবের ছিলনা। ক্রমে সে বিভিন্ন কৌশলে সামান্য পদবী হতে সিরাজউদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রিপদে আরোহণ করেছিলেন। এমনকি নবাবের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তারের জন্য নিজের সর্বাঙ্গসুন্দরী বোনকে সিরাজের অন্তঃপুরে পাঠিয়েছিল।[৩৪] কিন্তু সে অন্যদের মতো সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়নি। বরং পলাশীর যুদ্ধে একাকী বীরপ্রতাপে দেশ ও নবাবের

সিংহাসন রক্ষার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিল। এরূপ তথ্যের উপর ভর করে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর নাটকে মোহনলালের ভগিনীরূপে আলেয়াকে সৃষ্টি করেছিলেন বলে প্রতিভাত হয়।

সিনেমায় অপর দৃশ্যে নবাব তাঁর মা আমিনা বেগমকে বলতে শোনা যায়, 'রাজনীতি বুঝিনা আম্মি। শুধু বুঝি আমার এই দেশকে, দেশের মাটিকে, দেশের মানুষকে। ...যারা শুধু নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে, তাদের আমি কি করে শ্রদ্ধা করি। তাদের সামনে আদত করে কথা বলা, তাদের মন রক্ষা করে চলা। কী করে সম্ভব? এরই নাম যদি রাজনীতি হয়ে থাকে, এই রাজনীতি আমি কোনদিন শিখতে পারবনা আম্মি' (ন. সি. চ.)। এই সংলাপের আড়ালে সিরাজের দোষ ঢাকার চেষ্টা করেছেন চলচ্চিত্রকার। মা আমিনা বেগম জানায়, তাঁর আস্থা আছে সিরাজের উপর এবং সে ভাল করেই জানে নিজের প্রিয় কন্যা উম্মে জোহরার চেয়ে সিরাজউদ্দৌলা বেশি ভালবাসে এই দেশকে। কিন্তু দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে সে যদি হিংস্র হয়ে ওঠে তাতে কোন পাপ নেই। ছেলের প্রতি মায়ের এরকম মনোভাবের মাধ্যমে সিরাজের দেশপ্রেম ও দেশের প্রতি সর্বোচ্চ অনুরাগ ব্যক্ত করা হয়েছে। মায়ের মুখে মেয়ের কথা শুনে সিরাজের মেয়ে উম্মে জোহরার কথা মনে পড়ে যায়। পরের দৃশ্যে দেখা যায় জোহরা উস্তাদের কাছে অস্ত্রচালনা শিখছে। সিরাজউদ্দৌলা ও লুৎফা এমন সময় সেখানে প্রবেশ করেন। মেয়ের পারদর্শিতা দেখে বাবা-মা হাততালি দেয়। তাদেরকে দেখে জোহরা অস্ত্র ফেলে বাবার দিকে ছুটে আসার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু হঠাৎ নিজের ভুল বুঝতে পেরে মেঝে থেকে অস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে আবার উস্তাদের হাতে সমর্পণ করে তার প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করে। এরপর দৌড়ে গিয়ে বাবার কোলে ওঠে। এই দৃশ্যে নবাব পরিবারে সুশিক্ষা চর্চার আভাস দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতঅর্থে দৃশ্যটি চলচ্চিত্রকারের সুকুমারবৃত্তির পরিচয় বহন করে। এই দৃশ্যটিও খান আতা নিজস্ব চিন্তা থেকে বর্ধিত করেছেন। সিনেমায় সিরাজউদ্দৌলাকে ঘরে-বাইরে, সমাজে-রাষ্ট্রে, পরিজন-জনগণের কাছে আদর্শস্থানীয় করে তোলার জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা করা হয়েছে।

সিনেমার পরের দৃশ্যে ষড়যন্ত্রকারীরা গোপন বৈঠকে বসে। আলীবর্দির মৃত্যুর সময় তারা সিংহাসন রক্ষার ওয়াদা করলেও সিরাজউদ্দৌলাকে এখন আর সহ্য করতে পারছে না। এইসব প্রবীণ সভাসদদের কাছে নবাব এক অর্বাচীন বালক। সিরাজউদ্দৌলার উদ্ধত আচরণে এরা যে অতিষ্ঠ ছিল তার আভাস পাওয়া যায় গোপন বৈঠকে রাজভল্লবের সংলাপে—'কেন তাকে সহ্য করা হয়। নবাব আলীবর্দির কাছে আমরা ওয়াদা করেছিলাম সত্য। কিন্তু তার মানে কি এই, দিনের পর দিন এই অর্বাচীন দুর্বৃত্ত বালকের কাছে সবাইকে অপমানিত হতে হবে (ন. সি. চ.)।' তারা সবাই মিলে একমত হয় মীরজাফকে বাংলার মসনদে বসাবে। ইতোমধ্যে তারা কলকাতায় গভর্নর ড্রেকের কাছে চিঠি পাঠিয়ে তাদের অভিসন্ধির কথা জানিয়েছে। এসব শুনে মীরজাফর কিছুটা শ্লাঘা অনুভব করে। প্রসঙ্গ ঘোরাতে জগৎশেঠকে উদ্দেশ্য করে শওকত জঙ্গ-এর নামে সনদ আনানোর কারণ জানতে চায়। জগৎশেঠ নিজের ভুল স্বীকার করে মীরজাফরকে জাঁহাপনা সম্বোধন করলে মীরজাফর বিগলিত হয়ে ওঠে। নেহাত ভুলে যে জগৎশেঠ এ কাজ করেনি এবং নিজের অর্থযোগের হেতু শওকত জঙ্গ-এর হয়ে কাজ করেছিল তা ইতিপূর্বে নবাবের কথায়ও স্পষ্ট বোঝা যায়। তারা একে অন্যের অভিসন্ধি বুঝতে পারলেও সবাই স্বীয়-স্বার্থ বিবেচনায় ঐক্যবদ্ধ ছিল। তারপরও নবাবের বিরুদ্ধে কতগুলো লোভাতুর মানুষের স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির গোপন ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে দেখানোর জন্য পরিচালক এই দৃশ্যটি নির্মাণ করেছের সিকান্দার আবু জাফরের নাটক থেকে।[৩৫] শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটকে এরকম

দৃশ্যের অস্তিত্ব নেই। তবে অক্ষয়কুমারের বর্ণনায় গুপ্তমন্ত্রণার কথা উল্লেখ আছে। 'স্বার্থরক্ষার জন্য জগৎশেঠের মন্ত্রভবন পুনরায় নৈশসম্মিলনের সঙ্কেতস্থান হইয়া উঠিল। যাঁহারা গুপ্তমন্ত্রনায় মিলিত হইতে লাগিলেন তাঁহারা কেহই দেশের জন্য বা দশের চিন্তা করিতেন না—জৈন জগৎশেঠ, মুসলমান মীরজাফর, বৈদ্য রাজবল্লভ, কায়স্থ দুর্ল্লভরাম, সুদখোর উমিচাঁদ, প্রতিহিংসাতাড়িত মানিকচাঁদ,—ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও শোণিতসংস্রব বা স্নেহবন্ধন ছিল না; কেবল স্বার্থরক্ষার জন্যই একে অপরের পৃষ্ঠরক্ষার্থ দলবদ্ধ হইয়াছিলেন।'[৩৬]

কাশিমবাজার কুঠির জলসা শেষে ওয়াট্স, মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে—এমন সময় আলেয়া কক্ষে প্রবেশ করে। নর্তকীর ছদ্মবেশে ইতোমধ্যে সে ইংরেজদের মনও অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে। তাই তার সামনেই সবাই মিলে তাদের কুপরিকল্পনা করতে দ্বিধাবোধ করে না। এমন সময় বাইরে গোলার শব্দ শোনা যায়। মীরজাফর মনে করে হতবুদ্ধি শওকত জঙ্গ পূর্ণিয়া থেকে এসে বোধহয় কুঠি আক্রমণ করে বসেছে। প্রচণ্ড গোলাগুলিতে সবাই ভয় পেয়ে যায়। এমন সময় একজন ইংরেজ সৈন্য এসে খবর দেয় নবাবের সৈন্যরা কুঠি আক্রমণ করেছে। ওয়াট্স ক্রোদ্ধ হয়ে পাল্টা আক্রমণ করতে চায়। কিন্তু রাজবল্লভ বাঁধা দেয়। কারণ সে জানে নবাব সৈন্যদের সামনে তারা টিকতে পারবেনা। তাই সে পরামর্শ দেয় যে ওয়াট্স যেন বলে, আজ তাদের উৎসব। আর সবাই এখানে নিমন্ত্রিত অতিথি। দৃশ্যের এই অংশটুকু শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে। সিকান্দার আবু জাফরের নাটকে কাশিমবাজার কুঠি আক্রমণের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। রমেশচন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থেও এরকম বর্ণনা নেই। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়'র বর্ণনায় উল্লেখ আছে, '১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ মে সোমবার অপরাহ্ণে উমরবেগ জমাদার তিন সহস্র অশ্বারোহী লইয়া কাশিমবাজারে উপনীত হইয়া, নীরবে শিবির– সন্নিবেশ করিলেন। ...সুতরাং একে-একে দুই-একটি করিয়া সুচতুর ইংরাজ-কুঠিয়াল ইতস্তত: পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ...দূর্গমধ্যে কেবল ৩৫ জন গোরা, আর ৩৫ জন কালা সিপাহী, আর জন কতক লস্কর ভিন্ন অধিক সেনাবল ছিল না। ...সোম, মঙ্গল, বুধ চলিয়া গিয়াছে; বৃহস্পতিবারও চলিয়া যায়। প্রাচীরের বাহিরে সিপাহি-সেনা কাতারে কাতারে সমবেত হইতেছে, ইচ্ছা করিলে এখনি কাশিমবাজারের ক্ষুদ্র দুর্গ ধূমপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন করিয়া মুহূর্তমধ্যে ভগ্নাবশেষ করিতে পারে; অথচ একজন সিপাহীও বন্দুক উঠাইতেছে না। ৪ঠা জুন মুচলিকা-পত্র স্বাক্ষরিত হইলে কাশিমবাজারের ইংরাজ-দূর্গ সিরাজউদ্দোলার হস্তে সমর্পিত হইল।'[৩৭] এই সূত্র থেকে কাশিমবাজার কুঠির সৈন্য সামন্তের যে সংখ্যা জানা যায় তাতে এটা পরিষ্কার যে স্বয়ং সিরাজউদ্দোলার কুঠি আক্রমণে যাওয়ার কোন প্রয়োজন পরেনি—এরকম বর্ণনাও অক্ষয় কুমার মত্রৈয়-এর গ্রন্থে নেই। নবাব সৈন্যরাও কুঠি আক্রমণ করেনি। বরং বিনা রক্তপাতে ইংরেজ কর্তৃক মুচলেকা প্রদানের মাধ্যমে কাশিমবাজারে অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। চলচ্চিত্রকার সিরাজকে করিৎকর্মা প্রমানের মানসে এই গল্প ফেঁদেছেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

সিনেমায় প্রচণ্ড গোলাগুলির পর মোহনলালের নেতৃত্যে নবাব সৈন্য ভিতরে প্রবেশ করে। মূল নাটকে কুঠি লক্ষ্য করে নবাব সৈন্যদের কামানের গোলাবর্ষণের পর রায়দুর্লভের নেতৃত্বে সৈন্যরা কুঠিতে প্রবেশ করতে দেখা যায়।[৩৮] রায়দুর্লভের মত বিতর্কিত ব্যক্তিকে নবাবের পাশে না রেখে মোহনলালকে সিনেমায় ব্যবহার করে চলচ্চিত্রকার নবাবের পাশে একজন বিশ্বস্ত লোকের সমাবেশ

ঘটিয়েছেন। মোহনলাল প্রবেশের পরপরই নবাব সিরাজউদ্দোলা ভিতরে প্রবেশ করেন। তাঁকে দেখে ষড়যন্ত্রকারী সভাসদরা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। যদিও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর বর্ণনায় কাশিমবাজার কুঠিতে সভাসদদের কেউ উপস্থিত ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটকের অনুকরণেই এই দৃশ্য এগিয়ে যেতে থাকে। নবাব ওয়াট্‌সের কাছে কাশিমবাজার কুঠিতে অস্ত্র আমদানির কৈফিয়ত চায়। ড্রেক কলকাতার দুর্গ সংস্কার কেন বন্ধ করবে না বলে জানিয়েছে এরও জবাব চায় তার কাছে। ওয়াট্‌স বলে মি. ড্রেক কি করেছে তা সে জানে না। জবাবে নবাব বলেন, 'না জানলেও তোমাকেই কৈফিয়ত দিতে হবে। কেননা তুমিই কোম্পানির প্রতিনিধি। তোমাকে যে এতদিন সম্মান দেখানো হয়েছে তা শুধু সেই কারণে। নইলে তোমার ব্যক্তিগত চরিত্রের যে পরিচয় আমি পেয়েছি, তাতে তোমার মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গাধায় চড়িয়ে এদেশ থেকে বের করে দিতুম (ন. সি. চ.)।' আমিরচাঁদকে সাবধান করে দিয়ে নবাব বলেন, 'বাংলায় এসে স্বার্থ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে তুমি যেমন নিজের তেমনি আমাদেরও সর্বনাশের সূচনা করছ' (ন. সি. চ.)। এখানে নবাবকে কিছুটা উচ্চস্বরে আবেগী সংলাপ বলতে দেখা যায়। পুরো সিনেমাতেই নবাবের সংলাপের ধরণ প্রায় একই রকম ছিল। থিয়েটার বা যাত্রাপালায় পিছনের দর্শকদের কানে সংলাপ পৌঁছে দিতে পাত্র-পাত্রীকে উচ্চস্বরে সংলাপ বলে যেতে হয়। যা চলচ্চিত্রে নিষ্প্রয়োজন এবং সিনেমার জন্য তা অশোভনও বটে। কেননা সিনেমায় আলাদা সাউন্ড ট্রেকে সংলাপ ধারণ করা হয় যাতে দর্শকরা পরিষ্কারভাবে সংলাপ শুনতে ও বুঝতে পারে। তাছাড়া প্রেক্ষাগৃহ বা ঘরের ভিতর যেখানে বসেই দর্শকরা সিনেমা দেখুন না কেন প্রয়োজন মতো সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে তারা সংলাপ শুনতে পারে। 'শুটিং-এর সময়ে শিল্পীদের বলা সংলাপ কিন্তু মূল ছবিতে ব্যবহার করা হয় না। ইনডোর বা আউটডোর যেখানেই শুটিং হোক কিছু অবাঞ্ছিত শব্দ সংলাপের সাথে চলে আসে। এই অবাঞ্ছিত শব্দ মূল সাউন্ড ট্র্যাক থেকে মুছে ফেলা যায় না। তাই ডাবিং পদ্ধতির সাহায্যে আর একটি সাউন্ড ট্র্যাক তৈরি করা হয় যার ফলে সংলাপের সঙ্গে কোনো অবাঞ্ছিত শব্দ মিশে যেতে পারে না।'[৩৯]

কাশিমবাজার কুঠি অধিকারের পর সিরাজ কলকাতা অভিযানের উদ্যোগ নেন। মীরজাফর ও রাজভল্লবকে তার সঙ্গে করে কলকাতা অভিযানে নিয়ে যাওয়ার আদেশ করেন ও জগৎশেঠকে মুর্শিদাবাদেই থাকার নির্দেশ দেন। এর প্রেক্ষিতে শেঠজী নবাবের কাছে জানতে চায়—মীরজাফর আর রাজভল্লবকে কলকাতায় নিয়ে গেলে মুর্শিদাবাদ কি একেবারে অরক্ষিত হয়ে পড়বেনা? সিরাজ বলে হুম গুরুতর প্রশ্ন। বিনা মন্ত্রণায় কিছুই করা ঠিক নয়। গোলাম হোসেনকে ডাক দিয়ে জানতে চায় মীরজাফর ও রাজভল্লবকে কলকাতায় নিয়ে গেলে মুর্শিদাবাদের কোন ক্ষতি হবে কিনা? গোলামহোসেন একটা রূপক গল্প বলে—'একসময় এক চোরের দলের সাথে আমাকে থাকতে হতো। নগরের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রাণী কি? তাই নিয়ে একদিন চোরের দলের তুমুল তর্ক। ...সাব্যস্ত হল শিয়াল আর পেঁচা না থাকলে নাগরিকদের বড়ই ক্ষতি হয়। ...শিয়াল ধূর্ত, গর্তেই লুকিয়ে থাকে। আর পেঁচাও অশুভ। আঁধার ছেড়ে আলোয় আসতে চায়না। কিন্তু তবুও শিয়াল প্রহর ঘোষণা করে আর পেঁচা অমঙ্গলের আভাস দিয়ে নাগরিকদের উপকার সাধন করে। সেই থেকে চোরের দল শিয়াল আর পেঁচাকে পূজো দিতে লাগল' (ন. সি. চ.)। এখানে গোলামহোসেনকে নদিয়া জেলার প্রখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় নিযুক্ত নবরত্নদের অন্যতম গোপাল ভাঁড়ের ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায়। যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের একজন অত্যন্ত আস্থাভাজন মন্ত্রক ছিলেন। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাকে সেই রূপেই চিত্রিত করতে চেয়েছেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়

জগৎশেঠকেও কলকাতা অভিযানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর কুচক্রীদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ ছিল নবাবের অনুপস্থিতিতে তারা যেন মুর্শিদাবাদ দখল করে শওকত জঙ্গকে মসনদে বসিয়ে না দেয়।

> তৎকালে কলিকাতায় অল্প কয়েক সহস্র ইংরাজ বনিকের বসতি ছিল। তাঁহারা যেমন সংখ্যায় নগন্য, সেইরূপ সমরকৌশলে নিতান্ত অশিক্ষিত। তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে বিশেষ আড়ম্বর করা নিষ্প্রয়োজন। সিরাজউদ্দোলা তাহা জানিতেন। কিন্তু পাছে তাঁহার অনুপস্থিতিকালের অবসর পাইয়া কুচক্রিদল শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে, এই ভয়ে যাঁহার যাঁহার প্রতি সন্দেহ সমধিক প্রবল, তাঁহাদের সকলকেই সঙ্গে লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন; নিতান্ত অনুগত কয়েকজন সেনানায়ক রাজধানীরক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইচ্ছা না থাকিলেও, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর, মানিকচাদ; সকলকেই সসৈন্য নবাবের অনুগমন করিতে হইল।[৪০]

শুধুমাত্র পাদ্রী স্ট্রংকে রেখে সকলকে বন্দি করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন নবাব। কারণ, 'পিছনে শত্রু রেখে যুদ্ধযাত্রা কোন কাজের কথা নয়' (ন. সি. চ.)। এসময় আলেয়া হাতজোড় করে বলে—'আমি পেশাদার নর্তকী জাঁহাপনা। আমার অপরাধ মার্জনা হোক।' সবার সামনে এই লোক দেখানো ক্ষমা চাইলেও আলেয়ার কান্ডে নবাব খুশি হয়। মূল নাটকে আলেয়াকে নিজ থেকে কথা বলতে দেখা যায়নি। বরং সবার সাথে কথা শেষে আলেয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে নবাবকেই বলতেই দেখা যায়, 'তোমাকে তিরস্কার করা হয়নি সুন্দরী; পুরস্কারই তোমার প্রাপ্য।'[৪১] সিনেমায় চলচ্চিত্রকার এই দৃশ্যেও আলেয়াকে পূর্বের ন্যায় আড়ালে রাখতে নবাবের কাছে আত্মপক্ষ সমর্পণ করার সুযোগ দিয়েছেন।

আলীবর্দীর মৃত্যুর পর শুধুমাত্র ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নয়—ইতিহাস বলে ঘসেটি বেগমের সঙ্গে সিরাজের দ্বন্দ্ব পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছিল। ঘসেটির স্বামী ছিল ঢাকার শাসনকর্তা। তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য, বুদ্ধিহীন ও অতিশয় দুর্বল প্রকৃতির লোক হওয়ায় দিওয়ান হোসেন কুলী খানের উপর নির্ভর করতে হতো। এই সুযোগে হোসেন কুলী খানের সঙ্গে ঘসেটি বেগমের অবৈধ প্রণয় শুরু হয়। এ কারণে সিরাজ হোসেন কুলী খানকে প্রকাশ্য রাজপথে হত্যা করে। এরপর রাজবল্লভকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ঘসেটির স্বামীর মৃত্যুর পর সিরাজ তহবিল তছরূপের অপরাধে রাজবল্লভকে বন্দি করেন।[৪২] এসব কারণে ঘসেটি বেগম চরম ক্ষিপ্ত ছিল সিরাজের প্রতি। এর বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় চলচ্চিত্রে আমিনা বেগম ও ঘসেটী বেগমের সংলাপে। সিনেমায় আমিনা বেগমকে বলতে দেখা যায়—'সিরাজ তো তোমারও পুত্র। তুমিই তো তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছ।' উত্তরে ঘসেটী বেগম বলে—'অদৃষ্টের পরিহাস, তাই ভুল করেছিলাম। যদি জানতাম বড় হয়ে সে একদিন আমার সৌভাগ্যের অন্তরায় হবে। তাহলে দুধের শিশু সিরাজকে প্রাসাদ চত্তরে আছড়ে মেরে ফেলতে আমি কিছুমাত্র দ্বিধা করতামনা। ...বৃদ্ধ নবাবকে ছলনায় ভুলিয়ে তোমরা সিংহাসন দখল করেছ। তোমাকে আমি চিনিনা তুমি লোভী, হিংসুটে। কিন্তু মনে রেখ আর বেশিদিন তোমার ছেলেকে নবাবী করতে হবে না' (ন. সি. চ.)। সিনেমায় এই দৃশ্যটুকু সিকান্দার আবু জাফর রচিত নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে।[৪৩] মূল নাটকে ঘসেটী বেগম একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। প্রথম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যের পুরোটা জুড়েই তাঁর উপস্থিতি ছিল। এছাড়া দ্বিতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যেও তাঁর উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি

ছিল। সিকান্দার আবু জাফর রচিত নাটকেও প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় দৃশ্যের পুরোটায় এবং তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম দৃশ্যে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। অনুরূপ সিনেমায়ও ঘসেটী বেগমের চরিত্রটিকে আরেকটু বর্ধিত করার সুযোগ ছিল।

প্রচন্ড গোলাগুলির মধ্য দিয়ে কলকাতার দুর্গ আক্রমণ করে নবাব সৈন্য। সিরাজউদ্দোলার কাছে ইংরেজদের দূত সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসে। তারা বিনাশর্তে সন্ধি করতে চায়। সিরাজউদ্দোলা দূতকে বলেন, 'ড্রেককে বল সন্ধির কথা বিবেচনা করব মুর্শিদাবাদ গিয়ে।' মোহনলালকে পূর্ণিয়ার শওকত জঙ্গ-এর ভার দিয়ে মীরমর্দানকে মুর্শিদাবাদ যাত্রার আয়োজন করতে বলে সবাইকে যার যার শিবিরে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেন। মীরজাফরকে এতে অসন্তুষ্ট হতে দেখা যায়। মোহনলাল চলে যাওয়ার সময় তাকে ডেকে নবাব কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে, 'শওকত জঙ্গকে হত্যা করোনা মোহনলাল। বিদ্রোহী হলেও সে আমার ভাই।' এখানে নবাবকে ভাতৃবৎসল ও মানবিক দেখানো হয়েছে। কলকাতা আক্রমনের কিয়দংশ সিকান্দার আবু জাফরের নাটক থেকে নিয়ে এই দৃশ্যটি পরিচালক নিজের মতো করে দৃশ্যায়ন করেছেন। সিকানদার আবু জাফরের নাটকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম দৃশ্যে কলকাতা আক্রমণের বর্ণনা রয়েছে। কলকাতা জয় করে নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরে যায় বলেও একই অধ্যায়ের দ্বিতীয় দৃশ্যে হলওয়েলের কথায় জানা যায়— 'মুর্শিদাবাদে ফিরেই নবাব আমাদের মুক্তি দিয়েছেন।' অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়'র গ্রন্থেও এর সত্যতা মিলে। এছাড়া কলকাতা বিজয়ের মাসকাল পর নবাব মীরজাফরকে সঙ্গে নিয়ে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পূর্ণিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন এবং মোহনলালের নেতৃত্বে পূর্ণিয়া বিজয় হয় সেই তথ্য পাওয়া যায়।[৪৪] সিনেমার এই দৃশ্যে কলকাতা বিজয়ের পরপরই মোহনলালকে পূর্ণিয়া অভিযানের দ্বায়িত্ব দিয়ে পরিচালক ঘটনার কলেবর কমাতে চেয়েছেন এবং মোহনলালের উপর নবাবের পূর্ণ আস্থার বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন। একারণে পূর্বেই পরিচালক শওকত জংয়ের বিদ্রোহের খবর প্রচার করে পূর্ণিয়া অভিযানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে সিরাজউদ্দোলা মাকে জানান—'দাদুর নামে কলকাতার নাম আলীনগর রাখা হয়েছে। ইংরেজদের ফোর্ড উইলিয়াম দুর্গ এখন জনসাধারণের মসজিদ।' সিকান্দার আবু জাফরের নাটকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম দৃশ্যে কলকাতা বিজয়ের পর সেনাপতি মীরমর্দানকে ফোর্ড উইলিয়ামের ভিতরে একটি মসজিদ তৈরির আদেশ দিয়েছিলেন। সিরাজউদ্দোলার মানবিক ও ধর্মভীরু রূপকে দর্শকের সামনে মূর্তমান করার জন্য পরিচালক এখানে বাড়তি দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। পূর্ণিয়া বিজয় শেষে মোহনলাল ফিরে এসে শওকতজঙ্গকে অনিচ্ছাকৃত হত্যার কথা জানালে নবাব ভাতৃশোকে ভেঙে পড়েন এবং মোহনলালকে প্রসাদের বাইরে নিয়ে যেতে বলেন। বাইরে বসে নবাব স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন। সিনেমার এই যায়গায় পরিচালক নিজের মতো করে ছোট ছোট দৃশ্যের অবতারণা করে একদিকে কাহিনিতে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন অন্যদিকে কাহিনির গতিসঞ্চার করেছেন।

নবাবের দরবারে ওয়াট্স উপস্থিত। সিরাজ ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, 'রয়াট্স। ...আলীনগরে তোমাদের কোম্পানীর সঙ্গে যে সন্ধি হয় তার সব শর্ত তোমারও জানা আছে। আর এও জানা আছে যে তার প্রত্যেকটি শর্ত তোমরা লঙ্ঘন করেছ। তুমি ওয়াট্স আমার এ দরবারে স্থান পেয়ে আমারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাত। কলকাতার ইংরেজদের আদেশ দাও আমার আদেশ অমান্য করতে' (ন. সি. চ.)। উল্লেখ্য আলীনগর সন্ধির শর্ত হিসেবে কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি হিসেবে

ওয়াট্সকে নবাব দরবারে স্থান দেওয়া হয়েছিল। সন্ধির আট নম্বর শর্তে উল্লেখ ছিল—'কোম্পানীর একজন দূত নবাবের দরবারে থাকিবেন, তিনি যখনই প্রয়োজন বোধ করিবেন নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাকে যথোচিত সম্মান দেখাইতে হইবে'।[৪৫] ওয়াট্স ঔদ্ধ্যত স্বরে একথার জবাব দেয়— 'নবাব আমাকে যাহা খুশি শাস্তি দিতে পারেন। আমি আমার ডিউটি পালন করেছি।' ওয়াট্সের প্রতি রাগান্বিত হয়ে নবাব বলেন—'শাস্তি? আমার একটি ক্ষুদ্র ইশারায় তোমার ওই উদ্ধত শির দেহচ্যুত হয়ে এই দরবারের মেঝেতে গড়াগড়ি যেতে পারে। ...ভয় পেওনা ক্যাপ্টেন ওয়াটস, কোম্পানির এক ফিরিঙ্গির রক্তে এই দরবার আমি কলুষিত হতে দিব না। এই মুহূর্তে তুমি দরবার ত্যাগ কর।' ওয়াটস চলে গেলে সভাসদদের নিয়ে দরবারে তর্কবিতর্কের এক পর্যায়ে নবাব কাতর হয়ে বিনীতভাবে সবার উদ্দেশ্যে বলেন— '...বাংলার মান, বাংলার মর্যাদা, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসে আপনারা আপনাদের শক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে সর্বরকমে আমাকে সাহায্য করুন। আপনাদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে যদি এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাই তাহলে একদিন আপনারা আমার বিচারে বসবেন। সেদিন যে দণ্ড আমায় দেবেন আমি মাথা পেতে নিব। আমাকে অযোগ্য মনে করে এই সিংহাসনে যদি আর কাউকে বসাতে চান, আমি হৃষ্টমনে সিংহাসন ছেড়ে দোব। জাফর আলী খাঁ, আপনি শুধু সিপাহসালার নন, আপনি আমার পরম আত্মীয়। বিপদে আপনজন জেনে বুকে ভরসা নিয়ে যার কাছে দাঁড়ানো যায় সেই না আত্মীয়। লোভে পড়ে, অথবা মনের বশে, মানুষ অনেক সময় অনেক অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু কর্তব্যের আহ্বানে লোভ মোহ জয় করে মেরুদন্ড সোজা করে যে দাঁড়াতে পারে, সেইত পুরুষ। সেই পৌরুষ আপনার আছে, আমি জানি। ভাগ্যবান জগৎশেঠ, রাজা রাজবল্লভ, শক্তিমান রায়দুর্লভ। বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, তার শ্যামল প্রান্তরে আজ রক্তের আলপনা, জাতির সোভাগ্য-সূর্য আজ অস্তাচলগামী; শুধু সুপ্ত সন্তান-শিয়রে রুদ্যমানা জননী নিশাবসানের অপেক্ষায় প্রহর গুনায় রত। কে তাঁকে আশা দেবে, কে তাঁকে ভরসা দেবে? কে শোনাবে জাগরণের সেই অভয় বাণী। হে জন্মভূমি মা, তোমার এই মাটির বুকে যতদিন একটি মানুষের দেহেও প্রাণ বাকি থাকবে ততোদিন স্বাধীনতার এই সংগ্রাম চলবে' (ন. সি. চ.)। দীর্ঘতম এই সংলাপের পায় পুরোটা সিকান্দার আবু জাফরের নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে।[৪৬] তবে শেষোক্ত দুটি লাইন চলচ্চিত্রকার নিজ থেকে সংযোজন করেছেন। এই লাইনদুটি দ্বারা পরিচালক কৌশলে দেশমাতৃকা রক্ষার্থে বাংলাদশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মুক্তিকামীদের জাগরণের অভয় বাণী শুনিয়েছেন। সংলাপটি ঐ সময়ে বাংলাদেশের জনগণের মাঝে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। সিনেমার দীর্ঘতম এই সংলাপটি দর্শকদের মনে কোনরূপ বিরক্তি উৎপাদন না করে ভাষার ঝংকার ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গীর কারণে একদিকে দর্শকদের মনে তীব্র আবেগ সঞ্চার করেছে অন্যদিকে কাহিনিতে নাটকীয়তার সন্নিবেশ ঘটিয়েছে। তাছাড়া দৃশ্যের এই অংশটিতে মিডশট ও ক্লোজআপের ব্যবহারে চরিত্রগুলোর অভিব্যক্তি চমৎকারভাবে দর্শকদের চোখে ধরা দিয়েছে। থিয়েটারে নাটকের মঞ্চায়নে যা কখনো সম্ভব নয়। বিশেষ করে পিছনের সারির দর্শকদের কাছে সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিগুলো কখনোই ধরা পড়ে না। 'the film artist has a valuable means of expression, which is denied to the stage, in the power of choosing his distance from his subject. In a theater the spectator always remains at the same distance from the scene of action, and hence events and objects can only be shown within certain limits of size. The subtleties of facial expression, for instance, are lost for the majority of the spectators, who are not seated close to the stage.'[৪৭]

সিনেমায় সিরাজউদ্দোলাকে মন্ত্রণা কক্ষে কালোকাপড়ে মোড়ানো একটি কোরআন শরীফ নিয়ে এসে বলতে শোনা যায়—'যে পলাশীর মাঠে আজ আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা, সেই মাটির বুকে পাক কোরআন শরীফ স্পর্শ করে আসুন আমরা কসম খাই (ন. সি. চ.)।' সবাই কোরআন শরীফের উপর হাত রেখে কসম খায়—'জন্মভূমির আজাদী যতদিন না বিপদমুক্ত হয়। ততদিন আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভাবব না। তুচ্ছ ভেদাভেদ ভুলে যাব। প্রয়োজন হলে সবাই একসাথে হাসিমুখে প্রাণ দিব। আজাদীর পাক ঝান্ডা ঝিন্দাবাদ (ন. সি. চ.)।' কসম শেষে ইতিহাসের চরম ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন নবাব সিরাজউদ্দোলা। মীরজাফরকে উদ্দেশ্য করে বলেন—'নবাব আলীবর্দি খাঁর সিপাহসালার আপনি। বিচক্ষণ যুদ্ধনীতিবিদ বীর মীর জাফর আলী খাঁ যদি নিজ হাতে যুদ্ধভার গ্রহণ করেন তাহলে জয় আমাদের সুনিশ্চিত (ন. সি. চ.)।' সিনেমায় এসময় অস্তমিত সূর্যের দৃশ্য ও কালো রাত দেখানো হয়েছে। এই দৃশ্যটি দিয়ে চলচ্চিত্রকার মূলত বুঝিয়েছেন মীর জাফরের হাতে পলাশীর যুদ্ধের ভার দিয়ে সিরাজউদ্দোলা প্রকারান্তরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত করার সূচনা করে বাংলার আকাশে কালো রাত ডেকে এনেছেন। এই দৃশ্যটি ইতিহাস আশ্রিত হলেও চলচ্চিত্রকারের নিজস্বতা প্রয়োগের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মূল নাটকে দেখা যায় দরবার কক্ষে মীরজাফর নবাবের পক্ষে কাজ করার শপথ করে। কোরআন ছুঁয়ে সবাইকে একসাথে শপথ করতে উভয় নাটকের কোথাও দেখা যায় না। তবে মীরজাফরকে কোরান ছুঁয়ে, রাজবল্লভকে তামা-তুলসী-গঙ্গাজল ছুঁয়ে, রায়দুর্লভকে ঈশ্বরের নামে ও উমিচাঁদকে রাজজীকি'র কসম খেয়ে শপথ করতে দেখা যায় সিকানদার আবু জাফরের নাটকে।[৪৮] রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলাদেশের ইতিহাসেও মীরজাফরের শপথের কথা উল্লেখ আছে—'মীরজাফর কোরান স্পর্শ করিয়া ...নবাবের পক্ষে থাকিতে রাজী হইলেন।'[৪৯]

শপথ ভঙ্গ করে মীরজাফরের নেতৃত্বে রাজবল্লভ ও জগৎশেঠরা ক্লাইভের সঙ্গে গোপন বৈঠক করে এবং পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে। যার চরম মূল্য প্রায় দুইশ বছর ধরে বাংলাকে দিতে হয়েছে। একারনে মীরজাফরের নাম আজও বাংলায় বিশ্বাসঘাতকতার সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই মীরজাফরেরা সব যুগেই ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে সক্রিয় থাকে। খান আতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চার বছর আগেই এই উপলব্দি করতে পেরেছিলেন। যে কারনে ইতিহাসের আলোকে সিনেমা বানিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চোখে ধুলা দিয়ে প্রকারান্তরে পুরো সিনামাকেই রূপক হিসেবে দাঁড় করিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতির আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর মনে যে এ ধরনের অভিপ্রায় ছিল তা তাঁর পরবর্তী ছবি 'জীবন থেকে নেয়া'তে (১৯৭০) স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের আগের বছর ঝুঁকি নিয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে রূপকের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের আহবান করেছেন। উসমান সেমবেনের বিখ্যাত চলচ্চিত্র *Xala*[৫০]-তে এরকম রূপক ব্যবহারের কৌশল প্রয়োগ করতে দেখা যায়। ফরাসি উপনিবেশ থেকে সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে সেমবেন এই ছবিটি নির্মাণ করেন। তিনি তাঁর নির্মিত ছবিগুলোর মধ্যে একে 'সবচেয়ে কঠিন এবং বিপদজনক ছবি হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। বিপদজনক কারণ সেনেগালের নতুন এলিট গোষ্ঠীর আচরণ এবং কার্যকলাপ ছিল সমালোচনার বিষয়বস্তু। আর কঠিন কারণ সেমবেন এই ছবিতে মূলত রূপকের মাধ্যমে তার বক্তব্য তুলে ধরেছেন।'[৫১]

সিনেমার দৃশ্যে সিরাজউদ্দৌলা গোলামহোসেনকে নিয়ে খোলা প্রান্তরে হাঁটতে দেখা যায়। হাঁটতে হাঁটতে সিরাজউদ্দৌলার কণ্ঠে খোলাফায়ে রাশেদিনের কালে খলিফাদের সাধারণ মানুষের মত হাটে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ানোর গল্পের কথা শোনা যায়। গোলাম হোসেনও নিবিষ্ট মনে তা শুনতে থাকে—এমন সময় এক ইংরেজকে কুলির মাথায় বিরাট বোঝা দিয়ে পিছন থেকে গালমন্দ করতে দেখতে পান তাঁরা। কুলি ইংরেজকে লক্ষ্য করে বলে—'অ হ নবাবের বেটা অত বড় বোঝাটা নিয়ে চলে দেখনা কেনে (ন. সি. চ.)।' ইংরেজ আবারও গালমন্দ করায় কুলি মাথা থেকে পেটরা ফেলে দেয়। ইংরেজ এবার গালি দিতে দিতে কুলিকে মারতে থাকে। কুলিও পাল্টা মারতে মারতে ইংরেজের পিছু দৌড়াতে থাকে। এই প্রতিবাদী দৃশ্য দেখে নবাব আর গোলামহোসেন হাসতে থাকে। পরিচালকের নিজস্ব ভাবনাজাত এই হাস্যরসাত্মক দৃশ্যটি দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আহবান লক্ষ্য করা যায়। সিনেমার বেশিরভাগ অংশই সরাসরি নাটক থেকে অনূদিত হয়েছে। গল্প বা উপন্যাসের চেয়ে নাটকের দৃশ্যগুলো চলচ্চিত্রে রূপান্তর তুলনামূলক সহজ। কেননা নাটকে কাহিনির বর্ণনা থাকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংলাপও থাকে সরাসরি চলচ্চিত্রে ব্যবহারের উপযোগী। যা এই সিনেমায় লক্ষণীয়। 'অ্যাকশনের পরিণতির জন্য, কার্যকারণ-সম্পর্ক প্রতিপাদনের জন্য, চরিত্রের বিকাশের জন্য, নিয়তির অনিবার্যতার জন্য উপন্যাসে যত সময় অতিবাহিত হয়, নাটকে বা সিনেমায় হয় তার চেয়ে অনেক কম। সিনেমা তাই উপন্যাসের চেয়ে নাটকের বেশি কাছাকাছি, যতটা বিবরণাত্মক তার চাইতে বেশি নাট্যাত্মক।"[৫২]

যুদ্ধযাত্রার আগে রঙমহলে সিরাজের উপস্থিতিতে আলেয়া আশ্চার্যান্বিত হয়ে পড়ে—'নবাব মনসুরুল মুলক আমার দেহে পদধূলি দেবেন তা আমি স্বপ্নেও আশা করতে পারিনি জাঁহাপনা। এই সৌভাগ্য আমি সহ্য করতে পারছিনা (ন. সি. চ.)।' সিরাজ আলেয়ার হাত ধরে বলে, 'আমি শুধু নবাবই নই আলেয়া। আমি তোমার সহকর্মী। স্থির হও, জয়ের পথ অশ্রু দিয়ে ভিজিয়ে দিও না। পলাশীর মাঠে এবার ঝলমল করে সূর্য উঠবে আলেয়া। আর সেই আলোয় সমস্ত দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আলেয়া তোমার কোরবানি অমূল্য। সমস্ত দেশটাকে যদি তোমার গলায় পরিয়ে দিতে পারতাম তাহলে হয়ত মানাত। খোদা হাফেজ আলেয়া (ন. সি. চ.)।' এই দৃশ্যটি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে ধারণা নিয়ে চলচ্চিত্রকারের নিজস্ব সংলাপযোগে নির্মাণ করা হয়েছে। সিরাজ এখানে আলেয়ার কাছে বিদায় নিতে এলেও আলেয়া ভেবেছিল নবাব তার শয্যাসঙ্গী হতে এসেছিলেন। মূল নাটকের যে অংশ থেকে এই দৃশ্যটি নেওয়া হয়েছে সেখানেও নবাবের বহুগামিতার ইঙ্গিত আছে। আলেয়ার কক্ষে তাকেই উদ্দেশ্য করে নবাবকে বলতে শোনা যায়, 'জীবনে বহু নারীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে; কিন্তু তোমার মত কাউকে দেখিনি। প্রথম যৌবনের উম্মাদনায় নারী চেয়েছি, পেয়েছিও। নারীকে তখন দেখেছি শুধু ভোগের সামগ্রীর মত। আজ সে উম্মাদনা নেই। আজ নারীর কাছে আমার নানা দাবী। ...লোকে বলে এ লালসা। আমি জানি এ লালসা নয়। এ হচ্ছে নরের অন্তরের একান্ত স্বাভাবিক এক দাবী।'[৫৩] পরিচালক সিনেমায় সিরাজকে নারী-কলঙ্ক থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। যাতে আদর্শ ও দেশপ্রেমিক চরিত্র চিত্রণে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে। সিনেমায় পলাশীর যুদ্ধের প্রায় পুরো দৃশ্যই শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটকের অনুকরণে নির্মিত হয়েছে। শুধুমাত্র চলচ্চিত্রকার আলেয়াকে অন্তঃপুরে রাখতে চেয়েছেন নবাবের জন্য প্রার্থনা করার জন্য—যা আলেয়া চরিত্রের দ্রোহী রূপের বিপরীত। মূল নাটকে পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধের পুরো সময় ধরেই নবাব শিবিরে সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে আলেয়াকে দেখা গেছে। মূল কাহিনি থেকে

চলচ্চিত্রে চরিত্রের স্থানবদল প্রথাসিদ্ধ। সমালোচক বলেছেন, 'মুহূর্ত মধ্যে যত্রতত্র যাওয়ার পাসপোর্ট আছে চলচ্চিত্রের। সময়কে যদৃচ্ছ ভেঙেচুরে, এগিয়ে পিছিয়ে, তাঁকে হ্রস্ব বা দীর্ঘায়িত করে চলে তার অবলীলা।'[৫৪]

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মীরজাফর ও তার সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ পলাশীর যুদ্ধে নবাব পরাজয় বরণ করে মুর্শিদাবাদ ফিরে যেতে বাধ্য হন। যুদ্ধে মীরমর্দান ও ফরাসি সৈন্য সাঁফ্রে তাদের সৈন্যদল নিয়ে প্রাণপন লড়াই করতে করতে মৃত্যুবরণ করে। মোহনলাল ধরা পরে। সিরাজ গোলাম হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে গভীর রাতে স্ত্রী সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে পাটনার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। আশা এই যে, পাটনার রাজা সাহায্য করবেন। সেখান থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে আবার মুর্শিদাবাদে ফিরে আসবেন। আবার রাজ্য পাবেন, সিংহাসন পাবেন, পাত্র মিত্র পরিষদ সব পাবেন। নকিব আবার নাম হাঁকবে, বন্দি গান গাইবে, দেশ বিদেশ থেকে আসবে নানা উপঢোকন, আবার যুদ্ধ হবে রাজ্যের প্রসার হবে। কিন্তু পথে ক্ষুধার্ত জোহরার জন্য খাবার সন্ধান করতে গেলে পায়ের জুতো দেখে পাড়ে মীর কাশিমের সৈন্যরা চিনে ফেলে। এবং সিরাজউদ্দৌলাকে বন্দি করে রাজধানীতে ফেরত পাঠায়। রাজধানীতে এনে গোলাম হোসেন ও আলেয়ার সঙ্গে একই কারাগারে সিরাজউদ্দোলাকে বন্দি করে রাখা হয়। সিরাজউদ্দৌলাকে দেখে তারা চমকে উঠে। আলেয়া দৌড়ে আসতে গিয়ে শিকলে আটকে পড়ে যায়। বিমর্ষ কণ্ঠে সিরাজউদ্দৌলাকে বলতে শোনা যায়, মুর্শিদাবাদ আমার মায়া কাটাতে পারলনা গোলাম হোসেন, তাই আবার তার কোলে টেনে নিয়ে এল।

কারাগারে সৈন্যরা আসে গোলাম হোসেন ও আলেয়াকে নিয়ে যেতে। শিকলের বন্ধন খুলে দিলে নবাবের কাছে গিয়ে বলে, 'এই ভাল জাঁহাপনা, বিশ্বাস ঘাতকের শাসনে বেঁচে থাকতে হবেনা। ...যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে ততক্ষণ আপনার মঙ্গল কামনা করি। আপনার অন্তরের কাছে যতদিন থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তার প্রত্যেকটা দিনই শুধু গোস্তাকি করেছি জাঁহাপনা। বিনিময়ে আপনি আমাকে ভালবেসেছিলেন। সেই ভালবাসার ঋণ আমি জন্মভূমির বুকে রেখে যাব জাঁহাপনা। সে ঋণ শোধ হবে। এ দেশ স্বাধীন হবে।' আলেয়া বলে, 'যেদিন থেকে দেশকে ভালবাসতে শিখেছি সেদিন থেকে আপনাকে দেবতা বলেই জেনেছি। দেবতার এই স্পর্শ আমার মৃত্যু পথের পাথেয় হয়ে রইল জাঁহাপনা (ন. সি. চ.)।' এরপর আলেয়া গোলাম হোসেনকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে মোহনলালের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। সৈন্যরা আলেয়াকে ফাঁসির মঞ্চে নিতে গেলে গোলাম হোসেন বাঁধা দিয়ে সে নিজেই এগিয়ে যায়। আলেয়া পিছন দিক থেকে তার হাতে ধরে, গোলাম হোসেন ফিরে থাকায়। দুজনের মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয় না। কিন্তু চোখের ভাষা, মুখাবয়বের ভাষা অস্ফুট কথাগুলো দর্শকের কানে চিৎকার করে বলে দিতে সক্ষম হয়। এটাই সিনেমার ভাষা। গোলাম হোসেনকে ফাঁসির দড়ি পরানো হলে আলেয়া স্থির থাকতে না পেরে দৌড়ে দাদা বলে মোহনলালের কাছে যায়। মোহনলালও দিদি বলে ডাকে। গোলাম হোসেনের ফাঁসি কার্যকর হয়ে গেলে সৈন্যরা এগিয়ে আসে। আলেয়া মৃদু হেসে বিদায় নেয়। আবারও দুজনের নির্বাক অভিব্যক্তি সিনেমায় ধরা দেয়। আলেয়া এগিয়ে চলে, মোহনলালের ভিতরে অব্যক্ত ঝড় বয়ে চলে।

পরের দৃশ্যে কারাগারে সৈন্য প্রবেশ করে নবাবকে কুর্নিশ করে। পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে বলে—দরবার আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। নবাব ঘোরের মধ্যে বুঝতে না পেরে বলে,

সিপাহসালার মীর জাফর আলী খাঁ, মুর্শিদাবাদ কি পুনরুদ্ধার হয়েছে! নবাবকে দৌড়ে ছুটে যেতে দেখে সৈন্যরা শ্লেষের হাসি হাসে। সিরাজ দৌড়ে মসনদের কাছে গেলে উপস্থিত জনতা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। নবাব অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমরা এখানে কেন? একজন বলে আমরা আপনার দরবারী। আরেকজন বলে আমরা একজন একহাজারি কেউ দুই হাজারি। আরেকজন বলে আমাদের নেইকো কোন ঘরবাড়ি। সবাই অট্টহাসিসহ ঠাট্টা মশকরা করে। একজন মশকরা করে বলে, ওরে আসন দে রে হুজুরের আসন দে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুজুরের কষ্ট হচ্ছে। জনতার বানানো কাঁটা দিয়ে তৈরি, ঘেঁটু ফুল দিয়ে সাজানো একটি আসন সামনে এনে দেয়। এভাবে অপদস্তের পর পিছন দিক থেকে মোহাম্মদী বেগ এসে বলে, এবার উপঢৌকন দাও। নবাব অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমিও! চরম অপমানের জন্য একজন বলে ওই জুতোর জন্যই তো ধরা পরেছিলেন এবার পুরনো জুতো নবাবের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলে জুতো জোড়া পাল্টে এগুলো পড়ুন। আরেকজন বলে ফকিরের দরবারে খাবার খাবেন বলে ভেবেছিলেন, খাওয়া আর হয়নি, তাই এই নিন আপনার খানা। সানকিতে পান্তা ভাত আর মরিচ দেওয়া হয়। দৃশ্যের এই অংশটুকু নবাবের জন্য চরম অপমানজনক ও হাস্যরসাত্মক। নাটক বা যাত্রা পালায় দর্শকদের স্থুল বিনোদন দিতে এরকম দৃশ্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নাটকের সব দৃশ্য হুবহু চলচ্চিত্রে ব্যবহার করলে চলচ্চিত্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে। এতে নাটকের দাসত্ব থেকে চলচ্চিত্রের মুক্তি মিলে না। চলচ্চিত্রে দর্শককেও একটু ভাববার ফুসরত দিতে হয়। তা না হলে ঐ চলচ্চিত্র দর্শকমনে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে জাঁ বেনোয়া লেভি বলেছেন— 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে দর্শকের মনে ভাবনা সঞ্চার করার ভার না নিলে সিনেমার অপমৃত্যু হবে।'[৫৫] নাটকে বর্ণিত এই চটুল অংশটুকুও ব্যঞ্জনাপূর্ণ প্রায়োগিক কৌশলে চলচ্চিত্রে রূপান্তর করা যেত। ভাল চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য চিত্রনাট্য তৈরি থেকে দৃশ্যধারণ পর্যন্ত চলচ্চিত্রকারকে কাহিনি নিয়ে রীতিমত গবেষণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ছোট ছোট দৃশ্যও এই গবেষণার দাবী রাখে। সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে নির্মাণের বেলায় বিষয়টি আবশ্যক হয়ে পরে। অনেক প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার এই বিষয়টি মেনে চলতেন। ''শেক্সপিয়র অবলম্বনে যে দুটি ছবি, 'হ্যামলেট' এবং 'কিং লিয়র', ইন্টারপ্রিটেশন এবং ক্রিয়েটিভ পারসেপশনের নতুন মহিমায় পৃথিবীতে বিপুলভাবে সংবর্ধিত, তার পরিচালকের নাম কোজিন্তসেভ; তাঁকে যথার্থ অর্থে বলতে পারি আইজেনস্টাইনের উত্তর-সাধক। কেননা আইজেনস্টাইনের মতো তিনিও মনে করেন চলচ্চিত্র নির্মাণ একটা গবেষণার বিষয়।"[৫৬]

উপস্থিত জনতার ব্যঙ্গাত্মক কথামালার জবাবে সিরাজ মুখ খোলে অসহায় ভঙ্গিতে বলে— 'ভাইসব তোমাদের এই পরিহাস নির্মম। কিন্তু নিরর্থক নয়। সত্যিই আজ আমি তোমাদের উপহাসের পাত্র। প্রজা পালন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওই সিংহাসন আমি পেয়েছিলাম। প্রজার স্বার্থ রক্ষা করার দ্বায়িত্বও আমি নিয়েছিলাম। কিন্তু আমি তা কিছুই করতে পারিনি। পারিনি বলেই আজ আমি লাঞ্ছিত। পারিনি বলেই আজ আমি তোমাদের কাছে উপহাসের পাত্র। ...আমি যদি নিশ্চিন্তে আরামে দিন কাটাতে চাইতাম, তাহলে কারো সঙ্গে আমাকে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হতে হতো না। সকলের অন্যায় আবদার পূর্ণ করে মান মর্যাদা সম্ভ্রম সব বিকিয়ে দিয়ে নিজের রাজ্যে নিজের প্রাসাদে আমি বিলাসের স্রোতে ভাসতে পারতাম, ডুবতেও পারতাম। কিন্তু আমি তা চাইনি। আর চাইনি বলেই কি তোমাদের বিচারে আজ আমি অপরাধী? .. বর্গির হাঙ্গামার সময় নবাব আলীবর্দির সঙ্গে সমরে-শিবিরে, দিবসে-নিশীথে আমিও কি ছুটে বেড়াইনি? বাংলার প্রজাকুল যাতে সর্বহারা না হয়। তোমাদের সুখের সংসারে যাতে

ভাস্কর পন্ডিতের রোষানলে ভস্মীভূত না হয়। তোমাদের সন্তান সন্ততি যাতে না পতঙ্গের মত প্রাণ বলি দিতে বাধ্য হয়। তারই জন্যে, বিশ্বাস কর ভাই সব শুধু তারই জন্যে বাংলা বিহার উড়িষ্যার পথে প্রান্তরে সংগ্রাম স্থলে উল্কার মত আমি ছুটে বেড়িয়েছি। তার পুরষ্কার কি এই কন্টক আসন? তার পুরষ্কার কি এই ছিন্ন পাদুকা? তারই পুরস্কার কি ...লাঞ্ছনা? (ন. সি. চ.)।' আবেগ তাড়িত এ বক্তৃতায় উপস্থিত জনতা ভুল বুঝতে পেরে সিরাজউদ্দৌলার কাছে ক্ষমা চায়। তদের মধ্যে অনুশোচনা জেগে ওঠে। এই সুযোগ নিয়ে সিরাজউদ্দৌলা জনতার মাঝে বিদ্রোহী মনোভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে—সংলাপের বাগাড়ম্বরে। মূল নাটকের অনুসরণে সংলাপের বাহুল্য ব্যবহারে দৃশ্যটি বর্ধিত হয়েছে। 'বাংলা ছবিতে চটকদারি সংলাপের একটা রেওয়াজ অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। এ ধরনের সংলাপ ছবির চেয়ে নাটকেই মানায় বেশি। নাটকে কথাই সব, ছবিতে তা নয়।'[৫৭] আবেগতাড়িত উত্তেজক কথায় উপস্থিত জনতা জেগে ওঠে। এমন সময় হঠাৎ 'খামোশ' শব্দে সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। পিছন ফিরে দেখে সৈন্যরা সিরাজউদ্দৌলার দিকে অস্ত্র তাক করে আছে। কালক্ষেপণ না করে মোহাম্মদী বেগ এগিয়ে এসে নির্মমভাবে সিরাজের দেহে ছোরা বসিয়ে দেয়। সিঁড়ির উপর লুটিয়ে পড়েন তিনি। অনেক কষ্টে মাথা উঁচু করে বলেন—'দেখ, আমি তো শুধু নবাবই ছিলাম না, একজন মানুষও ছিলাম। একটি স্বাধীন দেশের সাধারণ মানুষ হিসেবে যতটুকু প্রাপ্য আমি তাও পেলাম না। আমি মরে যাচ্ছি অথচ আমার কন্যা, আমার স্ত্রী, আমার মা কোথায় আমি জানি না। অভাগা দেশ (ন. সি. চ.)।' উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সুবিখ্যাত ট্র্যাজিক নাটক 'হ্যামলেট' অবলম্বনে Grigori Kozintsev নির্মিত 'হ্যামলেট'[৫৮] সিনেমার শেষ দিকে বিষপানে মায়ের মৃত্যুর পর লিয়ার্টিয়াস যখন রাজা ক্লডিয়াসের ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেয় এবং হ্যামলেট যখন জানতে পারে বিষক্রিয়ায় কিছুক্ষণ পরেই তার মৃত্যু হবে, তখন সে রাজাকে হত্যা করে। এরপর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হ্যামলেট একটি ছোট্ট বাক্য ছাড়া আর কোন সংলাপ বলেনি। মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতেও দেখা যায়নি। কাউকে অভিসম্পাতও করেনি। শুধুমাত্র তার স্থির-নিশ্চল শারীরিক অভিব্যক্তিই দর্শকদের মনে করুণ রসের সঞ্চার করেছে। কিন্তু মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ছোট্ট একটি সংলাপ 'the rest is silence.' দর্শকদের আর নীরব থাকতে দেয়নি। মনের অজান্তেই স্বশব্দ দীর্ঘশ্বাস অথবা আফসোস সূচক শব্দ বেরিয়ে আসে। 'নবাব সিরাজদ্দৌলা' সিনেমায় অন্তিম সময়েও সংলাপে অতিকথনের দরুণ ট্র্যাজিক আবেদন ক্ষুণ্ন হয়েছে। 'হ্যামলেট' এখানে Subjective সিনেমা আর 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' Objective হিসেবে আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে। যদিও হ্যামলেট সিনেমাতেও সংলাপের আধিক্য রয়েছে। তবে ঘটনার নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীর আলোকপাত করা হয়েছে।

উপসংহার

গাঁস্ত রোবের্জ বলেছেন—প্রায়ই জোর দিয়ে বলা হয় যে, চলচ্চিত্রে নাটকীয়তা একটি দোষ। অর্থাৎ নাটক থেকে ফিল্ম যতদূরে সরে যেতে থাকে ততই ফিল্ম হয়ে ওঠে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা অত সোজা নয়। ...নাট্যনির্ভর সিনেমা অনেক মূল্যবান সম্পদ তৈরি করেছে এবং নাটকের পথে এগিয়ে যেতে যেতে সিনেমা স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবেও নিজেকে চিহ্নিত করেছে।[৫৯] নাট্যনির্ভর সিনেমা দোষের

নয়, সিনেমায় নাটকীয়তাও চলচ্চিত্রমানের জন্য ক্ষতিকর নয়। অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক। কিন্তু নাটকের অনুকরণ সিনেমার জন্য শুধু ক্ষতিকরই নয়, এর বিকাশের পথে অন্তরায়। পুরো সিনেমাতেই সংলাপে মঞ্চ নাটক বা থিয়েটারের আবহ রয়ে গেছে। বিশেষ করে সিরাজদৌলা চরিত্রের আবেগ সঞ্চারী দীর্ঘ সংলাপে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. *সিরাজদ্দৌলা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, পুষ্পেন্দুশেখর গিরি সম্পাদিত, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, পৃ. ১১, ১৮

২. ইসমাইল মোহাম্মদ (নাট্যপরিচালক), উদ্ধৃত : সৌমিত্র শেখর, ভূমিকা– *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* (নাটক), সিকান্দার আবু জাফর, সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত, মাটিগন্ধা, প্রাপ্তিস্থান– বিভাস, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ১৩

৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খন্ড (মধ্যযুগ), শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস প্রকাশিত, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১৫৯

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭, ১৪৮

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯, ১৬০

৬. মাসুদ শামস আলদীন, ভূমিকা– *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* (নাটক), সিকান্দার আবু জাফর, স্বদেশ প্রকাশ, ৩৪/২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ৪

৭. কে এম মোহসীন, মুখবন্ধ– *বাংলার মসনদ ও নবাব সিরাজউদদৌলা*, মুহাম্মদ ফজলুল হক প্রণীত, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা, পৃ. ১১

৮. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *সিরাজদ্দৌলা*, বাংলার ইতিহাস : ১, দিব্য প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১২, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ২১২, ২১৩, ২১৪

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯, ২৩০

১০. উদ্ধৃত : অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক, *নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধ*, এনটিভি ডট কম, ২৩ জুন ২০১৫, Link- http://www.ntvbd.com/opinion/12563/

১১. সিকানদার আবু জাফর, *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* (স্বরচিত নাটক), স্বদেশ প্রকাশ, ৩৪/২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ২১

১২. আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : আর্থসামাজিক পটভূমি ১৯৭০-১৯৮০ দশক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৪

১৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খন্ড (মধ্যযুগ), শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস প্রকাশিত, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১৬৬, ১৬৭।

১৪. *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* (নাটক), সিকানদার আবু জাফর, দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম দৃশ্য, স্বদেশ প্রকাশ, ৩৪/২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ৪৫

১৫. Sergei Eisenstein, *Film Form,* A Harvest/HBJ Book, Harcourt Brace Jovanovich, New York and London, ISBN 0-15-630920-3, P. 9

১৬. শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, স্বপ্রণীত নাটক *সিরাজদ্দৌলা*'র নিবেদন অংশ, পুষ্পেন্দুশেখর গিরি সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১৩৯

১৭. ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, উদ্ধৃত : *অভিনয় শিল্প– সংলাপ ও কণ্ঠস্বর*, অন্‌জন্ দাশগুপ্ত, প্রকাশক– গোপা দাশগুপ্তা, ৩৭/এ মহেন্দ্র সরকার স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ১৯০

১৮. *সিরাজদ্দৌলা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, পুষ্পেন্দুশেখর গিরি সম্পাদিত, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, পৃ. ১৪, ১৫

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

২০. *সিরাজদ্দৌলা*, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পুষ্পেন্দুশেখর গিরি সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্য, পৃ. ১৫১

২১. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *সিরাজদ্দৌলা– বাংলার ইতিহাস :* ১, দিব্য প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ৫০

২২. *সিরাজদ্দৌলা*, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পুষ্পেন্দুশেখর গিরি সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্য, পৃ. ১৪৭

২৩. *সিরাজ-উ-দ্দৌলা*, সিকানদার আবু জাফর, স্বদেশ প্রকাশ, ৩৪/২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা, তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় দৃশ্য, পৃ. ৭৩, ৭৪

২৪. Rudolf Arnheim, *Film as Art*, University of California Press, USA, ISBN: 0-520-24837-6; P. 112

২৫. *নবাব সিরাজদ্দৌলা* (চলচ্চিত্র, পুন:নির্মাণ), পরিচালক– প্রদীপ দে, প্রযোজনা ও পরিবেশনা– জয় ফিল্মস, ঢাকা, মুক্তি– ১৯৮৯

২৬. *সিরাজদ্দৌলা*, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পুষ্পেন্দুশেখর গিরি সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্য, পৃ. ১৪৮

২৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খন্ড (মধ্যযুগ), শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস প্রকাশিত, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১৬৫

২৮. *সিরাজদ্দৌলা*, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পুষ্পেন্দুশেখর গিরি সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্য, পৃ. ১৪৫

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

৩০. *সিরাজ-উ-দ্দৌলা*, সিকানদার আবু জাফর, সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত, মাটিগন্ধা, প্রাপ্তিস্থান– বিভাস, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিবেশ, পৃ. ৬৭, ৬৮

৩১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খন্ড (মধ্যযুগ), শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস প্রকাশিত, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১৬২ এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *সিরাজদ্দৌলা– বাংলার ইতিহাস :* ১, দিব্য প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ১৪৩

৩২. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *সিরাজদ্দৌলা– বাংলার ইতিহাস :* ১, দিব্য প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ১৪৪

৩৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খন্ড (মধ্যযুগ), শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস প্রকাশিত, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১৬৬

৩৪. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *সিরাজদ্দৌলা– বাংলার ইতিহাস :* ১, দিব্য প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ৫১,৫২

৩৫. *সিরাজ-উ-দ্দৌলা*, সিকানদার আবু জাফর, সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত, মাটিগন্ধা, প্রাপ্তিস্থান– বিভাস, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিবেশ, পৃ. ৭৬-৮০

৩৬. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *সিরাজদ্দৌলা– বাংলার ইতিহাস :* ১, দিব্য প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ১৮২, ১৮৩

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩, ৯৪, ৯৬

৩৮. *সিরাজদ্দৌলা*, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পুষ্পেন্দুশেখর গিরি সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্য, পৃ. ১৭৩

৩৯. অমিয় রায়চৌধুরী, *শতবর্ষের সিনেমা ও চার্লি চ্যাপলিন*, দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১২

৪০. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *সিরাজদ্দৌলা– বাংলার ইতিহাস :* ১, দিব্য প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ১০১

৪১. *সিরাজদ্দৌলা*, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পুষ্পেন্দুশেখর গিরি সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্য, পৃ. ১৭৭

৪২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খন্ড (মধ্যযুগ), শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস প্রকাশিত, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১৬০

৪৩. *সিরাজ-উ-দ্দৌলা*, সিকানদার আবু জাফর, স্বদেশ প্রকাশ, ৩৪/২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম দৃশ্য, পৃ. ৬০, ৬১, ৬২

৪৪. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *সিরাজদ্দৌলা– বাংলার ইতিহাস :* ১, দিব্য প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ১৪২

৪৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খন্ড (মধ্যযুগ), শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস প্রকাশিত, জেনারেল

প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১৬৯
৪৬. *সিরাজদ্দৌলা*, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পুষ্পেন্দুশেখর গিরি সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, দ্বিতীয় অংকের প্রথম দৃশ্য, পৃ. ১৮৪
৪৭. Rudolf Arnheim, *Film as Art*, University of California Press, USA, ISBN: 0-520-24837-6, P. 82
৪৮. *সিরাজ-উ-দ্দৌলা*, সিকানদার আবু জাফর, সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত, মাটিগন্ধা, প্রাপ্তিস্থান– বিভাস, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিবেশ, পৃ. ৭৫-৭৬
৪৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খন্ড (মধ্যযুগ), শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস প্রকাশিত, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১৭০
৫০. *Xala* (চলচ্চিত্র), পরিচালক– Ousmane Sembène, প্রযোজক– Filmi Domireve SNC, সেনেগাল, মুক্তি– ১৯৭৫
৫১. নাদির জুনাইদ, *দশটি রাজনৈতিক চলচ্চিত্র– বক্তব্য ও নির্মাণশৈলী*, জনান্তিক, ৫০ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৭, পৃ. ৭৩
৫২. ধীমান দাশগুপ্ত, প্রবন্ধ– *সাহিত্যের ভাষা বনাম চলচ্চিত্রের ভাষা : সংঘাত ও সমন্বয়*, *বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়*, বাংলা বিভাগ, চন্দননগর কলেজ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৫৮
৫৩. *সিরাজদ্দৌলা*, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পুষ্পেন্দুশেখর গিরি সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃ. ১৯৩
৫৪. বিভাস চক্রবর্তী, থিয়েটার ও সিনেমা, *শতবর্ষে চলচ্চিত্র– প্রথম খন্ড*, নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ১৬৮
৫৫. জাঁ বেনোয়া লেভি, চলচ্চিত্রের সাধনা, *চলচ্চিত্র : প্রথম পর্যায়*, আশ্বিন ১৩৫৭ সংখ্যা, কমল মজুমদার, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, নরেশ গুহ, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ সেন সম্পাদিত, প্রকাশক– দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা, পৃ. ১০
৫৬. পূর্ণেন্দু পত্রী, *সিনেমা সংক্রান্ত*, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৫, পৃ. ২৩
৫৭. সত্যজিৎ রায়, *বিষয় চলচ্চিত্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ৬০
৫৮. *Hamlet* (চলচ্চিত্র), পরিচালনা– Grigori Kozintsev, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মুক্তি– ১৯৬৪
৫৯. গাঁস্ত রোবের্জ, *সিনেমার কথা*, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৫, পৃ. ১৫৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চলচ্চিত্রে লোকসাহিত্য : বেহুলা

‘বেহুলা’ চলচ্চিত্র পরিচিতি

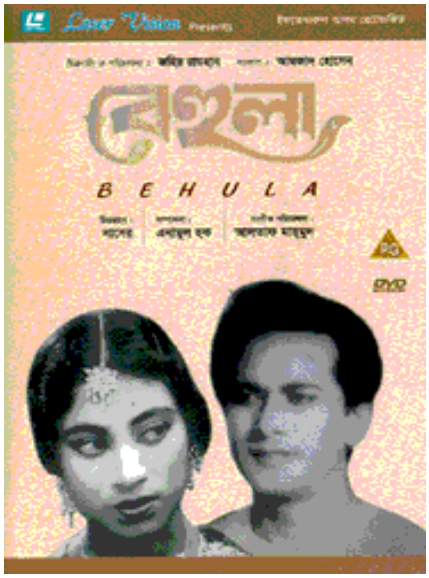

মূল গল্প : মনসামঙ্গল কাব্য বা পদ্মাপুরাণ
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : জহির রায়হান
প্রযোজনা : ইফতেখারুল আলম
সংলাপ : আমজাদ হোসেন
সম্পাদনা : এনামুল হক
চিত্রগ্রহণ : নাসের
শব্দগ্রহণ : মালিক মনসুর, বিনোদ মন্ডল (সহযোগী)
শিল্প নির্দেশনা : আবদুস সবুর
নৃত্য পরিচালক : আলতামাস আহমেদ
স্থিরচিত্র : কে ফটোগ্রাফার্স
স্টুডিও : স্টার সিনে কর্পোরেশন
সঙ্গীত : আলতাফ মাহমুদ
রূপসজ্জা : শেখ আকবর আলী
সাজ-সজ্জা : ড্রেস হাউস

অভিনেতা/অভিনেত্রী

কোহিনূর আক্তার সূচন্দা, রাজ্জাক, ফতেহ লোহানী, মোহাম্মদ জাকারিয়া, সুমিতা দেবী, আমজাদ হোসেন, রানী সরকার, নাসিমা, রুবিনা, জয়শ্রী, আঞ্জুম, রঞ্জনা, সাকিলা, জাভেদ করিম, হারুন (প্রমুখ)।

নেপথ্য কণ্ঠে : শাহনাজ বেগম, নীনা খান, ঝর্না ব্যানার্জী, মৌসুমি কবির, কণা, লাভলী, নাজমুল হুদা, দিলীপ বিশ্বাস, আবদুল লতিফ, আলতাফ মাহমুদ, মাহমুদুন্নবী।

মুক্তি : ১৯৬৬।
দৈর্ঘ্য : ১২৭ মিনিট।
ফরম্যাট : ৩৫ মি: মি:।
কালার : সাদাকালো।

Dhaka University Institutional Repository

আখ্যানের স্বর্গ-মর্ত্য : পুরাণ, মঙ্গলকাব্য ও লোকসাহিত্যে

'পদ্মাপুরাণ' বা 'মনসামঙ্গল' কাব্যে 'বেহুলা' একটি অন্যতম চরিত্র। তাকে কেন্দ্র করেই কাহিনি আবর্তিত হয়েছে ও পরিণতি লাভ করেছে। আখ্যানের নাম ভিন্নতার মতো স্থানভেদে এই মঙ্গলকাব্যের কাহিনিরও ভিন্নতা পাওয়া যায়। তবে মূল গল্পটি প্রায় সব জায়গাতেই এক। মনসামঙ্গলের এ পর্যন্ত প্রায় সত্তর জন কবির নাম পাওয়া গেছে।[১] এর সঠিক সংখ্যা আজও নিরূপণ সম্ভব হয়নি। বিবিধ মনসামঙ্গল কাব্যের পুঁথিতে শতাধিক বিভিন্ন ভনিতা দেখা যায়।[২] মনসামঙ্গল কাব্যে যে ক'জন কবির নাম পাওয়া গেছে কয়েকজন বাদে তাঁরা প্রায় সকলেই পূর্ববঙ্গের লোক। ধর্মমঙ্গলখ্যাত ময়ূর ভট্টের মতে কানা হরিদত্ত মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি। বিজয় গুপ্ত, নারায়ন দেব, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিপ্রদাস পিপিলাই প্রমুখ মনসামঙ্গল কাব্য রচনার জন্য সবচেয়ে বেশি আলোচিত। বিজয় গুপ্ত ও নারায়ন দেব এই আখ্যানের নামকরণ করেছেন 'পদ্মাপুরাণ'। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ নাম দিয়েছেন 'মনসামঙ্গল'। তবে মনসামঙ্গল নামেই আখ্যানটি অধিক পরিচিত। পুঁথি সাহিত্যের পাশাপাশি এটি লোকসমাজে মিথ ও লোকসাহিত্য আকারে ছড়িয়ে আছে। এই মিথ কিংবা লোকসাহিত্যও কাহিনির মূলভাবটি ধারণ করে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে বিস্তার লাভ করেছে।

কাহিনির উৎপত্তিস্থল নিয়েও পন্ডিতগণ নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। এর প্রধান রচয়িতাদের জন্মবৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, বিজয় গুপ্ত পনেরো শতকের মধ্যভাগে বরিশালের ঘাঘর ও ঘণ্টেশ্বরী নদীর মধ্যবর্তী ফুল্লশ্রী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগস্থহণ করেন।[৩] রাজেন্দ্র কুমার গুপ্ত সঙ্কলিত পদ্মাপুরাণ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, 'গৈলা ফুল্লশ্রী গ্রামের অপর নাম মানসী। মনসার অভিলসিত স্থান। এই গ্রামে কবি বিজয় গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন'[৪] নারায়ণ দেব সম্পর্কে জানা যায়, 'রাঢ় হইতে আসিয়া নারায়ণ দেব পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জিলার মধ্যে কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন তাড়াইল থানার অর্ন্তগত নসিরুজিয়াল পরগণায় বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন।'[৫] আসামবাসীগণ নারায়ণ দেবকে আসামের অধিবাসী মনে করেন। পদ্মাপুরাণের অসমিয়া সংস্করণই এর একটি কারণ। কেতকাদাস 'ক্ষেমানন্দ রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন। বঙ্গদেশের যে অংশটি গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত সেই অংশটি প্রাচীনকালে রাঢ় নামে পরিচিত ছিল।'[৬] মনসামঙ্গলের আরেক জনপ্রিয় কবি বিপ্রদাস পিপিলাই কলকাতার অদূরে বারাসত-বসিরহাট অঞ্চলের লোক ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।[৭] রচয়িতাদের জন্ম ও আবাস্থল বিবেচনায় বলা যায়, আখ্যানের উৎপত্তিস্থল যেখানেই হোক না কেন এর বিস্তার ঘটেছিল প্রাচীন বাংলা ছাড়িয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে। ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক-ধর্মীয় রীতি ও আচার, রচয়িতাদের মনস্তাত্ত্বিক ভিন্নতার কারণে এর কাহিনির পরিবর্তন লক্ষণীয়:

> উত্তর-বিহারে প্রচলিত বেহুলার কাহিনিটি বাংলা মনসা-মঙ্গল কাব্যের মত এত জটিল ও অনাবশ্যক পৌরনিক কাহিনিতে ভারাক্রান্ত নহে। বেহুলা-লখিন্দরের মূল কাহিনির ধারাটি এখানে অক্ষুণ্ন থাকিলেও, ইহার মধ্যে বাংলাদেশের মনসা-মঙ্গল কাব্যের মত কবি-কল্পনার এমন উদ্দাম নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায় না। মনসা-মঙ্গলের লৌকিক কাহিনিটি আপনার পূর্ণতা ও সংযম রক্ষা করিয়াই এখানে প্রচলিত আছে। ইহার কারণ এই মনে হইতে পারে যে, কাহিনির মূল ধারাটিই বিহারে প্রচলিত আছে এবং সে দেশের ধর্মীয় অবস্থার অনুকূল না হওয়ার জন্যই হয়ত ইহাতে অবান্তর মহাভারতীয় ও পৌরণিক আখ্যানসমূহ আসিয়া যুক্ত হইতে পারে নাই। কিংবা এমনও মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, মনসা-মঙ্গলের এই কাহিনিটি বিহার হইতে বাংলাদেশে আসিয়া এখানকার অধিকতর কল্পনা-শক্তি-সমৃদ্ধ কবিদিগের হাতে পড়িয়া এখানে পল্লবিত হইয়াছে। তবে এ'কথা সত্য, বাংলাদেশে প্রচলিত কাহিনিটির মধ্যে যেমন চরিত্র-সৃষ্টির সার্থকতা ও কাব্যগুণ আছে, বিহারে প্রচলিত কাহিনিতে তাহা নাই।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

অনেকে মনে করেন বগুড়া শহর হতে প্রায় ১১ কি: মি: উত্তরে গোকুল নামক স্থানে মাটি থেকে প্রায় ৪০-৫০ ফিট উঁচু ইটের তৈরি যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে সেটিই বেহুলার বাসর ঘর। এর মধ্যে রয়েছে ১৭২টি কক্ষ, একটি চৌবাচ্চা ও ৮ফুট গভীর একটি কুপ। ধারণা করা হয় বেহুলা-লখিন্দর সোহাগরাত যাপনের পর কুপে রক্ষিত জলে স্নান করে পরিশুদ্ধতা লাভের নিমিত্তে এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উপরদিকের ছোট্ট বৃত্তাকার অংশটিকে প্রবেশদ্বার মনে করা হয়। কিন্তু আখ্যানটির সর্বত্র বেহুলা-লখিন্দরের বাসর ঘরটি লৌহনির্মিত বলে উল্লেখ রয়েছে। তাই গোকুলের এই স্থাপনাটিকে আখ্যানোল্লেখিত বাসরঘর বলে সমর্থন করা যায় না।

চাঁদ সওদাগরের জন্মস্থান ও পরিচয় সম্পর্কে অনেক মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ পূর্ববঙ্গের চন্দ্ররাজবংশের রাজা শ্রীচন্দ্রদেবকে চাঁদ সওদাগর বলে মনে করেন। অনেকে একই বংশের রাজা হরিশ্চন্দ্রকে মনে করে থাকেন। আবার কেউ কেউ চাঁদ সওদাগরকে বাংলার লোক মানতেই নারাজ। তারা "মনসা-মঙ্গলের চম্পকনগরীকে প্রাচীন মগধের রাজধানী চম্পক অনুমান করিয়া 'বিহারই এই গীতির আদিস্থান বলিয়া গন্য' করিতে চাহেন।"[৯] তিব্বতি লেখক লামা তারানাথের বিবরণ অনুযায়ী চন্দ্রবংশীয় রাজারা দেয়াঙে অর্থাৎ চট্টগ্রামে রাজধানী গড়ে তুলেন। বর্তমান আনোয়ারা থানাধীন বটতলীতে বিমান বাহিনীর সিগনাল অফিস স্থাপন করার সময় প্রাচীন স্থাপনার একটি ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। একে এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে চাঁদ সওদাগরের বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করে আসছে। সেই বাড়ির অদূরে রয়েছে চাঁপাতলী গ্রাম। যা পদ্মাপুরাণে বর্ণিত চম্পকনগরের বিকৃত রূপ বলে মনে করা হয়। অপরদিকে বর্তমান কর্ণফুলী থানার বন্দর গ্রামে 'চট্টগ্রাম নেভাল একাডেমী'র সন্নিকটে চাঁদ সওদাগরের দিঘী নামে একটি প্রাচীন দিঘীর এখনো অস্তিত্ব রয়েছে। এলাকার লোকজন ধারণা করে থাকে এ দীঘিটিই স্থানীয় জনগণের পানীয়জলের চাহিদা মিটিয়ে চাঁদের সপ্তডিঙ্গাতে পানি সরবরাহের অন্যতম উৎস ছিল। কর্ণফুলী নদীর তীরেই তার বজরার জেটি ছিল। চাঁদ সওদাগর সপ্তডিঙ্গা নিয়ে এখান থেকে সমুদ্রযাত্রা করতেন। তবে এ সবই ধারণা মাত্র। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাকমা উপকথা মতে, এককালে চম্পানগরী বা চম্পকনগরী নামে চাকমাদের এক নগর ছিল। তবে ঐ চম্পকনগরের সাথে চাঁদ সওদাগরের কোনপ্রকার যোগসূত্র এখনো পাওয়া যায়নি।

বেহুলার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিচার করে এর ওপর দাক্ষিণাত্যের প্রভাব রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। বাঙ্গালী নারীসুলভ কমনীয়তার অভাব রয়েছে তার মধ্যে। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে ক্ষিতিমোহন সেনকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, 'বেহুলার তেজ ও নির্ভীকতা বিবাহ-কাল হইতে, তাহার স্বামীসহ সমুদ্রে ভাসিয়া পড়াও কম সাহসের কথা নয়। ...তাহা খুব স্বাধীনভাবে চলাফেরার অভ্যাস না থাকিলে আশা করা যায় না। দেবপুরীতে নৃত্য করিয়া দেবতাকে প্রসন্ন করা দেবদাসীর কাজ। তাহা বাংলাদেশের প্রথা নয়। তাহা তৈলঙ্গেরই বস্তু।'[১০] আবার একই গ্রন্থে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে উদ্ধৃত করে এর বিরুদ্ধ মতটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, 'তুর্কী আক্রমনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার সমাজে নৃত্য বাঙ্গালী নারীর যে অবশ্য-শিক্ষনীয় একটি বিদ্যা ছিল, তাহা নানা সূত্র হইতে জানিতে পাড়া যায়। মনসা-মঙ্গলে শিব সর্বত্রই নটরাজ, নৃত্যেই তাঁহার আনন্দ। সুতরাং এই গুন বাঙ্গালী নারীরও ছিল।'[১১] বেহুলা যে পূর্ব থেকেই গৃহে নৃত্যগীত করত মনসামঙ্গলে এর উল্লেখ পাওয়া যায়– 'শিশুকাল হইতে বামা শিখে নৃত্যগীত। / সাধুসুতে জীয়াইবা দৈবের লিখিত।। / মা বাপের বাটীতে বেহুলা নাচে গায়। / বেহুলার গানেতে অমলা মোহ যায়।।'[১২]

মনসা অনার্য দেবী। কৃষিনির্ভর ভারতের অনার্য অধিবাসীরা সাপের উপদ্রুপ থেকে বাঁচার জন্য সর্পদেবী কল্পনায় মনসার পূজা প্রচলন করে। প্রাচীন বাংলার সর্বত্র এ পূজার বিস্তার ঘটে। গবেষক James Fergusson মনে করেন অনার্য জাতি, বিশেষ করে তুরানিয়ানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সর্পপূজার প্রচলন ঘটে। সেখান হতে ভারতবর্ষে এর বিস্তার হয়। 'it is that Serpent Worship is

Dhaka University Institutional Repository

essentially that of a Turanian, or at least of a non-Aryan people.'[১৩] অপরদিকে William Ckooke তাঁর *An Introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India* নামক গ্রন্থে এর কিছুটা দ্বিমত পোষণ করলেও সর্পপূজা যে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে উৎপত্তি হয়েছে সে বিষয়ে তিনিও সংশয়াপন্ন, '…may have introduced the worship into India from some northern home. But Mr. Ferguson's theory that snake worship was of purely Turanian origin is, to say the least, very doubtful.'[১৪] পারস্য ও ভারতবর্ষ ছাড়াও প্রাচীন মিশর, চীন, জাপান, কম্বোডিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকায় সর্পদেবতার (Snake God) অস্তিত্ব ও সর্পপূজার (Snake worship) প্রচলন দেখা যায়। উৎপত্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া গেলেও সর্পপূজার প্রচলন সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরেছিল এবং স্থানভেদে এর আচারও ভিন্ন-ভিন্ন রূপ লাভ করেছিল —একথা জোর দিয়ে বলা যায়। 'দেবতাদের মানুষ সৃষ্টির ব্যাপার নিয়ে সন্দেহ থাকলেও, মানুষ যে দেবতা সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে সংশয় নেই। মানুষ দেবতা সৃষ্টি করেছে বলেই পৃথিবীর বিভিন্ন জনসমাজে দেবতাদের মধ্যে এত বৈচিত্রময় রূপ দেখা যায় এবং এক এক জনসমাজে দেবতা-কল্পনায় দেশ-কাল-ভাব অনুসারে দেবতাদের রূপ ও স্বরূপের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটেছে।'[১৫]

লোককথা ও মঙ্গলকাব্য অনুযায়ী পার্বতীর কথা চিন্তা করে কামমগ্ন শিবের একদিন বীর্যস্খলন হয়। পদ্মপাতার ওপর সেই বীর্য রাখলে পদ্মের নল বেয়ে তা পাতালে চলে যায়। সেখানে ঐ বীর্য থেকে মনসার জন্ম হয়। নাগরাজ বাসুকীর কাছে পালিত মনসা যুবতী হলে পিতার কাছে ফিরে আসে। পিতা শিবের কাছে তাঁর পরিচয় দিয়ে কৈলাসে যাবার আকুতি জানায়। কৈলাসে গিয়ে সে শিবের স্ত্রী পার্বতীর রোষে পড়ে। পার্বতীর ইচ্ছায় মনসাকে বনবাসে দেয়া হয়। এরমধ্যে ব্রহ্মার বীর্য ধারণ করে মনসা উনকোটি নাগ জন্ম দিয়ে সর্পদেবী রূপে অধিষ্ঠিত হন। বনবাস থেকে ফিরে মনসা স্বর্গে স্থান পাবার বাসনায় পিতার কাছে নিজের পূজা প্রচলনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। শিব জানায়, তাঁর ভক্ত চাঁদ সওদাগরের কাছ থেকে যদি পূজা আদায় করা যায়, তবে মর্ত্যে মনসাপূজার প্রচলন হবে।

পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী বেহুলা স্বর্গের অনিরুদ্ধের স্ত্রী ঊষা। সর্পদেবী মনসার কারসাজিতে স্বর্গের নটসভায় ঊষা-অনিরুদ্ধের নাচের মুদ্রা ভুল হয়। এতে উপস্থিত দেবতাগণ ক্ষিপ্ত হন। তাঁদের অভিশাপে স্বর্গচ্যুত হয়ে মর্তে গমন করে ঊষা-অনিরুদ্ধ। লোককাহিনি অনুযায়ী তারা হলেন উজানীনগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলা এবং চম্পকনগরের চাঁদ সওদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দর (লখাই/লক্ষীন্দর/লক্ষ্মীন্দর)। 'মনসামঙ্গল কাহিনি স্থুলত : তিনভাগে বিভক্ত। ...তৃতীয় ভাগই হইতেছে মূল আখ্যায়িকা'[১৬] অর্থাৎ চাঁদ সওদাগর-বেহুলা-লখিন্দর উপাখ্যান।

বিধির বিধান অনুযায়ী মর্তে তারা আবার স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মিলিত হন। বেহুলার শ্বশুর চাঁদ সওদাগরের কাছে সর্পদেবী মনসা মর্ত্যে তাঁর পূজা প্রচলনের অভিলাষে পূজা প্রার্থনা করেন। শিবভক্ত চাঁদ পূজা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে রুষ্ট মনসার রোষে পড়ে। পিতার পরামর্শ গ্রহণ ছাড়াও মনসার মনে চাঁদসওদাগরের কাছ থেকে পূজালাভের বাসনার আরও একটি কারণ ছিল। চণ্ডীর (পার্বতীর আরেক নাম) সাথে মনসার আগে থেকেই বিরোধ চলে আসছিল। 'পরমাসুন্দরী কন্যা অকুমারী বেশ। / চণ্ডীর প্রহারে তার তনু হইল শেষ।। / অতি কোপে মারে চণ্ডী সহিতে না পারি। / কাতর হইয়া বলে জয় বিষহরী।।'[১৭] সৎ-মা পার্বতীর কাছে সে ছিল চক্ষুশূল। এ কারণে নিগৃহীত মনসাকে পরবর্তীতে অত্যন্ত উগ্র স্বভাবের অসুখী এক দেবী হিসেবে দেখা যায়। পার্বতীর সঙ্গে বিরোধের সূত্র ধরে চণ্ডীভক্ত চাঁদ সওদাগরের হাতে মর্ত্যে নিজের পূজা প্রতিষ্ঠার জেদ চাপে মনসার। এর ফলহেতু মনসার কারসাজিতে চাঁদের সপ্তডিঙ্গা (মতান্তরে চৌদ্দডিঙ্গা[১৮]) পানিতে ডুবে যায়। একে একে ছয় ছেলে সাপের কামড়ে মারা পড়ে। তাতেও শিব ভিন্ন কারো পূজা দিতে রাজি হয়নি। নিঃস্ব

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদ সওদাগরের ঘরে জন্ম নেয় লখিন্দর। কুচক্রী মনসা পূজা আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে লৌহবাসরে লখিন্দরের প্রাণনাশ করে। স্বামীর পুনর্জীবনের আশায় বেহুলা মৃত লখিন্দরকে নিয়ে কলাগাছের ভেলায় চড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। অনেক বাধাবিপত্তি পেড়িয়ে শেষে স্বর্গের ধোবিন নেতার সহযোগিতায় দেবপুরীতে পৌঁছায়। সেখানে নৃত্যগীতে দেবতাদের তুষ্ট করে বর লাভ করে। কিন্তু মনসা শর্ত জুরে দেয় চাঁদ সওদাগর তাঁকে পূজা দিতে হবে। শর্তে রাজি হলে মনসা লখিন্দর ও অতীতে তাঁর কোপে নিহত চাঁদের অন্য ছয়পুত্রের জীবন এবং সম্পদ-সম্ভারসহ সপ্তডিঙ্গা ফিরিয়ে দেয়। শিবভক্ত চাঁদ বেহুলার অনেক অনুনয়-বিনয়ে শেষ পর্যন্ত মনসার পূজা দিতে রাজি হয়। এভাবে মর্ত্যে মনসার পূজার প্রচলন ঘটে। মনসা পূজা প্রচলন করে লখিন্দর-বেহুলারূপী স্বর্গের দম্পতি অনিরুদ্ধ-ঊষা পুনরায় স্বর্গে গমন করে।

বেহুলা : মঙ্গলকাব্য ও লোকসাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সংযোগ বিচার

পুরাণ, মঙ্গলকাব্য কিংবা লোককথা সবখানেই 'বেহুলা' একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। এই চরিত্রটি বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে পতিব্রত ও সতীত্বের দৃষ্টান্ত। আখ্যানটিও লৌকিক-পারলৌকিক উভয় কারণে বহুল জনপ্রিয়। বাংলার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ঘরে ঘরে মঙ্গল কামনায় প্রতি আশ্বিন মাসে এর পাঠ হয়। উপাখ্যানের এই জনপ্রিয়তাকে উপজীব্য করে বাংলাদেশ ও ভারতে একাধিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। ১৯৬৬ সালে জহির রায়হান বাংলাদেশে প্রথম 'বেহুলা' নামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। কাহিনির জনপ্রিয়তাকেই কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন তিনি। আগের বছর তাঁর প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবি 'বাহানা'র ব্যবসায়িক ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার জন্য এমন একটি জনপ্রিয় কাহিনিই খুঁজছিলেন। হিন্দু মিথের উপর গড়ে ওঠা দেব-দেবী নির্ভর—আগাগোড়াই হিন্দু সংস্কৃতিকে ধারণ করা এমন একটি গল্প নির্বাচনেও ব্যবসায়িক ঝুঁকি ছিল। ষাটের দশকে যখন একটি মহল বাংলা ভাষার উপরই হিন্দুত্বের তকমা এঁটে দিয়েছিল, সেইসময় এরকম একটি গল্প নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ দুঃসাহসিক ব্যাপার ছিল। বিশেষ করে দর্শকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ যেখানে মুসলিম। হিন্দু পৌরনিক কাহিনিনির্ভর সিনেমা দেখতে তারা কতটা আগ্রহী হবেন, সেদিক থেকেও যথেষ্ট অনিশ্চয়তা ছিল। জহির রায়হান সেই সাহস দেখালেন। দারুণভাবে ব্যবসাসফল হয়েছিল এই ছবি। বাংলার সমাজে প্রচলিত কাহিনির সার্বজনীনতাকেই দর্শক গ্রহণ করেছিল। এই সার্বজনীনতা এতই প্রভাব ফেলেছিল যে এদেশের মুসলিম সমাজেও ঐ সময় দাদি-নানিরা তাদের নাতি-নাতনিদের চাঁদ সওদাগর কিংবা বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি শুনিয়ে ঘুম পাড়াত।

স্থান-কাল-মাধ্যম ভেদে কাহিনির ভিন্নতা থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য একটি সর্বজনগ্রাহ্য কাহিনি দাঁড় করানো চলচ্চিত্রকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। তা মোকাবেলা করতে জহির রায়হান কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। চলচ্চিত্রের শুরুতেই তিনি পৌরনিক উপাখ্যান 'বেহুলা-লখিন্দর' সমন্ধে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সম্বলিত একটি ধারণা নেপথ্যকণ্ঠ ও টাইটেল কার্ডে লিখিত ইমেজের মাধ্যমে দর্শকদের দিতে চেয়েছেন— 'সাংসারিক দুঃখ কষ্টে চির অভ্যস্ত এই সমাজ একমাত্র নিজের আদর্শকে চিরদিন উচ্চ করিয়া ধরিয়া লইয়া পথ চলিয়াছে। পরাজয় যে জীবনে মানিয়া লইল, সেইত দূর্ভাগা। নৈরাশ্যমথিত হৃদয়ে আশার একটি দীপশিখাকেও যে অনির্বাণ রাখিয়া দুস্তর সংসার গাঙুরে ভেলা ভাসাইয়া দিয়াছে, তাহার জীবনে বাঁচিবার মত বলের-ত অভাব হয় না এবং পরিনামে বাঁচিয়া উঠিতে পারে সে-ই। বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি বা পদ্মাপুরাণে দেবতা নাই। পদ্মাপুরাণ প্রকৃত

Dhaka University Institutional Repository

মানুষেরই কাব্য।[১৯] এই উক্তির দ্বারা জহির রায়হান স্পষ্টতই ইঙ্গিত করেছেন তাঁর নির্মিত 'বেহুলা' মর্তের মাটি ও মানুষের সাংসারিক জীবনের সুখ-দুঃখের গল্প। দেবলোকের কোন ভূমিকা নেই এখানে। কাহিনির প্রয়োজনে দেবলোকের কিছু দৃশ্যায়ণ থাকলেও তার প্রভাব একেবারেই গৌণ। ১৯৭৭ সালে কলকাতায় নির্মিত অমল দত্তের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় নির্মিত 'বেহুলা লখীন্দর' সিনেমায় মর্তের চেয়ে স্বর্গের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অমল দত্তের সিনেমার শুরুই হয়েছে দেবীর প্রতি ভক্তি সংগীত দিয়ে। দেবীবন্দনার পরই দেখা যায় ইন্দ্রসভায় ঊষা-অনিরুদ্ধ নৃত্যরত। এখানে পৌরনিক কাহিনি অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু জহির রায়হানের বেহুলা সিনেমা একেবারেই মর্ত্যের মানুষের। চলচ্চিত্রকার সিনেমার শুরুতে সেটা স্পষ্ট করেছেন।

নাম ভূমিকার পরেই প্রায় ৪৫ সেকেন্ড দীর্ঘ প্যানশটে দখোনো হয়েছে চাঁদ সওদাগরের প্রাসাদের দৃশ্য। প্রাসাদের চূড়ায় বসানো রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মূর্তি। এতে একদিকে বোঝানো হয়েছে তার প্রাসাদ তথা জমিদারির বিশালতা। অন্যদিকে চাঁদের ধর্মানুগত্যতা। বিশাল প্রাসাদের বাইরে বসে চাঁদ সওদাগর জ্যোতিষীকে দিয়ে ছেলের বিয়ের জন্য পাত্রীর সন্ধান করছে। জ্যোতিষী ঠিকুজী বিশ্লেষণ করে দেখে লখিনের বিয়ে হবে পশ্চিমে সায়সওদাগরের (সায়বেনে) সতী, বুদ্ধিমতী, সুন্দরী কন্যা বেহুলার সঙ্গে। একথা শুনে চাঁদ সওদাগর পুলকিত হয়ে ওঠে। কারণ সায় সওদাগর তার পরম বন্ধু। সিনেমায় লৌকিকতা আরোপ করতে পূর্ব বন্ধুত্বের সম্পর্কের অবতারণা করা হয়েছে। বাংলার কোন এলাকায় এরকম কাহিনি প্রচলিত আছে বলে জানা যায়নি। তবে বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ (জেলা) এলাকায় 'বেহুলা-লখিন্দর' নামে প্রচলিত যাত্রাপালায় সায়সওদাগর ও চাঁদ সওদাগরের মধ্যে বিয়াইর সম্পর্ক ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে সায়ের ছয় মেয়ের সঙ্গে চাঁদের মৃত ছয় ছেলের বিয়ের সম্পর্কের কথা উল্লেখ রয়েছে।[২০] সিনেমার দৃশ্যে বিবাহযোগ্য পুত্রের বিয়ে দেওয়ার জন্য বাবার আকুলতার চিরাচরিত বাঙালি রূপটি ফুটে ওঠেছে। তৎকালীন সমাজে রাজা-জমিদারদের যে কোন প্রয়োজনে ভবিষ্যৎ জেনে নেওয়ার প্রচলন, এমনকি বিয়ের পাত্র-পাত্রীর সন্ধান ও বিয়ের ব্যাপারে জ্যোতিষের দ্বারস্থ হওয়ার বিষয়টি সিনেমায় ওঠে এসেছে। মঙ্গলকাব্যে ঘটকের মাধ্যমে লখিন্দরের জন্য পাত্রীর সন্ধান করতে দেখা যায়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গলের 'লখিন্দরের বিবাহ সম্বন্ধ' অংশে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। 'ঘটক বলেন বেনে কর অবধান। / চাঁদসদাগর বটে তোমার সমান।। / অবিবাহী পুত্র তার নাম লখিন্দর। / তারে কন্যা দেহ তুমি সায় সদাগর।। / সায়বেনে বলে তুমি তারে যদি জান। / গণক আনিয়া তবে দুই রাশি গণ।। / গণনে পঠনে যদি দুই রাশি হয়। / তবে ত তাহারে কন্যা দিব সুনিশ্চয়।।'[২১]

লখিনের মৃগয়া গমনের অস্তিত্ব মূল কাহিনিতে নেই। সিনেমায় দৃশ্য বর্ণনার মাধ্যমে তৎকালীন রাজা-জমিদারপুত্রদের শিকারে যাওয়ার মতো বিলাসিতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পরের দৃশ্যে সায়সওদাগরের কন্যা বেহুলা সখীদের নিয়ে সরোবরে নৃত্যগীতে মগ্ন। সকল সখীরা তাকে পদ্মদল বেষ্টনীতে ঘিরে গান গাইছে। মাঝখানে পাপড়ি বেষ্টিত পদ্মকলির ন্যায় বেহুলা। তার চোখদুটি যেন প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের উপর বসা একজোড়া কালো ভ্রোমরা। বেহুলা চরিত্রটির সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে চলচ্চিত্রকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। 'বেহুলা ছবিটি আক্ষরিক অর্থেই বেহুলাময়। গল্পটাতেই বেহুলা চরিত্রটির প্রাধান্য খুব বেশি আর পরিচালকও ছবির বড় অংশ ব্যয় করেছেন এই চরিত্রের সুচন্দার মিষ্টি চেহারা, বিশেষ করে তার অসম্ভব সুন্দর দীঘির মত টলটলে পটলচেরা চোখকে দর্শকের সামনে তুলে ধরতে।'[২২] জমিদার কন্যাদের সখী-সহচরী নিয়ে ঘোরাফেরা করার দৃশ্য যোগ করে সিনেমায় লৌকিকতা আনা হয়েছে। নৃত্য-গীত ছিল ঐ সময়ের সিনেমায় দর্শক মনোরঞ্জনের অন্যতম প্রধান উপাদান।

Dhaka University Institutional Repository

জলকেলি শেষে সখিদের নিয়ে প্রাসাদে ফেরার পথে বেহুলা এক অচেনা লোককে ময়ূর কাঁধে হেঁটে বেড়াতে দেখে অবাক হয়। কারণ এ রাজ্যে মনসার পূজা হয়। মনসা সর্পদেবী, ময়ূর অকারণে সর্প হত্যা করে। তাই নিছনিপুর রাজ্যে মনসার প্রধান শত্রু ময়ূর নিষিদ্ধ। অপরদিকে অচেনা লোকের সঙ্গে আসা ময়ূর সর্প হত্যা করেছে জানতে পেরে মনসা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ধুমকেতুকে আদেশ দিয়ে বলে— 'যে দেশের মানুষ আমাকে পূজো করে। সেখানে ময়ূর! ময়ূর যে আমার এক সাপ মেরে ফেলেছে। যাও, শিগ্‌গির খোঁজ নিয়ে এসো কোন্ পাপিষ্ঠ ঐ দুর্মুখ ময়ূরকে এনেছে। তাকে বের করে তার শাস্তির আয়োজন কর (বে. চ.)।' মূল কাহিনির উন্মত্ত মনসাকে এই দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। নিছনিপুর রাজ্যের নাম নিয়ে মূল কাহিনিতে মতভেদ রয়েছে। বিজয় গুপ্ত লিখেছেন, 'সায় নামে সদাগর উজানিতে ঘর / তাহার ঘরে কন্যা আছে পরম সুন্দর।'[২৩] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ লিখেছেন, 'নিছনি নগরে বেনে সায় অধিকারী। / তাহার বনিতা নাম অমলা সুন্দরী।।'[২৪] চলচ্চিত্রকার এই মতভেদকে অতিক্রম করতে গিয়ে নিছনি নগর থেকে নিছনিপুর নামটি ব্যবহার করেছেন। সিনেমায় নিছনিপুরবাসী কর্তৃক মনসা পূজার ফলে কাহিনি মূলভাব চ্যুত হয়েছে। কারণ মূলে শিবভক্ত চাঁদ সওদাগর কর্তৃক মনসার পূজা প্রচলনই আখ্যানের অভীষ্ট ছিল। তাছাড়া সায় সওদাগর ছিলেন শিব সাধক। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে তার সম্পর্কে উল্লেখ আছে, 'অনেক পুরুষে করে শিবলিঙ্গ পূজা। / অতি শুদ্ধভাবে পূজে দেবী দশভূজা।।"[২৫] মর্ত্যে মনসার পূজা প্রচলনের প্রধান উপায় ছিল কোন শিব সাধকের হাতে পূজা পাওয়া। সেদিক থেকে মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচলিত হওয়া এবং পুরো আখ্যানটিরই পরিসমাপ্তি ঘটার কথা। মূল অনুযায়ী এখানে এক ধরনের কাহিনিজট তৈরি হয়েছে। সায় সওদাগর সম্বন্ধে পুরাণ, মঙ্গলকাব্য বা লোককাহিনিতে বিস্তারিত বর্ণনা নেই। সে সুযোগ নিয়ে চলচ্চিত্রকার তাঁর নিজের মতো করে সায়কে নির্মাণ করেছেন। মূল কাহিনি থেকে বের হয়ে জহির রায়হান সিনেমায় লৌকিক সামন্তবাদকে তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং মনসাকে এখানে সাম্রাজ্যবাদী প্রভু হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তাই তাঁর অনুগত রাজ্যে অন্যের অনধিকার অনুপ্রবেশে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সায় সওদাগরকে এখানে মনসার একনিষ্ঠ সাধক হিসেবে দেখানো হয়েছে মূলত মনসার সামন্তবাদী আধিপত্য বোঝানোর জন্য।

বেহুলা তার গলার মুক্তোর হার রাস্তার এক ভিক্ষুককে দিয়ে বাবার কাছে ক্ষমা চাইতে এলে সায় বলে— 'ভিক্ষুকের হাত ভরে দিলে যে দেবতা আমার সন্তুষ্ট হয়' (বে. চ.)। এখানে সায়ের ধর্মভীরুতা ও পরহিতৈষী রূপ দেখা যায়। অপরদিকে এক বিদেশি ময়ূর দিয়ে সাপ মেরে ফেলেছে চাকর মারফত এ খবর পেয়ে সায় বিচলিত হয়ে ওঠে। সর্প হত্যার দায়ে ঐ বিদেশিকে সে প্রাণদণ্ড দিতে প্রতিজ্ঞ হয়। ধর্মভীরু সায় সওদাগর হাত জোড় করে মনসার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে— 'মা মনসা, মা মনাসা, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মা। আমার কোন দোষ নেই' (বে. চ.)। বিদেশিরূপী লখিনকে ধরে নিয়ে এলে তাকে উদ্দেশ্য করে কথার মধ্যেও মনাসার ভয়ে বিচলিত হতে দেখা যায়— 'তুমি জান এটা মা মনসার রাজ্য? ময়ুর হল মা মনসার বড় শত্রু' (বে. চ.)। এই দৃশ্যে সায় সওদাগরের সংলাপে চর্বিত চর্বণ লক্ষণীয়। সত্যজিৎ রায় বলেছেন, চলচ্চিত্রে সময়ের দাম বড় বেশি। যত অল্প কথায় যত বেশি বলা যায়, ততই ভালো ; আর কথার পরিবর্তে যদি ইঙ্গিত ব্যবহার করা যায়, তবে ত কথাই নেই।[২৬] এই দৃশ্যে সায়কে প্রথমে চরম মনসাভক্ত ধার্মিক হিসেবে দেখা যায়, পরক্ষণে নীতিজ্ঞানহীন সুবিধাবাদী জমিদাররূপে দেখে পাঠকের মনে দোলাচলের জন্ম দেয়। সায়ের কথার জবাবে লখিন্দর যখন বলে 'আপনারা যাকে দেবী বলে পূজা করেন আমরা তাকে ঘৃণা করি' (বে. চ.)। এ কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে সায় লখিন্দরের পরিচয় জানতে চায়। লখিন্দর জানায় চম্পক রাজ্যের রাজা চাঁদ সওদাগরের ছেলে সে। একথা শুনে সায় পুলকিত হয়ে ওঠে। লখিনকে সঙ্গে নিয়ে বেহুলাকে অন্তঃপুরে যেতে বলে। একটু আগে যাকে প্রাণদণ্ড দিবে বলে মনস্থির করেছিল তাকে ন্যূনতম শাস্তি দেওয়ার কথাও ভুলে যায়। চাঁদ সওদাগর তার বন্ধু বলে মুহূর্তেই ধর্মজ্ঞান লোভ পেয়ে যায়। এখানে

Dhaka University Institutional Repository

স্বজনপ্রীতির কাছে তার ধর্ম ও নীতিজ্ঞানের পরাজয় ঘটেছে। চলচ্চিত্রকার এখানে ক্ষমতাবানদের স্বরূপ উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন।

নিছনিপুরে বেহুলা-লখিন্দর একসাথে ঘুরাফেরা করতে করতে একে অপরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে। মূল উপাখ্যানে এরকম কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। আখ্যান অনুযায়ী ঘটক মারফত খবর পেয়ে চাঁদসওদাগর নিজেই যায় কন্যা দেখতে। 'পাত্র মিত্র পুরোহিত করিয়া সংহতি। / কন্যা দেখিতে যায় সাধু নরপতি।। / সশস্ত্র হাজার পাইক চলিল সত্বর। / হস্তী পৃষ্ঠে চড়ি যায় চান্দ সদাগর।।'[২৭] পৌরনিক আখ্যান থেকে বের করে এনে কাহিনিকে লৌকিক প্রেমোপাখ্যান হিসেবে নির্মাণ করতে চলচ্চিত্রকার বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহপূর্ব প্রেম কাহিনির অবতারণা করেছেন। সিনেমায় লখিন চোখের আড়াল হলেই বেহুলা উন্মনা হয়ে ওঠে। জল আনার ছলে কলসি কাঁখে খুঁজতে খুঁজতে দীঘির পাড়ে যায়। লখিন্দরকে পেয়ে প্রণয়ের দাবি খাটিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'না বলে এত সকাল সকাল চলে এলে যে' (বে. চ.)। লখিন এই অধিকার খাটানোর মর্মার্থ না বুঝে বেরসিকের মতো উত্তর দেয়, 'বাইরে আসতে হলে কাউকে বলে আসতে হয় (বে. চ.)!' এতে কিছুটা লজ্জায় পড়ে যায় বেহুলা। কপট অভিমানে বাড়ি চলে যাওয়ার পথে বেহুলা কলসী খুঁজে পায় না। সখীরা কলসী লুকিয়ে রেখে বেহুলা-লখিন্দরকে উদ্দেশ্য করে প্রেমের গান গাইতে থাকে। এই দৃশ্যে প্রেমিক প্রেমিকার লোকজ মান-অভিমান, কলসি কাঁখে পানি আনার ছলে প্রেমিকের সঙ্গে প্রেয়সীর দেখা করতে যাওয়ার গ্রামবাংলার চির চেনা দৃশ্যের রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সায় সওদাগর বেহুলাকে লখিনের কাছে বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবে। বেহুলার মা অমলা এতে বাধ সাধে। কারণ সে জানে মনাসার অভিশাপে চাঁদের বংশ বিষে বিষে জর্জরিত। ছয় ছয়টি ছেলে ইতোপূর্বে সর্প দংশনে মারা গেছে। কিন্তু সায় সওদাগর অবিচল। লখিনের জন্মের আগেই সে চাঁদ সওদাগরকে কথা দিয়েছে। মনসার কুচক্রে চাঁদ সওদাগর যখন মহাজ্ঞান শক্তি, ধন্বন্তরী, ছয় ছেলে ও সম্ভারসহ সপ্তডিঙ্গা মধুকরী হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। সর্বহারা চাঁদের সেই দুঃসময়ে হাত ধরে কথা দিয়েছিল বেহুলাকে লখিনের হাতে তোলে দিবে। তাই সায়ের দৃঢ়চেতা মনোভাবের কাছে অমলার অমত হেরে যায়। অমল দত্ত পরিচালিত বেহুলা লখিন্দর সিনেমায় ধন্বন্তরীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। যে মনসার আক্রোশে সাপের কামড়ে মারা যাওয়া মানুষদের জীবিত করে তোলে।[২৮] সেখানে সে ছিল মনসার বিরুদ্ধে চাঁদ সওদাগরের একটি বড় অস্ত্র। মঙ্গলকাব্যেও তার সরব উপস্থিতি রয়েছে— ধন্বন্তরি মরা মানুষ জীয়ায় প্রতাপে। / ধন্বন্তরি থাকিতে চান্দে জিনিবে কার বাপে।। / যে দেখিলাম তাহার গুণ শুন তাহা কই। / ধন্বন্তরি বধিতে সাজাও বিষ দই।।[২৯] জহির রায়হান ধন্বন্তরী অধ্যায়টিকে সিনেমায় এড়িয়ে গেছেন। চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রা, সর্বস্ব হারানো, ছয় ছেলের মৃত্যু ও লখিনের জন্ম থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত অংশটুকুও একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে।

বেহুলা লখিন্দরের প্রগাঢ় প্রেমপর্বের মুহূর্তে সিনেমায় গানের ব্যবহার করা হয়— 'নাচে মন ধিনা ধিনা, প্রাণেতে বাজে বীনা। বাজে রে। / নাচে মন ধিনা ধিনা, প্রাণেতে বাজে বীনা। বাজে রে। / সখা বাজেনা, বাজেনা, বাজেনা রে। / সখা বাজেনা, বাজেনা, বাজেনা রে। / তোমার সঙ্গ বিনা আমার মনের বিনা। / তোমার সঙ্গ বিনা আমার মনের বিনা। / সখা বাজেনা, বাজেনা, বাজেনা রে। / সখা বাজেনা, বাজেনা, বাজেনা রে।'[৩০] সঙ্গীতপর্বের বাইরে লখিন বেহুলাকে ময়ূর নাচ শেখায়। এই খবর পেয়ে মনসা আরও রুষ্ট হয়। যে রাজ্যে তার পূজো হয়, তার নামে যারা অন্ধ, সেই রাজ্যের রাজতনয়া ময়ূর নাচ শিখছে এটা মনসা মেনে নিতে পারে না। মেয়ের প্রতি অনুরক্ততায় সায় সওদাগরকে দেবীর কথা ভুলে যেতে দেখে ক্ষুব্ধ মনসা নিজেই যায় বেহুলাকে বারণ করতে। বেহুলা মনসাকে চিনতে না পেরে অবজ্ঞা করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মনসা অভিশাপ দেয়— 'আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, বাসররাতে তুমি তোমার সিঁথির সিঁদুর হারাবে' (বে. চ.)। এই অভিশাপ বারবার

Dhaka University Institutional Repository

বেহুলার কানে বাজে। একথা শুনে সায় সওদাগরও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কাহিনির শুরুতে তাকে যেভাবে মনসার একনিষ্ঠ ভক্ত হিসাবে দেখানো হয়েছিল, পরবর্তীতে আর এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। এমনকি মেয়েকে এতোবড় অভিশাপ দেওয়ার পরও সিনেমায় তার মঙ্গলের জন্য মনসার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে দেখা যায়নি সায়কে। স্বধর্মের প্রতি অনুরাগ ও মেয়ের মঙ্গল কামনার চেয়ে বন্ধুকে দেয়া ওয়াদা রক্ষা করার বিষয়টিকে জহির রায়হান বড় করে দেখিয়েছেন।

মনসার সহচরী মেনকার অনুকম্পা হয় নিরপরাধ বেহুলার জন্য। বেহুলাকে অভিশাপমুক্ত করার জন্য মনসাকে অনুরোধ করে। কিন্তু কিছুতেই তাঁর মন গলাতে পারেনি। কারণ চাঁদসওদাগর তার চরম শত্রু। মনসা এখানে তার শত্রুর ছেলেকে কিছু না করে বেহুলাকে শাপ দিয়েছে। পূর্ব শত্রুকে ঘায়েল না করে ভক্তকে শত্রুজ্ঞান করেছে। যার ময়ূরের আঘাতে সাপ মারা গেছে, যে বেহুলাকে ময়ূরনৃত্য শিখিয়েছে তাকে নাগালে পেয়েও নিষেধ না করে, প্রতিশোধ না নিয়ে ; বেহুলাকে নিষেধ করা, অভিশাপ দেয়া—এর দ্বারা মনসার প্রতিহিংসাপরায়ণ মানসিকতার ব্যাপকতা বোঝানো হয়েছে সিনেমায়। মনসামঙ্গল কাব্যের কোথাও বেহুলাকে অভিশাপ দিতে দেখা যায়নি। বরং চাঁদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে, তার উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ছেলে লখিন্দরকে বাসররাতে সর্প দংশনে হত্যা করা হয়। লৌকিক জটিলতার মতো মনসা কর্তৃক ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে বড় করে দেখিয়ে সিনেমায় নাটকীয়তা তৈরির লক্ষ্যে এরকম কুটিল কাহিনির আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকতে পারে।

চাঁদ সওদাগরের স্ত্রী সনকা ছেলে লখিনের অমঙ্গল আশংকায় লুকিয়ে মনসার পূজো দেয়। একদিন পূজো দিতে যাওয়ার সময় চাঁদের হাতে ধরা পড়ে যায়। ক্ষিপ্ত হয়ে চাঁদ লাথি দিয়ে সনকার হাতে থাকা মঙ্গলঘট ভেঙ্গে ফেলে। কারণ মনসার জন্য তার ছয় ছেলেকে হারাতে হয়েছে, শোকে তার চোখের জল ফুরিয়ে গেছে। তাই চ্যাংমুড়ি কানি মনসাকে সে ঘৃণা করে। সিনেমায় চাঁদ সওদাগরকে মনসার চক্রান্তে অতিষ্ট হয়ে তার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতে দেখা গেলেও এর মূল কাহিনিতে রয়েছে চাঁদের জাত্যাভিমান। কারণ মনসা অনার্য নিম্নবর্গের মানুষের পূজনীয়। চাঁদের মতো উচ্চবংশীয় কেউ মনসার পূজা করলে জাত-ভেদ থাকে না। তাই সে সম্ভ্রান্ত দেব-দেবী শিব-পার্বতীর পূজাদানে আগ্রহী ছিলেন। নিজের বউ হয়ে সনকা চুপি চুপি মনসার পূজা দেয়, এটা তার কাম্য নয়। এখানে চাঁদের অবিচল জেদী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। জেদের কারণে চাঁদসওদাগর হয়ত বুকে পাথর চাপা দিতে পেরেছে কিন্তু মা হয়ে সনকা তা পারেনি। এই সনকা বাঙালি মায়ের প্রতিচ্ছবি। সন্তানের মঙ্গল কামনায় সে সবকিছু করতে পারে। এই দৃশ্যে চাঁদের মুখে ছয় পুত্রবধুর কথা উল্লেখ থাকলেও সিনেমার কোথাও তাদের উপস্থিতি দেখা যায় না। চরিত্রবহুল এই কাহিনি থেকে যথাসম্ভব চরিত্র কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা সাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টির সাথে অর্থের কোন সংশ্রব না থাকলেও চলচ্চিত্রে এটি ব্যয়বহুল ব্যাপার।

সিনেমায় দেখা যায় মনসার কারণে বারবার বিপর্যস্ত চাঁদ বিপদের কথা শুনলেই শঙ্কিত হয়ে ওঠে। যেন অনিবার্য পরিনতি তাকে আবার গ্রাস করবে। একারণে চাঁদ সওদাগরের কাছে চাকর খবর নিয়ে এলে প্রথমে দুঃসংবাদ মনে করে ভরকে যায়। যখন জানতে পারেনিছনিপুরের সায় সওদাগর সপরিবারে আসছে তখন খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ে। বহুদিন পর তার মনে বাঁধ ভাঙ্গা আনন্দের জোয়ার ওঠে। বন্ধু সায়ের মেয়ে বেহুলা আর নিজের সন্তান লখিনকে কাছে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে সে বুঝতে পারে না এটা কি জীবন না মৃত্যুর স্বাদ—'ওরে, ওরে আমার সাত রাজার ধন এক মানিক। ...ওরে আমার লক্ষ্মী মা। তোরা আমায় ধর। আনন্দে আমার সর্বশরীর কাঁপছে। একি জীবন না মৃত্যু!'(বে. চ.) আনন্দের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেলে মানুষের এমন উপলব্ধি হতে পারে। এাঁ

মানুষের অনুভূতির চরম পর্যায়। আনন্দের শেষ রেখা। চলচ্চিত্রকার এখানে মানব মনের অনুভূতি প্রকাশে গভীরতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

সায় তার বন্ধু চাঁদ সওদাগরকে বেহুলার প্রতি মনসার দেয়া অভিশাপের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বেহুলা-লখিন্দরের মঙ্গলের জন্য মনসার পূজো দিতে অনুরোধ করে। কিন্তু চাঁদসওদাগর অবিচল। তাই সনকা এ বিয়েতে রাজি হয় না। ছয় ছেলে হারিয়ে শোকাগ্রস্ত মা তার একমাত্র ধন লখিনকে হারাতে চায় না। বন্ধুত্বের ওয়াদা রক্ষার্থে চাঁদের ওপর মনসার অভিশাপের কথা জেনেও সায় যেহেতু তার মেয়েকে বিনাবাক্যে লখিনের হাতে তুলে দিতে রাজি, সেখানে চাঁদ সওদাগর বিবেকবোধের তাড়না থেকে পূর্ব ওয়াদা হতে সরে আসতে পারে না। তাই সনকাকে সে বলে, 'আমার ওপর মনসার অভিশাপের কথা জেনেও সায় সওদাগর যদি তার সোনার প্রতিমাকে তোমার হাতে সঁপে দিতে পারে, তাহলে তুমি কেন পারবেনা। তুমিতো সব জান সনকা। লখিনের জন্মের সময়ই এ বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে আছে। মনসার শত অভিশাপও এ বিয়ে বন্ধ করতে পারবে না। চাঁদ সওদাগর যদি বেঁচে থাকে এ বিয়ে হবেই হবে' (বে. চ.)। একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের বলিষ্ঠরূপ এই চরিত্রের মাধ্যমে ফুটে ওঠেছে। চাঁদ সওদাগর চরিত্রে ফতেহ লোহানী দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন। চাঁদ সওদাগরের এই দৃঢ় মনোভাব, বিদ্রোহীরূপ সত্ত্বা ১৯২৭ সালে মন্মথ রায় প্রথমে তাঁর 'চাঁদসদাগর' নামক পৌরাণিক নাটকে অঙ্কিত করেন। মন্মথ রায়ের এই নাটককে উপজীব্য করে ১৯৩৪ সালে প্রফুল্ল রায় 'চাঁদসদাগর' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।[৩১] সিনেমায় ক্ষেত্রবিশেষে সায়সওদাগরকেও দৃঢ়চেতা মনোভাবাপন্ন দেখা যায়। বন্ধুকে দেওয়া কথা রাখতে গিয়ে, বন্ধুর প্রতি সহমর্মী হয়ে আরাধ্য দেবীকে পর্যন্ত ভুলে যেতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। মঙ্গলকাব্যে বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিয়ে পূর্ব থেকেই পাকাপাকি হয়ে থাকার বিষয়ে কোন উল্লেখ না থাকলেও লোকমুখে প্রচারিত কাহিনিতে কোন কোন স্থানে এর উল্লেখ লক্ষণীয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যাত্রাপালায় ব্যবহৃত কাহিনিতে সায় সওদাগরের সঙ্গে চাঁদ সওদাগরের পূর্ব পরিচয় ও সেই সূত্রে বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহ পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে থাকার বিষয়টির স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া পুরাণ অনুযায়ীও বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহ বিধির বিধান মতে পূর্ব নির্ধারিত অনিবার্য বিষয়।

চাঁদ ও সায়ের সম্মিলন দেখে মনসার প্রতিশোধপরায়ণ মনোভাব তীব্র হয়ে ওঠে। সদয় মেনকা আবারও বেহুলার ওপর থেকে অভিশাপ উঠিয়ে নিতে মনসাকে অনুরোধ করে। মনসা কোনভাবেই রাজি হয়না। অবিচল চাঁদসওদাগর পরিকল্পনা করে বেহুলা-লখিন্দরের জন্য লোহার বাসর তৈরি করার। মনে মনে নিশ্চিন্ত হয় এই ভেবে যে, লোহার বাসরঘর ভেদ করে মনসা বেহুলা-লখিন্দরের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। চাঁদ সিদ্ধান্ত নেয় ওদের জন্য সাঁতালি পর্বতের পাথর খুড়ে লৌহবাসর তৈরি করবে। কার্যসিদ্ধির জন্য বিশুকে খবর পাঠায়। মনসামঙ্গলে[৩২] এর নাম বিশ্বকর্মা বলে উল্লেখ আছে। বেদে বিশ্বকর্মাকে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বিশ্বের তাবৎ কর্মের সম্পাদক। তিনি শিল্পসমূহের প্রকাশক, অলঙ্কার শিল্পের স্রষ্টা, দেবতাদের গমনাগমনের জন্য বিমান নির্মাতা। অর্থাৎ শিল্পবিদ্যায় তাঁর একচ্ছত্র অধিকার।[৩৩] পুরাণের বিশ্বকর্মাকে লোকজ করতে পরিচালক তার নাম দিয়েছেন বিশু। বাংলার গ্রামে গ্রামে বাস করা মিস্ত্রিদের প্রতিনিধি এই বিশু। চলচ্চিত্রে বিশু ও তার বউয়ের মধ্যে মূল ঘটনা বিবর্জিত বাড়তি হাস্যরসাত্মক দৃশ্যের অবতারণা করে বাংলার গ্রামীন সমাজের স্বামী-স্ত্রীর নিত্য কলহ ফুটিয়ে তুলেছেন জহির রায়হান। দর্শকদের স্থুল আনন্দ দেয়াও এর একটি উদ্দেশ্য ছিল। তবে এসব দৃশ্যে চলচ্চিত্রের শিল্পগুণ ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা থাকে। পরে আরও একটি দৃশ্যে বিশু এবং তার বউয়ের মধ্যে অহেতুক দৃশ্যগীতের অবতারণা করা হয়েছে।

পরিকল্পনামতো চাঁদ বিশুমিস্ত্রিকে সব কাজ বুঝিয়ে দেয়। অধিক নিশ্চয়তার জন্য বাসরঘর ধুয়া দিয়ে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় লৌহবাসর তৈরির খবর মনসা জেনে গিয়ে দম্ভ করে বলে, 'চাঁদ সওদাগরের জানা উচিত যে সে মর্তের মানুষ, স্বর্গের দেবীর সঙ্গে সে কিছুতেই পারবে না' (বে. চ.)। এ উক্তির দ্বারা দুর্বলের প্রতি পরাক্রমশালীদের দম্ভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এখানে মনসার দেবীসুলভ পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং আমাদের সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দাম্ভিক ক্ষমতাশালীর প্রতিচ্ছবি হিসেবে তাকে দেখতে পাই। কূটকৌশলী মনসা ধুমকেতুকে নির্দেশ দেয়, যে করেই হোক সায় আর চাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে। নির্দেশ পেয়ে ধুমকেতু তান্ত্রিকের ছদ্মবেশ ধারণ করে বেহুলার কাছে যায়। পানি খাওয়ার ছলে পূর্ব অভিশাপের কথা তোলে ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের কথা জানায়। বেহুলা কাকুতি মিনতি করে এর উপায় জানতে চায়। তান্ত্রিকরূপী ধুমকেতু বেহুলাকে ঘোর অমাবস্যার রাতে দ্বিপ্রহর সময়ে এক কাপড়ে, এলোকেশে, একাকিনী শ্মশানঘাটে যেতে বলে। বেহুলা ধুমকেতুর অভিসন্ধি বুঝতে না পেরে অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভের আশায় বিনাবাক্যে রাজি হয়ে যায়। এই পুরো দৃশ্যটিই মূল কাহিনি বিবর্জিত। এখানে মনসা চরিত্রটিকে দেবী মহিমা থেকে বের করে এনে মনুষ্য সমাজের একজন ক্ষমতাবান কুটিল নারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। লখিন্দরের মঙ্গল কামনায় আচ্ছন্ন বেহুলা সাত পাঁচ না ভেবে রাত দ্বিপ্রহরে সবার অগোচরে তান্ত্রিকের কথামতো শ্মশানঘাটে ছুটে যায়। সেখানে তান্ত্রিকের দেয়া অমৃত সুধা পান করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মনসার আদেশে ধুমকেতু চাঁদ সওদাগরের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। যাতে বেহুলাকে এ অবস্থায় দেখে ভুল বোঝে। এই পুরো ঘটনাটাই আমাদের সমাজের কুটিল মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের কর্মকান্ডের সাথে উপমেয়। প্রকারান্তরে চলচ্চিত্রের মনসা 'দেবী' নয়, সমাজের নষ্ট মানুষদের প্রতিভূ।

শ্মশানঘাট থেকে উদ্ধারের পর বেহুলার মুখ থেকে সুরার গন্ধ বের হয়। তাতে সবার মনে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। বেহুলাকে অসতী মনে করে চাঁদ সওদাগর বিয়েতে অমত করে। সনকাও অসতী মেয়েকে পুত্রবধু করতে রাজি নয়। এমন নাটকীয় মুহূর্তেও লখিন্দরকে নির্বিকার দেখা যায়। পুরো ছবিতেই তাকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। কাহিনির প্রবহমানতার জন্য যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকুই তাকে পর্দায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এর একটি কারণ হতে পারে, নায়ক হিসেবে এটিই ছিল রাজ্জাকের প্রথম ছবি। সে কারণে তাঁর উপরে পরিচালকের আস্থার কিছুটা ঘাটতি ছিল। সঙ্গত কারণে তাঁকে দিয়ে সংলাপও যথাসম্ভব কম বলানো হয়েছে। বেহুলা অসতী নয় একথা বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে লখিনকে তার গলা টিপে মেরে ফেলতে বলে। নিজের বাবাও তাকে বিশ্বাস করতে চায় না। বেহুলা যখন তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে তুমিও আমায় বিশ্বাস কর না বাবা? প্রতিউত্তরে সে বলে, 'বিশ্বাস, বিশ্বাস করতে যে বুক ফেটে যাচ্ছে মা' (বে. চ.)। এই দৃশ্যেও পরিচালক নিজের মতো করে কাহিনি বর্ধিত করেছেন। মানব মনের সহজাত সন্দেহ প্রবণতা এবং এর ফলে সৃষ্ট জটিলতা এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিছুতেই কাউকে বিশ্বাস করাতে না পেরে নিরুপায় বেহুলা হঠাৎ বারুদের মতো জ্বলে ওঠে। এতদিনের শান্ত ধীর বেহুলা হঠাৎ প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে, 'আমি যাব না, আমি অসতী নই' (বে. চ.)। বেহুলার দৃঢ়তা দেখে সবাই অবাক হয়। এতক্ষণ ধরে দর্শকদের দেখানো সিনেমার 'বেহুলা' চরিত্রটি অসহায় বাঙালি নারীত্বের খোলস থেকে বেরিয়ে স্বরূপে ফিরে আসে। তার তেজ দেখে কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে চাঁদ সওদাগর বেহুলার কাছে জানতে চায়— 'সতী না অসতী জানব কিভাবে'? বেহুলাও অনুরূপ জানতে চায়— 'কষ্টি পাথরে যদি সোনা যাচাই করা যায়, তাহলে সতী-অসতী যাচাই করার কি কিছুই নেই পৃথিবীতে?' (বে. চ.) সনকা উত্তর দেয়, আছে। আগুন।

নির্দ্বিধায় অগ্নিপরীক্ষা দিতে রাজি হয় বেহুলা। কারণ সে জানে, সে সতী। তার বদ্ধমূল বিশ্বাস আগুন কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবুও কিছুটা সংশয় তার মনে ছিল। তাই পরের শটে

অগ্নিপরীক্ষায় যাওয়ার আগে লখিনের কাছে শেষবারের মতো আবদার করে তার কপালে সিঁদুর দেওয়ার জন্য। তার মনের দ্বিধা ; যদি আগুনে পুড়ে মারা যায়, তাই লখিনের হাতে সিঁদুর পড়ে তার শেষ ইচ্ছা পুরণ করতে চায়। এবারও নির্বিকারভাবে বেহুলার ইচ্ছা পুরণ করে লখিন্দর। শেষবারের মতো লখিনের পা ছুঁয়ে জলন্ত আগুনের দিকে পা বাড়ায়। সবাই বিমর্ষ হলেও কেউ তাকে বাঁধা দেয় না। এ যেন যুগ যুগ ধরে ভারতীয় হিন্দু সমাজে চলে আসা নিয়ম, সতীত্ব প্রমাণের উপায়। ধর্মভীরুদের কাছে নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথার মতো স্বাভাবিক বিষয়। যে প্রথায় বাবার মৃত্যুর পর সন্তানেরা তাদের জীবিত মাকে জলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করার আয়োজন করত। তেমনি মা-বাবা, হবু স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ি সবাই মিলে বেহুলার সতীত্ব প্রমানের আয়োজন করেছে। *Widows in Indian life: From ancient to the present times* শীর্ষক একটি গবেষণাপত্রে সতীদাহ প্রথার এরকম বর্ণনা পাওয়া যায়, 'this suttee system in later course of time took a dangerous trend in the society of Bengal. This system was so popular that the children after the death of their father used to arrange funeral pyre for their living mother, and they did not even hesitate to put fire to that pyre.'[৩৪] কেউ কেউ নিজের সতীত্ব প্রমানের জন্য স্বেচ্ছায় আগুনে ঝাঁপ দিত। কেউ আবার ধর্মীয় কীংবা সামাজিক চাপে বাধ্য হতো। Ketan Mehta পরিচালিত ২০০৫ সালের আলোচিত ছবি *Mangal Pandey: The Rising* ছবিতে দেখা যায় Jwala নামক এক সদ্য বিধবাকে সহমরণের জন্য শ্মশানঘাটে মৃত স্বামীর চিতায় বসিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিতা যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে Jwala চিৎকার করে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছে কিন্তু অন্যরা ধর্মের নামে জোর করে তাকে জীবন্ত দাহ করার চেষ্টা করছে।[৩৫] কখনো কখনো স্বেচ্ছা সহমরণেচ্ছুকে আফিম খাইয়ে আচ্ছন্ন করে রাখা হত যাতে জ্বলন্ত চিতা থেকে পালানোর চেষ্টা করতে না পারে। অপর্ণা সেন পরিচালিত 'সতী' সিনেমার প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায় আফিম খাইয়ে সদ্য বিধবাকে স্বামীর সঙ্গে সহমরণের জন্য শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।[৩৬] আলোচ্য সিনেমায় নিজেকে সতী প্রমানের জন্য বেহুলা কারো প্ররোচনা ছাড়াই আগুনে ঝাপ দিয়েছে। বরঞ্চ আগুনে ঝাপ দেওয়ার আগে দৃঢ়চিত্তে বাবাকে বলেছে, 'কেঁদোনা বাবা, ভগবান যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে তার আগুনেও আমি পোড়ব না (বে. চ.)।' ধর্মীয় বিশ্বাস আর নিজের প্রতি আস্থার কারণে স্বেচ্ছায় আগুনে ঝাপ দিতে সে কুণ্ঠাবোধ করেনি। জহির রায়হান তাঁর পূর্ব ঘোষিত লৌকিকতা ছেড়ে এই দৃশ্যে অলৌকিক জগতে প্রবেশ করেছেন। তাই আগুন বেহুলাকে স্পর্শ করেনি। সতীত্বের পরীক্ষায় সে জিতে যায়। চাঁদ সওদাগর বুঝতে পারে এ সবই মনসার কীর্তি। যে সায়সওদাগর দিন রাত মনসার পূজা করত, সে মনসা সায় সওদাগর আর তার মেয়েকে ধোকা দিয়েছে। পুরো সিনেমাকে জহির রায়হান দেবলোক থেকে বের করে এনে মিথের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। কিন্তু সতীদাহ প্রথার মতো আগুনে ঝাপ দিয়ে সতী প্রমাণের ঘৃণ্য একটি বিষয় অবতারণা করে ধর্মীয় গোড়ামীকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এর মাধ্যমে দর্শকদের মনে একধরনের সস্তা আবেগ সৃষ্টি করার অভিপ্রায় হয়ত তাঁর মধ্যে কাজ করে থাকতে পারে।

কূটকৌশলে বারবার চাঁদের কাছে হেরে গিয়ে মনসা অস্থির হয়ে পড়ে। বরাবরের মতো মেনকা মনসার প্রতিহিংসাপরায়ণ কাণ্ডের প্রতিবাদ করে। চাঁদসওদাগরের উপর অসন্তোষের কারণে তাকে শাস্তি দিতে গিয়ে বেহুলার জীবন নষ্ট করার প্রতিবাদ করে। মনসা মেনকাকে জানায় বেহুলা যদি চালাক মেয়ে হয় তাহলে সে অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে ; সে যদি বাসর ঘরে সারারাত জেগে থাকতে পারে, যদি সে সতীত্ব নষ্ট না করে তাহলে তার কোন ক্ষতি হবে না। একথা শুনে মেনকা গোপনে গিয়ে বেহুলাকে সাবধান করে আসে। মেনকাকে খারাপ মানুষের ভিড়ে সমাজে যে কিছু বিবেকবোধসম্পন্ন ভাল মানুষ আছে তাদের প্রতিরূপ হিসেবে জহির রায়হান চিত্রিত করেছেন।

গানের তালে তালে লোহার বাসর তৈরির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলে। শ্রমজীবী মানুষ কাজের সময় গান গাইতে গাইতে পরিশ্রমকে ভুলে থাকতে চায়। বিশুমিস্ত্রি ও তার লোকজন গানে গানে লৌহবাসর তৈরির মতো কঠিন কাজ সম্পন্ন করে। বাসরঘর তৈরি হয়ে গেলে ধোঁয়া পরীক্ষা করে চাঁদসওদাগর নিশ্চিন্ত হয়। খুশি হয়ে বিশুকে জায়গির, রাজ্যখন্ড দিতে চায়। বিশু এসব না নিয়ে বলে— 'প্রভু, বিপদে পড়লে রাজা প্রজাকে সাহায্য করবে, আর প্রজা করবে রাজাকে। এখানেই তো মানুষের আসল পরিচয়' (বে. চ.)। বিশুকে এখানে নির্লোভ অতি সাধারণ এক মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে দেখা যায়। চাঁদ সওদাগর খুশি হয়ে নিজের গলার রত্নহার বিশুকে দিয়ে দেয়। উপহার পেয়ে বিশু খুশিতে আটখানা হয়ে যায়। কল্পনায় ভাবে এই রত্নহার পড়ে বউয়ের সামনে গিয়ে তাকে রাজার মতো আদেশ দিবে। বউয়ের কাছ থেকে অকর্মা বলে অনেক মুখ ঝামটা সহ্য করতে হয়েছে তাকে। তার উচিত জবাব দিবে আজ। অসহায় সাধারণ মানুষের হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সম্পদযোগ হলে খুশিতে তার মানসে যে অবান্তর ভবিষ্যৎ কল্পিত হয়, জহির রায়হান সেই গভীরে প্রবেশ করে বিশু চরিত্রে এই দিকটি উন্মোচন করেছেন। এমন সময় মনসা এসে তার সামনে হাজির হয়। চাঁদের দেয়া রত্নহারের চেয়ে বেশি মূল্যের রত্নহার, এমনকি যা চায় তা-ই দেয়ার প্রলোভন দেখায়। বিনিময়ে ঐ লোহার বাসরঘরে একটা সূচ পরিমাণ ছিদ্র করে দিতে বলে। বিশু কিছুতেই রাজি হয়না। সাফ জানিয়ে দেয় নিমুক খেয়ে সে রাজার সঙ্গে নিমুক হারামি করতে পারবে না। দুরাচারী মনসা কথা না শুনলে বিশুকে সর্প দংশনে বংশ নির্বংশ করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে উধাও হয়ে যায়। লৌকিকতা আরোপ করতে গিয়ে সিনেমার অনেক স্থানে জহির রায়হান গোল পাকিয়ে ফেলেছেন। সিনেমার কোথাও মনসা 'দেবী', আবার কোথাও ক্ষমতাধর নারী। সিনামায় তাঁর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা দেখা যায়। ইচ্ছে করলে সে নিজে যে কোন কাজ করতে পারে। তার একটি বিশাল কর্মী বাহিনীও আছে। ইতোপূর্বে চাঁদকে সর্বস্বান্ত করে দেওয়ার উল্লেখও আছে এই সিনেমায়। তারপরও লৌহবাসরে সামান্য ছিদ্র করে দেয়ার জন্য বিশুর দ্বারস্থ হওয়ায় মনসার স্বরূপ নিয়ে দর্শকদের দ্বিধান্বিত করে।

মনসার প্রলোভন, হুমকি বিশুর নির্লোভ মনুষ্যত্বকে টলাতে পারেনি। বিমর্ষ হয়ে বিশু বাড়ি ফিরে ভাত খেতে গিয়ে পাতিলে সাপ দেখতে পায়। সারা ঘরে শুরু হয় সাপের উপদ্রুব। ঘরের যেদিকে তাকায় সেদিকেই সাপ দেখা যায়। আতংকিত হয়ে পড়ে সবাই। মনসা আবার এসে বিশু তার প্রস্তাবে রাজী কিনা জানতে চায়। বিশু এবারও তার নীতিতে অবিচল থাকে। পরদিন ঘরের বাইরেও সাপের উপদ্রুব শুরু হয়। বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত মনসার কথায় বিশু রাজি হয়। গোপনে গিয়ে লোহার বাসর ঘরে ছিদ্র করে দিয়ে আসে। নিরুপায় বিশু মন থেকে কষ্ট পায়, কান্না করে। সে বেহুলা-লখিন্দরের বিয়েতে অংশগ্রহণ না করে বাড়িতে বসে থাকে। কমলী তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে দুজনের কথোপকথন থেকে বিশুর মনোকষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাপের দংশনের চেয়ে বিবেকের দংশন অনেক বেশি যন্ত্রনাদায়ক মনে হয় তার কাছে। সেই বোধ থেকে চাঁদ সওদাগরকে সব খুলে বলতে যায়। কিন্তু পথে মনসা তার গতিরোধ করে হুমকি দেয়। তারপরও বিশু বিয়ে বাড়িতে যায়। সবার বাঁধা উপেক্ষা করে চাঁদ সওদাগরের কাছ পর্যন্ত গিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পরে। অতিরিক্ত মদ্যপান করেছে ভেবে চাঁদ সওদাগর তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলে। সত্য আর প্রকাশ হয় না। এই দৃশ্যটি সিনেমায় চরম নাটকীয়তার উদ্রেগ করেছে। এখানে বিশুকে সাপে দংশন করেছে কিনা স্পষ্ট বুঝা যায় না। তবে ধারণা করা যেতে পারে মনসার কথা না রেখে সত্য ফাঁস করে দিতে আসার পথে মনসার নির্দেশে বিশুকে সাপে দংশন করেছে। চলচ্চিত্রকার এখানে দর্শকদের সামনে জিজ্ঞাসা ছুড়ে দিয়ে শিল্পগুণের পরিচয় দিয়েছেন।

ত্রুটিহীন বাসরঘর তৈরি হয়ে গেছে ভেবে নিশিন্তমনে চাঁদ সওদাগর যখন বিয়ের আয়োজন করতে থাকে। নৃত্য-গীতে মহা আনন্দে চাকররা গ্রামবাসীদের নিমন্ত্রণ করে। বিয়ের রাতে ঠাকুর বিস্মিত হয় কুলপ্রথা ভেঙ্গে ছেলের বাড়িতে বিয়ের প্রথম রাত যাপনের জন্য। সায়সওদাগর বলিষ্ঠ

কণ্ঠে তখন ঠাকুরকে বলে—'কুলপ্রথা, আইন, নিয়ম, সমাজের চেয়ে দুটি ছেলে-মেয়ের জীবন বড়'। এখানে কুলপ্রথা নয়, পরিচালক নিজেই সামাজিক প্রথা ভাংতে চেয়েছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল কাব্যে 'চাঁদ সদাগরের নিছনি নগরে গমন ও সায়বেনের সহিত কথোপকথন' অংশে দেখা যায়, চাঁদসওদাগর নিজেই ঘটককে সঙ্গে নিয়ে সায়বেনের বাড়িতে যায় এবং লখিন্দরের বিয়ে পাকাপাকি করে আসে। 'আমার সহিত তুমি কর কুটুম্বিতা / সায় সদাগর বলে আমার ঐ কথা।। / তুমি যে আমায় জান, আমি তোমায় জানি। / লখিন্দরে বিভা দিব বেহুলা নাচুনী।।'[৩৭] সিনেমায় হবু বরের বাড়িতে কনেসহ মেয়েপক্ষ এসে বিয়ে পাকাপাকি করা, বরের বাড়িতেই বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা করা এসব দৃশ্যের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধাচারণ করে চলচ্চিত্রকার দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মাপুরাণে দেখা যায় বরযাত্রীসহ লখিন্দর বিয়ে করতে উজানী নগর যায়। বিয়ে শেষে নববধূ নিয়ে দোলায় চড়ে চম্পকনগরে ফিরে আসে। 'চান্দ বলে শুন পুত্র পন্ডিত লখাই। / দোলায় চড় বধূ সমেত নিজ দেশে যাই।। / দোলায় চড়িল বেহুলা আর লক্ষ্মীন্দর। / হস্তীর পৃষ্ঠেতে চড়ে চান্দ সওদাগর।।'[৩৮]

সিনেমায় চাঁদ সওদাগরের বাড়িতে বিয়ের আয়োজন চলে। এতে বিয়ের রাতেও দীর্ঘ গানের ব্যবহার করা হয়েছে। মনসামঙ্গলের কাহিনি নিয়ে অনেক পালা ও গীতিনাট্য প্রচলিত আছে। 'বেহুলা' সিনেমা নির্মানকালীন সময়ে এগুলো খুব জনপ্রিয় ছিল। তাই চলচ্চিত্রকার দর্শক চাহিদার কথা মাথায় রেখে সুযোগ পেলেই সিনেমায় গানের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। সে সময় বাংলা সিনেমায় গান অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মনে করা হতো। তবুও কথায় কথায় গানের ব্যবহারে মূল কাহিনি স্ববিস্তারে বর্ণনার সুযোগ কমে যায়। সিনেমার শিল্পগুণ নষ্ট হয়। গানের ব্যবহার বাড়িয়ে দৃশ্যায়নের খরচ, সময় ও ঝামেলা এড়াতে নির্মাতাদের কাছে এটি একটি কৌশল—অযথা গান জুড়ে দিয়ে সিনেমার দৈর্ঘ্য বাড়ানোর ফন্দি। ১২৭ মিনিট দৈর্ঘের এই চলচ্চিত্রে চৌদ্দটি গানের ব্যবহারে মোট ব্যয় হয়েছে ৪৫ মিনিট ১০ সেকেন্ড সময়। যা মোট সময়ের ৩৫ শতাংশেরও বেশি। 'বেহুলা'কে কিছুটা গীতিনাট্যধর্মী সিনেমা হিসেবে নির্মাণ করতে জহির রায়হান প্রয়াসী হয়েছিলেন বলে প্রতিভাত হয়। চলচ্চিত্রের মধ্যে শিল্পের সব শাখার মিশ্রণ থাকে। H. P. Manoogain বলেছেন, 'from music the Film secures rhythmic arrangements, and at times developes there to the point of being 186 Kev186terized by a musical form. Form painting compositional arrangements and the subtle intricates of design. From dance comes the ebb and flow of movements the refinement of communicate the rough physical gesture and relationship. And from the theatre comes both the playright, an original and creative artist and the stage director, and interpretive artist who fuses the written play idea with the craft and form of his direction, thus heightening the substance of the content through his staging. Also from the theatre comes these interpretive artists and designs responsible for scenery costumes and lighting as well as the make-up artists, animators, film cutters and editors.'[৩৯] তবে সবকিছুর সুসংহত ব্যবহার না হলে চলচ্চিত্রের স্বকীয়তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সিনেমায় গানের অধিক ব্যবহার ও প্রাধান্য আলোচ্চ চলচ্চিত্রের জন্য কিছুটা হলেও শিল্প-সংকট তৈরি করেছে।

বাসর রাতে বেহুলাকে স্বামীহীন করার অভিশাপ কার্যকর করতে সব নাগিনীরা আদেশের অপেক্ষায় প্রস্তুত। প্রতিশোধের উন্মত্ব নেশার হিংস্রতা প্রকাশ করার জন্য চলচ্চিত্রে মনসার কথার সঙ্গে সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়েছে। শঙ্খিনী, পদ্মিনী, নাগরাজ, মনিরাগ, শঙ্খচূড়, দুধরাজ,

অজগর, চন্দ্রভোড়া, কাল নাগিনী কেউই স্বেচ্ছায় লখিন্দরকে দংশন করতে যেতে রাজি হয় না। অবশেষে শঙ্খিনীকে আদেশ করা হয়। সে লোহার বাসর ঘরে প্রবেশ করে দেখে ঘুমন্ত স্বামীর শিউরে বসে বেহুলা পাহারা দিচ্ছে। বেহুলাও তার উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। শঙ্খিনীকে তাড়াতে বেহুলা মন্ত্র উচ্চারণ শুরু করে— 'উত্তর বাঁধলাম, পশ্চিম বাঁধলাম, বাঁধলাম পূর্বদ্বার / দক্ষিনদ্বারে সর্বনাশা সর্প মনসার / স্বাক্ষী থাকল চন্দ্র সূর্য প্রভু অবতার / দক্ষিনদ্বারে সর্বনাশা সর্প মনসার / সতী আমি সতি নারী পতি লখিন্দর / সিঁথির সিঁদুর সত্য হইলে ছারবি তুই এই ঘর' (বে. চ.)। এরপর গীত-মন্ত্রে শঙ্খিনীকে মিনতি করে চলে যেতে। বেহুলার আকুতি দেখে শঙ্খিনী ফিরে এলে মনসা তাকে তিরস্কার করে। শঙ্খিনী জানায় বেহুলা এখনো ঘুমায়নি। বেহুলা জেগে থাকলে সে দংশন করতে সক্ষম হবে না। মনসা নেতাকে নির্দেশ দেয় ঘুমের রানীকে বলতে, সে যেন বেহুলাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। এবার কাল নাগিনীকে নির্দেশ দেয় লখিন্দরকে দংশন করার জন্য। আপত্তি সত্বেও কাল নাগিনীকে যেতে হয়। যাওয়ার সময় মনসা শিখিয়ে দেয় দরকার হলে বাইরে থেকে কাকের ডাক দিতে। যাতে সকাল হয়েছে মনে করে বেহুলা ঘুমিয়ে পরে। কালনাগিনীকে পথমধ্যে বেহুলার সর্বনাশ করতে নিষেধ করে মেনকা। কিন্তু কালনাগিনী অসহায়, সে দেবীর নির্দেশ অমান্য করতে পারে না। তবে সে কথা দেয়, লখিন্দর তাকে আঘাত না করা পর্যন্ত দংশন করবে না। মেনকা পূর্বেই বেহুলাকে গোপনে জানিয়ে এসেছিল যাতে বাসরঘরে সে ঘুমিয়ে না পড়ে। কিন্তু বাইরে কাকের ডাক শুনে, কালনাগিনীর ছলনা বুঝতে না পেরে সকাল হয়ে গেছে ভেবে বেহুলা ঘুমিয়ে পড়ে। এই সুযোগে কালনাগিনী পালঙ্কে গিয়ে বসে। ঘুমের ঘোরে লখিন্দর কালনাগিনীকে পা দিয়ে আঘাত করলে তাকে দংশন করে। লখিন্দরের চিৎকার শুনে বেহুলা ঘুম থেকে ওঠে বাঁচাও বাঁচাও করে আর্তনাদ করে। কিন্তু ততক্ষণে বিষের জ্বালায় ছটফট করতে করতে লখিন্দর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সিনেমায় এই দৃশ্যগুলোতে মনসার দেবত্ব ও কাহিনিতে অলৌকিকত্ত্ব আরোপ করা হয়েছে। মূল কাহিনিকে এখানে অনুসরণ করা হয়েছে।

স্বামীশোকে বেহুলা স্তব্ধ হয়ে পড়ে। একে একে তার হাতের সব শাঁখা খুলে ফেলা হয়। এত আয়োজনের পরও এই দুর্ঘটনায় চাঁদ সওদাগর ও সায় সওদাগর নির্বাক হয়ে যায়। চাপা কষ্ট নিয়ে চাঁদ সওদাগর বেহুলাকে লখিন্দরের পা দিয়ে তার মাথার সিঁদুর মুছে ফেলতে বলে। বেহুলা মুছতে চায় না। কান্নায় তার বুক ফেটে আসে। চাঁদ সওদাগর তাকে কাঁদতে মানা করে বলে— 'ছিঃ কাঁদিসনে মা, তাহলে ঐ চ্যাংমুড়ি কানী হাসবে। শেষ দেখা দেখে নে মা। ...আমি ওকে জলে ভাসিয়ে দিব' (বে. চ.)। বেহুলা আকুতি জানায় যাতে জলে ভাসিয়ে দেওয়া না হয়। চাঁদ সওদাগর বলে— 'সে-ই প্রথা, সে-ই নিয়ম। অনেক সময় জলের গুণে মরাও বেঁচে ওঠে।' একথা শুনে বেহুলার মনে ক্ষীণ আশা জাগে। বেহুলা মরা স্বামীর সঙ্গে ভেসে যেতে চায়, দূরে, অমৃতের দেশে। স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। একারণে সিঁথির সিঁদুর মুছতে চায় না। সর্পনির্ভর সিনেমার মধ্যে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত সবচেয়ে আলোচিত ও ব্যবসাসফল ছায়াছবি তোজাম্মেল হক বকুল পরিচালিত 'বেদের মেয়ে জোসনা'। ১৯৮৯ সালে নির্মিত এ ছবিতে দেখা যায়, বঙ্গরাজের এক পরগনার কাজী সাহেবের মেয়ে জোসনাকে সাপে কাটলে বাঁচানোর সব চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তাকে কলার ভেলায় চড়িয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ভাসতে ভাসতে সেই ভেলা নদীর তীরে এসে থামে। সেখান থেকে এক বেদে সর্দার তাকে উদ্ধার করে সুস্থ করে তোলে।[৪০] প্রাচীনকাল থেকে বাংলার লোকসমাজে একটি ধারণা তৈরি হয়েছিল সাপে কাটা মানুষ মরে না। পানিতে ভাসিয়ে দিলে কোন একসময় কারো না কারো দ্বারা সে সুস্থ হয়ে ওঠে। ২০১০ সালে ভারতে নির্মিত, মনোজ কুমার পরিচালিত 'সতী বেহুলা' সিনেমায় তান্ত্রিকের মুখে বলতে শোনা যায় 'হিন্দু শাস্ত্রমতে সাপে কাটা ব্যক্তিকে শুধু ভেলায় ভাসানো হয়।'[৪১] বেহুলা-লখিন্দরের পৌরণিক কাহিনি কিংবা হিন্দুশাস্ত্র নয়, জহির রায়হানের 'বেহুলাতে' লোকসমাজে প্রচলিত ধারণাই প্রাধান্য পেয়েছে। সেই ধারণায় ভর করে কলাগাছের ভেলায় চড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পারি জমায় বেহুলা। নেপথ্যে গীত হতে থাকে, 'কি শাপে

দংশিল লখাইরে / হে বিধি কি হইল / সুতানলি সাপ ও রে ছিল / ও তার কৃষ্ণবর্ণ দেহ... / সুতাসম ছিদ্র দিয়া হায়রে বাসরে পৌছিল...' (বে. চ.)।

যুগে যুগে নারীদেরকেই শুধু সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। আগুনে ঝাপ দিতে হয়েছে। পতিব্রতা প্রমাণের জন্যও নিজেকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুক্ষীণ হতে হয়েছে। মনসামঙ্গলেও বেহুলাকে লোহার কলাই রান্না করে পতিব্রততার পরীক্ষা দিতে দেখা যায়— 'হেনকালে চাঁদবেনে কহে আর কথা। / যদি সে তোমার কন্যা হয় পতিব্রতা।। / লোহার কলাই দিবে করিয়া রন্ধন। / সে ধনী বিভা করে আমার নন্দন।।'[৪২] অমল দত্তের 'বেহুলা লখিন্দর' সিনেমায় যখন লখিন্দরের লাশের পাশে বলাবলি করছিল— বাসররাতে যার পতিবিয়োগ হয় সে অসতী। তখন অগ্নিপরীক্ষা দিয়েই শুধু পার পায়নি। তুলাদন্ড পরীক্ষা দিয়ে, কন্টকাসরে নৃত্য করে বেহুলাকে সতীত্বের প্রমাণ দিতে হয়েছিল।[৪৩] তার আগে স্বামীর লাশ নিয়ে ভেলায় চড়ার পর্যন্ত অনুমতি পায়নি ।

অনেকদিন হয়ে গেলেও চাঁদ সওদাগর শোক ভুলতে পারেনা। কেঁদে কেঁদে চাঁদ সওদাগর-সনকার চোখ পাষাণ হয়ে যায়। সিনেমার সংলাপে জানা যায়, এক বর্ষায় লখিনদরকে ভাসিয়ে দিয়েছে মাঝে আরেকটি বর্ষা পাড় হয়ে গেছে। এক বর্ষা থেকে আরেক বর্ষা মানে এক বছর। এক বছরের অধিককাল সময় স্বামীকে নিয়ে বেহুলা অথৈ দড়িয়ায় ভাসতে থাকে। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে' বর্ণিত আছে মরা লখিন্দরকে নিয়ে বেহুলা ছয় মাস পারি দিয়ে দেবপুরীতে শিবের কাছে পৌঁছায়— 'মরা স্বামী লইয়া কোলে, ভাসি গাঙ্গরীর জলে, / তোমার উদ্দেশে আসি হেথা।। / অপার সমুদ্রপার, ছয় মাস নিরাহার, শরীর শুকায় ভোকে শোকে।'[৪৪] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত 'মনসামঙ্গলে'ও লখিন্দরকে নিয়ে বেহুলার ভেলায় চড়া থেকে নেতার সাথে স্বাক্ষাতের সময় ছয়মাস বলে উল্লেখ আছে, 'মঙ্গল বিভার রাতি / কাল সর্পে খাইল পতি / ছয় মাস ভেসে আসি জলে। / ভাগ্যেতে ছিল যে লেখা / তোমার সঙ্গেতে দেখা / পতি পাব তোমা কৃপাবলে।'[৪৫] লখিন্দরকে নিয়ে বেহুলার ভেলায় চড়ে অজানার পথে ভেসে বেড়ানোর দৃশ্যে কোন সংলাপ নেই। বেহুলার স্থির-নিশ্চল অভিব্যক্তি দিয়ে অনেক না বলা কথা, জমাট বাঁধা অনেক কষ্ট বুঝে নেওয়া যায়। ডিটেলের ব্যবহারে পরিচালক এখানে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সূর্যের উদয়-অস্ত, ভরদুপুর সময়, ঢেউ, দমকা বাতাস এসবের মধ্যে ভেলা ভাসার দৃশ্য ধারণের মাধ্যমে উত্তাল দরিয়ার মাঝ দিয়ে দিন রাত পেড়িয়ে নির্ভীক বেহুলার ভেসে চলার চমৎকার দৃশ্যায়ন হয়েছে। দর্শকদের কাছে হয়ত পানির মধ্যে এতো লম্বা সংলাপহীন দৃশ্য দেখে বিরক্তির উদ্রেগ হতে পারে। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে দেখা যাবে এতে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বেহুলার অভিব্যক্তি তুলে ধরা হয়েছে। এখানে অসঙ্গতি একটি দেখা যায়। স্বামীর লাশ পঁচে শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গেছে কিন্তু কলা গাছের ভেলা অক্ষতই রয়ে গেছে। মূল আখ্যান অনুযায়ী ভাসান অংশে বেহুলাকে অনেক বিপদ ও চড়াই উৎরাই পার হতে হয়েছে। সেখানে সে সবকিছু শক্তভাবে মোকাবেলা করেছে। 'বেহুলা' সিনেমায় এসব দৃশ্য থাকলে স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে অবিচল বেহুলার দৃঢ়চেতা ও সংগ্রামী রূপটি ফুটে ওঠত। এর পরিবর্তে তার শান্ত-স্থির অসহায় বাঙালিসুলভ রূপটি এই চলচ্চিত্রে ওঠে এসেছে।

ভাসতে ভাসতে ভেলা একসময় নেতার ঘাটে গিয়ে ভিড়ে। নেতা ঘাটে কাপড় কাঁচতেছিল। বেহুলাকে দেখে নেতা সাহায্য করতে চায়। এতে বহুদিন পর বেহুলার মুখে সম্ভাবনার চিহ্ন দেখা যায়। নেতার মুখে স্বামীকে ফিরে পাওয়ার কথা শুনে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। কিভাবে স্বামীকে ফিরে পাবে জানতে চায়। নেতা সবিস্তারে সব খোলে বলে। নেতার কথামতো বেহুলা মরা স্বামীর কঙ্কাল নিয়ে ইন্দ্রসভায় পৌঁছে। বেহুলাকে দেখে ইন্দ্রসভায় উপস্থিত মনসা অবাক হয়। দেবরাজ ইন্দ্র বেহুলার পরিচয়, কিভাবে এল, আসার কারণ জানতে চায়। বেহুলার হয়ে নেতা উত্তর দেয় 'আমি নিয়ে এসেছি প্রভু। দেবরাজের সমীপে ওর কিছু বক্তব্য আছে' (বে. চ.)। বেহুলা দেবরাজের কাছে স্বামীকে

ফেরত চেয়ে বলে, 'তোমরাই না হয় শাস্ত্র তৈরি করেছ, তোমরাই যদি তাকে ভাঙ্গবে। তাহলে মানুষ আর দেবতায় পার্থক্য রইল কোথায়' (বে. চ.)। বেহুলার করুণ আকুতি মনসা ছাড়া ইন্দ্রসভার দেবতাদের মনে দাগ কাটে। দেবগণ এটা অন্যায় বলে প্রতিবাদ করে। এক দেবতা বলে ওঠে চাঁদ সওদাগর যদি মনসার পূজো দিত, বেহুলা যদি ময়ূর নাচ না শিখত তাহলে লখিন্দর মারা যেত না। উত্তরে বেহুলা বলে 'জোর করে কি কারো কাছ থেকে ভক্তি আদায় করা যায় প্রভু' (বে. চ.)। অন্যরা বেহুলার এ কথার সমর্থন করে। দেবতারা জানায় লখিন্দরকে ফিরে পেতে হলে দেবতাদের খুশি করে, তাদের আশীর্বাদ লাভ করে বর পেতে হবে। যে ময়ূর নাচ শেখার কারণে মনসার বিরাগভাজন হয় সেই ময়ূর নাচ দেবতাদের খুশির জন্য উৎসর্গ করে। ময়ূরনাচে দেবতারা তুষ্ট হয়। মৃত লখিনের প্রাণ ফিরে পায়। বেহুলার পতিভক্তি দেখে ইন্দ্রসভার সবাই খুশি হয়, এমনকি মনসাও। ময়ূরনৃত্য ছাড়া দেবলোকের দৃশ্যায়নে খুব বেশি তাড়াহুড়ো করা হয়েছে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সিনেমায় দেবলোকের প্রভাব কম দেখানো এর একটি কারণ হতে পারে। অথবা সিনেমায় নাচ-গানকে বেশি প্রাধান্য দিতে গিয়ে সময় স্বল্পতার জন্য শেষদিকে এসে সিনেমাকে দ্রুত পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিশেষ করে দেবলোকে মনসার কোন ভূমিকাই ছিলনা। অথচ সমগ্র কাহিনিতেই মনসা একটি সক্রিয় চরিত্র। শেষদিকে তাকে একপ্রকার গুরুত্বহীন করে তোলা হয়েছে।

এতদিন অপেক্ষা করতে করতে চাঁদ সওদাগর অধৈর্য হয়ে ভাবে বেহুলা-লখিন্দর আর ফিরে আসবে না। সায়ও চাঁদকে সব ভুলে গিয়ে শক্ত হতে বলে। সব হারিয়ে ভিতরে ভিতরে চাঁদ সওদাগর দুমড়ে মুচড়ে গেলেও বাইরে সে শক্ত। এমন সময় বাইরে বাবা-মা বলে ডাক শোনা যায়। সবাই বের হয়ে দেখে বেহুলা জীবিত লখিন্দরকে নিয়ে ফিরে এসেছে। সবার পুর্নমিলনে আবার খুশির জোয়ার বয়ে যায়। এর মধ্যে বেহুলা চাঁদের কাছ থেকে ওয়াদা নেয় যে, মা মনসার পূজো দিতে হবে। এ কথায় চাঁদ সওদাগর দ্বন্দে পড়ে যায়। একদিকে বেহুলাকে দেওয়া কথা, অন্যদিকে শিবভক্তি ও মনসাকে ঘৃণা, বেহুলাও মনসাকে কথা দিয়ে এসেছে এসব ভাবনা থেকে শেষপর্যন্ত বেহুলার আবদারের কাছে চাঁদের প্রতিজ্ঞা হার মানে। সে রাজি হয় মনসাকে পূজো দিতে, কারো ওপর ভক্তির নিদর্শন হিসেবে নয়, বেহুলার অনুরোধে।

শেষকথা

দেবী মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে আখ্যানটি রচিত হলেও পুরো কাহিনিতেই চাঁদ সওদাগর ও বেহুলার মানবীয় রূপ আধিপত্য বিস্তার করেছে। সমালোচকের উক্তিতেও একথার সত্যতা পাওয়া যায়। 'মনসামঙ্গলের সুপরিচিত গল্পে মনসার দৈবী মহিমার চেয়ে বনিক চন্দ্রধর, আর তার পুত্রবধু বেহুলার মানবী শক্তির জয়গানই শেষপর্যন্ত বেশি প্রকট হয়েছে।'[৪৬] সিনেমাতেও কাহিনির সেই ভাবটি প্রাধান্য পেয়েছে। বেহুলার সাফল্যের পর সাপনির্ভর অনেক সিনেমা তৈরি হয়েছে আশির দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত। এসব সিনেমা এতটাই প্রভাব ফেলেছিল যে বাংলার সাধারণ জনগণ ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল সাপদের আলাদা রাজ্য আছে। মানুষের মতো এদের সুখ-দুঃখের অনুভুতি আছে। এসময় ভারতেও সাপনির্ভর অনেক সিনেমা নির্মিত হয়েছে। বেহুলা চরিত্রে অভিনয়কারী সুচন্দা চমৎকার অভিনয় করেছে। এটি তার দ্বিতীয় ছবি হলেও লখিন্দর চরিত্রে অভিনয়কারী রাজ্জাকের নায়ক হিসেবে এটিই ছিল প্রথম ছবি। এ কারণে অভিনয়ে তার একটু জড়তা লক্ষণীয়। যথাসম্ভব কম সংলাপ ছিল তার চরিত্রে। উপস্থিতিও ছিল তুলনামূলকভাবে কম। কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে বেহুলা চরিত্রটিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে চাঁদ সওদাগর চরিত্রটি কোথাও কোথাও বেহুলাকে ছাড়িয়ে গিয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে। চাঁদ সওদাগর চরিত্রে ফতেহ লোহানী বলিষ্ঠ অভিনয় করেছেন। মনসা চরিত্রে সুমিতা

দেবীও অসাধারণ অভিনয় করেছে। তবে তাকে এক চোখ কানা অবস্থায় দেখালে চরিত্রটি আরও ফুটে উঠার সম্ভাবনা ছিল। পৌরনিক ও প্রচলিত কাহিনিতে তাকে 'চ্যাংমুড়ি কানি' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য সিনেমাতেও চাঁদ সওদাগরের সংলাপে 'চ্যাংমুড়ি কানি' হিসেবে মনসাকে অভিহিত করতে দেখা যায়। পুরো সিনেমাতেই সংলাপে যথেষ্ট ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে বেহুলা লখিন্দরের মধ্যকার সংলাপ। সায় সওদাগর ও চাঁদসওদাগরের সংলাপে যাত্রাপালার প্রভাব লক্ষণীয়। অভিব্যক্তিগুলো ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় ছবিটিতে অসংখ্য ক্লোজআপ ও ডিপক্লোজ শটের ব্যবহার করা হয়েছে। তবে দৃশ্যগতি ও কাহিনির পরম্পরা যথাযথ ছিল।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত, ভূমিকা– নারায়ণ দেব রচিত *পদ্মাপুরাণ*, শ্রীতমোনাশ চন্দ দাশ গুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৭), হাজরা রোড, কলিকাতা

২. শ্রীসুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*– আদি হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত, মডার্ন বুক এজেন্সী, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, (১৯৪০) পৃ. ৯৭

৩. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, বাংলাপিডিয়া*, পিডিএফ সংস্করণ, Link: http://bn.banglapedia.org/index.php?title=বিজয়_গুপ্ত

৪. রাজেন্দ্র কুমার গুপ্ত, ভূমিকা– বিজয় গুপ্ত রচিত *পদ্মাপুরাণ*, রাজেন্দ্র কুমার গুপ্ত সঙ্কলিত, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, ক্যানিং স্ট্রীট, কলকাতা

৫. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, দীপক ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বাদশ সংস্করণ (২০০০), এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটারজী স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. ২৫৪

৬. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ভূমিকা, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত *মনসামঙ্গল*, সম্পাদনা– বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, দশম মুদ্রণ ২০১৫, সাহিত্য অশাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি, পৃ. ভূমিকা অংশ– ছয়

৭. শ্রীসুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*– আদি হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত, মডার্ন বুক এজেন্সী, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, (১৯৪০), পৃ. ১০৫

৮. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, দীপক ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বাদশ সংস্করণ (২০০০), এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটারজী স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. ২৩৩

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০

১২. *মনসামঙ্গল*, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, সম্পাদনা– বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, দশম মুদ্রণ ২০১৫, সাহিত্য অশাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি, পৃ. ১৯

১৩. James Fergusson, *Tree and Serpent worship: or Illustration of Mythology and Art in India*, H. Allen and Co., 13, Waterloo Palace, S.W. Publishers to the India Office, P. 40

১৪. William Ckooke, *An Introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India*, Publisher Allahabad: Printed at the government press, North-Western Provinces and Oudh. P. 263

১৫. ড. বাসুদেব রায়, *মনসামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ*, পাঠক বন্ধু লাইব্রেরী, ৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ০১

১৬. শ্রীসুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*– আদি হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত, মডার্ন বুক এজেন্সী, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, (১৯৪০), পৃ. ৯৭

১৭. *পদ্মাপুরাণ*, বিজয় গুপ্ত, রাজেন্দ্র কুমার গুপ্ত সঙ্কলিত, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড,

ক্যানিং স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. ১৫
১৮. হুমায়ুন আজাদ, *লাল নীল দীপাবলি*, পেপারব্যাক সংস্করণ : শ্রাবণ ১৪২৩, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ২৫ (রাজেন্দ্র কুমার গুপ্ত সঙ্কলিত, বিজয় গুপ্ত রচিত *পদ্মাপুরাণের 'চান্দর চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবান'* অংশে বেশ কয়েকবার চৌদ্দ ডিঙ্গার কথা উল্লেখ আছে, পৃ. ১১৬-১২৪)
১৯. টাইটেল কার্ড, *বেহুলা* (চলচ্চিত্র), চিত্রনাট্য ও পরিচালনা– জহির রায়হান, প্রযোজনা– ইফতেখারুল আলম, ঢাকা, মুক্তি– ১৯৬৬,
২০. *মানিকগঞ্জের শ্রেষ্ঠ যাত্রাপালা*, DVD Version (প্রথম পর্ব), পরিচালনা– আজিজুল ইসলাম শুক্কু, প্রযোজনা ও পরিবেশনা– স্টারগোল্ড, ৩০ পাটুয়াটুলী, সালাম ম্যানশন, ঢাকা
২১. *মনসামঙ্গল*, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, সম্পাদনা– বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, দশম মুদ্রণ ২০১৫, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি, পৃ. ২৪
২২. http://www.somewhereinblog.net/blog/raisul_juhala/29445737
২৩. *পদ্মাপুরাণ*, বিজয় গুপ্ত, রাজেন্দ্র কুমার গুপ্ত সঙ্কলিত, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, ক্যানিং স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. ১৩৬
২৪. *মনসামঙ্গল*, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, সম্পাদনা– বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, দশম মুদ্রণ ২০১৫, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি, পৃ. ১৮
২৫. *পদ্মাপুরাণ*, বিজয় গুপ্ত, রাজেন্দ্র কুমার গুপ্ত সঙ্কলিত, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, ক্যানিং স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. ১৩৬
২৬. সত্যজিৎ রায়, *বিষয় চলচ্চিত্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, পৃ. ৬১
২৭. *পদ্মাপুরাণ*, বিজয় গুপ্ত, রাজেন্দ্র কুমার গুপ্ত সঙ্কলিত, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, ক্যানিং স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. ১৩৬
২৮. *বেহুলা লখিন্দর* (চলচ্চিত্র), পরিচালনা– অমল দত্ত, প্রযোজনা– দীনেশ চন্দ্র দে, দীনেশ চিত্রম, কলকাতা, মুক্তি– ১৯৭৭
২৯. *পদ্মাপুরাণ*, বিজয় গুপ্ত, রাজেন্দ্র কুমার গুপ্ত সঙ্কলিত, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, ক্যানিং স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. ৫৯
৩০. *বেহুলা* (চলচ্চিত্র), পরিচালনা– জহির রায়হান, প্রযোজনা– ইফতেখারুল আলম, ঢাকা, মুক্তি– ১৯৬৬, সঙ্গীত– ৩
৩১. https://bn.wikipedia.org/wiki/চাঁদসওদাগর _সদাগর
৩২. *মনসামঙ্গল*, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, ২০ নম্বর অধ্যায়– *বিশ্বকর্মাকে লোহার বাসর নির্মাণ করিবার আজ্ঞা*, সম্পাদনা বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি, পৃ. ৩২
৩৩. পরেশচন্দ্র মন্ডল, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, বাংলাপিডিয়া।
Link: bn.banglapedia.org/index.php?title=বিশ্বকর্মা_পূজা
৩৪. *Widows in Indian life: From ancient to the present times*, a research paper, P. 14,
Link:http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/116468/7/07_chapter%201.pdf
৩৫. *Mangal Pandey: The Rising* (2005), an Indian film, Directed by Ketan Mehta, screenplay by Farrukh Dhondy, India.
৩৬. *সতী*, মূল গল্প– কমল কুমার মজুমদার, পরিচালনা– অপর্ণা সেন, চিত্রনাট্য অপর্ণা সেন ও অরুন ব্যানার্জি, প্রযোজনা– এনএফডিসি, কলকাতা, মুক্তি ১৯৮৯
৩৭. *মনসামঙ্গল*, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, সম্পাদনা– বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, দশম মুদ্রণ ২০১৫, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি, পৃ. ২৮
৩৮. *পদ্মাপুরাণ*, বিজয় গুপ্ত, রাজেন্দ্র কুমার গুপ্ত সঙ্কলিত, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, ক্যানিং স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. ১৬৩
৩৯. *The Film Maker's Art*, Haig P. Manoogain, P. 25
৪০. *বেদের মেয়ে জোসনা*, রচনা ও পরিচালনা– তোজাম্মেল হক বকুল, প্রযোজনা– আনন্দমেলা চলচ্চিত্র, ঢাকা, মুক্তি ১৯৮৯

৪১. *সতী বেহুলা*, পরিচালক– মনোজ কুমার, প্রযোজক– নির্মলা সিংহ, ভারত, মুক্তি ২০১০
৪২. *বেহুলা লখিন্দর* (চলচ্চিত্র), পরিচালনা– অমল দত্ত, প্রযোজনা– দীনেশ চন্দ্র দে, দীনেশ চিত্রম, কলকাতা, মুক্তি– ১৯৭৭
৪৩. *মনসামঙ্গল*, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, সম্পাদনা– বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, দশম মুদ্রণ ২০১৫, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি, পৃ. ২৮
৪৪. *পদ্মাপুরাণ*, বিজয় গুপ্ত, রাজেন্দ্র কুমার গুপ্ত সঙ্কলিত, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, ক্যানিং স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. ১৮৬
৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬
৪৬. শ্রীভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, বঙ্কিম চ্যাটারজী স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. ১৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

করিতার ছবি : হুলিয়া

‘হুলিয়া’ চলচ্চিত্র পরিচিতি

মূল কাহিনি: নির্মলেন্দু গুণ রচিত কবিতা ‘হুলিয়া’।
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: তানভীর মোকাম্মেল।
প্রযোজনা: সাঈদা মোকাম্মেল।

প্রোডাকসন তত্ত্বাবধায়ক: মানজারে হাসীন।
আলোকচিত্র: আনোয়ার হোসেন।
সম্পাদনা ও রেকর্ডিং: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা সংস্থা ঢাকা।
শব্দগ্রহণ: নাসির আহমেদ।
সংগীত: ওয়াহিদুল হক।
রূপসজ্জা: বঙ্গজিৎ দত্ত ও সহকর্মী বৃন্দ।
শিল্পনির্দেশনা: আ. মু. মামুনুর রশীদ।

অভিনয়ে: আসাদুজ্জামান নূর, মোহাম্মদ জাকারিয়া, হুমায়ুন ফরিদী, লিলি চৌধুরী, ডলি আনোয়ার, শামীম আখতার, লাবনী, আলী যাকের, আতাউর রহমান, রামেন্দু মজুমদার, ইনামুল হক, খালেদ মাহমুদ, সৌমেন, মালেক খান, আওয়াল, দিলওয়ার হোসেন, মহসীন আলী প্রমুখ।

মুক্তি: ১৯৮৫।
দৈর্ঘ্য: ২৮ মিনিট (স্বল্পদৈর্ঘ্য)।
ফরম্যাট: ১৬ মি. মি.।
কালার: সাদাকালো।

‘হুলিয়া’ কবিতা পরিচিতি

কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর নিজের ফেরার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ‘হুলিয়া’ কবিতাটি রচনা করেন। এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘প্রেমাংশুর রক্ত চাই’তে ১৯৭০ সালে গ্রন্থভূক্ত হয়।

অনুবন্ধ

পাক দুঃশাসনের যুগান্তে মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর বহুল আলোচিত কবিতা ‘হুলিয়া’ রচনা করেন। এই কবিতা অবলম্বনে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে স্বৈরশাসকের দমন-পীড়নের আরেক সংকটময় সময়ে নির্মিত হয় চলচ্চিত্র ‘হুলিয়া’।

১৯৮৫ সালে চলচ্চিত্রকার তানভীর মোকাম্মেল এটি নির্মাণ করেন। 'হুলিয়া' ছিল তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র।[১] এর মাধ্যমে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। কারণ, এর আগে এদেশে কবিতা অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণে কেউ প্রয়াসী হননি। কবিতার মতো একটি ছোট্ট পরিসর থেকে চলচ্চিত্রে বিশদভাবে রূপান্তর চলচ্চিত্রকারের জন্য অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ ব্যপার। কেননা ঠিকমত কাহিনি-বিন্যাস করে এর যথাযথ বিস্তার ও প্রয়োগ ঘটাতে না পারলে অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্য দোষে চলচ্চিত্রটি দুষ্ট হতে পারে। যদিও চলচ্চিত্রকারের যদৃচ্ছ স্বাধীনতা রয়েছে কবিতার একটিমাত্র লাইন থেকে ধারণা বা অনুপ্রেরণা নিয়েও নিজের মতো করে চলচ্চিত্র নির্মাণের। তথাপি কাহিনিকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে টেনে লম্বা করা শিল্পমানের দৃষ্টিতে চলচ্চিত্রের জন্য বিপদজ্জনক। অকারণে রাবার টেনে লম্বা করতে থাকলে এক সময় তা ছিঁড়ে গিয়ে যেমন হাতে ব্যথার উদ্রেগ ঘটাতে পারে, তেমনি শুধুমাত্র চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য বিস্তারের অভিপ্রায়ে অহেতুক কাহিনিকে টেনে বড় করা হলে দর্শকদের মনেও বিরক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে। ফলে দর্শক চলচ্চিত্রটি দেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। তানভীর মোকাম্মেল সেই দিকটি মাথায় রেখে অযথা কলেবর বৃদ্ধি না করে স্বল্পদৈর্ঘ্যে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে চলচ্চিত্রকার বলেছেন, "প্রত্যেক কবিতার একটি ব্যাপ্তি ও পরিপ্রেক্ষিত থাকে। 'হুলিয়া' কবিতার যে ব্যাপ্তি তাতে এ থেকে একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি করলে অনেক বাড়তি উপাদান, চরিত্র ও ঘটনা যোগ করতে হতো। তাতে কবিতাটির কাঠামো ও মূল নির্যাসটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যেত। সে কারণেই একে স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র হিসেবে নির্মাণ করেছি।"[২]

কবিতা থেকে চলচ্চিত্র শুধু বাংলাদেশেই নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধারায় নির্মিত হতে দেখা গেছে। এমনকি নির্বাক যুগেও কবিতা থেকে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। কবিতা নির্ভর চলচ্চিত্রের মধ্যে ব্রিটিশ-কানাডিয়ান কবি Robert W. Service রচিত কবিতা 'The Shooting of Dan McGrew' অবলম্বনে আমেরিকান চলচ্চিত্রকার Clarence G. Badger নির্মিত *The Shooting of Dan McGrew* (১৯২৪) ; আমেরিকান কবি Alice Duer Miller এর কবিতা 'The White Cliffs' অবলম্বনে আমেরিকান চলচ্চিত্রকার Clarence Brown নির্মিত *The White Cliffs of Dover* (১৯৪৪) ; আমেরিকান কবি Sylvia Plath এর কবিতা 'Lady Lazarus' অবলম্বনে ব্রিটিশ চলচ্চিত্রকার Sandra Lahire নির্মিত *Lady Lazarus* (১৯৯১) ; গ্রিক মহাকবি Homer এর 'The Odyssey' অবলম্বনে আমেরিকান চলচ্চিত্রকার Ethan Coen I Joel Coen নির্মিত *O Brother, Where Art Thou?* (২০০০) ; চায়না কিংবদন্তি 'Hua Mulan' অবলম্বলে আমেরিকান চলচ্চিত্রকার Tony Bancroft I Barry Cook নির্মিত এনিমেটেড সিনেমা *Mulan* (১৯৯৮) ; ভারতীয় কবি Changampuzha Krishna Pillai এর কবিতা 'Ramanan' অবলম্বনে ভারতে নির্মিত D. M. Pottekkat এর চলচ্চিত্র *Ramanan* (১৯৬৭) ; ইরানীয়ান কবি Forough Farrokhzad এর কবিতা 'The Wind Will Carry Us' অবলম্বনে ইরানি চলচ্চিত্রকার Abbas Kiarostami নির্মিত *The Wind Will Carry Us* (১৯৯৯) ; ওয়েলশ্ কবি Dylan Thomas এর 'Under Milk Wood' অবলম্বনে ব্রিটিশ চলচ্চিত্রকার Andrew Sinclair নির্মিত *Under Milk Wood* (১৯৭২) এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।[৩]

হুলিয়া : চলচ্চিত্রের ব্যবচ্ছেদ ও কবিতার সঙ্গে সংযোগ বিচার

'১৯৫৮ সালের জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক আইন জারী থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতনকে উপেক্ষা করে যেসব সাহসী তরুণেরা এদেশে গণআন্দোলনের ভিত্তি রচনা করেছিলেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে'[৪] সিনেমাটি পর্দাভিষিক্ত করেছেন চলচ্চিত্রকার। এখানে 'সাহসী তরুণেরা' শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে পরিচালক স্পষ্টত বুঝিয়েছেন এই সিনেমায় হুলিয়া মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়ানো তরুণটি নির্ভীক। সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে না। বরং জেল জুলুমের পরোয়া না করে হুলিয়া মাথায় নিয়েই দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মুক্তির আন্দোলনে সংঘঠিত করছে আরো অনেক তরুণকে।

সিনেমার প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় মেঠোপথ ধরে একটি ট্রেন এগিয়ে যাচ্ছে। কামরার ভিতরে কয়েকজন যাত্রী বসে আছে। এর মধ্যে শ্মশ্রুমন্ডিত এক তরুণ খবরের কাগজ পাঠে মগ্ন। মাঠ ছাড়িয়ে গ্রাম পেড়িয়ে ট্রেনটি ছুটে চলেছে গন্তব্যে। খবরের কাগজ পাঠরত তরুণটি হঠাৎ আনমনা হয়ে গভীর ভাবনায় নিবিষ্ট হয়ে পড়ে। তার চক্ষুস্পটে খণ্ড-খণ্ডভাবে ভেসে ওঠে এদেশের নিপীড়িত জনগণের উপর পাকিস্থানি স্বৈর-শাসক বাহিনীর নির্যাতনের চিত্র, মুক্তিকামী মানুষের প্রতিবাদ। পাশে একজন দেয়াশলাইয়ের আগুনে সিগারেট ধরিয়ে টানছে। নির্মলেন্দু গুণের 'হুলিয়া'তে উল্লেখ আছে 'ট্রেনে সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে একজনের কাছ থেকে আগুন চেয়ে নিয়েছিলুম।'[৫] তানভীর মোকাম্মেল হয়ত পরের শটে কবিতায় বর্ণনার হুবহু দৃশ্যায়ণ করতে পারতেন। কিন্তু সিগারেট খাওয়ার জন্য লোকটির কাছ থেকে তরুণের আগুন চেয়ে নেওয়ার দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দি করার অভিপ্রায় তাঁর ছিলনা। পরিবর্তে তিনি অন্যরকম ব্যাঞ্জনা সৃষ্টি করলেন তরুণের চোখে ভেসে ওঠা নির্যাতনের কিছু স্থিরচিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে। এতে সিগারেটের আগুনের পরিবর্তে তরুণের বুকের ভিতরে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা ক্ষোভের আগুন সচেতন দর্শকের সামনে মূর্তমন্ত হয়েছে। 'পথের পাঁচালী' সিনেমায় উনুনে ফুটন্ত ভাতের টগবগে ফেনার আড়ালে সর্বজয়ার বুকের ভিতরে গুমরে ওঠা কান্নার দৃশ্যের মতো রূপক ব্যবহারের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এখানে।[৬]

ট্রেনের হুইসেলের তীব্র শব্দে হঠাৎ তরুণটির ভাবনায় ছেঁদ পড়ে। বারহাট্টা স্টেশনে এসে ট্রেন থামে। শুভ্রবসন আচ্ছাদিত সৌম্যকান্তি নিরুদ্বেগ তরুণটি প্রসন্নচিত্তে এগিয়ে চলে প্ল্যাটফর্ম ধরে। হঠাৎ একটি হাত পেছন থেকে এগিয়ে এসে তার কাঁধ স্পর্শ করে। এরকম আরও অনেক হাত রোজ খুঁজে ফেরে তাকে। তবুও সে নিরুত্তাপ। দেশের মুক্তির জন্য সে সদা প্রস্তুত দুঃশাসনের শেকলবন্দি হতে, তবুও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করতে নয়। অনাহূত হাতটি নিজ থেকেই পিছিয়ে যায়। সহাস্যে আবার এগিয়ে চলে তরুণটি। হয়ত তাকেই ধরতে এসেছিল ঐ হাত। কিন্তু তাকে নিরুদ্বেগ দেখে কিংবা একই রকম চেহারার অন্য কেউ মনে করে ফিরে গেছে। বারহাট্টা স্টেশনের গেট দিয়ে বেড়িয়ে যাওয়ার সময় চেকার যখন টিকেট চেক করছিল, তখনো একজন দূর থেকে তার পিছু নিয়েছিল। কবিতার বর্ণনায় দেখতে পাই 'একজন মহকুমা স্টেশনে উঠেই আমাকে জাপটে ধরতে চেয়েছিল, / একজন পেছন থেকে কাঁধে হাত রেখে চিৎকার করে উঠেছিল। / আমি সবাইকে মানুষের সমিল চেহারার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। / কেউ চিনতে পারেনি আমাকে'[৭]। সিনেমায় কাঁধ স্পর্শ করে লোকটিকে চিৎকার দিতে দেখা যায়নি। তরুণটিকেও বলতে হয়নি তুমি যাকে খুঁজছ আমি সে ব্যক্তি নই। কোন সংলাপ নয়, এমনকি শব্দও নয়, যুবকের মুখের অভিব্যক্তিই বিষয়টির ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে। এটিই ভিজ্যুয়াল সেন্স। *The Pilgrim* (১৯২৩) সিনেমার শুরুতে দেখা যায় পুরস্কার

ঘোষণা করে জেলগেটে একটি *Wanted* পোস্টার সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে। পরের দৃশ্যে একটা লোক নদী থেকে সাঁতার কেটে পাড়ে এসে দেখে যেখানে তার কাপড় রাখা ছিল তা সেখানে নেই। এর পরির্বতে রয়েছে জেলখানায় পরিধেয় কয়েদীর পোশাক।[৮] নির্বাক সিনেমার এই দৃশ্য দিয়ে কারো বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কোন জেল পলাতক আসামী তার পোশাক বদল করে স্নানরত ব্যক্তির কাপড় নিয়ে গেছে। কবিতার বর্ণনা মতো মহকুমা স্টেশনে তরুণকে জাপটে ধরার চেষ্টার দৃশ্যটি এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে একজনকে তার পিছু নিতে দেখা গেছে। এই দৃশ্য দ্বারা মুক্তিকামী জনগণের পিছনে জান্তার গোয়েন্দা বাহিনী কিভাবে ঐ সময়টিতে জালের মতো বিস্তার করে রেখেছিল চলচ্চিত্রকার দর্শকদের সে আভাস দিয়েছেন।

অবিরাম ছুটে চলা তরুণটি পাক সরকারের নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার একজন ফেরারি। যার নামে জারি হয়েছে দুঃশাসনের হুলিয়া। এরকম হাজারো স্বাধীনতাকামী তরুণ—যাদের বিরুদ্ধে ঝুলে আছে স্বৈরতন্ত্রের হুলিয়া, সে তাদেরই একজন প্রতিনিধি। কবি নির্মলেন্দু গুণকেও এমনই এক দুঃসময়ে হুলিয়া মাথায় ঘুরতে হয়েছিল দেশের পথে প্রান্তরে। "১৯৬৫ সালে সাপ্তাহিক 'জনতা'য় প্রকাশ হয় তাঁর রচিত 'কোনও এক সংগ্রামীর দৃষ্টিতে'। সেই সময় নিজেও সম্পাদনার কাজ করেন 'সূর্য ফসল' সংকলনের। ...সংকলনের কবিতাগুলোতে গ্রন্থিত হয় শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে মেহনতী মানুষের বিদ্রোহের ডাক। যা সে সময়ের পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে। কবির বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং জারি হয় গ্রেফতারী পরোয়ানা। মাথার উপরে হুলিয়া নিয়ে কবি ফেরেন এক জায়গা থেকে অন্যত্র।'[৯] ফেরার জীবনের এই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি লিখেছিলেন তাঁর বহুল আলোচিত 'হুলিয়া' কবিতাটি। কবিতায় উল্লেখিত স্থানও কবির জন্ম-শৈশব বিজড়িত নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টা। কবির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন ও ভূমিকার সরাসরি প্রতিফলন ঘটেছে এই কবিতায়। উত্তম পুরুষে বর্ণিত এই কবিতাটি আসলে কবির নিজেরই কথা। আর হুলিয়া মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়ানো তরুণটি তিনি নিজেই। এক সাক্ষাৎকারে নির্মলেন্দু গুণ তা স্বীকার করে বলেছেন— 'আমার উপরে যে হুলিয়া ছিল তা সকল স্বাধীনতাকামী হুলিয়াগ্রস্তদের উপর, এমনকি সমগ্র দেশ ও জাতির উপর আরোপিত হুলিয়া বলে আমার কাছে মনে হয়েছিল। নিজেকে তাদেরই একজন মনে করে আমার ফেরার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কবিতাটি রচনা করি।'[১০] 'হুলিয়া' সিনেমা নির্মাণের সময় চলচ্চিত্রকারের অনুরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত ধারণার প্রভাবও পড়েছে চলচ্চিত্রটিতে। তানভীর মোকাম্মেলকেও বিভিন্ন সময় গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে চলাচল করতে হয়েছে। কারণ ঐ সময় তিনি নিজেও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার এক বামপন্থী তরুণ ছিলেন। এ কারণে চলচ্চিত্রটিতে সমাজতন্ত্রের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। কবিতাটিতেও সমাজতন্ত্রের কিছু অনুষঙ্গ লক্ষণীয়। যেমন: কমিউনিস্ট, কার্ল মার্কস, ক্রুপস্কায়া, ন্যাপকর্মী ইত্যাদি। চলচ্চিত্রকারের জবানিতেও এ কথার সত্যতা মিলে—'আমি নিজেও একজন বামপন্থী তরুণ ছিলাম। গোয়েন্দাদের চোখ এড়াতে ঐ সময় ট্রেনে-বাসে আমাকেও গোপনে চলাচল করতে হয়েছে। কবিতার ওই যুবকটার মতোই। ফলে সেসবের একটা প্রভাব অবচেতনভাবে ছবিটাতে পড়ে থাকতে পারে।[১১]

স্টেশন থেকে বের হয়ে তরুণটি রফিজের স্টলে চা খেতে ঢোকে। এদিক ওদিক দেখে নিয়ে একটি চেয়ারে বসে পড়ে। মুখোমুখি বসা এক বামপন্থী নেতা সিগারেট ফুঁকছে। চলচ্চিত্রকার নিখুঁতভাবে এই বামপন্থী নেতা চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কবিতায় শুধু উল্লেখ

আছে, 'একজন রাজনৈতিক নেতা / তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন, মুখোমুখি বসে দূর থেকে / বারবার চেয়ে দেখলেন, কিন্তু চিনতে পারলেন না।'[১২] সাহিত্যে শুধুমাত্র 'বামপন্থী' শব্দটি দ্বারা একটি মানুষের রাজনৈতিক পরিচয় জ্ঞাপন সম্ভব। কিন্তু চলচ্চিত্রে হয় সংলাপের আশ্রয় নিতে হয়, নয়তো প্রতীক, রূপক বা ডিটেলের ব্যবহারে তা প্রকাশ করতে হয়। তানভীর মোকাম্মেল মুখোমুখি বসে থাকা ঐ লোকটিকে বামপন্থী হিসেবে দর্শকদের সামনে উপস্থাপনের জন্য টেবিলের উপর চায়ের কাপের সামনে Rostislav Ulyanovsky রচিত *National Liberation* বইটি রেখেছেন। রাশিয়ান বামপন্থী লেখকের এই বইটি দর্শকদের সামনে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করেছে। যদিও বইটি কবিতায় বর্ণিত সময়ের অনেক পরে রচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে চলচ্চিত্রকার নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন, '*হুলিয়া* কবিতাটিতে একটি জাতির মুক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হয়েছিল। এ কেবল একজন তরুণের বিরুদ্ধে হুলিয়া নয়, যেন একটা গোটা জাতিসত্ত্বার বিরুদ্ধেই হুলিয়া। তাই ছবিতেও একটি জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে। সে কারণে *National Liberation* নামের উলিয়ানভস্কির বইটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। বইটি এখানে প্রতীক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে, ডিটেল্‌সের অংশ হিসেবে নয়।'[১৩] শিল্পে এরকম স্বাধীনতা সর্বজন স্বীকৃত।

শটের বিভিন্ন কোণ থেকে বামপন্থী নেতার পর্যবেক্ষণে মনে হয়, তাঁর কাছেও তরুণটিকে চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু বার বার চেয়ে দেখেও তাকে চিনতে পারছেন না। কবিতায় যে ছোট্ট বর্ণনা ছিল এখানে কোনরূপ সংলাপ ছাড়াই সিনেমা ভাষায় চলচ্চিত্রকার তা দর্শককে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। প্যানশটে চিত্রায়িত দেয়ালে টানানো জিন্নার ছবি ও টেপরেকর্ডারে বাজানো উর্দু গান তৎকালীন সময়কে নির্দেশ করেছে। 'রাজনৈতিক আলাপ নিষেধ' লেখা দেয়াললিখন সত্ত্বেও চায়ের টেবিল ঘিরে তরুণদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা দেখে দর্শকদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, শত বিধিনিষেধ থাকার পরও এদেশের তরুণরা সংঘবদ্ধ হয়ে দেশের মুক্তির জন্য প্রকাশ্য আলোচনা করতে কোনরূপ ভয় পেত না। শিল্পে *Minimalism* বলে একটি ধারা গত শতাব্দীর ষাট ও সত্তুরের দশকে পশ্চিমা বিশ্বে গড়ে উঠেছিল।[১৪] এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাহুল্যকে বর্জন করা। অর্থাৎ অল্প কথায় কিংবা স্বল্প ইমেজে অধিক ভাবনা, অনুভব বা অনুভূতি প্রকাশ করা। কোনরূপ সংলাপ ছাড়াই এই পর্যন্ত সিনেমাভাষা ব্যবহার করে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলচ্চিত্রকার *Minimalism*-এর পথেই হেঁটেছেন।

দীর্ঘক্ষণ পর 'একটা চা'—এই ছোট্ট কথাটির মাধ্যমে সিনেমায় সংলাপের সূচনা হয়। তরুণটি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে চা দিতে আসা লোকটির (রফিজের) মুখের দিকে। কিন্তু তার মধ্যে কোন প্রকার ভাবাবেগ না দেখে তরুণ কিছুটা অবাক হয়। কারণ নেতার মতো রফিজও তাকে চিনতে পারেনি। ক্যাশ-কাউন্টারে বসা লোকটিকে চারটি ভিন্ন শটে দেখানো হয়েছে নিবিষ্টমনে টাকা গুণে যেতে। এত সময় ধরে চায়ের দোকানে এতগুলো টাকা গোনা অপ্রাসঙ্গিক এবং বাহুল্য দোষে দুষ্ট বলে প্রতিভাসিত হয়। কবিতার রফিজ'কে এখানে দোকানের কর্মচারী হিসেবে দেখানো হয়েছে। কবি তার কবিতায় রফিজকে চায়ের দোকানের মালিক হিসেবেই দেখিয়েছেন। 'বারহাট্টায় নেমেই রফিজের স্টলে চা খেয়েছি'—উক্তিটিই তার প্রমাণ। তর্ক হতে পারে রফিজের দোকান বললেই রফিজ মালিক হবে এমন কোন কথা নেই। অনেক সময় একই দোকানে দীর্ঘদিন কাজ করা কর্মচারী তার কর্ম ও ব্যবহারের গুণে লোকমুখে ব্যপক পরিচিতি পায়। এ কারণে মূল মালিকের নাম ছাপিয়ে

তার নামেই দোকানটি অধিক পরিচিতি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে কবিতার রফিজের মৃত্যুর পর তাকে স্মরণ করে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত কবির একটি লেখা থেকে দু-চারটি বাক্য উদ্ধৃত করে বিষয়টির মীমাংসা করা যেতে পারে। "আমি যখন 'হুলিয়া' লিখি, তখন আমাদের বারহাট্টা রেলস্টেশনে রফিজের একটি চায়ের স্টল ছিল। আমার হুলিয়া কবিতায় বর্ণিত রফিজ কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয়। স্কুলে রফিজ আমার সহপাঠী ছিলো। এক পর্যায়ে পরীক্ষা পাশের অসম্ভব সংগ্রামে ইতি দিয়ে রফিজ তাঁর গোপালপুরের বাড়ি সংলগ্ন বারহাট্টা রেল স্টেশনে একটি চায়ের স্টল খুলে বসে।"[১৫] সাহিত্যের সঙ্গে হুবহু মিল রেখে দৃশ্য নির্মাণ করতে হবে চলচ্চিত্রকারের এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যেকোন দৃশ্য নির্মাণ তাঁর ইচ্ছাধীন। এক্ষেত্রে অপঠিত বা স্বল্পপঠিত সাহিত্য থেকে সিনেমা করলে কাহিনিকে ইচ্ছেমত বর্ধন-কর্তন করার সুবিধা পাওয়া যায়। দর্শকদের কাছে এরজন্য কৈফিয়ত দেওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। সমালোচকদের কাছেও সাহিত্যে কোনটি ছিল আর চলচ্চিত্রে কি হল তার তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় না। রাশিয়ান চলচ্চিত্রকার Andrei Tarkovsky ও স্প্যানিশ চলচ্চিত্রকার Luis Buñuel প্রমুখ তাঁদের চলচ্চিত্রের জন্য non-defined বিষয়কে বেছে নিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। যাতে নিজের মতো করে কাহিনি বর্ধিত করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করা যেতে পারে,

> "অরসন ওয়েলস-এর 'সিটিজেন কেন'। ...পৃথিবীর চলচ্চিত্র ইতিহাসে ছবিটি এমন একটা জায়গা করে নিয়েছে যে...। দর্শকের জন্য, সিনেমার ছাত্রের জন্য 'সিটিজেন কেন' বেদ-বাইবেল-কোরান বললে ভুল হয় না। এই অরসন ওয়েলস বেশ কিছুকাল পরে ছবি করলেন কাফ্কার 'ট্রায়াল' নিয়ে। 'ট্রায়াল' আমার ভীষণ প্রিয় উপন্যাস— বেশ কয়েক বার পড়া। যেটাকে আমি আমার valued judgement-এর মধ্য দিয়ে নিয়ে এসে নিজের মতো করে define করেছি। এই ছবি দেখতে গিয়ে সাংঘাতিক হতাশ হয়েছিলাম। বার বার নানা কথা মনে এসেছিল সেই হতাশার সময়ে; মনে হয়েছিল কেন উনি ছবিটা করতে গেলেন। আমি আমার বেশ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এ-ব্যাপারে আলোচনাও করেছিলাম। তাঁরাও একই মত পোষণ করেছিলেন। কিন্তু 'সিটিজেন কেন'-এ ব্যাপারটা আদৌ তা হয়নি, যেহেতু ওটা একটা non-define বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।"[১৬]

পূর্ব থেকে define বা valued বিষয় নিয়ে সিনেমা করলে সততার সঙ্গে বিষয়বস্তুকে তুলে ধরার পক্ষে মত দেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। নয়তো সেখানে 'extension' এবং তা থেকে জাত 'missing link' এলে দর্শকদের ভাবনার সঙ্গে সংঘাত বাঁধার সম্ভাবনা থাকে। তবে রফিজকে নিয়ে নির্মলেন্দু গুণের লেখা প্রকাশের বহু আগে সিনেমাটি তৈরি হওয়ায় চলচ্চিত্রকার সাধারণ দর্শকদের কাছ থেকে কৈফিয়তের দায় এড়িয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সমালোচকদের কাছ থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা অনেক সমালোচক মনে করেন সাহিত্য কিংবা পূর্ব থেকে প্রকাশিত কোন বিষয়ের উপর চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে গেলে তা ভালভাবে পর্যালোচনা করতে হয়, এমনকি চরিত্রগুলোও ভালভাবে বিশ্লেষণ করে নিয়ে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে হয়। না হলে কাহিনির সততা রক্ষা হয় না। তবে কেউ কেউ একেবারেই এ মতের ধার ধারেন না। চলচ্চিত্রকার আন্তোনিয়োনি, ফিশার এদের মধ্যে অন্যতম। চলচ্চিত্রে রফিজের চরিত্র প্রসঙ্গে তানভীর মোকাম্মেল ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন—'আমাদের এমন একটা চায়ের দোকান দরকার ছিল যেখানে কমিউনিস্ট নেতাটি বসে থাকবেন, কয়েকটি তরুণ ছেলে আড্ডা দিতে থাকবে, পুলিশের গোয়েন্দা যুবকটিকে

অনুসরণ করে এসে একটা ভিন্ন টেবিলে বসতে পারবে। এতগুলো চরিত্র ও ঘটনার কারণে আমাদের একটা বড় চায়ের দোকানের প্রয়োজন ছিল। আর বড় চায়ের দোকানে মালিক নিজে নয়, তার কর্মচারীরাই চা পরিবেশন করে। সে কারণেই রফিজকে চায়ের দোকানের মালিক হিসেবে না দেখিয়ে দোকানের কর্মচারী হিসেবে দেখানো হয়েছিল।'[১৭]

সিনেমার দ্বিতীয় সংলাপ 'একটু চিনি' চেয়ে বলার পর আবার কাছে আসে রফিজ। এবারও তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে তরুণ। কিন্তু আশ্চর্য হয় রফিজ এবারও তাকে চিনতে না পারার জন্য। কবিতায়ও এর চমৎকার বর্ণনা রয়েছে, 'অথচ কী আশ্চর্য, পুনর্বার চিনি দিতে এসেও / রফিজ আমাকে চিনলো না।'[১৮] তরুণটি হয়ত আশা করেছিল এতোদিনের সহপাঠী রফিজ তাকে দেখে চিনবে। প্রথমবার চিনতে না পারায় হয়তো রফিজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই পুনর্বার চিনি চেয়েছিল। তারপরও রফিজ তাকে চিনতে না পারায় কিছুটা হতাশ হয়ে পিছনে ফিরে দেখে প্ল্যাটফর্ম থেকে পিছু নেওয়া লোকটি চায়ের দোকানে এসে উপস্থিত। একারনেই হয়ত রফিজের সঙ্গে কথা আর এগুয়নি। পাশের টেবিলে আলোচনারত তরুণদের মধ্য থেকে হঠাৎ একজন বলে ওঠে, 'চাচা মিয়া উর্দু বাদ দিয়া বাংলা গান বাজান' (হু. চ.)। আচমকা কথাটি তরুণের পিছু নেওয়া লোকটিকে যেন কষাঘাত করে। এতে প্রতিভাত হয় সে শাসকদলের কোন চর। অন্যদিকে বামপন্থী নেতার মুখের হাসি বুঝিয়ে দেয় পাকিস্তানবাদের বিরুদ্ধে বাংলার তরুণদের প্রতিবাদ কতটা আশাব্যঞ্জক ছিল। চলচ্চিত্রকার এখানে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রেই শুধু বর্ধিতকরণ কিংবা পরিবর্তন গ্রাহ্য বিষয় নয়। সাহিত্য থেকে সাহিত্য সৃষ্টিতেও পরিবর্তন পরিবর্ধন স্বীকৃত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত রামায়ণ অবলম্বনে 'মেঘনাদ বধ কাব্য' রচনা করতে গিয়ে খলনায়ককে নায়ক বানিয়েছেন। যে কাব্যটি মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনা ও মহাকাব্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। "মহাকবি কালিদাসের 'ধভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটক যেমন তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, তেমনই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।"[১৯] শুধু মধুসূদন নয়, তাঁর আগেও এ ধরনের পরিবর্তনের নজির রয়েছে। 'মধুসূদন যে রামায়ণ-কাহিনি অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিতে গিয়া বাল্মীকি-রামায়নের মৌলিক আদর্শ বিসর্জন দিয়াছিলেন তাহাই নহে-ইহার পূর্বে কৃত্তিবাস এই কাজে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনিও বাল্মীকির আনুগত্য স্বীকার না করিয়া তাঁহারই কাহিনি লইয়া বাঙ্গালীর সমাজ ও পারিবারিক জীবনের সুমহান কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।'[২০]

পরের দৃশ্যে 'কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা এক হও' এবং 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' এই দেয়াল-লিখনগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ছাঁচে ফেলে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করা হয়েছে। তরুণটিও যে সমাজতন্ত্রের আদর্শ অনুসারী দেয়াল লিখনগুলো দেখার পর তার অভিব্যক্তি সেই সাক্ষ্য বহন করে। কবিতায়ও এর স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। সত্তুরের দশকে পশ্চিমবঙ্গের নকশালপন্থী আন্দোলনের ছোঁয়া এপার বাংলায়ও লেগেছিল। ফলে ঐ সময়ে উগ্র-বামপন্থার প্রভাব এদেশের প্রায় সর্বত্র দেখা যেত। তাদের কাছে সশস্ত্র বিপ্লবই ছিল মুক্তির একমাত্র পথ। গ্রামে-গঞ্জে-শহরে এই সংক্রান্ত দেয়াল লিখন সবার নজর কাড়ত। সত্যজিৎ রায়ের 'জন-অরণ্য'[২১] সিনেমায়ও এর প্রভাব বিলোকিত হয়। এতে শ্রেণীকক্ষের ভিতরে দেয়াল লিখনে দেখা যায়, 'মুক্তির একমাত্র পথ

জনযুদ্ধ / শ্রেণীশত্রু খতম কর' —এসব শ্লোগান। রাস্তার পাশের দেয়ালেও দেখা যায় উগ্রবাদী শ্লোগান—'বন্দুকের নলই শক্তির উৎস'।

অনেকদিন পর বাড়ি ফিরছে তরুণটি। সমাজের উঁচু তলার মানুষ এবং শাসক শেণির যেখানে বসবাস—সেই শহরগুলোর ক্রমোন্নতি হলেও অজপাড়াগাঁয়ের কোন পরিবর্তন হয় না। 'দীর্ঘ পাঁচ বছর পর পরিবর্তনহীন গ্রামে ফিরছি আমি। / সেই একই ভাঙাপথ, / একই কালোমাটির আল ধরে গ্রামে ফেরা, / আমি কতদিন পর গ্রামে ফিরছি।'[২২] মাঠের পর মাঠ পেড়িয়ে, ফসলি জমির আল মাড়িয়ে পথচলা যেন শেষ হতে চায় না। গ্রামে ফিরতে ফিরতে শরীরের ছায়া লম্বা থেকে ছোট হতে হতে যেন পায়ের তলায় বন্দি হয়ে গেছে। 'আমি যখন বাড়িতে পৌঁছলুম তখন দুপুর, / আমার চতুর্দিকে চিকচিক করছে রোদ্দুর– ; / আমার শরীরের ছায়া ঘুরতে ঘুরতে ছায়াহীন / একটি রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে।'[২৩] কবিতার এই বর্ণনাগুলোকে তানভীর মোকাম্মেল প্রায় পরিবর্তন রহিত ভাবে সেলুলয়েডে ধারণ করেছেন। বিভিন্ন শট বিভাজনের মাধ্যমে শরীরের ছায়ার পরিবর্তন সুনিপুণতায় তুলে ধরেছেন। 'শরীরের ছায়া ঘুরতে ঘুরতে ছায়াহীন একটি রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে' —এই অনুষঙ্গটি বোঝানোর জন্য নদীর জলে তরুণটির হাত-মুখ ধোয়া ও পাড়ে দাঁড়িয়ে পানিতে ঢিল ছুঁড়ে শৈশবকে রোমন্থন করার দৃশ্যটি উটুঁস্থান থেকে 'টিল্ট-ডাউন' শটে বিভিন্ন কোন থেকে অনেক সময় ধরে দেখানো হয়েছে। যাতে দর্শকের কাছে স্পষ্ট হয় শরীরের ছায়া পদতলে এসে নিবদ্ধ হয়েছে এবং সময়টি ঠিক দুপুর। প্রখ্যাত ইরানী চলচ্চিত্রকার আব্বাস কিয়ারোস্তমী তাঁর সিনেমায় একটি বিষয়কে তুলে ধরতে নানা কোণ থেকে অনেকক্ষণ ধরে শুট করে যেতেন। তাঁর *Where Is the Friend's Home* সিনেমায় দেখা যায় আহ্মেদ তার বন্ধুর লেখার খাতাটি ফেরত দেওয়ার জন্য পাশের গ্রামে ছুটে যাচ্ছে। মাঠের পর মাঠ আর লোকালয় পেরিয়ে বন্ধুর বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে।[২৪] একই রকম চিত্র দেখা যায় কিয়ারোস্তমীর *The Wind Will Carry Us* সিনেমায়। এতে প্রধান চরিত্র 'ইঞ্জিনিয়ার' তার সঙ্গীদের নিয়ে তেহরান থেকে প্রায় ৫০০ মাইল দূরবর্তী কুর্দি গ্রাম সিয়াহ্ দারেহ্তে যান একটি গাড়িতে করে। যাওয়ার এই দৃশ্যটি প্রায় ছয় মিনিট ধরে লম্বা লম্বা শটে চিত্রায়ন করেছেন চলচ্চিত্রকার।[২৫] হুলিয়াতেও স্টেশন থেকে যুবকের বাড়ি যাওয়ার দৃশ্যটি চলচ্চিত্রের দৈর্ঘের তুলনায় অনেক বেশি সময় ধরে ক্যামেরার মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। এই যায়গাটায় তানভীর মোকাম্মেলের সাথে আব্বাস কিয়ারোস্তমীর দৃশ্যবর্ণনা পদ্ধতির কিছুটা সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন না ঘটলেও কবির দৃষ্টিতে গ্রামে কোন কিছুই যেন আগের মতো নেই। বদলে গেছে। সেই শৈশব, তার স্মৃতি, কিছুই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। 'অনেক বদলে গেছে বাড়িটা, / টিনের চাল থেকে শুরু করে পুকুরের জল, / ফুলের বাগান থেকে শুরু করে গরুর গোয়াল ; / চিহ্নমাত্র শৈশবের স্মৃতি যেন নেই কোনখানে'।[২৬] পরিচালক এখানে শৈশবকে ফুটিয়ে তুলেছেন মাছ ধরা আর পুকুরের পানিতে লাফিয়ে ঝাপিয়ে গোসল করা দুরন্ত শিশুদের মাঝে। এ পর্যন্ত কবিতার সাথে কাহিনির ধারাবাহিকতা হুবহু রক্ষা করা হলেও পরের দৃশ্যে এর ছেদ পড়েছে। কবিতায় আঁকা প্রকৃতির অসম্ভব সুন্দর একটি চিত্রকল্পের চিত্রায়ণ এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে—'পড়ার ঘরের বারান্দায় নুয়ে পড়া বেলিফুলের গাছ থেকে / একটি লাউডুগী উত্তপ্ত দুপুরকে তার লকলকে জিভ দেখালো। / স্বতঃস্ফূর্ত মুখের দাড়ির মতো বাড়িটির চতুর্দিকে / ঘাস, জঙ্গল, গর্ত, আগাছার গাঢ় বন গড়ে উঠেছে অনায়াসে; / যেন সবখানেই সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করে / এখানে শাসন

করছে গোঁয়ার প্রকৃতি। / একটি শেয়াল একটি কুকুরের পাশে শুয়েছিল প্রায়, / আমাকে দেখেই পালালো একজন, / একজন গন্ধ শুঁকে নিয়ে আমাকে চিনতে চেষ্টা করলো / –যেমন পুলিশ-সমেত চেকার তেজগাঁয় / আমাকে চিনতে চেষ্টা করেছিল।'[২৭] কবিতার এই চিত্রকল্পটিও সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' কিংবা 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র প্রকৃতি বর্ণনার মতো সম্ভাবনাময় ছিল। আলোচ্য কবিতাটিতে এতোবেশি সিনেমাটিক উপাদান রয়েছে যে এর প্রতিটি শব্দই সিনেমায় রূপান্তর করার মতো। কবিতাটি কখনো চলচ্চিত্রে রূপান্তর হবে এমন অভিপ্রায় থেকে কবিতাটি লেখা হয়নি, তথাপি পুরো কবিতায় চিত্ররূপময়তা এসে ধরা দিয়েছে। চলচ্চিত্র নির্মাণের অভিপ্রায়ে গল্প বা উপন্যাস হরহামেশা লেখা হলেও (উদাহরণ- নীহাররঞ্জন গুপ্ত) এতদ্‌উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা বিরল। তবে জার্মান এক চলচ্চিত্র সংস্থার ইচ্ছেতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চলচ্চিত্র নির্মাণকে মাথায় রেখে 'The Child' নামের একটি ইংরেজি কবিতা লিখেছিলেন বলে জানা যায়।[২৮] 'হুলিয়া' কবিতা থেকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরের সময় পরিচালক সচেতনভাবে কবিতার অনেক উপাদান বাদ দিয়েছেন। মূল বিষয়টিকে তুলে ধরতে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো বর্জন করাই চলচ্চিত্রের জন্য আদর্শ। আলোচ্য সিনেমায় কবিতার নির্যাস ও এতে প্রতিফলিত রাজনৈতিক বক্তব্যটি তুলে ধরাই পরিচালকের অভিপ্রায় ছিল— কাহিনির হুবহু বর্ণনা তুলে ধরা নয়। হুলিয়া কবিতার মাধ্যমে যেমন কবিতাটি রচনার সময়কার প্রেক্ষিত বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি সিনেমাতেও নির্মাণকালীন সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অবধারিতভাবে চলে এসেছে। এ কারণে চলচ্চিত্রকারকে কোথাও কোথাও কাহিনিকে বর্ধিত করতে হয়েছে।

বিরামহীন পথচলায় হাঁটতে-হাঁটতে ক্লান্ত তরুণটিকে দেখানো হয়েছে একটি প্রাচীন বৃক্ষের নীচে বসে নিজেকে জুড়িয়ে নিতে। বহু বছর ধরে গাছটি নিঃস্বার্থভাবে পথিকদের ছায়া দিয়ে আসছে। একসময় এর গাঢ় ছায়ার প্রশান্তিতে হারিয়ে যেত দেহ-মন। কবিতার বর্ণনায় এই গাছটি আজ শ্রীহীন। 'হাঁটতে হাঁটতে একটি গাছ দেখে থমকে দাঁড়ালাম, / অশোক গাছ, বাষট্টির ঝড়ে ভেঙে যাওয়া অশোক, / একসময় কী ভীষন ছায়া দিতো এই গাছটা; / অনায়াসে দু'জন মানুষ মিশে থাকতে পারতো এর ছায়ায়।'[২৯] ঝড়ে ভেঙে পরা এমন একটি বড় অশোক গাছ খুঁজে বের করা চলচ্চিত্রকারের জন্য সহজলভ্য বিষয় নয়। শিল্পের স্বাধীনতা থাকলেও শিল্প সৃষ্টির বাস্তবতা আছে। সেই বিষয়টিকে মেনে নিয়ে তাঁকে এই দৃশ্যে কিছুটা কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। গাছটি দেখে যুবকের থমকে দাঁড়ানোর দৃশ্যটি সচেতনভাবে বাদ দিতে হয়েছে। তবে শ্রান্ত পথিকদের তার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে, মমতা দিয়ে কাছে টেনে নেওয়ার অনুষঙ্গটি ওঠে এসেছে।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তরুণটি পৌঁছে যায় বাড়ির সীমানায়। পিছনের দরজায় টোকা দিয়ে 'মা' বলে ডাক দেয়। এমন সময় নিস্তব্ধ গ্রামের মাথার উপর দিয়ে বিকট শব্দে একটি প্লেন উড়ে যায়। তরুণটি মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকায়। চক্ষুস্পটে আবারো ভেসে ওঠে প্রতিবাদ-নির্যাতনের স্থিরচিত্র। এতে বুঝতে বাকি থাকে না এটি একটি টহলরত যুদ্ধ বিমান। যা স্বৈরাচারী রাষ্ট্র মুক্তিকামী জনগণকে তার রক্তচক্ষু দেখিয়ে দাবিয়ে রাখার নিমিত্তে ব্যবহার করে থাকে। এখানে কিছু শব্দ ও স্থিরচিত্রের ডিটেল ব্যবহার করে চলচ্চিত্রকার বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন। 'শান্ত-স্থির-বোকা গ্রামকে কাঁপিয়ে দিয়ে / একটি এরোপ্লেন তখন উড়ে গেলো পশ্চিমে...। / আমি বাড়ির পেছন থেকে শব্দ করে / দরোজায় টোকা দিয়ে ডাকলুম, মা'[৩০] —কবিতার এই লাইনগুলোর হুবহু অনুকরণে

দৃশ্যের এই অংশটি নির্মিত হলেও মধ্যে স্থিরচিত্রের ব্যবহার চলচ্চিত্রে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। বিমান উড়ে যাওয়ার দৃশ্য সরাসরি না দেখালেও যুদ্ধ-বিমানের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কখনো কখনো শব্দও দৃশ্যের পরিবর্তে সিনেমার প্রধান ভাষা হয়ে দাড়ায়। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে মনীষার মানসিক দ্বন্দের চরম মুহূর্তে পাশ দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে একপাল খচ্চরের চলে যাওয়া এবং এই সময়টুকোতে ভাবনার মধ্যে হারিয়ে গিয়ে মনীষার একান্তই নিজেকে উপলব্ধি করা—ঘণ্টার এই ঢং ঢং শব্দ দ্বারা এখানে তার মনের ভিতরের অবস্থা দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।[৩১] আবার পথের পাঁচালীতে কাশবনের ভিতর অপু-দুর্গার কানে দূর থেকে ট্রেনের শব্দ ভেসে আসার পর তাদের অভিব্যক্তি, জীবনে প্রথম ট্রেন দেখার অনুভূতি ব্যক্ত করে।[৩২] 'নৈঃশব্দেরও কিছু-কিছু ব্যাপার ছবিতে আছে যা সিনেমাকে আরও অর্থবহ করে তোলে, যার যোগ soundtrack-এর সঙ্গে। তা ছাড়া ছবিতে নিশ্চলতাও একটা বিশিষ্ট আঙ্গিক হিসেবে স্বীকৃত। ছবিতে হঠাৎ ঘটনাক্রম, প্রসঙ্গ বা action হঠাৎ স্থির হয়ে গেলে অর্থাৎ freeze হলে তারও একটা প্রচণ্ড প্রভাব তৈরি হয়'।[৩৩] বর্ণনাপদ্ধতি ছাড়া চলচ্চিত্রের মতো বিষয় প্রকাশের আর কোন প্রকরণ নেই সাহিত্যের। এখানেই চলচ্চিত্রের বিশিষ্টতা।

ক্যাচক্যাচ শব্দে বাড়ির পিছনের দরজাটি খুলে গেল। একটি হাসিমাখা মুখ দরজার ফাঁক দিয়ে বেড়িয়ে এল। দুটি প্রশস্ত বাহু বুকে টেনে ধরল তরুণটিকে। বহুদিন যে মা ছেলের ডাক শুনতে না পেয়ে দরজা খোলতে আসেনা। বহু প্রতীক্ষিত সে ডাক শুনে আজ মায়ের ভিতরটা জুড়িয়ে গেছে। ছেলেকে বুকের মধ্যে শক্ত আলিঙ্গনে বন্দি করে ফেলেছে। কখনো তাকে হারিয়ে যেতে দিবে না। কোন অপশক্তি আর ছেলেকে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবেনা। 'বহুদিন যে দরোজা খোলেনি, / বহুদিন যে দরোজায় কোন কণ্ঠস্বর ছিল না, / মরচে পড়া সেই দরোজা মুহূর্তেই ক্যাচক্যাচ শব্দ করে খুলে গেলো। / বহুদিন চেষ্টা করেও যে গোয়েন্দা বিভাগ আমাকে ধরতে পারেনি, / চৈত্রের উত্তপ্ত দুপুরে, অফুরন্ত হাওয়ার ভিতরে সেই আমি / কত সহজেই একটি আলিঙ্গনের কাছে বন্দী হয়ে গেলুম; / সেই আমি কত সহজেই মায়ের চোখে চোখ রেখে / একটি অবুঝ সন্তান হয়ে গেলুম।'[৩৪] মায়ের চোখের দিকে সন্তানের এই অবুঝ দৃষ্টির এক আবেগঘন মুহূর্ত চলচ্চিত্রকার ক্যামেরাবন্দি করতে পারেননি। 'ঋত্বিক ঘটকের অযান্ত্রিক ছবিতে—গাড়ির ইঞ্জিনে যখন বিনোদ জল ঢালে— তখন সাউন্ড-ট্র্যাকে একটা অদ্ভুত গরগর শব্দ শোনা যায়। যেন কোন তৃষ্ণার্ত মানুষ ঢক ঢক ক'রে জল খাচ্ছে।'[৩৫] দীর্ঘদিন ছেলেকে না দেখে মায়ের মনে এরকম তৃষ্ণা জেগে ওঠার কথা। এই দৃশ্যে এমন অভিব্যক্তি চোখে পরে না। এখানে মায়ের তৃষিত হৃদয়ের হাহাকাররত রূপটি তাঁর চোখের চাহনির মাঝে প্রকাশ করা যেত। এতে করে বহুদিন পর মায়ের সঙ্গে ছেলের সাক্ষাতের মুহূর্তটি চলচ্চিত্রে একটি অর্থবহ দ্যোতনা তৈরি করার অবকাশ পেত।

পরের লাইনটিরও হুবহু দৃশ্যায়ন হয়নি—'মা আমাকে ক্রন্দনসিক্ত একটি চুম্বনের মধ্যে / লুকিয়ে রেখে, অনেক জঙ্গলের পথ অতিক্রম করে / পুকুরের জলে চাল ধুতে গেলেন'।[৩৬] এতোদিন ধরে মায়ের বুকের ভিতরে জমানো কষ্ট চোখের জলের স্রোতধারা হয়ে ঝরে পড়ছে, চরম আবেগে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে স্নেহভরা চুম্বন করছে —এরকম আবেগঘন বর্ণনার দৃশ্যায়ন এখানেও হয়নি। মানবিক আবেগের চেয়ে সামাজিক-রাজনৈতিক আবেগই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে এই সিনেমায়। অনেক জঙ্গলের পথ মাড়িয়ে গিয়ে মায়ের চাল ধোয়ার দৃশ্যটিতে পরিচালক নিজের মতো করে পরির্বতন এনেছেন। সিনেমায় দেখা যায় পুকুর ঘাটে চাল ধুয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে লম্বা পথ ধরে মা

বাড়ি ফিরছেন। চাল ধুতে যাওয়ার পরিবর্তে চাল ধুয়ে ফিয়ে আসার এই দৃশ্যে অবস্থার রূপান্তর ঘটলেও মূলভাবটির পরিবর্তন হয়নি।

পরের দৃশ্যে চলচ্চিত্রকার একটি বাড়তি চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। বোনের চরিত্র। যে তরুণটিকে আগ্রহভরে ঘরের ভিতরে নিয়ে যায় কিছু একটা দেখানোর জন্য। বোন চরিত্রটিকে এখানে বাংলার হাজারো বিপ্লবীর বোন হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। যে ভাইয়ের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করে। যে অনেকদিন পর ভাইকে পেয়ে তার অনুপস্থিতিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো আগ্রহভরে বলতে চায়, দেখাতে চায়। বোনের আহ্বানে ঘরে প্রবেশ করে ভাইটি দেখে মঙ্গল ও সিদ্ধির জনক গণেশের মূর্তি যে যায়গায় স্থাপিত ছিল সেখান থেকে তা সরিয়ে লেনিনের ছবি টাঙিয়ে দিয়েছেন বাবা। বিষয়টি যে অপ্রত্যাশিত তা বোঝানোর জন্যও এখানে একটি অতিরিক্ত চরিত্র আবশ্যক ছিল। বোন চরিত্রটি দ্বারা ঘটনায় নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হয়েছে। যেখানে গণেশ মূর্তির পাশে মঙ্গলপ্রদীপ জ্বলত, সেখানে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সংগ্রামের প্রতীক হয়ে ওঠা লেনিনের বাঁধাই করা ছবি! এটি ভাই-বোন দু'জনের কাছেই আশ্চর্যকর বটে। এ ঘটনা বাবার মধ্যে জেগে ওঠা সাম্যবাদী চেতনার পরিচয় বহন করে। ধর্মের চেয়ে মানবতার মুক্তি এখানে মুখ্য বিষয়। কবিতার বর্ণনায় 'আমি ঘরের ভিতরে তাকালুম, / দেখলুম দু'ঘরের মাঝামাঝি যেখানে সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি ছিল, / সেখানে লেনিন।'[৩৭] সিনেমায় গনেশের ছবির পরিবর্তে প্রজ্জলিত মঙ্গলপ্রদীপ সমেত মূর্তি দেখানো হয়েছে। যুবকের কল্পনায় ভেসে বেড়ানো এই দৃশ্যাংশটি দিয়ে বোঝা যায় এই ঘরে নিয়ত গণেশ পূজা হতো। দেশের দুর্দিনে বাবার কাছে পূজার চেয়ে প্রতিরোধ বড় হয়ে উঠেছে দেখে ছেলের মুখে প্রশান্তির অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। কবির বর্ণনায় দেখা যায়– 'বাবার জমাখরচের পাশে কার্ল মার্কস; / আলমিরার একটি ভাঙা কাচের অভাব পূরণ করছে / স্ক্রুপস্কায়ার ছেঁড়া ছবি'।[৩৮] এই অংশটি চিত্রায়িত হলে চলচ্চিত্রে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা আরও বেশি নিবদ্ধ হতো। বিশেষ করে আলমিরার একটি ভাঙা কাচের অভাব পূরণ করেছে 'নাদেজদা স্ক্রুপস্কায়ার' ছেঁড়া ছবি, এরকম একটি দৃশ্য মুক্তির আন্দোলনে নারীর অবদানকে মহিমান্বিত করত।

কবিতায় বাসন্তী নামে একটি চরিত্রের বর্ণনা আছে— 'আমরা ভালোবাসার নামে একদিন সারারাত / এ গাছের ছায়ায় লুকিয়ে ছিলুম। / সেই বাসন্তী, আহা, সেই বাসন্তী এখন বিহারে, / ডাকাত স্বামীর ঘরে চার সন্তানের জননী হয়েছে।'[৩৯] স্পষ্টত বুঝা যায় এই বাসন্তী তরুণটির প্রেমাস্পদ ছিল। চলচ্চিত্রকার এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে নির্মাণ করেছেন। সিনেমায় দেখা যায় ঘর থেকে একটি চিঠি নিয়ে এসে বারান্দার মেঝেতে বসে তরুণটি তা পড়া শুরু করে— 'সুজন, আশা করি তোমরা ভাল আছ। আমরা আছি মোটামুটি। একথা ভাবতেও পারিনা, আমরা আজ আলাদা। বারহাট্টার কথা সবসময় মনে হয়। তোমাদের কথা, আমাদের শান্ত গ্রামটির কথা। বর্তমানে শ্যামবাজারে এক পিসীর বাড়িতে ওঠেছি। গলির ভিতরে ঘুপচে অন্ধকার। দিনের বেলায়ও আঁধার। কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবি তা-ও ভাল, ওখানকার মতো সর্বদা এতো আতঙ্ক তো নেই। তোমরা আসছ তো? ভাল থেকো। ইতি– তোমারই বাসন্তী (হু. চ.)।' বাসন্তীর বয়ানে চিঠি পাঠ থেকে জানা যায় তরুণটির নাম সুজন। চলচ্চিত্রকার নিজেই 'তরুণ' চরিত্রটির নামকরণ করেছেন। কবিতায় কোথাও তার নামের উল্লেখ নেই। বাসন্তীর কণ্ঠেই সমস্ত চিঠিটির পাঠ হয়েছে। চলচ্চিত্রে এই কৌশলটি বেশ পুরনো। যার চিঠি, পাঠকের কাছে তাকে মূর্ত করার জন্য তারই কণ্ঠে পাঠ; কখনো

কখনো মন্তাজের ব্যবহারে তাকে বা চিঠির বিষয়বস্তুকে ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয়। এখানেও চিঠি পড়ার মাঝে সুজনের কল্পনায় ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয়েছে তাদের অতীত জীবনের প্রেমময় সময়ের কিছু রোমান্টিক দৃশ্য। চিঠির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশটি ছিল— আতঙ্কে বাসন্তীদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে কলকাতার শ্যামবাজারে চলে যাওয়া, সুজনরা আসবে কী না উৎকণ্ঠা সহকারে তা জানতে চাওয়া। এর মাধ্যমে ঐ সময়ে সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারগুলোর উপর আক্রমণের আতঙ্ক মূর্তমান হয়েছে। ফুলের মতো সাজানো নিশ্চিত ভবিষ্যত ফেলে নিরুপায় হয়ে তাদের অন্ধকার অনিশ্চয়তার মধ্যে চলে যাওয়ার সত্যটুকু ওঠে এসেছে। ঘুপচে অন্ধকার ঘর ও ফুলেল সরিষা ক্ষেতে দুজনের হাত ছেড়ে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার দৃশ্য বর্ণনার মাধ্যমে তারই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কবি নির্মলেন্দু গুণ বলেছেন— বাসন্তী চরিত্রটি বাস্তবিক ছিল না, যেসকল লোকেরা ঐ সময় দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল তাদেরকে আপনজন জ্ঞান করে এই চরিত্রটি কবিতায় সৃষ্টি করা হয়েছে।[৪০] এটি একটি প্রতীকি চরিত্র। কবির মতো চলচ্চিত্রকারও চরিত্রটিকে একটি প্রতীকী রূপ দিয়েছেন। কবিতায় যে বাসন্তী বিহারে চলে গিয়েছিল, সিনেমায় সে কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছে। 'দেশভাগের বিচ্ছেদ ও যন্ত্রণা বোঝাতে বিহারের প্রান্তরের চেয়ে উত্তর কলকাতার আধো-অন্ধকার গলিই বেশী অর্থবহ বলে মনে হয়েছে'[৪১]।

সন্ধ্যায় মহকুমা থেকে বাবা ফেরে, তার সঙ্গে সংসারের ব্যাগ। কবির ভাষায়, 'সন্ধ্যায় মহকুমা শহর থেকে / ফিরবেন বাবা, তাঁর পিঠে সংসারের ব্যাগ ঝুলবে তেমনি।'[৪২] সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বেলে মায়ের প্রার্থনা করার দৃশ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে সময়টি সন্ধ্যা। সাইকেলের শব্দ পেয়ে দৌড়ে গিয়ে মেয়েটি বাবাকে তার দাদা আসার খবর জানায়। এখানে বঙ্গবালিকার স্বভাবসুলভ চপলতা প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে সুজনও ঘর থেকে বের হয়ে বাইরে আসে। তাকে দেখেই বাবা বলেন, 'কেসটা মিটেছে'। দীর্ঘদিন পর ছেলেকে দেখে কুশল বিনিময় না করে সরাসরি মামলার প্রসঙ্গে কথা বলার মধ্য দিয়ে ছেলের জন্য বাবার সতত উদ্বিগ্নতা প্রকাশ পেয়েছে। বাবার কথায় সাড়া না দিয়ে সুজন কিছুক্ষণ মৌন থাকে। প্রসঙ্গ ঘুরাতে জিজ্ঞেস করে— এবার ফসল কেমন হয়েছে বাবা? বাবা আকুল হয়ে এবার বলেন, 'উকিলবাবু বলছিলেন তুই রাজি হলেই কেসটা তুলে নিবে'। সুজন আবারও প্রসঙ্গ ঘোরায়— 'মনে হয় দখিণের চকে এবার ধান ভালই হয়েছে'। বাবার এই উদ্বিগ্নতার ফলহেতু সম্ভাব্য করনীয় সম্বন্ধে আঁচ করতে পেরেই সুজন বারবার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বিষয়টিকে চাপা দিতে চেয়েছে। স্নেহময় বাবা অসহায় ভঙ্গিতে ছেলের সম্মতির প্রত্যাশায় আবার বলেন, 'আজ রাতেই তাহলে উকিলবাবুর কাছে...'। সুজন স্পষ্ট জানিয়ে দেয়— 'আমি বন্ড দেব না বাবা'। এখানে সুজনের আপোসহীন সংগ্রামী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও বাবাকে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে আপোসকামী হতে দেখা যায়। যা পূর্বে চিত্রায়িত তাঁর সাম্যবাদী চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যে বাবা দেবতা গনেশকে সরিয়ে লেনিনকে স্থান দিয়েছে, তাঁর কাছে ছেলেকে বন্ড দিয়ে আপোষ করার প্রস্তাব দেওয়া বেমানান। চলচ্চিত্রকার এখানে ছেলের মঙ্গলের জন্য বাধ্য হওয়া বাবার অসহায়ত্বের দিকটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। ভিতর থেকে মায়ের ডাক শুনে সুজন খাওয়ার জন্য চলে গেলে ছেলের শৈশবের স্মৃতি মনে করে বাবার ভিতরে ভিতরে গুমরে কান্নার দৃশ্যটিও সন্তানের হিতের জন্য স্নেহাতুর বাবার অসহায়ত্বের দিকটি নির্দেশ করে। এখানে এমনটিও ভাবা যেতে পারে, বাবার ভিতরে সাম্যবাদী চেতনা যা পূর্বে দেখা গিয়েছিল, তা আসলে ছেলের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তারই স্মৃতি রক্ষা মাত্র। কিন্তু এই ভাবনাকে নিশ্চিতভাবে গ্রহন করা যায় না। কারণ যদি তা-ই হতো তাহলে গনেশের মূর্তি সরিয়ে

লেনিনের ছবি স্থাপন না করে পাশেও স্থাপন করা যেত। বাবা-ছেলের দৃশ্যটি সরাসরি কবিতানুগ নয়, ছেলেকে নিরাপদে রাখার জন্য একজন বিপ্লবীর বাবার প্রাণান্তকর চেষ্টার এই রূপটি চলচ্চিত্রকারের সৃষ্টিজাত।

রাতে খাবার সময় মায়ের পাশে সেনবাড়ি থেকে আসা বৌদিকে দেখা যায়। শরীরের দূরবস্থার প্রসঙ্গ টেনে বৌদি বিয়ে করতে বলেন সুজনকে। কবিতায় এর উল্লেখ আছে, 'সেনবাড়ি থেকে খবর পেয়ে বৌদি আসবেন, / পুনর্বার বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন আমাকে।'[৪৩] বৌদির কথার জবাবে সুজন সহাস্যে বলে— কে তাকে মেয়ে দেবে, যার পিছনে সর্বদা গোয়েন্দা লেগে থাকে। এমন সময় বাইরে পুরুষ কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সবাই ভয় পেয়ে যায়। এই বুঝি ধরতে এল তাকে। একজন বিপ্লবীর পরিবারে এরকম ভয় সতত তাড়া করে ফেরে। সন্ত্রস্ত হয়ে ছোটবোন বাইরে যায় দেখতে। ফিরে এসে জানায়— আদিত্য দা এসেছে। কবিতার বর্ণনায়— 'খবর পেয়ে যশমাধব থেকে আসবে ন্যাপকর্মী ইয়াসিন, / তিন মাইল বিষ্টির পথ হেঁটে রসুলপুর থেকে আসবে আদিত্য। / রাত্রে মারাত্মক অস্ত্র হাতে নিয়ে আমতলা থেকে আসবে আব্বাস।'[৪৪] কখনো কখনো কবিতার লাইনই হয়ে ওঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মারাত্মক অস্ত্রসম। কবির ভাষায়, 'কবিতা আমার নেশা, পেশা, প্রতিশোধের হিরন্ময় হাতিয়ার'।[৪৫] কবিতার এই চরিত্রগুলো প্রত্যেকেই বাস্তবে ছিলেন। কৌশলগত কারণে শুধু তাদের নাম পরিবর্তন করে কবিতায় উপস্থাপন করা হয়েছে বলে কবি এই গবেষককে দেয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন।

সিনেমায় পরের দৃশ্যে দেখা যায় অনেকেই এসে উপস্থিত সুজনের ঘরে। সিনেমার দীর্ঘতম এই দৃশ্যটির প্রায় পুরোটাই তানভীর মোকাম্মেল বর্ধিত করেছেন। ঝোলা থেকে লিফলেট বের করে একজনকে দেয় সুজন, সেও গোপনীয়তার সঙ্গে তার ঝোলায় রেখে দেয়। এখানে বামপন্থী আন্দোলন কর্মীদের গোপন তৎপরতা দেখানো হয়েছে। চলচ্চিত্রকারের বামপন্থী মনোভাবের প্রভাব এখানে স্পষ্ট। কবি নিজেও বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে তাঁর কবিতায়ও সেই অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে।[৪৬] তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে বামপন্থীরা তাদের বিপ্লব প্রসারের হাতিয়ার হিসেবে চলচ্চিত্রকে ব্যবহার করেছিলেন। লেনিন নিজে এর সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকায় অনেক 'প্রোপাগান্ডা' সিনেমা তৈরি হয়। যার মধ্য থেকে কিছু চলচ্চিত্র শিল্পমানের দিক থেকেও অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে আমেরিকান চলচ্চিত্র *The Birth of a Nation* (১৯১৫)[৪৭] এবং রাশিয়ান চলচ্চিত্র *Battleship Potemkin* (১৯২৫)[৪৮] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যাটলশিপ পোটেমকিন সিনেমাটি বিপ্লবী আন্দোলনের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছিল। 'জার নিকোলাসের শাসনের বিরুদ্ধে ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে জনগণের যে বিক্ষোভ ও আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেই গণজাগরণের বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সোভিয়েত বিপ্লবী সরকার আইজেনস্টাইনকে এই ছবিটি নির্মাণের দায়িত্ব প্রদান করেন।'[৪৯]

সভায় উপস্থিতদের পকেট থেকে বের করে সিগারেট দেয় সুজন। সেই সিগারেটে টান দিতে দিতে একজন বলে, এবার কতদিন? জবাবে সুজন বলে, 'স্টেশনে পেছনে লেগেছিল। শঙ্কর দা'র সঙ্গে রফিজের দোকানে দেখা। দাদাতো প্রথমে চিনতেই পারেনি (হু. চ.)।' মুখের দাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে এর কারণ ব্যাখ্যা করে। 'এরপর রফিজ মিয়া দু'দুবার চিনি দিতে এসেও... (হু. চ.)' এতটুকু বলে উচ্চহাস্যে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলে, 'তা এদিককার খবর কি? (হু. চ.)' সিনেমার প্রথম

দিকের প্রায় সংলাপহীন অংশটুকু সাধারণ দর্শকদের কাছে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনবোধ থেকে চলচ্চিত্রকার এই সংলাপগুলোর অবতারণা করেছেন। শুরুর দিকে চলচ্চিত্রটি যে আলাদা ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে সর্মথ হয়েছিল এখানে সংলাপযোগে একই বিষয় পুনর্ব্যক্ত করায় তা ব্যহত হয়েছে। কারণ চলচ্চিত্র সৃষ্টির শুরুতে প্রায় চার দশক নির্বাক ছবিগুলো কোনরূপ শব্দ ছাড়াই তৈরি হয়েছিল। বলা যায় এ সময়ের মধ্যে চলচ্চিত্র নিজেই আলাদা একটি ভাষা হিসেবে জায়গা তৈরি করে নিয়েছিল। ছবি দিয়ে কথা বলানোর কায়দাই চলচ্চিত্রের ভাষা। 'শব্দ দিয়ে ছবি তৈরি করে কবিতা। ছবি দিয়ে শব্দ তৈরি করে ফিল্ম। কবি যদি যোগ্য হন, তাঁর ব্যবহৃত শব্দের ভিতর দিয়ে ছবিটাকে ঠিক-ঠিক দেখতে পান পাঠক'[৫০] সিনেমার বেলায় ঠিক উল্টো কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ ছবির ভিতর শব্দটাকে (সংলাপ) খুঁজে পান দর্শক।

সুজনের কথার উত্তরে লোকটি জানায় এদিকশার খবর ভাল না। সবার ঘরে অভাব। আরেকজন বলে— 'হারানের বউটা গলায় দড়ি দিল, ভাত জোটে না, কি করবে?...তমিজ আলীর ঘরটাও পুরে গেল। তমিজ মিয়া এখন পাগল হইয়া হাটে হাটে ঘুরে। আর তার মাইয়াটা গঞ্জের পাড়ে নাম লেখাইছে (হু. চ.)।' সংলাপটিতে ঐ সময়কার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের বর্ণনা রয়েছে। নিরন্তর ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করা, বাধ্য হয়ে বেশ্যাবৃত্তিতে নাম লেখানো, ঐ সময়ের ক্ষুধার্ত সমাজকে চিত্রিত করেছে। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ে। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওদিকে তাকায়। আরও দুজন কমরেড ঘরে প্রবেশ করে। এর মধ্যে একজন আব্বাস, গায়ের চাদরে লুকিয়ে রাখা অস্ত্রই তা প্রমাণ করে। দ্বিতীয়বার কথা বলা লোকটি এবার বলে— 'নাদের চোধুরী কয় কি জানেন, কয়, মুসলিমলীগ পাকিস্তান আনছে, রাখতেও পারবে'। আব্বাস বলে 'ওর বাপেও পারবে না'। প্রথম কথা বলা লোকটি বলে— 'শেখ মুজিব জেলে'। এসময় কমিউনিস্ট নেতা মনি সিং, মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতারত ছবি দেখানো হয়। তানভীর মোকাম্মেল নিজেই স্বীকার করেছেন, "আমার 'হুলিয়া' স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটিতে এক বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীর বয়ানে মুক্তিযুদ্ধের কথা আছে। মাওলানা ভাসানী, মণি সিং, এঁদের কথা আছে।"[৫১] চলচ্চিত্রকার বামপন্থী আন্দোলনের ধারাকে গুরুত্ব দিলেও স্বাধীনতা যুদ্ধে সকলের অংশগ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরতে ভুল করেননি। শেখ মুজিবের ছবি প্রদর্শন তা প্রমাণ করে। কবিতায়ও তাঁর কথা উল্লেখ ছিল। আরেকজন বলে— 'আইয়ুব খান কি এত সহজেই ছেড়ে দিবে? (হু. চ.)' চিন্তামগ্ন সুজনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে জেনারেল আইয়ুব খান ও স্বৈরাচারী হিটলারের ছবি, শকুনের ঠোঁট সদৃশ চিত্র, শত্রু বাহিনীর সৈন্য ও পাকিস্তানি সৈন্যদের কুচকাওয়াজ। এইসব দৃশ্য বর্ণনায় বোঝা যায়, হিটলার যেমন তার সৈন্যবাহিনী দ্বারা জুলুম অত্যাচার চালিয়ে লাখো লাখো নিরপরাধ সাধারণের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল। তেমনি স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারও তার শকুনী ঠোঁট দিয়ে বাংলার বুক চিঁড়ে রক্তাক্ত করতে চেয়েছিল এই জনপদ। এসময় আরেকজন বলে ওঠে— 'যুদ্ধ ছাড়া ওদের কাছ থেকে আলাদা হওয়া যাবে না'। আবারও সুজনের চোখের সামনে ভেসে উঠে শত্রুবাহিনীর গোলায় বিধ্বস্ত ধ্বংসলীলার চিত্র। মরে পড়ে থাকা হতভাগ্যদের ছবি, মানুষের খুলি ও হাড়গোড়ের ছবি, উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের ছবি, মুক্তিকামী জনগণের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আর সমুচিত জবাব দেওয়ার ছবি। এখানে সুজনের চোখ দিয়ে যুদ্ধের ফলে সম্ভাব্য পরিণতির কথা দর্শকদের চোখের সামনে মূর্ত করা হয়েছে। পরের শটে আরেকজন জিজ্ঞেস করে 'দেশ স্বাধীন হলে কি চালের দাম কমব? (হু. চ.)' দ্বিতীয় লোকটি জানতে চায়, 'কেউ গ্রাম ছেড়ে যাবে না? ঘারানের বউ, তমিজ আলী? (হু. চ.)' এই সংলাপ

মনে করিয়ে দেয়— মুক্তিকামী সাধারণ মানুষের কাছে স্বাধীনতা মানে ক্ষুধা থেকে মুক্তি। নিরাপদে নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা। এর বাইরে তাদের আর কিছুই চাওয়ার নেই, জানারও নেই।

এত প্রশ্নের মাঝেও সুজনকে নিরুত্তর থাকতে দেখা যায়। শুরু থেকেই সুজন চরিত্রে মৌনতা এবং এস্থলে অভিব্যক্তির প্রয়োগ ঘটেছে। যদিও এই অংশে কবি বলেছেন, 'আমি কিছুই বলবো না। / আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকা সারি সারি চোখের ভিতরে / বাংলার বিভিন্ন ভবিষ্যৎকে চেয়ে চেয়ে দেখবো'।[৫২] সুজনের কাছে উত্তর না পেয়ে প্রথম লোকটি জোর দিয়ে বলে 'সমাজতন্ত্র করতেই হবে (হু. চ.)।' এই ছোট্ট সংলাপটিকে সিনেমায় সমাজতন্ত্র প্রচারের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন ঘুমাচ্ছিল, পাশের জন ধাক্কা দিয়ে তাকে জাগিয়ে দেয়। এই দৃশ্যটি অধিকারবিহীন নিরুত্তাপ জনগণকে বিপ্লবের পথে জাগ্রত করার ইঙ্গিত বহন করে। সবাই সুজনের মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়। তার দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকে। সুজন আরেকটি সিগারেট ধরায়। এরমধ্যে আরেকজন জিজ্ঞেস করে— 'তা লড়াইডা কিসের জন্য, স্বাধীনতা? না সমাজতন্ত্র? (হু. চ.)' অন্যজন বলে, 'কন খোকা দা (হু. চ.)'। এবার সবাই সমস্বরে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় তার কাছে। এখানে আরেকটি বিষয় দর্শকদের মনে দ্বন্দের জন্ম দেয়, পূর্বে তরুণটিকে প্রেমিকার বয়ানে 'সুজন' নামে পরিচিত করানো হয়েছিল। এখানে আবার বিপ্লবীদের 'খোকা' নামে ডাকতে দেখা যায়। দুটির মধ্যে দ্বিতীয় নামটিই গ্রহণযোগ্য, কেননা প্রেমিকার মুখে সুজন নামটি ভালবাসার আবেগসঞ্জাত বহিঃপ্রকাশ বলে প্রতিভাত হয়। মৌনতা ভেঙ্গে এবার খোকা বলে, 'পরাধীন দেশে সমাজতন্ত্র হয় না। সমাজতন্ত্রের পথ অনেক লম্বা। এই পথে একেক সময় একেক রকম লড়াই। এখনকার লড়াই দেশ স্বাধীন করার (হু. চ.)।' এতে স্বাধীনতা যুদ্ধে সমাজতন্ত্রীদের অবস্থান পরিষ্কার করা হয়েছে। চরিত্রের মৌনতা ও সংলাপ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, অতিরিক্ত মৌনতা যেমন সিনেমায় ভাব প্রকাশের অন্তরায়, অতিকথন ও দোষনীয়। তাই দুইয়ের মধ্যে পরিমিতিবোধ ও ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক। 'চলচ্চিত্রে সংলাপের প্রধানত দুটি কাজ। এক কাহিনিকে ব্যক্ত করা ; দুই, পাত্র-পাত্রীর চরিত্র প্রকাশ করা। সাহিত্যের কাহিনিতে কথা যে কাজ করে, চলচ্চিত্রে ছবি ও কথা মিলিয়ে সে-কাজ হয়। পরিবেশ বর্ণনার জন্য কথার প্রয়োজন নেই, ছবিই সে-কাজ করে। চরিত্র-বর্ণনার আকৃতিগত দিকটা ছবিতেই প্রকাশ পায়। প্রকৃতির দিকটা কিছুটা অভিনেতার ভাবভঙ্গি ও বাকীটা তার সংলাপে প্রকাশিত হয়। ছবি দিয়ে যা বলা সম্ভব হল না, সংলাপে কেবল সেইটুকুই বলার চেষ্টা করা উচিত।'[৫৩] 'হুলিয়া'তে সংলাপের পরিমিতিবোধ লক্ষণীয়।

ভোরে যখন চাষিরা গরু নিয়ে মাঠে যাওয়ায় ব্যস্ত, সে সময় রাতের সভায় উপস্থিত দ্বিতীয় লোকটি দেখতে পায় একটি মোটরভ্যানে করে পুলিশ আসছে গ্রামে। গতিবিধি দেখে তার বুঝতে অসুবিধা হয় না তারা কি উদ্দেশ্যে এসেছে, কোন দিকে যাচ্ছে। প্রাণপনে দৌড়াতে দৌড়াতে খোকাদের বাড়ি ছুটে গিয়ে পুলিশ আসার খবর দেয় সে। স্বাভাবিকভাবেই দর্শকরা বোঝতে পারে স্টেশন থেকে যে লোকটি তাকে অনুসরণ করছিল সেই গোয়েন্দার দেওয়া তথ্য পেয়েই পুলিশ এসেছে। তাছাড়া 'সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ সেই সময়ে বামপন্থী আন্দোলন কর্মীদের বাড়ির উপরও খুব নজর রাখত। ব্রিটিশ আমল থেকেই একটা কথা প্রচলিত ছিল— 'guard the mothers of the revolutionaries। বিপ্লবীদের ধরতে হলে তাদের মা-দের পাহাড়া দাও। কারণ, কোন না কোন সময় তারা তাদের মায়েদের সাথে দেখা করতে আসবে।'[৫৪] খোকাকে আবারও মায়ের কাছে

বিদায় নিয়ে মমতার বাঁধন ছিন্ন করে বেড়িয়ে পড়তে হয় অজানার পথে। মায়ের কিছুই করার থাকে না। কেননা তার ছেলে বিপ্লবী। তবে এখানে মায়ের চরিত্রটি চিরাচরিত বাঙ্গালি মায়ের প্রতিচ্ছবি হিসেবে চিত্রায়ণ হয়েছে। সিনেমার শেষদিকে কাহিনিতে যেভাবে বাম আন্দোলনের দিক আলোকপাত করা হয়েছে সেভাবে মায়ের চরিত্রটি নির্মাণের সুযোগ ছিল। যেভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল *Mother* সিনেমার 'মা' চরিত্রটি।[৫৫]

ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ধানক্ষেত মাড়িয়ে সহযোদ্ধাদের কাছে বিদায় নিয়ে খোকা পৌঁছে যায় নদীর পাড়ে। ছোট্ট ডিঙ্গায় করে মাথায় হুলিয়া নিয়ে আবার ভেসে চলে ভবিষ্যতের পথে। খড় কুটোর মতন। যাওয়ার আগে সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলে। যা স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতির ইঙ্গিত বহন করে। নেপথ্যে কবিতাটির আবৃত্তি বাজতে থাকে। ডিঙ্গি ছেড়ে এবার খোকা আবার সেই একই পথ ধরে ফিরে যায়, যে অশথ গাছের পাশ দিয়ে সে এসেছিল। আবার সেই ট্রেনের হুইসেল, আবার সেই ছুটে চলা, কখনো মুখ ঢেকে, নিজেকে লুকিয়ে। নিজের কাছে আনমনে নিজেই প্রশ্ন করে। 'আমার নামে কতদিন আর এরকম হুলিয়া ঝুলবে?[৫৬] কবিতায় যে প্রশ্নটি তার সাথীরা করেছিল। তখনও সে যার উত্তর দিতে পারেনি। কারণ উত্তরটি তার নিজেরই অজানা। পথ এগিয়ে চলে, চোখের সামনে আবারও ভেসে ওঠে প্রতিবাদের দৃশ্য, বিক্ষোভের দৃশ্য, শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতনের দৃশ্য। ছুটেচলা ট্রেনের সামনে থাকা দুটি লাইনের মতো তার সামনেও দুটি রাস্তা খোলা। একটি পরাজয় বরণ করা, অন্যটি সংগ্রামে ঝাপিয়ে পরে দেশকে মুক্ত করা। হুলিয়া মাথায় খোকা ছুটতে থাকে দ্বিতীয় পথ ধরে, স্বাধীনতার পথে।

পরিশেষ

সত্তর ও আশির দশকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে যে সকল কর্মী পরবর্তীতে চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছিলেন তাঁদের সিনেমায় বিশুদ্ধতার ছাপ পাওয়া যায়। চলচ্চিত্র দেখা, পাঠ করা ও বোঝার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা বিভিন্ন সময়ে চলচ্চিত্রের নানা দিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তানভীর মোকাম্মেল কবিতা থেকে *Agitprop* ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ করে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মূল কাহিনির কেন্দ্রে অবস্থান করে, ঘটনার বাহুল্য বর্জন করে, চলচ্চিত্রকার সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিষয়কে ফুটিয়ে তুলতে কোথাও কোথাও কাহিনিকে বর্ধিত করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। কেননা জীবনানন্দ দাশের প্রায় বিমূর্ত কবিতা 'বনলতা সেন'কে বর্ধিত করা যত সহজ, হুলিয়ার মতো বর্ণনাবহুল কবিতাকে বর্ধিত করা তার চেয়ে অনেক জটিল। সংলাপের পরিমিত ব্যবহারও চলচ্চিত্রটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। রূপক এবং ডিটেলের ব্যবহারে চলচ্চিত্রটিতে যুগযন্ত্রণা তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি বিষয় বৈচিত্র্যে চলচ্চিত্রটি স্বাতন্ত্রতার দাবি রাখে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. তানভীর মোকাম্মেল, সাক্ষাৎকার: জাপান ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম 'কমিউনিটি নিউজ', সম্পাদনা- জেড এম আবুসিনা, সাগামিহারা, কানাগাওয়া, জাপান। Link- http://community.skynetjp.com/id26.htm

২. তানভীর মোকাম্মেল, এই গবেষককে দেওয়া লিখিত সাক্ষাৎকার, তারিখ- ২৭ এপ্রিল ২০১৮

৩. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_based_on_poems এবং http://flavorwire.com/387561/10-great-movies-based-on-poems

৪. হুলিয়া চলচ্চিত্রে টাইটেল দৃশ্যে ইমেজের মাধ্যমে দেয়া লিখিত বক্তব্য।

৫. নির্মলেন্দু গুণ, কবিতা- *হুলিয়া*, গ্রন্থ- *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭, কবি প্রকাশনী, ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট, ২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা, পৃ. ৯

৬. দ্রষ্টব্য: *পথের পাঁচালী* (চলচ্চিত্র), চিত্রনাট্য ও পরিচালনা- সত্যজিৎ রায়, প্রযোজনা- পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত, মুক্তি- ১৯৫৫

৭. নির্মলেন্দু গুণ, কবিতা- *হুলিয়া*, গ্রন্থ- *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭, কবি প্রকাশনী, ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট, ২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা, পৃ. ৯

৮. *The Pilgrim*, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা- চার্লি চ্যাপলিন, প্রযোজনা- চার্লি চ্যাপলিন প্রোডাকশন, আমেরিকা, মুক্তি- ১৯২৩

৯. *সাতকাহন*, রিয়া দাশগুপ্তা সম্পাদিত, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অক্টোবর-২০১২। Link: http://satkahan.weebly.com/245324762495-2451-24532476249524682494 2480-24552482250924741.html

১০. নির্মলেন্দু গুণ, গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (পাঠক সমাবেশে এই গবেষক কর্তৃক ভিডিও ক্যামেরায় ধারণকৃত), শাহবাগ, ঢাকা, তারিখ- ১৯ এপ্রিল ২০১৮

১১. তানভীর মোকাম্মেল, এই গবেষককে দেওয়া লিখিত সাক্ষাৎকার, তারিখ- ২৭ এপ্রিল ২০১৮

১২. নির্মলেন্দু গুণ, কবিতা- *হুলিয়া*, গ্রন্থ- *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭, কবি প্রকাশনী, ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট, ২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা, পৃ. ৯

১৩. তানভীর মোকাম্মেল, এই গবেষককে দেওয়া লিখিত সাক্ষাৎকার, তারিখ- ২৭ এপ্রিল ২০১৮

১৪. https://en.wikipedia.org/wiki/Minimalism

১৫. গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (পাঠক সমাবেশে এই গবেষক কর্তৃক ভিডিও ক্যামেরায় ধারণকৃত), শাহবাগ, ঢাকা, তারিখ- ১৯ এপ্রিল ২০১৮ এবং Link: https://www.ebanglalibrary.com/ হুলিয়া/

১৬. বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, *কীভাবে ছবি করি কীভাবে ছবি হয়*, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১১, পরম্পরা প্রকাশন, ২০এ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা, পৃ. ৩৪

১৭. তানভীর মোকাম্মেল, এই গবেষককে দেওয়া লিখিত সাক্ষাৎকার, তারিখ– ২৭ এপ্রিল ২০১৮

১৮. নির্মলেন্দু গুণ, কবিতা- *হুলিয়া*, গ্রন্থ- *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭, কবি প্রকাশনী, ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট, ২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা, পৃ. ৯

১৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ভূমিকা: মেঘনাদবধ কাব্য; সাহিত্যম্, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. i

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. iv

২১. *জন অরণ্য* (চলচ্চিত্র), চিত্রনাট্য ও পরিচালনা- সত্যজিৎ রায়, প্রযোজনা- ইন্দাস ফিল্মস (সুবীর গুহ), ভারত, মুক্তি- ১৯৭৬

২২. নির্মলেন্দু গুণ, কবিতা- *হুলিয়া*, গ্রন্থ- *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭, কবি প্রকাশনী, ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট, ২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা, পৃ. ৯

২৩. পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা- ৯।

২৪. *Where Is the Friend's Home* (চলচ্চিত্র), পরিচালনা- Abbas Kiarostami, প্রযোজনা- Ali Reza Zarrin, ইরান, মুক্তি- ১৯৮৭

২৫. *The Wind Will Carry Us* (চলচ্চিত্র), পরিচালনা ও প্রযোজনা- Abbas Kiarostami, ইরান, মুক্তি- ১৯৯৯

২৬. নির্মলেন্দু গুণ, কবিতা- *হুলিয়া*, গ্রন্থ- *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭, কবি প্রকাশনী, ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট, ২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা, পৃ. ৯

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯, ১০

২৮. শঙ্খ ঘোষ, 'ফিল্মের মধ্যে কবিতা', *শতবর্ষে চলচ্চিত্র- প্রথম খণ্ড*, প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১১, নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন,

কলকাতা, পৃ. ১৯২

২৯. নির্মলেন্দু গুণ, কবিতা- *হুলিয়া*, গ্রন্থ- *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭, কবি প্রকাশনী, ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট, ২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা, পৃ. ১০

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৩১. *কাঞ্চনজঙ্ঘা* (চলচিত্র), চিত্রনাট্য পরিচালনা ও প্রযোজনা- সত্যজিৎ রায়, ভারত, মুক্তি- ১৯৬২

৩২. *পথের পাঁচালী* (চলচিত্র), চিত্রনাট্য ও পরিচালনা- সত্যজিৎ রায়, প্রযোজনা- পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত, মুক্তি- ১৯৫৫

৩৩. ঋত্বিক ঘটক, উদ্ধৃতঃ *ঋত্বিককুমার ঘটক- নিজের পায়ে নিজের পথে* (নতুন মুদ্রণ, ২০১৬), মনফকিরা, ২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১, নবোদিত, মুকুন্দপুর, কলকাতা, পৃ. ৫০

৩৪. নির্মলেন্দু গুণ, কবিতা- *হুলিয়া*, গ্রন্থ- *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭, কবি প্রকাশনী, ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট, ২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা, পৃ. ১০

৩৫. *অযান্ত্রিক* (চলচ্চিত্র), পরিচালনা- ঋত্বিক ঘটক, প্রযোজনা- এল. বি. ফিল্মস ইন্টারন্যাশানাল, ভারত, মুক্তি- ১৯৫৮

৩৬. নির্মলেন্দু গুণ, কবিতা- *হুলিয়া*, গ্রন্থ- *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭, কবি প্রকাশনী, ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট, ২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা, পৃ. ১০, ১১

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৪০. নির্মলেন্দু গুণ, গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (পাঠক সমাবেশে এই গবেষক কর্তৃক ভিডিও ক্যামেরায় ধারণকৃত), শাহবাগ, ঢাকা, তারিখ- ১৯ এপ্রিল ২০১৮

৪১. তানভীর মোকাম্মেল, এই গবেষককে দেওয়া লিখিত সাক্ষাৎকার, তারিখ- ২৭ এপ্রিল ২০১৮

৪২. নির্মলেন্দু গুণ, কবিতা- *হুলিয়া*, গ্রন্থ- *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭, কবি প্রকাশনী, ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট, ২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা, পৃ. ১১

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৪৫. *সাতকাহন*, রিয়া দাশগুপ্তা সম্পাদিত, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অক্টোবর-২০১২। Link: http://satkahan.weebly.com/245324762495-2451-24532476249524682494248O-24552482250924741.html

৪৬. নির্মলেন্দু গুণ, গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (পাঠক সমাবেশে এই গবেষক কর্তৃক ভিডিও ক্যামেরায় ধারণকৃত), শাহবাগ, ঢাকা, তারিখ- ১৯ এপ্রিল ২০১৮

৪৭. *The Birth of a Nation*, পরিচালক- D. W. Griffith, প্রযোজনা- D. W. Griffith & Harry Aitken, আমেরিকা, মুক্তি- ১৯১৫

৪৮. *Battleship Potemkin*, পরিচালক- Sergei Eisenstein, প্রযোজনা- Jacob Bliokh, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মুক্তি- ১৯২৫

৪৯. নাদির জুনাইদ, *দশটি রাজনৈতিক চলচ্চিত্র- বক্তব্য ও নির্মাণশৈলী*, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৭, জনান্তিক, ৫০ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, পৃ. ৯৭

৫০. শঙ্খ ঘোষ, 'ফিল্মের মধ্যে কবিতা', *শতবর্ষে চলচ্চিত্র- প্রথম খন্ড*, প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১১, নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, পৃ. ১৮৮

৫১. তানভীর মোকাম্মেল, স্বাক্ষাৎকার: রুদ্র হক, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, বিভাগ- গ্লিটজ, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭,
Link: https://bangla.bdnews24.com/glitz/article1435592.bdnews

৫২. নির্মলেন্দু গুণ, কবিতা- *হুলিয়া*, গ্রন্থ- *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭, কবি প্রকাশনী, ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট, ২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা, পৃ. ১১

৫৩. সত্যজিৎ রায়, *বিষয় চলচ্চিত্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, পৃ. ৬০

৫৪. নির্মলেন্দু গুণ, গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (পাঠক সমাবেশে এই গবেষক কর্তৃক ভিডিও ক্যামেরায় ধারণকৃত), শাহবাগ, ঢাকা, তারিখ- ১৯ এপ্রিল ২০১৮

৫৫. *Mother* (চলচ্চিত্র), পরিচালনা- Vsevolod Pudovkin, মূল কাহিনি- ম্যাক্সিম গোরকির 'মা' উপন্যাস, প্রযোজনা- Mezhrabpomfilm, মুক্তি- ১৯২৬

৫৬. নির্মলেন্দু গুণ, কবিতা- *হুলিয়া*, গ্রন্থ- *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭, কবি প্রকাশনী, ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট, ২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা, পৃ. ১১

উপসংহার

উপসংহার

ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের ফলে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যে উন্নয়নের দামামা বেজেছিল তার পিছনে আঠার ও উনিশ শতকের অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রে। এর ধারাবাহিকতায় উনিশ শতকের শেষাংশের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার—চলচ্চিত্র। যৌগিক এই মাধ্যমটি সৃষ্টির শুরু থেকেই মানব জীবনে এমনভাবে মিশে গেছে যে বর্তমান সময়ে প্রাত্যাহিক জীবন-যাত্রায় তা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। কী অবসর-বিনোদনের উপায়, কী শিক্ষা-সচেতনতা ও যোগাযোগের মাধ্যম, কী ব্যবসা ও ব্যবসা সহায়ক উপকরণ—সর্বক্ষেত্রেই চলচ্চিত্র আজ দুর্দণ্ড প্রতাপে এগিয়ে চলেছে। শিল্প মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের মতো এতো বহুমাত্রিক উপযোগিতা আর কোন মাধ্যম আজ পর্যন্ত দেখাতে সক্ষম হয়নি। চলচ্চিত্রের এই সর্বজয়ী বিশিষ্টতা অর্জনের প্রধান কারণ এর সহজবোধ্যতা। মানুষের মনের না বলা কথামালা চোখের সামনে জীবন্ত প্রদর্শন করতে পারার ক্ষমতার কারণে ভার্চুয়াল সমাজের জীবন-বীক্ষণ ও জীবন-চিত্রণ আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই চলচ্চিত্র এখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন ও রূপান্তরের নিয়ামকগুলোর মধ্য থেকে চালকের আসনের দখল নিতে শুরু করেছে।

শিল্প-বিপ্লবের সংক্রাম হেতু মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন—পুঁজিবাদের আগ্রাসন, শোষন ও শাসনে ক্লীষ্ট সাধারণ মানুষের কর্মক্লান্তি এবং বিচ্ছিন্নতাবোধের নৈরাশ্যলগ্নে চলচ্চিত্রের যাত্রা আলোর ঝলকানি হয়ে প্রশান্তির বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। শুরু থেকেই সকল শ্রেণীর মানুষ নির্মল আনন্দের আধার হিসেবে চলচ্চিত্রের উপর আস্থাশীল হয়ে ওঠে। ক্রমশ এর প্রতি মানুষের আত্মযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। চলচ্চিত্রের সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পিছনে সাহিত্যের অবদান সবচেয়ে বেশি। সাহিত্য এতোদিন মানব-জীবনের প্রতিচিত্র মলাটবন্দি করে নির্দিষ্ট পাঠকের কাছে নৈবেদ্য-স্বরূপ প্রকাশ করলেও সর্বসাধারণ এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারত না। কিন্তু চলচ্চিত্র সাহিত্যের গল্পগুলো দিয়ে এমন এক ভার্চুয়াল সমাজ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে যেখানে সকলের অবাধ যাতায়াতের পথ সুগম হয়েছে। এই পথ ধরে চলচ্চিত্র আজ অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র সত্ত্বার আসন পাকাপোক্ত করেছে। তবে সাহিত্যের গল্প বলার রীতি-পদ্ধতির সঙ্গে চলচ্চিত্রের যে ভাতৃত্ববোধ তৈরি হয়েছে তা আজও সমভাবে বিদ্যমান। চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যা-ই নির্মিত হোক না কেন—এর মধ্যে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে কোন না কোন গল্প। একারণে সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক আত্মিক। যদিও উভয় মাধ্যমেরই রয়েছে আলাদা রীতি-পদ্ধতি। উভয়েই স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের উন্মেষ ঘটেছিল সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। স্থানীয়ভাবে নির্মিত প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত পূর্ণদৈঘ্য চলচ্চিত্রটিও ছিল সাহিত্যনির্ভর। স্বাভাবিকভাবে এর বিকাশ যাত্রায় সাহিত্যের সংশ্লেষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পরেছিল। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত নির্মিত বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের মধ্যে প্রায় ১৩ শতাংশ চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে সাহিত্য থেকে। বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই হার আরও অনেক বেশি। বর্তমান সময়ে এর উপযোগিতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কারণ সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্রগুলোর ব্যবসায়িক সাফল্যের হার বেশি। তাছাড়া সাহিত্যের চলচ্চিত্রোপোযোগী কাহিনি ও এর সিনেমাটিক উপাদান সমৃদ্ধ-চিত্রনাট্য তৈরিতে

বিশেষভাবে সহযোগিতা করে থাকে। সাহিত্য কিংবা সাহিত্যিকের জনপ্রিয়তাও চলচ্চিত্রের প্রচারণায় সহায়ক হিসেবে কাজ করে থাকে যা বাজার কাটতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ ভূখণ্ডেও চলচ্চিত্রকাররা বারবার ধর্ণা দিয়েছেন সাহিত্যের দরবারে সফল চলচ্চিত্র নির্মানের প্রত্যাশায়। এক্ষেত্রে তাঁরা বেছে নিয়েছেন জনপ্রিয় ধারার সাহিত্যগুলোকে। প্রচলিত কাহিনি, মিথ, পুরাণ, লোকসাহিত্যও চলচ্চিত্রকারদের আকৃষ্ট করেছে সমসাময়িক গ্রাহ্যতার কারণে। এদেশের লোকসমাজে বহুল প্রচলিত এসব কাহিনির চলচ্চিত্ররূপ সর্বস্তরের দর্শকের কাছে নন্দিত হয়েছিল—একদিকে কাহিনির গুনে, অন্যদিকে নির্মাণশৈলী ও চলচ্চিত্রকারদের মুন্সিয়ানায়। লোকসমাজে বিশেষভাবে প্রচারিত গল্প, উপন্যাস, নাটক এমনকি কবিতা থেকে চলচ্চিত্র নির্মানে আগ্রহ দেখিয়েছেন এদেশের চলচ্চিত্রকাররা। সাহিত্যের এসব ভাণ্ডার হতে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে অনেক সময় মূল সাহিত্যকে সরাসরি অনুকরণ-অনুসরণ করেছেন চলচ্চিত্রকাররা। কখনও সাহিত্যকে ছাপিয়ে গিয়ে অনন্য আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে, কখনওবা সাহিত্যের মূল সুরকে ব্যহত করে সমালোচনার জন্মদানে পারঙ্গমতা দেখিয়েছে চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রের কোন প্রকার দায় সাহিত্যকে আজ অবধি নিতে না হলেও চলচ্চিত্রকে বারবার বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে সাহিত্যের মানহানির অপবাদে। যদিও অনেক চলচ্চিত্রকাররা এসবের ধার ধারেন না, কেননা তাঁরা মনে করেন চলচ্চিত্র কারো মুখাপেক্ষী নয়।

চলচ্চিত্রের ইতিহাস, ক্রমবিকাশ ও সাহিত্যের সঙ্গে এর সম্পর্কের চুলচেরা বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়—চলচ্চিত্র আজ আর কোনভাবেই সাহিত্যের উপর নির্ভরশীল নয়। শিল্পের সকল মাধ্যমের মধ্যে বর্তমান সময়ে এটি সবচেয়ে প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় মাধ্যম। তবে চলচ্চিত্রে কাহিনির শিল্পমান বৃদ্ধি, প্রচারণার বাড়তি সুবিধা ও বিনিয়োগকৃত টাকা লাভসহ ফেরত পাবার আশায় জনপ্রিয় সাহিত্য কিংবা জনপ্রিয় লেখকের সাহিত্যকর্ম চিত্রায়ণের প্রতি এখনো চলচ্চিত্রকারদের প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। এটা নির্ভরশীলতা নয়। বরং নিজের লাভের জন্য সাহিত্যের উপাদান নিংড়ে নিয়ে চলচ্চিত্র আগ্রাসীর ভূমিকা পালন করছে। অপরদিকে যাঁরা তাদের সাহিত্যকর্মকে চলচ্চিত্র নির্মাণের বাসনায় রচনা করে চলেছেন—প্রকারান্তরে তাঁরা নিজের অজান্তেই সাহিত্যকে চলচ্চিত্রের কাছে বিকিয়ে দিচ্ছেন। সৃষ্টির শুরুতে নিজের পরিপুষ্টি লাভের জন্য চলচ্চিত্র সাহিত্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করলেও সাহিত্যের ঋণ শোধ করার মতো সুযোগ চলচ্চিত্র আজ অবধি পায়নি। কেননা চলচ্চিত্র কিংবা চিত্রনাট্যকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনার প্রয়োজন এখনো দেখা যায়নি। সাহিত্যের ভিত্তিমূল এতো গভীরে প্রোথিত যে অন্য মাধ্যমকে অনুসরণ-অনুকরণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না।

পরিশিষ্ট

চলচ্চিত্রপঞ্জি

ক. গবেষণায় ব্যবহৃত মূল চলচ্চিত্র (মুক্তির ক্রমানুসারে)

বেহুলা : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা– জহির রায়হান, প্রযোজনা– ইফতেখারুল আলম, মুক্তি– ১৯৬৬।

নবাব সিরাজদ্দৌলা : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা– খান আতাউর রহমান, প্রযোজনা– মাহবুবা রহমান, বাংলাদেশ, মুক্তি– ১৯৬৭।

তিতাস একটি নদীর নাম : পরিচালক– ঋত্বিক কুমার ঘটক, প্রযোজনা– পূর্বপ্রাণ কথাচিত্র, বাংলাদেশ, মুক্তি– ১৯৭৩।

সারেং বৌ : পরিচালনা– আবদুল্লাহ আল-মামুন, প্রযোজনা– এ বি এম প্রোডাকসন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থায় নির্মিত, ঢাকা, মুক্তি– ১৯৭৮।

সূর্য দীঘল বাড়ী : পরিচালনা– মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী, প্রযোজনা– জনচিত্রায়ণ, পরিবেশনা– শাওন সাগর লিমিটেড, ঢাকা, মুক্তি– ১৯৭৯।

রামের সুমতি : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা– শহিদুল আমিন, প্রযোজনা ও পরিবেশনা: জাভেদ ফিল্মস, বাংলাদেশ, মুক্তি– ১৯৮৫।

হুলিয়া : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা– তানভীর মোকাম্মেল, প্রযোজনা– সাঈদা মোকাম্মেল, মুক্তি– ১৯৮৫।

খ. সাহিত্যনির্ভর বাংলাদেশের অন্যান্য চলচ্চিত্র (১৯৫৬-১৯৮৫, মুক্তির ক্রমানুসারে)

সাল	সিনেমার নাম	পরিচালকের নাম
১৯৫৬	*মুখ ও মুখোশ*	আবদুল জব্বার খান
১৯৫৯	*জাগোহুয়া সাবেরা (উর্দু)*	আখতার জং কারদার
১৯৫৯	*মাটির পাহাড়*	মহীউদ্দীন
১৯৬২	*সূর্যস্নান*	সালাউদ্দিন
১৯৬৩	*ধারাপাত*	সালাউদ্দিন
১৯৬৪	*তানহা (উর্দু)*	বেবী ইসলাম
১৯৬৪	*সুতরাং*	সুভাস দত্ত
১৯৬৫	*নদী ও নারী*	সাদেক খান
১৯৬৫	*রূপবান*	সালাউদ্দিন
১৯৬৫	*রহিম বাদশা ও রূপবান*	সফদার আলী ভুঁইয়া
১৯৬৬	*ফির মিলেঙ্গে হাম দোনো (উর্দু)*	সৈয়দ শামসুল হক
১৯৬৬	*গুনাই বিবি*	সৈয়দ আলাউল

১৯৬৬	*গুনাই*	বজলুর রহমান
১৯৬৬	*১৩ নং ফেকু উস্তাগার লেন*	বশীর হোসেন
১৯৬৬	*বেগানা*	এস এম পারভেজ
১৯৬৬	*কাগজের নৌকা*	সুভাস দত্ত
১৯৬৬	*মহুয়া*	আলি মনসুর
১৯৬৬	*আপন দুলাল*	নজরুল ইসলাম
১৯৬৬	*জরিনা সুন্দরী*	ইবনে মিজান
১৯৬৭	*আয়না ও অবশিষ্ট*	সুভাস দত্ত
১৯৬৭	*ময়ুরপংখী*	হাবীব মেহেদী
১৯৬৭	*আনোয়ারা*	জহির রায়হান
১৯৬৭	*কাঞ্চনমালা*	সফদার আলী ভুঁইয়া
১৯৬৭	*সাইফুল মূলক বদিউজ্জামাল*	আজিজুর রহমান
১৯৬৭	*আলীবাবা*	নজরুল ইসলাম
১৯৬৭	*আগুন নিয়ে খেলা*	আমজাদ হোসেন ও নুরুল হক বাচ্চু
১৯৬৭	*নয়নতারা*	কাজী হায়াৎ
১৯৬৮	*মধুমালা*	আজিজুর রহমান
১৯৬৮	*সাতভাই চম্পা*	দিলীপ সোম
১৯৬৮	*অরুণ বরুণ কিরণ মালা*	খান আতাউর রহমান
১৯৬৯	*গাজী কালু চম্পাবতী*	মহীউদ্দিন
১৯৬৯	*আলোমতি*	সালাউদ্দিন
১৯৬৯	*বেদের মেয়ে*	নূরুল হক বাচ্চু
১৯৬৯	*অবাঞ্ছিত*	কামাল আহমেদ
১৯৬৯	*মলুয়া*	ফাল্গুনী গোষ্ঠী
১৯৭০	*আমির সওদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরী*	ইবনে মিজান
১৯৭১	*গাঁয়ের বধূ*	আলি কাওসার
১৯৭১	*সুখ-দুঃখ*	খান আতাউর রহমান
১৯৭২	*কমল রানীর দীঘি*	ইবনে মিজান
১৯৭৩	*বলাকা মন*	সুভাস দত্ত
১৯৭৩	*ঝড়ের পাখি*	সি বি জামান
১৯৭৩	*পলাতক*	রূপকার
১৯৭৪	*মাসুদ রানা*	মাসুদ পারভেজ
১৯৭৫	*মালকাবানু*	ফয়েজ চৌধুরী
১৯৭৬	*কাজলরেখা*	সফদার আলী ভুঁইয়া
১৯৭৬	*নয়নমনি*	আমজাদ হোসেন
১৯৭৬	*পালংক*	রাজেন তরফদার
১৯৭৭	*কুয়াশা*	আজিজুর রহমান
১৯৭৭	*বসুন্ধরা*	সুভাস দত্ত
১৯৭৮	*গোলাপী এখন ট্রেনে*	আমজাদ হোসেন
১৯৭৮	*ডুমুরের ফুল*	সুভাস দত্ত
১৯৭৮	*সোহাগ*	সাইফুল আজম কায়েস
১৯৭৯	*নদের চাঁদ*	শেখ নজরুল ইসলাম
১৯৭৯	*নাগর দোলা*	বেলাল আহমেদ

১৯৮০	*স্মৃতি তুমি বেদনা*	দিলীপ সোম
১৯৮০	*এখনই সময়*	আবদুল্লাহ আল মামুন
১৯৮০	*এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী*	বাদল রহমান
১৯৮০	*গাংচিল*	রুহুল আমীন
১৯৮০	*কসাই*	আমজাদ হোসেন
১৯৮১	*মৌ-চোর*	রাজ্জাক
১৯৮১	*ভালো মানুষ*	চাষী নজরুল ইসলাম
১৯৮১	*মহানগর*	আজিজুর রহমান
১৯৮১	*স্বামী*	নূর-উল আলম
১৯৮২	*দেবদাস*	চাষী নজরুল ইসলাম
১৯৮৩	*মেঘ বিজলী বাদল*	কাজী নূরুল হক
১৯৮৩	*লালুভুলু*	কামাল আহমেদ
১৯৮৩	*প্রাণসজনী*	জহিরুল হক
১৯৮৩	*লাইলী মজনু*	ইবনে মিজান
১৯৮৪	*রাজবাড়ী*	কাজী হায়াৎ
১৯৮৪	*চন্দ্রনাথ*	চাষী নজরুল ইসলাম
১৯৮৫	*রাধাকৃষ্ণ*	মতিন রহমান
১৯৮৫	*রাইবিনোদিনী*	মুহম্মদ হান্নান
১৯৮৫	*সৎ ভাই*	রাজ্জাক

গ. গবেষণায় সহায়ক অন্যান্য বাংলাদেশি চলচ্চিত্র

মুখ ও মুখোশ : রচনা, পরিচালনা ও প্রযোজনা– আবদুল জব্বার খান, ইকবাল ফিল্মস্, পূর্ব পাকিস্তান, মুক্তি ১৯৫৬।

নদী ও নারী : রচনা- হুমায়ুন কবির, পরিচালনা ও প্রযোজনা– সাদেক খান, পূর্ব পাকিস্তান, মুক্তি ১৯৬৫।

রূপবান : রচনা, পরিচালনা ও প্রযোজনা– সালাউদ্দিন, পরিবেশনা- পপুলার ফিল্মস এন্ড থিয়েটার, পূর্ব পাকিস্তান, মুক্তি ১৯৬৫।

মহুয়া : পরিচালক– আলি মনসুর, লোককাহিনি অবলম্বনে নির্মিত, পূর্ব পাকিস্তান, মুক্তি ১৯৬৬।

কাগজের নৌকা : কাহিনি- রোমেনা আফাজ, পরিচালক– সুভাস দত্ত, পূর্ব পাকিস্তান, মুক্তি ১৯৬৬।

আনোয়ারা : পরিচালক– জহির রায়হান, প্রযোজক– ইফতেখারুল আলম, পূর্ব পাকিস্তান, মুক্তি ১৯৬৭।

বেদের মেয়ে : পরিচালক– নূরুল হক বাচ্চু, পূর্ব পাকিস্তান, মুক্তি ১৯৬৯।

মাসুদ রানা : পরিচালক– মাসুদ পারভেজ, প্রযোজক– মাসুদ পারভেজ, ঢাকা, মুক্তি ১৯৭৪।

নয়নমনি : পরিচালক– আমজাদ হোসেন, প্রযোজক– আলমগীর পিকচার্স লি:, ঢাকা, মুক্তি ১৯৭৬।

বসুন্ধরা : পরিচালক– সুভাস দত্ত, প্রযোজক– সুভাস দত্ত, ঢাকা, মুক্তি ১৯৭৭।

গোলাপী এখন ট্রেনে : পরিচালক ও প্রযোজক– আমজাদ হোসেন, ঢাকা, মুক্তি– ১৯৭৮।

ডুমুরের ফুল : পরিচালক– সুভাস দত্ত, প্রযোজক– সুভাস দত্ত, ঢাকা, মুক্তি ১৯৭৮।

নবাব সিরাজদ্দৌলা : নবাব সিরাজদ্দৌলা– পুনঃনির্মাণ, পরিচালক– প্রদীপ দে, প্রযোজনা ও পরিবেশনা– জয় ফিল্মস, ঢাকা, মুক্তি– ১৯৮৯।

এখনই সময় : পরিচালক– আবদুল্লাহ আল মামুন, প্রযোজক– আফজালুর রহমান, ঢাকা, মুক্তি ১৯৮০।

এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী : পরিচালক– বাদল রহমান, প্রযোজক– গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, মুক্তি ১৯৮০।

দেবদাস : পরিচালক– চাষী নজরুল ইসলাম, প্রযোজক– একেএম মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা, মুক্তি ১৯৮২।

চন্দ্রনাথ : পরিচালক– চাষী নজরুল ইসলাম, প্রযোজক– বেগম বদরুন নাহার খান, ঢাকা, মুক্তি ১৯৮৪।

বেদের মেয়ে জোসনা : রচনা ও পরিচালনা– তোজাম্মেল হক বকুল, প্রযোজনা– আনন্দমেলা চলচ্চিত্র, ঢাকা, মুক্তি ১৯৮৯।

পদ্মানদীর মাঝি : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা– গৌতম ঘোষ, প্রযোজনা– বাংলাদেশ ও ভারত, মুক্তি ১৯৯৩।

ঘ. গবেষণায় সহায়ক বিদেশি চলচ্চিত্র

অযান্ত্রিক : পরিচালক– ঋত্বিক কুমার ঘটক, প্রযোজনা– এল. বি. ফিল্মস্ ইন্টারন্যাশনাল, ভারত, মুক্তি– ১৯৫৮।

কাঞ্চনজঙ্ঘা : চিত্রনাট্য পরিচালনা ও প্রযোজনা– সত্যজিৎ রায়, ভারত, মুক্তি– ১৯৬২।

কাবুলিওয়ালা : পরিচালক– তপন সিংহ, প্রযোজনা– চারুচিত্র, ভারত, মুক্তি– ১৯৫৬।

জন অরণ্য : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা– সত্যজিৎ রায়, প্রযোজনা– ইন্দাস ফিল্মস (সুবীর গুহ), ভারত, মুক্তি– ১৯৭৬।

তিন কন্যা : পরিচালনা ও প্রযোজনা– সত্যজিৎ রায়, পরিবেশক ছায়াবাণী প্রাইভেট লি:, কলকাতা, মুক্তি– ১৯৬১।

পথের পাঁচালী : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা– সত্যজিৎ রায়, প্রযোজনা– পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত, মুক্তি– ১৯৫৫।

মা (Mother) : পরিচালনা– Vsevolod Pudovkin, নির্মাণ–

		Mezhrabpomfilm, মূল কাহিনি– ম্যাক্সিম গোরকির 'মা' উপন্যাস, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মুক্তি– ১৯২৬।
যুক্তি তক্কো আর গপ্পো	:	পরিচালনা– ঋত্বিক ঘটক, প্রযোজনা– রিতা প্রোডাকসন্স, ভারত। মুক্তি– ১৯৭৭।
বেহুলা লখিন্দর	:	পরিচালনা– অমল দত্ত, প্রযোজনা– দীনেশ চন্দ্র দে, দীনেশ চিত্রম, কলকাতা, মুক্তি– ১৯৭৭।
সতী	:	মূল গল্প– কমল কুমার মজুমদার, পরিচালনা– অপর্ণা সেন, চিত্রনাট্য– অপর্ণা সেন ও অরুন ব্যানার্জি, প্রযোজনা– এনএফডিসি, কলকাতা, মুক্তি ১৯৮৯।
সতী বেহুলা	:	পরিচালক– মনোজ কুমার, প্রযোজক– নির্মলা সিংহ, ভারত, মুক্তি ২০১০।
Battleship Potemkin	:	পরিচালক– Sergei Eisenstein, প্রযোজনা– Jacob Bliokh, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মুক্তি– ১৯২৫।
Hamlet	:	পরিচালনা– Grigori Kozintsev, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মুক্তি– ১৯৬৪।
Mangal Pandey: The Rising	:	Directed by Ketan Mehta, screenplay by Farrukh Dhondy, India, Release- 2005.
Pray for Japan	:	A Japanese documentary film, directed and produced Stuart J. Levy, Release- 2012.
Redes	:	পরিচালনা– Fred Zinnemann and Emilio Gómez Muriel, প্রযোজনা– Carlos Chávez, ম্যাক্সিকো, মুক্তি– ১৯৩৬।
The Birth of a Nation	:	পরিচালক– D. W. Griffith, প্রযোজনা– D. W. Griffith & Harry Aitken, আমেরিকা, মুক্তি– ১৯১৫।
The Impossible	:	Directed by J. A. Bayona, Produced by Álvaro Augustin, Belen Atienza and Enrique López Lavigne, Telecinco Cinema, Spain, Release- 2012.
The Land of Hope	:	Director and Screenwriter- Sion Sono, Producers: Mizue Kunizane, Yuji Sadai, Yuko Shiomaki, Japan, Release- 2012.
The Pilgrim	:	চিত্রনাট্য ও পরিচালনা– চার্লি চ্যাপলিন, প্রযোজনা– চার্লি চ্যাপলিন প্রোডাকশন, আমেরিকা, মুক্তি- ১৯২৩।
The Tree of Life	:	Directed and Written by Terrence Malick, River road entertainment and Plan B entertainment, United States, Release- 2011.
The Wind Will Carry Us	:	পরিচালনা ও প্রযোজনা- Abbas Kiarostami, ইরান। মুক্তি- ১৯৯৯
Tidal Wave	:	Directed by- Yoon Je-kyoon, Produced by- Yoon Je-kyoon, Lee Sang-yong and Gil Yeong-min, CJ Entertainment, South Korea, Release- 2009.
Where Is the Friend's Home	:	পরিচালনা– Abbas Kiarostami, প্রযোজনা– Ali Reza Zarrin, ইরান, মুক্তি– ১৯৮৭।
Xala	:	পরিচালক– Ousmane Sembène, প্রযোজক– Filmi Domireve SNC, সেনেগাল, মুক্তি– ১৯৭৫।

ঙ. গবেষণায় সহায়ক ভিডিওচিত্র

মানিকগঞ্জের শ্রেষ্ঠ যাত্রাপালা	:	DVD Version (প্রথম পর্ব), পরিচালনা– আজিজুল ইসলাম শুক্কু, প্রযোজনা ও পরিবেশনা– স্টারগোল্ড, ৩০ পাটুয়াটুলী, সালাম ম্যানশন, ঢাকা।

গ্রন্থপঞ্জি

ক. মূলগ্রন্থ

চিত্রনাট্য, *তিতাস একটি নদীর নাম*	:	পার্থিব রাশেদ ও মনিস রফিক সম্পাদিত, রোদেলা প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), ১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা, ২০১৩।
চিত্রনাট্য, *সূর্য দীঘল বাড়ী*	:	'সূর্য দীঘল বাড়ী' বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত, চলচ্চিত্রপত্র সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮১, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১০ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
তিতাস একটি নদীর নাম	:	অদ্বৈত মল্লবর্মন, দ্বিতীয় প্রকাশ–আশ্বিন ১৩৬৫, পুথিঘর, ২২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।
তিতাস একটি নদীর নাম	:	অদ্বৈত মল্লবর্মণ, আজকাল প্রকাশনী, পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১১, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।
পদ্মাপুরাণ	:	নারায়ণ দেব, শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৪৭, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ৪৮ হাজরা রোড, কলিকাতা।
পদ্মাপুরাণ	:	বিজয় গুপ্ত, রাজেন্দ্র কুমার গুপ্ত সঙ্কলিত, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, ক্যানিং স্ট্রীট, কলকাতা।
প্রেমাংশুর রক্ত চাই	:	নির্মলেন্দু গুণের কাব্যগ্রন্থ, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় মুদ্রণ- ২০১৭, কবি প্রকাশনী, ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট, ২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা।
বাংলা দেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড (মধ্যযুগ)	:	রমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত, শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস প্রকাশিত, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ।
মনসামঙ্গল	:	কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, সম্পাদনা– বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, দশম মুদ্রণ ২০১৫, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি।
সারেং বৌ	:	শহীদুল্লা কায়সার, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ৪৬ বাংলাবাজার ঢাকা, নবম মুদ্রণ ১৯৮৮।
সারেং বৌ	:	শহীদুল্লা কায়সার, সারেং বৌ, জোনাকী প্রকাশনী, ৩৯/৪ নর্থ ব্রুক হল রোড, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০০।
সিরাজ-উ-দ্দৌলা	:	সিকানদার আবু জাফর, স্বদেশ প্রকাশ, ৩৪/২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
সিরাজ-উ-দ্দৌলা	:	সিকান্দার আবু জাফর রচিত নাটক, সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত, মাটিগন্ধা, প্রাপ্তিস্থান– বিভাস, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
সিরাজদ্দৌলা :	:	শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত, পুষ্পেন্দুশেখর গিরি সম্পাদিত, দে'জ

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯।

সিরাজদ্দৌলা, বাংলার ইতিহাস : ১ : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত, দিব্য প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১২, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা।

সূর্য-দীঘল বাড়ী : আবু ইসহাক রচিত উপন্যাস, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, বাংলাবাজার-ঢাকা ; একবিংশ সংস্করণ (এপ্রিল-২০১০)।

খ. সহায়ক-গ্রন্থ

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল*, রত্নাবলী, ১১এ ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

অচিন্ত্য বিশ্বাস : *গৌড়মেখমালা*, রাজসাহী বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি, চেরি প্রেস লিমিটেড, ৮৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

অজয় সরকার (সম্পাদক) *চলচ্চিত্র সমালোচনা ১৫*, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

অতনু পাল (সম্পাদক) : *ঋত্বিক ঘটক*, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা, ১৯৮৮।

অন্‌জন্‌ দাশগুপ্ত : *অভিনয় শিল্প– সংলাপ ও কণ্ঠস্বর*, প্রকাশক– গোপা দাশগুপ্তা, ৩৭/এ মহেন্দ্র সরকার স্ট্রিট, কলকাতা।

অনুপম হায়াৎ : *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, তেজগাঁও, ঢাকা।

: *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের রূপরেখা*, পলল প্রকাশনী, ৪৭ আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।

: *চলচ্চিত্রবিদ্যা*, চলচ্চিত্র অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা।

অবনীন্দ্রনাথ বেরা : *চলচ্চিত্র সমালোচনা ৫০*, সুজন প্রকাশনী, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

অমিয় রায় চৌধুরী : *শতবর্ষের সিনেমা ও চার্লি চ্যাপলিন*, দীপায়ন, প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৪০৪, কলকাতা।

অরুণ সান্যাল (সম্পাদক) : *প্রসঙ্গ ঃ বাংলা উপন্যাস*, ওয়েস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ৪ কলেজ রোড, কলিকাতা-৯।

অশোক মিত্র : *পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫।

অসীম সোম : *চলচ্চিত্র-তত্ত্বের মূলসূত্র : চলচ্চিত্র কথা*, রূপরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯।

অসীম সোম (সম্পাদক) : *চলচ্চিত্র কথা*, রূপরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ- জুন ১৯৭৫।

আলম কোরায়েশী : *চলচ্চিত্রের নানা কথা : এফডিসিতে ৩০ বছর*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০।

আহমদ শরীফ : *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম

প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৭১, বর্ণমিছিল, ৬৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা।

আহমাদ মাযহার : *বাঙালির সিনেমা*, অনন্যা, ৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা। প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

আহমেদ আমিনুল ইসলাম : *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : আর্থসামাজিক পটভূমি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮।

আবদুল্লাহ আল-মামুন : *অভিনয়*, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০।

আরজুমন্দ আরা বানু : *শহীদুল্লা কায়সার ও জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : বিষয় প্রকরণ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ৬ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা।

আশুতোষ ভট্টাচার্য : *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, দীপক ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বাদশ সংস্করণ– ২০০০, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটারজী স্ট্রীট, কলকাতা।

ইরাবান বসুরায় : *সিনেমার ঋত্বিক ঋত্বিকের সিনেমা*, যুক্ত, ৪৪ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণী, তেজগাঁও, ঢাকা।

উদয়শঙ্কও বর্মা ও অধ্যাপক দেবাশিস মল্লিক (সম্পাদক) : *বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়*, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি, বাংলা বিভাগ, চন্দননগর কলেজ, জানুয়ারি ২০১১।

উপমা দাশগুপ্ত (সম্পাদক) : *অভিনয় কুমার দাশ : স্মরণে চিরঞ্জীব*, বড়াল প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।

ঐন্দ্রিলা আহমেদ : *একজন মহানায়কের কথা*, বইপত্র প্রকাশন, ১১/১ বাংলাবাজার, ইসলামী টাওয়ার, ঢাকা ১১০০।

ঋত্বিককুমার ঘটক : *নিজের পায়ে নিজের পথে*, সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা, ২ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ৭০০০১৩।

কাজী তোবারক হোসেন ও মুহাম্মদ হাসান ইমাম (সম্পাদক) : *আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের চিন্তা ও তত্ত্ব*, তৃতীয় প্রকাশ, জুন ১৯৯৬, সামাজিক বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র, দারুল আমান ৬৮ পুরানা পল্টন লাইন, শান্তিনগর, ঢাকা।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাঙ্গলার ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী) : নবাবী আমল*, প্রথম দে'জ সংস্করণ : এপ্রিল ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩।

কোরআন শরীফ : দ্রষ্টব্য, সূরা আত-তাওবাহ।

গাস্তঁ রোবের্জ : *সিনেমার কথা*, বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৮৪।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ : *সিরাজদ্দৌলা*, *পুস্তক বিপনি*, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯।

গোপালচন্দ্র রায় : *শরৎচন্দ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

: *শরৎচন্দ্রের বৈঠকি গল্প*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক) : *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

জগমোহন মুখোপাধ্যায় : *গবেষণা-পত্র অনুসন্ধান ও রচনা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট

লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

জ্যোতির্ময় দত্ত (সম্পাদক) : *নিজের আয়নায় সত্যজিৎ : দীর্ঘতম ও শেষ সাক্ষাৎকার*, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারী ১৯৯৩, বদ্বীপ, ৩০/৪৩ নয়াপট্টি রোড, কলিকাতা-৭০০০৫৫।

তপন দাস (অনুবাদক) : *সের্গেই আইজেনস্টাইনের অ্যান অ্যামেরিকান ট্র্যাজেডি*, বাক্‌শিল্প, ১৭-সি তেলিপাড়া লেন, কলকাতা ৭০০০৩১।

তপন গুহঠাকুরতা : *ভিডিও ক্যামেরা ও ভিডিওগ্রাফি*, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৪।

তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত : *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, আপার সারকুলার রোড, কলকাতা।

তারাপদ সন্ত্র : *শরৎচন্দ্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য*, ঋক প্রকাশনী, ১৫৪ আচার্য প্রফুল্ল রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬।

তানভীর মোকাম্মেল : *চলচ্চিত্রকথা*, বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট, ৬৪/সি গ্রীন রোড, ঢাকা ১২০৫, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

: *সিনেমার শিল্পরূপ, অনার্য, ১০৭/১ বক্সকালভার্ট রোড, পল্টন, ঢাকা ১০০০।*

দিলীপ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক) *আইজেনস্টাইন*, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- মে ১৯৮৬।

ধীমান দাশগুপ্ত (সম্পাদক) : *চলচ্চিত্রের অভিধান*, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ১৯৮১।

: *চলচ্চিত্র নির্মাণে ডিজিটাল প্রযুক্তি*, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৪।

: *মুভি ফোটোগ্রাফি*, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৪।

ধীমান দাশগুপ্ত : *চিত্রনাট্য রচনা ও চিত্রনাট্য বিশ্লেষণ*, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

: *সিনেমার আঙ্গিক*, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ১৯৯৩।

: *ন্যারেটিভ ফিল্ম নির্মাণ*, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০০৯।

: *কম্পোজিশন*, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৯৭।

: *রঙ*, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ- ফেব্রুয়ারি ২০০৬।

: *সিনেমার ভাষা*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ- পৌষ ১৪১০।

ধীরাজ ভট্টাচার্য : *যখন নায়ক ছিলাম*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১২ বি. সি. বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩।

ধীরেশ ঘোষ : *চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিচালনা, সিনে ক্লাব অফ্ ক্যালকাটা, কলকাতা ৭০০০১৩।*

নাদির জুনাইদ : *দশটি রাজনৈতিক চলচ্চিত্র– বক্তব্য ও নির্মাণশৈলী*, জনান্তিক,

৫০ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা ; প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৭।

নারায়ণ চৌধুরী : *কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র*, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেডে, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২।

নরেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক) : *ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র*, সংহতি পাব্লিশিং হাউজ, ৭নং মুরলীধর সেন লেন, কলকাতা।

নির্মাল্য আচার্য্য ও দিব্যেন্দু পালিত (সম্পাদক) : *শতবর্ষে চলচ্চিত্র* (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১১।

নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায় : *বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র*, আনন্দধারা, ৭৯/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা, প্রথম প্রকাশ– ১২ মে ১৯৮৬।

: *শতবর্ষে চলচ্চিত্র* (দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১১।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত : *নীহাররঞ্জন গুপ্তের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সমগ্র*, মৌ প্রকাশনী, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা ১০০০।

নীহাররঞ্জন রায় : *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড, ২২/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা।

নূরুল আলম আতিক : *নতুন সিনেমা, সময়ের প্রয়োজন*, ঐতিহ্য, রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা।

নৃপেন্দ্র সাহা : *বাংলা থিয়েটারের পূর্বাপর*, তৃণ প্রকাশ, ২৮ নীলকমল কুণ্ডু লেন, শিবপুর, হাওড়া ৭১১১০২।

পরিমল ভট্টাচার্য (অনুবাদ/গ্রন্থনা/ভাষ্য) : *বার্গম্যান, আপনি*, অবভাস, গড়িয়া স্টেশন রোড, কলকাতা-৮৪।

পেমেন্দ্র মিত্র : *সিনেমার সব উপন্যাস*, পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রোড, কলকাতা ৭০০০০৯।

পুষ্পেন্দু শেখর গিরি : *সিরাজদ্দৌলা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩।*

পূর্ণেন্দু পত্রী : *সিনেমা সংক্রান্ত*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ-জুলাই ২০০৫।

প্রণব কুমার বিশ্বাস : *বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, সমকাল প্রকাশনী, কলকাতা, বাংলা- ১৩৮৪।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় : *নট-নাট্য-চলচ্চিত্রকথা*, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারী ১৯৬০, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা।

ফজলে রাব্বি (প্রকাশক) : *অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন*, ডিসেম্বর ১৯৭১, পাণ্ডুলিপি : অনুবাদ বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ফজলুল হক : *ঋত্বিক কুমার ঘটক– এক বিরলপ্রজ প্রতিভার নাম*, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

বাদল রহমান : *চলচ্চিত্রের ভাষা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ– ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫।

বাঁধন সেনগুপ্ত : *ঋত্বিক চলচ্চিত্র কথা*, প্রথম সংস্করণ-২০০৩, পুনশ্চ, ৯এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা।

বাসুদেব রায় : *মনসামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ*, পাঠক বন্ধু লাইব্রেরী, ৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।

বিকাশ চক্রবর্তী : *কাব্য, প্রতীকীবাদ ও আধুনিক উপন্যাসের ধারা*, চৌরঙ্গ, শ্রাবন ১৩৭৫ সংখ্যা।

বিকাশ মজুমদার : *আবু ইসহাক : সমাজবাস্তবতার কথাকার*, বলাকা, ৪০ মোমিন রোড, কদমমোবারক মার্কেট চট্টগ্রাম, প্রথম প্রকাশ– ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৬।

বিজয় রায় (প্রকাশক) : *চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ৬৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা।

বিভাস মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক) : *চলচ্চিত্র চর্চা, ঋত্বিককুমার ঘটক : সামগ্রিক মূল্যায়ন*, ব্রহ্মপুর, কলকাতা ৭০০০৯৬।

: *চলচ্চিত্র চর্চা, প্রসঙ্গ : ঋত্বিককুমার ঘটক চলচ্চিত্র সমালোচনা*, ব্রহ্মপুর, কলকাতা ৭০০০৯৬।

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা, পরিমার্জিত সংস্করণ, মে ২০১৩।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত : *কীভাবে ছবি করি কীভাবে ছবি হয়*, পরম্পরা প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ– জানুয়ারি ২০১১।

ব্রজসুন্দর দাস : *অভিনেতার চরিত্র নির্মাণ*, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা।

ভুঁইয়া ইকবাল : *বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০।

ভূদেব চৌধুরী : *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা।

মতলুব আলী : *জয়নুলের জলরঙ*, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০।

মনসুর মুসা : *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ১০ সাহেব বাজার ঢাকা।

মনিস রফিক (সম্পাদক) : *সুবর্ণরেখা– প্রসঙ্গ ঋত্বিক*, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

মনীন্দ্র চক্রবর্তী : *দরদী শরৎচন্দ্র*, বসুধারা প্রকাশনী, ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা ৬।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত : *মেঘনাদবধ কাব্য*, সাহিত্যম্, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *পদ্মানদীর মাঝি*, মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস সম্পাদিত, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ– জুলাই ২০০৫।

মাসুদ-উর-রহমান : *ফটোগ্রাফি বিদ্যা*, আলভী এন্টারপ্রাইজ, ৪২/১ ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০।

: *চলচ্চিত্র স্মৃতি ও আমি, জ্যোতিপ্রকাশ*, ৪২/১ ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০।

: *চলচ্চিত্রের কারিগরীমান, জ্যোতিপ্রকাশ*, ৪২/১ ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০।

মির্জা তারেকুল কাদের : *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ– জুন ১৯৯৩।

মুহম্মদ খসরু : *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন*, পড়ুয়া, ৪৫ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০।

মুহাম্মদ ফজলুল হক : *বাংলার মসনদ ও নবাব সিরাজউদদৌলা*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

মো. আবু হানিফ শেখ : *বাংলাদেশের নদ-নদী ও নদী তীরবর্তী জনপদ*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন : *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ* (২০১৩), রোদেলা প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ম্যাক্সিম গোর্কি : *মা*, অনুবাদ– পুষ্পময়ী বসু, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ-১৯৯৬, সম্পাদনা ও ভূমিকা– ড. সফিকুন্নবী সামাদী, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৬৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা।

মৃণাল সেন : *চলচ্চিত্র* ভূত-*বর্তমান-ভবিষ্যৎ*, গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ– জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪।

রজত রায় ও সোমেশ্বর ভৌমিক (সম্পাদক) : *সিনেমা সময় সমাজ*, জানুয়ারী ১৯৮৭, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

রফিকউল্লাহ খান : *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৮৭-১৯৮৭*, প্রথম প্রকাশ : জৈষ্ঠ ১৪০৪, গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *গল্পগুচ্ছ* (অখন্ড সংকলন), বিশ্বসাহিত্য ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

রাধারানী দেবী : *শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯।

শর্মিলা ঘোষ (সম্পাদক) : *চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ (প্রথম খণ্ড)*, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেডে, ৬৮ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩।

: *চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ (দ্বিতীয় খণ্ড)*, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেডে, ৬৮ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩।

শম্ভু মিত্র : *চাঁদ বণিকের পালা*, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩।

শামসুজ্জামান খান (সম্পাদক) : *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য (প্রথম খণ্ড)*, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ– জানুয়ারি ১৯৯৮, গুপ্ত প্রেস, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

শেখ আমিনুল ইসলাম (সম্পাদক) : *এক মুঠো চলচ্চিত্র*, প্রথম আন্তর্জালিক সংস্করণ ০৬ চৈত্র ১৪১৭, প্রতীতি প্রকাশনা, ঢাকা।

: *এক মুঠো চলচ্ছবি*, দ্বিতীয় আন্তর্জালিক সংস্করণ ০৯ ফাল্গুন ১৪১৮, প্রতীতি প্রকাশনা, ঢাকা।

শিবাদিত্য দাশগুপ্ত ও সন্দীপন ভট্টাচার্য (সম্পাদক) : *সাক্ষাৎ ঋত্বিক*- জানুয়ারি ২০০০, কলকাতা।

সত্যজিৎ রায় : *অপুর পাঁচালি*, পঞ্চম মুদ্রন- ডিসেম্বর ২০১০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।
: *একেই বলে শুটিং*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।
: *বিষয় চলচ্চিত্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।
: *যখন ছোট ছিলাম*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় : *কালিকট থেকে পলাশী*, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৫৬, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯।

সতীশচন্দ্র শীল : *দেবদেবীতত্ত্ব (১ম খণ্ড)*, শ্রীভারতী পাবলিশিং কোং, ১৭০ রমেশ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা-৬।

সন্দীপন ভট্টাচার্য (সংকলক) : *ঋত্বিককুমার ঘটক– নিজের পায়ে নিজের পথে*, নতুন মুদ্রণ- ২০১৬, মনফকিরা, ২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১, নবোদিত, মুকুন্দপুর, কলকাতা।

সরিফা সালোয়া ডিনা : *শহীদুল্লা কায়সারের উপন্যাস : বিচিত্র বীক্ষণ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, বেজমেন্ট ৫৫, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, ২৫৩-৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড, কাঁটাবন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৮।

সাজেদুল আউয়াল : *ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র : সমাজবাস্তবতা ও নির্মাণভাবনা*, গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০।
: *চলচ্চিত্রকলার রূপ-রূপান্তর*, দিব্যপ্রকাশ, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
: *চলচ্চিত্রকলা*, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০।

সের্গেই আইজেনস্টাইন : অ্যান অ্যামেরিকান ট্র্যাজেডি, ভাষান্তর- তপন দাস, বাকৃশিল্প, ১৭-সি তেলিপাড়া লেন, কলকাতা ৭০০০৩১।

সুকুমার সেন : *ভাষার ইতিবৃত্ত*, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ-১৯৭৫।
: *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*– আদি হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত, মডার্ন বুক এজেন্সী, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা, ১৯৪০।

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য : *ছোটোগল্পের পর্ব-পর্বান্তর*, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ১৯৯৯, প্রতিভাস, ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ৭০০০০২।

সুবোধ ঘোষ : *অযান্ত্রিক* (ছোটগল্প, গল্পসমগ্র-১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা। পৃ. ৪৫১-৪৫৫।

সুব্রত রুদ্র (সম্পাদক) : *সেই ঋত্বিক*, প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ৭০০০০২।

সুব্রত বড়ুয়া : *কথাশিল্পী শহীদুল্লা কায়সার : জীবন ও কর্ম*, চারুলিপি

প্রকাশন ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।

সুরমা ঘটক : *ঋত্বিক– পদ্মা থেকে তিতাস*, ২য় মুদ্রণ– ১৯৯৯, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা।

সোনিয়া মুর : *স্তানিস্লাভ্স্কির অভিনয় পদ্ধতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০।

সোমেন ঘোষ : *সেলুলয়েডের মহান কথাকারেরা*, প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ৭০০০০২।

সোমেশ্বর ভৌমিক : *সিনেমা এবং কয়েকজন*, প্রথম প্রকাশ– জানুয়ারি ২০১৪, মুদ্রক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা।

: *সেন্সর ও সিনেমা*, প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা ১৭।

সৌমেন গুহ : *সের্গেই আইজেনস্টাইন : জীবন ও চলচ্চিত্র (১৮৯৮-১৯৪৮)*, দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯।

সৈকত আসগর : *হীরালাল সেন*, গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০, প্রথম প্রকাশ– ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩।

হাজী মজিবর রহমান (প্রকাশক) : *শরৎ রচনাসমগ্র*– ২, মলি প্রকাশনী, ২২ রাফিন প্লাজা, মিরপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫।

হাসান রাউফুন : *চলচ্চিত্র শিক্ষা*, জ্যোতিপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১০।

হেমেন্দ্রকুমার রায় : *সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র*, এম সি সরকার এন্ড সন্স লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা।

হুমায়ুন আহমেদ : *ছবি বানানোর গল্প*, সুবর্ণ, ১৫০ ঢাকা স্টেডিয়াম, ঢাকা ১০০০।

হুমায়ুন কবির : *শরৎ-সাহিত্যের মূলতত্ত্ব*, বিশু মুখোপাধ্যায় অনূদিত, শোভা প্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট, ঢাকা-১০০০, দ্বিতীয় প্রকাশ– জুলাই ২০১৩।

গ. সহায়ক-পত্রিকা

এক্ষণ : নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত, সুবর্ণরেখা, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা।

চলচ্চিত্র : *চলচ্চিত্র : প্রথম পর্যায়*, আশ্বিন ১৩৫৭ সংখ্যা, কমল মজুমদার, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, নরেশ গুহ, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ সেন সম্পাদিত, প্রকাশক– দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা।

চলচ্চিত্রপত্র : *সূর্য দীঘল বাড়ী বিশেষ সংখ্যা*, সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা,

সেপ্টেম্বর ১৯৮১, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১০ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

দেশ : ১৭ জুন ১৯৯৫ সংখ্যা, কলকাতা।

দৈনিক কালের কণ্ঠ : ৬ আগস্ট ২০১৫ সংখ্যা, ঢাকা।

দৈনিক প্রথম আলো (ছুটির দিনে) : মুদ্রিত সংস্করণ, ৭ জানুয়ারি ২০১২, ঢাকা।

দৈনিক সমকাল : ২৪ নভেম্বর ২০১৭ সংখ্যা, ঢাকা।

বসুমতী : ৮ জুলাই ১৯৬৫ সংখ্যা, কলকাতা।

বায়স্কোপ : বিশিষ্ট সংখ্যা–১৯৩০, কলকাতা।

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা : দ্বিতীয় সংখ্যা- মে ১৯৮৬, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

: সত্যবতী গিরি সম্পাদিত *(১৯৮৮-৮৯)*, তৃতীয় সংখ্যা- মার্চ ১৯৮৯, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

বিশ্বভারতী পত্রিকা : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসে গোষ্ঠীজীবনচেতনা*, মাঘ-চৈত্র সংখ্যা ১৪১৩, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ-৬, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭।

: প্রসূন ঘোষ, *মঙ্গলকাব্য ও আধুনিক উপন্যাস*, মাঘ-চৈত্র সংখ্যা ১৪১৩, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ-৬, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭।

ভারতবর্ষ : *শরৎ স্মরণ সংখ্যা*, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, নাথ ব্রাদার্স ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা।

ভোরের পাতা : ঈদ সংখ্যা-২০১৫, ঢাকা।

মাসিক পূবালী : ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ঢাকা।

সচিত্র স্বদেশ : জাকিউদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত, ১ম বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ২০ আগষ্ট ১৯৮১।

সাতকাহন : রিয়া দাশগুপ্তা সম্পাদিত, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অক্টোবর-২০১২।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা : ৮ম বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ১৬ নভেম্বর ১৯৭৯, শামসুর রাহমান সম্পাদিত, দৈনিক বাংলা ভবন, ১ নং ডি. আই. টি. এভেন্যু, ঢাকা।

: ৮ম বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ২৩ নভেম্বর ১৯৭৯।

: ৮ম বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ১১ জানুয়ারী ১৯৮০।

: ৯ম বর্ষ ১ সংখ্যা, ২৩ মে ১৯৮০।

: ৯ম বর্ষ ১৬ সংখ্যা (ঈদ-উল আযহা সংখ্যা), ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮০।

: ৯ম বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ১৭ অক্টোবর ১৯৮০।

: ৯ম বর্ষ ২১ সংখ্যা, ৭ নভেম্বর ১৯৮০।

: ৯ম বর্ষ ২৩ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮০।

: ৯ম বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮০।

ঘ. সহায়ক প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ভূমিকা

অপরেশ কুমার ব্যানার্জী : ভূমিকা, *চলচ্চিত্র শিক্ষা*, হাসান রাউফুন রচিত, জ্যোতিপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১০।

অসিত সেন : 'পরিচালকের দায়-দায়িত্ব', *শতবর্ষে চলচ্চিত্র* ১*ম খণ্ড*, নির্মাল্য আচার্য্য ও দিব্যেন্দু পালিত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জনিুয়ারি, ২০১১।

অনুপম হায়াৎ : *চলচ্চিত্রে দেবদাস*, *ভোরের পাতা*, ঈদ সংখ্যা– ২০১৫, ঢাকা।

আবুল কাশেম ফজলুল হক : *নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধ*, এনটিভি ডট কম, ২৩ জুন ২০১৫।

আশুতোষ ভট্টাচার্য : ভূমিকা– মেঘনাদবধ কাব্য, সাহিত্যম্, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা।

ঋত্বিক ঘটক : 'ছবির মাপকাঠি', *সুবর্ণরেখা– প্রসঙ্গ ঋত্বিক*, মনিস রফিক সম্পাদিত, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

কে এম মোহসীন : মুখবন্ধ– *বাংলার মসনদ ও নবাব সিরাজউদদৌলা*, মুহাম্মদ ফজলুল হক প্রণীত, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

গুরুদাস ভট্টাচার্য : *প্রসঙ্গ ঋত্বিককুমার ঘটক : সামগ্রিক মূল্যায়ন*, 'ঋত্বিক ঘটক গঙ্গা থেকে সুবর্ণরেখা থেকে তিতাস', চলচ্চিত্র চর্চা, বিভাস মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ব্রহ্মপুর, কলকাতা।

গৌতম ভদ্র : 'তিতাস একটি নদীর নাম : মালোর চোখে– তিতাস একটি নদীর নাম : মধ্যবিত্তের চোখে' গৌতম ভদ্র, *চলচ্চিত্র চর্চা*, বিভাস মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ব্রহ্মপুর, কলকাতা।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত : চলচ্চিত্রের শিল্পপ্রকৃতি, *চলচ্চিত্র কথা*, অসীম ঘোষ সম্পাদিত, রূপরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা– ৯।

জাকিউদ্দিন আহমেদ (সম্পাদক) : *মেক-আপ শিল্প এবং নানাবিধ*– সচিত্র স্বদেশ, ১ম বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ২০ আগষ্ট ১৯৮১।

জাঁ বেনোয়া লেভি : 'চলচ্চিত্রের সাধনা', *চলচ্চিত্র : প্রথম পর্যায়*, আশ্বিন ১৩৫৭ সংখ্যা, কমল মজুমদার, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, নরেশ গুহ, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ সেন সম্পাদিত, প্রকাশক– দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা।

তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত : ভূমিকা– নারায়ণ দেব রচিত *পদ্মাপুরাণ*, শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৭), হাজরা রোড, কলকাতা।

দিব্যেন্দু পালিত : *চলচ্চিত্র কথা*, অসীম সোম সম্পাদিত, রূপরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ– জুন ১৯৭৫।

ধীমান দাশগুপ্ত : 'সাহিত্যের ভাষা বনাম চলচ্চিত্রের ভাষা : সংঘাত ও

সমন্বয়', *বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়*, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি ; বাংলা বিভাগ, চন্দননগর কলেজ, জানুয়ারি ২০১১।

পবিত্র সরকার : *বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়*, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি, বাংলা বিভাগ, চন্দননগর কলেজ, জানুয়ারি ২০১১।

পার্থ রাহা : 'চলচ্চিত্র ও সাহিত্য', *বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়*, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি ; বাংলা বিভাগ, চন্দননগর কলেজ, জানুয়ারি ২০১১।

প্রবীর সেন : 'ঋত্বিক কুমার ঘটকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার' *ঋত্বিক ঘটক*, অতনু পাল সম্পাদিত, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা, ১৯৮৮।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য : ভুমিকা– কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত *মনসামঙ্গল*, সম্পাদনা– বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, দশম মুদ্রণ ২০১৫, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি।

বিভাস চক্রবর্তী : 'থিয়েটার ও সিনেমা', *শতবর্ষে চলচ্চিত্র– প্রথম খন্ড*, নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১১।

বিশ্বজিৎ ঘোষ : ভূমিকা– *তিতাস একটি নদীর নাম*, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, আজকাল প্রকাশনী, পুনর্মুদ্রণ– আগস্ট ২০১১, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।

: বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০।

বীতশোক ভট্টাচার্য : *প্রসঙ্গ ঋত্বিককুমার ঘটক : সামগ্রিক মূল্যায়ন*, 'যন্ত্র, জন্তু, মানুষ এবং ঋত্বিক', চলচ্চিত্র চর্চা, বিভাস মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ব্রহ্মপুর, কলকাতা।

মইনুদ্দীন খালেদ : 'ঋত্বিক ঘটকের তিতাস একটি নদীর নাম', *সুবর্ণরেখা– প্রসঙ্গ ঋত্বিক*, মনিস রফিক সম্পাদিত, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

মলয় দেব : 'বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে সমাজ ও মানুষ', *সিনেমা সময় সমাজ*, সম্পাদনা– রজত রায় ও সোমেশ্বর ভৌমিক, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

মানজারেহাসীন মুরাদ : ভূমিকা, *চলচ্চিত্র শিক্ষা*, হাসান রাউফুন রচিত, জ্যোতিপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১০।

মাসুদ শামস আলদীন : ভূমিকা– *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* (নাটক), সিকান্দার আবু জাফর রচিত, স্বদেশ প্রকাশ, ৩৪/২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মিছিল খন্দকার : *বাংলা চলচ্চিত্রের উত্থানপর্বে লোককাহিনি*, দৈনিক সমকাল, ২৪ নভেম্বর ২০১৭ সংখ্যা, ঢাকা।

মুনমুন হোড় সিন্‌হা : 'যুগ্ম আহ্বায়কের নিবেদন', *বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়*, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি ; বাংলা বিভাগ, চন্দননগর

Dhaka University Institutional Repository

কলেজ, জানুয়ারি ২০১১।

মুহম্মদ খসরু : 'শেষ সাক্ষাৎকার প্রথম নমস্কারের আগে', *সুবর্ণরেখা– প্রসঙ্গ ঋত্বিক*, মনিস রফিক সম্পাদিত, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

মৃণাল সেন : 'সিনেমার সংকট', *সিনেমা সময় সমাজ*, সম্পাদনা– রজত রায় ও সোমেশ্বর ভৌমিক, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

রাজেন্দ্র কুমার গুপ্ত : ভূমিকা– বিজয় গুপ্ত রচিত *পদ্মাপুরাণ*, রাজেন্দ্র কুমার গুপ্ত সঙ্কলিত, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, ক্যানিং স্ট্রীট, কলকাতা।

শঙ্খ ঘোষ : 'ফিল্মের মধ্যে কবিতা', *শতবর্ষে চলচ্চিত্র- প্রথম খন্ড*, প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১১, নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

শতদ্রু চাকী : 'প্রসঙ্গ ঋত্বিককুমার ঘটক : চলচ্চিত্র সমালোচনা', *চলচ্চিত্র চর্চা*, বিভাস মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ব্রহ্মপুর, কলকাতা।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় : 'সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের আন্তঃসম্পর্ক', *বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়*, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি ; বাংলা বিভাগ, চন্দননগর কলেজ, জানুয়ারি ২০১১।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় : 'সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের আন্তঃসম্পর্ক', *বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়*, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি ; বাংলা বিভাগ, চন্দননগর কলেজ, জানুয়ারি ২০১১।

শহীদুল্লা কায়সার : তৃতীয় মুদ্রনে লেখকের ভূমিকা, *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী*, গোলাম সাকলায়েন সম্পাদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৮১।

শিবেশ চট্টোপাধ্যায় : 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : দরদী জীবনশিল্পী', ডঃ অরুণ সান্যাল সম্পাদিত- *প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস*, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ৪ কলেজ রোড, কলিকাতা-৯।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় : 'ঋত্বিক ঘটক– চিন্তা ও সৃষ্টি', *শতবর্ষে চলচ্চিত্র* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ-চতুর্থ মুদ্রণ নভেম্বর ২০১১, নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

সব্যসাচী দেব : 'সূচক ভাষণ', *বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়* পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি ; বাংলা বিভাগ, চন্দননগর কলেজ, জানুয়ারি ২০১১।

সিমিত রায় অন্তর : *সিনেমার আয়-ব্যয় ও ফাঁকা বুলি*, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৬ আগস্ট ২০১৫ সংখ্যা, ঢাকা।

সুকুমার সেন : ভূমিকা– *শরৎ রচনাসমগ্র* ২, মলি প্রকাশনী, ২২ রাফিন প্লাজা, মিরপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫।

স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায় : 'সূর্য দীঘল বাড়ি', সাপ্তাহিক বিচিত্রা (৮ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা), ১১ জানুয়ারী ১৯৮০, দৈনিক বাংলা ভবন, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ : *লাল নীল দীপাবলি*, পেপারব্যাক সংস্করণ : শ্রাবণ ১৪২৩,

Dhaka University Institutional Repository

আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

ঙ. সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

A Berriedale Keih : *Indian Mythology*, Mittal Publication, A-1/8, Mohan Garden, New Delhi-110 059.

Arthur Cotterell : *The Encyclopedia of Mythology*, Anness Publishing Ltd., Hermes House, 88-89 Blackfriars Road, London SEI 8HA.

David Bordweel and Kristin Thompson : *Film Art : An Introduction*, Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi-110001.

David Parkinson : *History of Film*, (Thames and Hudson, Italy, Reprinted 1997).

Donald A. Mackenzie : *Indian Myth and Legend*, The Gresham Publishing Company, 34 Southampton ST. Strand London.

Ernst Ingmar Bergman : *The English Literature Companion*, Google Book, By Julian Wolfreys.

H. J. Rose : *A Handbook of Greek Mythology*, Methuen & co. Ltd., Sixth edition 1958, ISBN: 0-203-42176-0.

Haig P. Manoogain : *The Film Makers Art.*

Helen A. Clarke : *A Guide to Mythology*, Doubleday, Page & Company, Garden City, New York.

Ivo Blom : *Jean Desmet and the Early Dutch Film Trade*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2003, ISBN: 90 5356 570 1.

James Fergusson : *Tree and Serpent worship : or Illustration of Mythology and Art in India*, H. Allen and Co., 13, Waterloo Palace, S.W. Publishers to the India Office.

Jean-Lue Comolli and Paul Narboni : *Cinema/ideology/criticism* : *The Film Studies Reader*, Edited by : Joanne Hollows, Peter Hutchings and Mark Jancovich, Oxford University Press Inc., New York.

Karin Bijsterveld & José van Dijck (Edited) : *Sound Souvenirs: Audio Technologies, Memory and Cultural Practices*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009, ISBN 978 90 8964 132 8.

Kristin Thompson and David Bordweel : *Film History*, McGraw-Hill Companies, 1221 Avenue of the America, New York, ISBN 0-07-038429-0.

L. de Blois and R. J. van der Spek : *An Introduction to the Ancient World*, Second edition published 2008, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon. OX14 4RN.

Marianne van den Boomen, Sybille Lammes, Ann-Sophie Lehmann, : *Digital Material: Tracing New Media in Everyday Life and Technology*, Amsterdam University Press, ISBN: 978 90 8964 068 0.

Dhaka University Institutional Repository

Joost Raessens, and Mirko Tobias Schäfer (Edited)
Pierre Leprohon : *Michelengelo Antonioni*.
Rev. A. Smythe Palmer : *Folk-Etymology*, George Bell and Sons, York Street, Covent Garden, London.
Richard Allen and Malcolm Turvey (Edited) : *Camera Obscura, Camera Lucida: Essays in Honor of Annette Michelson*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2003, ISBN: 90 5356 494 2.
Ritwik Ghatak : *Cinema and I*, Ritwik Memorial Trust, 1/10 Prince Golam Mohd Road, Calcutta-700026.
Rudolf Arnheim : *Film as Art*, University of California Press, USA, ISBN: 0-520-24837-6.
Sergei Eisenstein : *Film Form*, A Harvest/HBJ Book, Harcourt Brace Jovanovich, New York and London, ISBN 0-15-630920-3.
: *The Film Sense*, edited and translated by : Jay Leyda, Meridian Books, New York 1957.
Tim Bergfelder, Sue Harris, Sarah Street : *Film Architecture and the Transnational Imagination*, Amsterdam University Press, ISBN: 978 90 5356 984 9.
V. I. Pudovkin : *Film technique & Film Acting*, Translated by Ivor Montagu, First American Edition, Bonanza Books, New York.
W. Crooke B. A. : *An Introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India*, The Government Press, North Western Provinces and Oudh, Allahabad, India.
William Ckooke : *An Introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India*, Publisher Allahabad: Printed at the government press, North-Western Provinces and Oudh.

চ. ইন্টারনেটে প্রকাশিত সহায়ক প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ভিডিওচিত্র

http://en.wikipedia.org/wiki/Sumer
http://www.history-of-china.com/spring-and-autumn-period/mozi.htm
http://www.obscurajournal.com/history.php
http://www.pbs.org/wgbh/masterpiece/learningresources/fic_adaptation.html
http://d2buyft38glmwk.cloudfront.net/media/cms_page_media/11/FITC_Adaptation_1.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_based_on_poems
https://books.google.com.bd/books?id=N4YdBQAAQBAJ&pg=PA237&dq=Film+has+nothing+to+do+with+Literature&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiYhJCTtoHXAhWJs48KHStsAeYQ6AEIJDAA#v=onepage&q=Film%20has%20nothing%20to%20do%20with%20Literature&f=false

Dhaka University Institutional Repository

https://bn.wikipedia.org/wiki/সত্যজিৎ_রায়ের_ চলচ্চিত্র
http://www.cinemacom.com/2002-sight-sound.html
https://samakal.com/cinematic/article/17111548/বাংলা-চলচ্চিত্রের-উত্থানপর্বে-লোককাহিনি
http://www.kalerkantho.com/print-edition/ronger-mela/2015/08/06/252833
https://www.youtube.com/watch?v=wAIUccGSuz8
https://bangla.bdnews.24com/glitz/article.1447530bdnews
http://bn.vikaspedia.in/InDG
https://medium.com/@krisgage/there-are-several-types-of-love-59141dea1689
http://www.ntvbd.com/opinion/12563/
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=বিজয়_গুপ্ত
http://www.somewhereinblog.net/blog/raisul_juhala/29445737
https://bn.wikipedia.org/wiki/চাঁদসওদাগর_সদাগর
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=বিশ্বকর্মা_পূজা
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/116468/7/07_chapter%201.pdf
http://community.skynetjp.com/id26.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_based_on_poems
http://flavorwire.com/387561/10-great-movies-based-on-poems
http://satkahan.weebly.com/245324762495-2451-245324762495246824942480-24552482250924741.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Minimalism
https://www.ebanglalibrary.com/ হুলিয়া/
http://satkahan.weebly.com/245324762495-2451-245324762495246824942480-24552482250924741.html
https://bangla.bdnews24.com/glitz/article1435592.bdnews

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকারপঞ্জি

ঋত্বিক ঘটক : সাক্ষাৎকার : প্রবীর সেন, *সুবর্ণরেখা– প্রসঙ্গ ঋত্বিক* (২০১১), মনিস রফিক সম্পাদিত, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

: স্বাক্ষাৎকার : এফ. সা. বিজয় সোনি ও নেত্র সিং রাওয়াত, মার্চ ১৯৮৬, *সুবর্ণরেখা– প্রসঙ্গ ঋত্বিক* (২০১১), মনিস রফিক সম্পাদিত, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

: সাক্ষাৎকার : জগৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ : ধ্বনি ৩য় বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।

কবরী : *তিতাস একটি নদীর নাম* চলচ্চিত্রে রাজার ঝি চরিত্রে অভিনয়কারী, সাক্ষাৎকার : Cinemascope, *Ritwik Ghatak Retrospective* (Documentry), চিত্রনাট্য ও পরিচালনা– মুকুট ভট্টাচার্য ও সৌরজিৎ রায়, সম্পাদনা– ইন্দ্রজিৎ শীল, ভারত।

গৌতম ঘোষ : গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলকাতা: তারিখ– ০৬.০১.২০১৪ (গৌতম ঘোষের নিজ বাসায় এই গবেষক কর্তৃক ভিডিও ক্যামেরায় ধারণকৃত)।

: স্বাক্ষাৎকার : জয়ন্ত সাহা, গ্লিটজ, বিডি নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, তারিখ– ১৫ জানুয়ারি ২০১৮।

চাষী নজরুল ইসলাম : গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কমলাপুর, ঢাকা, তারিখ– ২১.০৪.২০১১ (চাষী নজরুল ইসলামের নিজ বাসায় এই গবেষক কর্তৃক ভিডিও ক্যামেরায় ধারণকৃত)।

তানভীর মোকাম্মেল : সাক্ষাৎকার: জাপান ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম 'কমিউনিটি নিউজ', সম্পাদনা– জেড এম আবুসিনা, সাগামিহারা, কানাগাওয়া, জাপান।

: এই গবেষককে দেওয়া লিখিত সাক্ষাৎকার, তারিখ– ২৭ এপ্রিল ২০১৮।

নির্মলেন্দু গুণ : স্বাক্ষাৎকার: রুদ্র হক, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, বিভাগ- গ্লিটজ, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭।

: গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (পাঠক সমাবেশে এই গবেষক কর্তৃক ভিডিও ক্যামেরায় ধারণকৃত), শাহবাগ, ঢাকা, তারিখ- ১৯ এপ্রিল ২০১৮।

ফারুক : সারেং বউ চলচ্চিত্রের নায়ক ফারুকের (পুরো নাম: আকবর হোসেন পাঠান দুলু) সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, উত্তরা, ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ (ফারুকের নিজ বাসায় এই গবেষক কর্তৃক ভিডিও ক্যামেরায় ধারণকৃত)।

মসিহউদ্দিন শাকের : পরিচালক– 'সূর্য দীঘল বাড়ী' চলচ্চিত্র, মসিহউদ্দিন শাকেরের নিজ বাসায় এই গবেষক কর্তৃক মৌখিক গ্রহণকৃত সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ০৪ জুন ২০১৫।

Dhaka University Institutional Repository

হাবিবুর রহমান খান : প্রযোজক– *তিতাস একটি নদীর নাম* (চলচ্চিত্র, ১৯৭৩), গবেষকের সঙ্গে হাবিবুর রহমান খানের নিজ বাসায় (গুলশান, ঢাকা) ভিডিও ক্যামেরায় ধারণকৃত সাক্ষাৎকার, ২৭ মে ২০১৮।

— ০ —

Dhaka University Institutional Repository